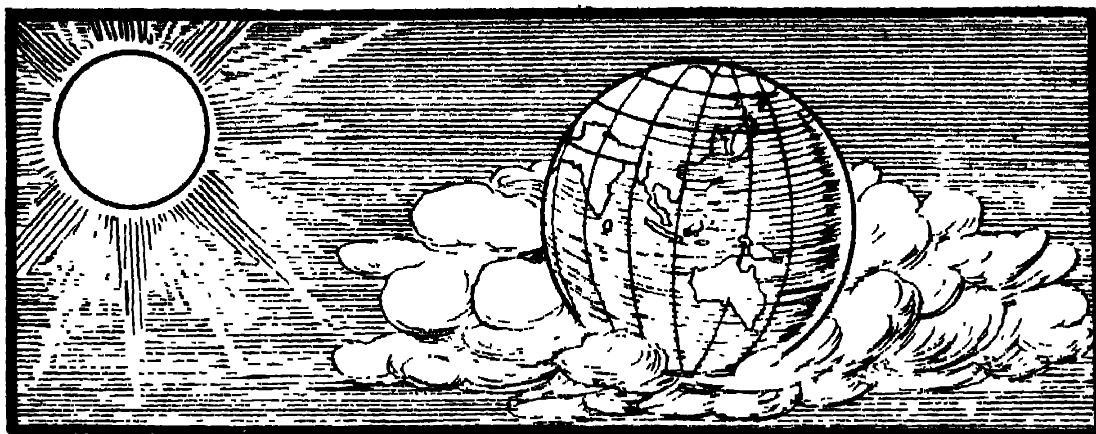
শিশু-ভারতী

[ছেলেদের বিশ্বকোষ]

সম্পাদক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিষয়-বিভাগ

পঞ্চম-খণ্ড ২১ হইতে ২৫ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৬০১ হইতে ২০০০



এখানে সংক্ষিপ্তভাবে পঞ্চম খণ্ডের বিষয়-বিন্যাস ও সূচীপত্র দেওয়া হইল। সমুদয় খণ্ড সম্পূর্ণ হইলে স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত সূচীপত্র (Index) দেওয়া হইবে।

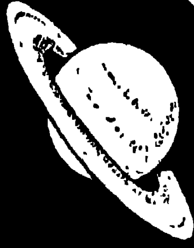
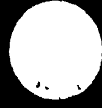
পঞ্চম খণ্ডের সূচীপত্র

পৃ
প্র
বি
ব্যা
ভূ-
মান
রাজ
স
শব্দ
শ
শরীর
স
সঞ্চয়
সা
পৃথি
সাহিত্
বৈ

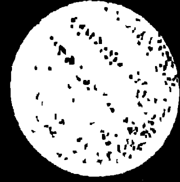


গ্রহরাজ বৃহস্পতি

আকাশের কথা





গ্রহরাজ বৃহস্পতি



এইবার তোমাদের গ্রহরাজ বৃহস্পতির কথা বলিব। শাস্ত্রে লেখা আছে, বৃহস্পতি দেবতা-দের গুরু এবং বিদ্যা ও বুদ্ধিতে অদ্বিতীয়। বৈজ্ঞানিকেরা ত আর শাস্ত্র মানেন না, কোনও জিনিষ সঠিক বলিয়া প্রমাণ না হইলে তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাঁহাদের কৌতূহল অদ্ভুত এবং তাঁহারা শীঘ্রই জানিতে পারিলেন যে, বৃহস্পতি সূর্য্যের একটি গ্রহমাত্র। সূর্য্যের গ্রহগুলির মধ্যে ইহাই সবচেয়ে বড়। সেই-জন্যই জ্যোতিষীরা বৃহস্পতিকে 'গ্রহরাজ' বলিয়া থাকেন। যথার্থই বৃহস্পতি গ্রহদের রাজা। ইহার আয়তন ছোট-খাটো সূর্য্যেরই মতন। ইহার ব্যাস মোটামুটি হিসাবে ৮৬,৭২০ মাইল হইবে। বৃহস্পতি ঠিক গোলাকার নহে ও দুই পাশে মেরুর দুইটি জায়গায় কিঞ্চিৎ চাপা। উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত ব্যাসের পরিমাণ ৮১,৮৮০ মাইল। কিন্তু নিরক্ষ-বৃত্তের (Equatorial) ব্যাসের দৈর্ঘ্য ৮৮,৬৪০ মাইল। বৃহস্পতির আয়তন এত বড় যে, পৃথিবীর মতন ১,৩১২টি গোলক সহজেই ইহার মধ্যে ঢুকিয়া থাকিতে পারে। বৃহস্পতির ওজন কিন্তু সেই পরিমাণে বেশী নয়। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, আয়তনে খুব বড় হইলেও ইহা ওজনে কেবলমাত্র ৩১৭টি পৃথিবীর সমান। ইহার ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের একচতুর্থাংশ মাত্র।

পৃথিবী আমাদের যত জোরে টানিতেছে, তাহা অপেক্ষা ২৬ গুণ জোরে বৃহস্পতি তাহার পৃষ্ঠের উপরকার জিনিষগুলিকে টানিতেছে। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ নিশ্চয় নামজাদা খেলোয়াড় এবং উল্লম্ফন-প্রতিযোগিতায় বোধ হয় পুরস্কারও পাইয়াছ। যে প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছে ধর সে এই পৃথিবীতে ২০ ফিট লাফাইতে পারে। বৃহস্পতিতে গেলে তাহার কিন্তু সেই আস্ফালন কিম্বা অহঙ্কার থাকিবে না। সেইখানে গিয়া সে আট ফিটও লাফাইতে পারিবে কিনা সন্দেহ।

সূর্য্যের চারিধারে একবার ঘুরিয়া আসিতে বৃহস্পতির প্রায় বার বৎসর লাগে। পথটা লম্বাও বটে এবং গ্রহরাজের আকারও বৃহৎ সেইজন্য তিনি গজেন্দ্রগমনেই চলিয়া থাকেন। পৃথিবীর গতির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৯ মাইল, কিন্তু বৃহস্পতির গতির হার সেকেণ্ডে আট মাইল মাত্র। সূর্য্য রাজ-চক্রবর্ত্তী এবং বৃহস্পতি গ্রহরাজ। গ্রহরাজ-

বড় বেশী সূর্য্যের নিকটে আসেন না এবং গড়ে ৪৮৩,২০০,০০০ মাইল দূরে থাকিয়াই প্রদক্ষিণ করেন। কখনও কখনও দূরত্ব কমিয়া ৪৬০,০০১,০০০ মাইল হয় এবং কখনও কখনও বাড়িয়া ৫০৭,০০০,০০০ মাইল হয়। নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরপাক্ খাইতে বৃহস্পতির প্রায় দশ ঘণ্টা লাগে। অন্য কোনও গ্রহ এত তাড়াতাড়ি ঘুরপাক খায় না। একবার ঘুরপাক খাইতে প্রকৃত কত সময় লাগে, সঠিক তাহা বলা যায় না। কারণ, ইহা দেখা যায় যে, বৃহস্পতির দেহের বিভিন্ন অংশের দাগগুলি (Spots) ঘুরপাক খাইতে ভিন্ন ভিন্ন সময় লাগে। এই বিষয়ে পরে বিশদভাবে বলিব।

বৃহস্পতির নয়টি চাঁদ—ইহাদের মধ্যে চারটি বড় আর পাঁচটি ছোট। পৃথিবীর যদি এতগুলি চাঁদ থাকিত, কি মজাই হইত। রোজই রাত্রিকালে চাঁদগুলির নানারকম কলা দেখা যাইত। কোনটার পূর্ণিমা, আর কোনটার বা অমাবস্যা হইত। ইতালী দেশের বড় জ্যোতিষী গ্যালিলিও (Galileo) সাহেব বৃহস্পতির চারিটি বড় চাঁদ আবিষ্কার করেন। এই বিষয়ে একটি মজার কাহিনী আছে।



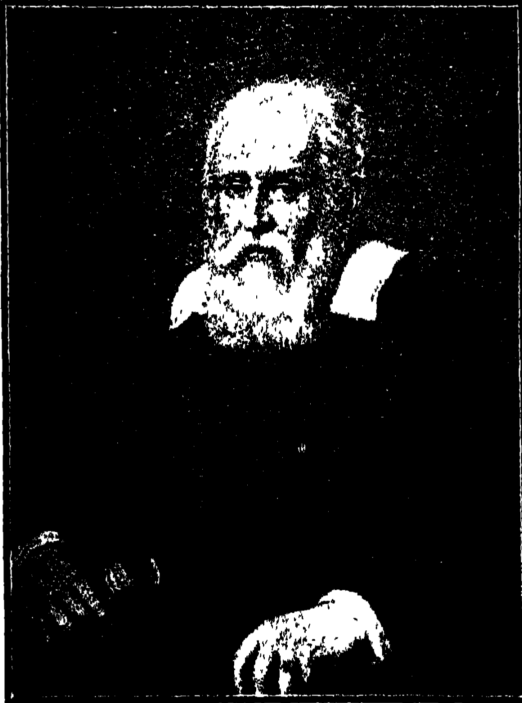
বৃহস্পতি ও পৃথিবীর আপেক্ষিক আয়তন

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে একদিন গ্যালিলিও শুনিলেন যে লিপারসে (Lippershey) ফ্লাণ্ডারস্ (Flanders) প্রদেশের এক চশমা-বিক্রেতা এক অদ্ভুত কাচের যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন। এই যন্ত্র দিয়া দেখিলে

দূরের জিনিষ কাছে আসিয়াছে বলিয়া এইরূপ একটা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিলে



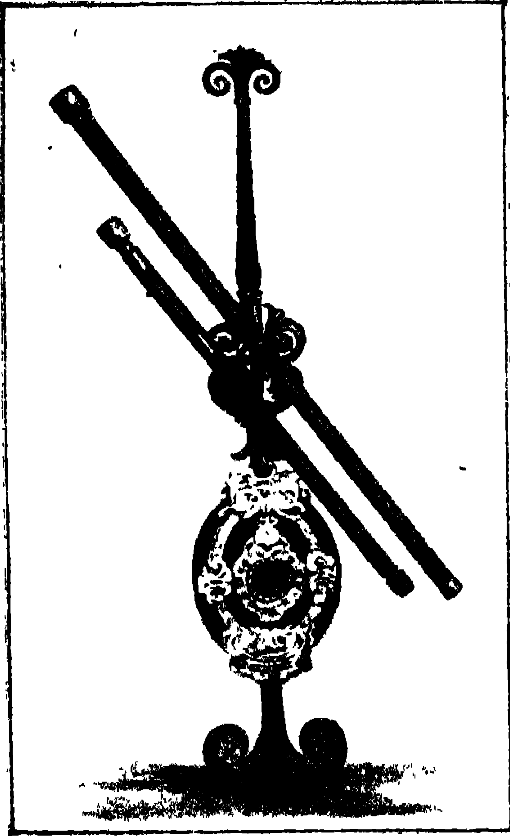
বৃহস্পতি ও ইহার কয়েকটি চাঁদ



গ্যালিলিও

বোধ হয় গ্যালিলিও ভাবিলেন যে, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলিকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ হইবে। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তিনি এইরূপ একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার শ্রম সার্থক হইল ও দূরবীণ যন্ত্র তৈয়ার হইল। তিনি ১৬১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে দূরবীণ দিয়া বৃহস্পতিকে দেখিতে লাগিলেন। যে গ্রহটিকে শুধু চোখে কেবল উজ্জ্বল বিন্দুর মত দেখা যায়, তাহাকে দূরবীণ দিয়া আলোর চাক্তির মতন দেখা গেল। বৃহস্পতির চারিদিকে চারিটি চাঁদও দেখা গেল। গ্যালিলিও আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না, তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই এই ঘটনাটি একটি চিরস্মরণীয় ব্যাপার। দূরবীণের আবিষ্কার জ্যোতিষ শাস্ত্রে এক নবযুগ আনিয়াছে। দূরবীণের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রের অনেক তত্ত্বই জানা গিয়াছে। রাত্রির পর রাত্রি, গ্যালিলিও

দূরবীণ দিয়া বৃহস্পতি ও তাহার চাঁদ দেখিতে লাগিলেন। তিনি চাবিটিকে আবিষ্কার করিলেন যে, চাঁদগুলি অনবরত বৃহস্পতির চারিদিকে ঘুরিতেছে। তিনি মনের আনন্দে অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে ডাকিয়া এই সংবাদ দিলেন এবং আরও বলিলেন, যে, সকল গ্রহ এইরূপে সূর্য্যকে



গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ

প্রদক্ষিণ করিতেছে, ও যে-সব গ্রহের চাঁদ আছে, চাঁদগুলিও সেই সকল গ্রহের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চাঁদগুলি অনবরত বৃহস্পতির চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহা দেখাইয়া দিলেও তখনকার পণ্ডিতেরা ইহা বিশ্বাস করিলেন না। কেহ তাঁহাকে পাগল বলিলেন, আর কেহ বা বলিলেন যে, তিনি যাদুমন্ত্র জানেন। গ্যালিলিওকে অনেক অপমান ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল।

দুইশত বিরাশী বৎসর পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বার্ণার্ড(Barnard) সাহেব বৃহস্পতির পঞ্চম চাঁদটি আবিষ্কার করেন। অবশিষ্ট চারিটি চাঁদ ১৯০৪ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়। সকলের চেয়ে নিকটের চাঁদ বৃহস্পতির কেন্দ্র হইতে ১,১২,৫০০ মাইল দূরে ঘুরিয়া বেড়ায়। বৃহস্পতিকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে ইহার প্রায় বার ঘণ্টা সময় লাগে। সবচেয়ে বড় দুইটি চাঁদের ব্যাস ৩,৩৫০ মাইল ও ৩,৫৪০ মাইল। আয়তনে ইহারা পৃথিবীর চাঁদের চার পাঁচ গুণ। বড়টি প্রায় সাত দিনে ও অন্যটি প্রায় সতের দিনে বৃহস্পতির চারিধারে একবার ঘুরিয়া আসে। পৃথিবীর চাঁদের মতন বৃহস্পতির চাঁদগুলির গ্রহণ হয়। এই বিষয়ে একটি চমৎকার গল্প আছে। মধ্যযুগের, এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, আলোক-কিরণের গতির বেগ অসীম এবং আলোক মুহূর্ত্ত মধ্যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর জ্যোতিষীরা কোন্ কোন্ সময়ে বৃহস্পতির চাঁদগুলির গ্রহণ হওয়া উচিত, তাহা হিসাব করিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, নির্ণীত সময়ের কখনও আগে, কখনও বা পরে গ্রহণ দেখা যাইত। অনেকদিন পর্য্যন্ত পণ্ডিতেরা ইহার কোন কারণ ধরিতে পারেন নাই। অবশেষে ডেন্‌মার্ক দেশের নামজাদা জ্যোতিষী (Roemer) সাহেব ১৬৭৫ খৃস্টাব্দে ইহার কারণ দেখাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে, আলোক-কিরণের গতির বেগ অসীম নহে—সসীম, এবং এই গতির হার সঠিক জানিতে পারিলে গ্রহণের নির্ণীত ও দৃষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও ব্যবধান থাকিবে না। রোমার

সাহেব কিরূপে আলোকের গতির বেগ মাপিতে হয়, তাহার এক প্রণালী দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতেরা কিন্তু তাঁহার মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন না। অবশেষে পঞ্চাশ বৎসর পরে ব্রাড্‌লি (Bradley) সাহেব রোমার সাহেবের অনুমান যে সত্য, তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

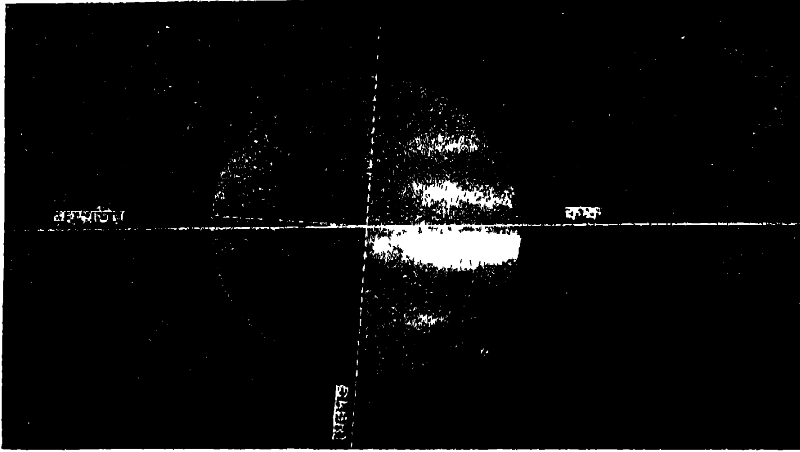
কখনও কখনও দূরবীণ দিয়া দেখিলে এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ে। সারি বাঁধিয়া কয়েকটি কালো বিন্দু বৃহস্পতির দেহ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিতে বড়ই চমৎকার লাগে। এই বিন্দুগুলি কি জান? এইগুলি বৃহস্পতির কয়েকটি চাঁদের ছায়া। এক সঙ্গে কতকগুলি চাঁদের ছায়া কাছাকাছি পড়াতে এইরূপ সুন্দর দেখায়। ঘুরিতে ঘুরিতে বৃহস্পতি কখন কখন অপেক্ষাকৃত পৃথিবীর খুব নিকটে আসিয়া পড়ে, আবার কখনও বা অনেক দূরে সরিয়া যায়। এই দুইটি গ্রহের মধ্যে ব্যবধান কমিয়া কখন ৩৬৭,০০০,০০০, মাইল হয়, আবার কখনও বাড়িয়া ৬০০,০০০,০০০, মাইল হয়। বৃহস্পতি যখন খুব কাছে আসে, সেই সময় দূরবীণ দিয়া দেখিলে ইহার আকারটি বেশ বড় দেখায়, আবার যখন ইহা দূরে সরিয়া যায় তখন ইহার আকারটি অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট দেখায়।

বৃহস্পতির দেহে কয়েকটি চাঁদের ছায়া

পৃথিবী হইতে দূরত্ব হিসাবে বৃহস্পতির আয়তনের পরিবর্তন

বৃহস্পতির নিরক্ষ-বৃত্ত (Equator) ইহার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কক্ষ (Orbit) হইতে অল্পই আনত। এই বৃত্ত ও কক্ষের মধ্যে যে

কোণ, তাহা তিন ডিগ্রীর চেয়ে কম। তোমরা বোধ হয় জান যে, পৃথিবীর নিরক্ষ-বৃত্ত ও কক্ষের মধ্যে যে কোণ, তাহা অনেক বড় এবং প্রায় সাড়ে তেইশ ডিগ্রী হইবে। সেইজন্য



বৃহস্পতির মেরুদণ্ডের অবনমন

সূর্যকে ঘিরিয়া পৃথিবী যখন চলাফেরা করে, ইহার মেরুদণ্ডটি বাঁকা ভাবেই থাকে। তোমরা ভূগোলে পড়িয়া থাকিবে যে, এই কারণেই পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়। বৃহস্পতি কিন্তু প্রায় খাড়া ভাবেই সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে সেই জন্যই বৃহস্পতিতে ঋতুর প্রায় কোনও পরিবর্ত্তন হয় না।

বড় দূরবীণ দিয়া বৃহস্পতিকে দেখিলে তাহার দেহের উপর নানা রকম দাগ দেখা যায়। কোনটা লাল রঙের, কোনটার রঙ বাদামী, আবার কোনটা বা সবুজ বর্ণের। কিছুদিন ধরিয়া বৃহস্পতিকে দেখিয়া থাকিলে ইহা বেশ বোঝা যায় যে, বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন দাগগুলি দৃষ্টি পথে আসিয়া পুনরায় চলিয়া যাইতেছে। বৃহস্পতি নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে তাড়াতাড়ি ঘুরপাক খাইতেছে বলিয়াই এরূপ দেখা যায়। বেশীর ভাগ দাগই বৃহস্পতির গায়ে পেটীর (belt) মতন সাজানো দেখা যায়। এই পেটীগুলি বিষুবরেখার সমান ব্যবধানে সাজানো দেখা যায়। বৎসরে বৎসরে এই কটিবন্ধগুলির (belts) সংখ্যা ও পরিসর কমে বাড়ে। বেশীর ভাগ রেখাই কয়েক সপ্তাহের, না হয় কয়েক মাসের মধ্যে বিলীন হইয়া যায় এবং পুনরায় অন্য রেখা দেখা যায়। যে ভাবে এই দাগগুলি নিজের আকার ও স্থান পরিবর্ত্তন করে, তাহাতে মনে হয়, এইগুলি বৃহস্পতির মেঘ। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি দাগ দেখা যায়—যেগুলি



বৃহস্পতি—২৯এ মার্চ্চ ১৯৩৩ খৃঃ, লোহিতাংশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে

অনেক বৎসর ধরিয়া রহিয়াছে ও খুব অল্পই বদলাইয়াছে। বিষুবরেখার উপরকার

দাগগুলি যে অনুপাতে স্থান বদ্লায়, তাহা

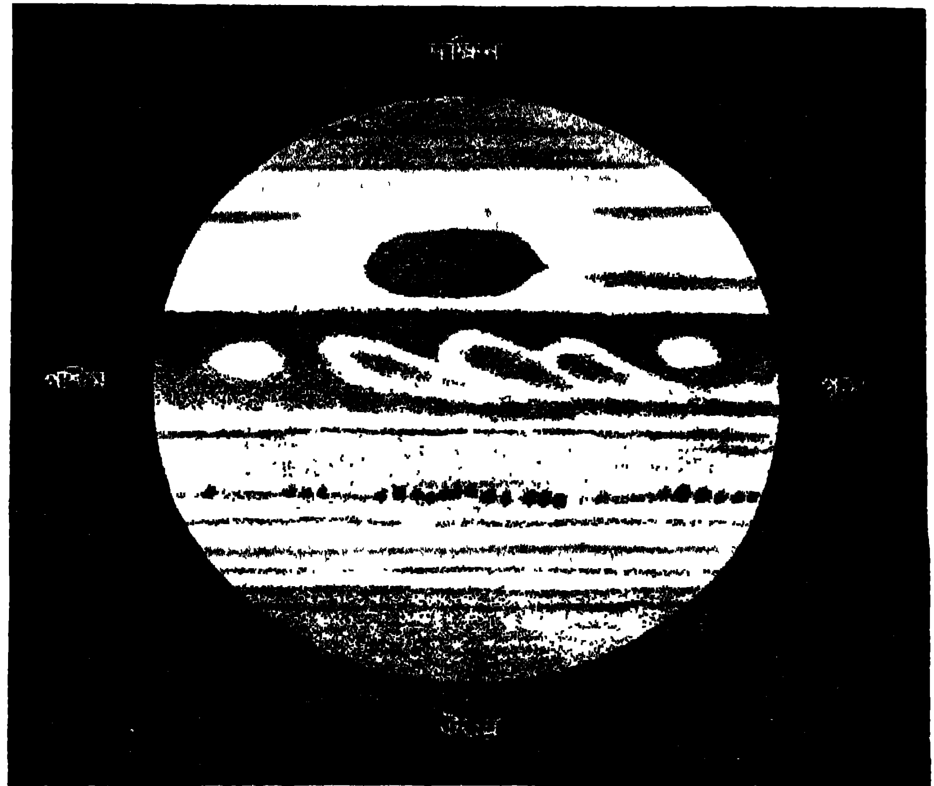


বৃহস্পতি ১০ই মে- ৯৩৪.খৃঃ

অনেকটা ডিমের মতন। প্রথমে ইহার রঙ্ বেশ লাল ছিল, এখন অনেকটা বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩০,০০০ মাইল জুড়িয়া রহিয়াছে এবং ইহা প্রস্থে প্রায় ৭,০০০ মাইল হইবে। এই বড় লাল দাগের ঠিক দক্ষিণে ৪৫,০০০ মাইল জুড়িয়া একটি কাল অংশ দেখা যায়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এই কাল দাগটি প্রথমে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। আগেই বলিয়াছি যে, বৃহস্পতির দেহের ভিন্ন ভিন্ন কটিবন্ধের(Zone) দাগগুলির মেরুদণ্ডের চারিপাশে ঘুরিতে বিভিন্ন সময় লাগে। বিষুবরেখার উপরকার দাগগুলি সবচেয়ে দ্রুতবেগে ঘুরপাক খাইতেছে। তোমরা বোধ হয় কেহ কেহ জান যে, সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন কটিবন্ধগুলির একবার ঘুরপাক খাইতে

হইতে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, একটি প্রবাহ ঝড়ের বেগে ঘণ্টায় ২২০ মাইল গতিতে বিষুব-রেখার উপর দিয়া অনবরত পূর্ব্বদিকে চলিয়াছে। কি করিয়া এই প্রবাহের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে বৃহস্পতির গায়ে একটি বড় দাগ দেখা যায়। জ্যোতিষীরা ইহাকে "বৃহৎ লোহিতাংশ" বলিয়া থাকেন। ইহা দেখিতে



বৃহস্পতি ২৯এ নভেম্বর, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ

লোহিতাংশের আকার ডিমের ন্যায়। নীচে সারি সারি সাজান দাগ দেখা যাইতেছে

বিভিন্ন সময় লাগে। ইহা হইতে তোমরা

বোধ হয় মনে করিবে যে, বৃহস্পতির কোনও অংশ এখনও জমিয়া জমাট হইয়া যায় নাই এবং ইহা সম্পূর্ণ তরল কিংবা বায়বীয় অবস্থায় আছে। কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা এইরূপই অনুমান করিতেন। বৃহস্পতির উপর যে সূর্যের আলোক পড়ে, তাহা পৃথিবীর উপর সূর্যের আলোকের সাতাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র কিন্তু তবুও বৃহস্পতিকে খুব উজ্জ্বল দেখায়

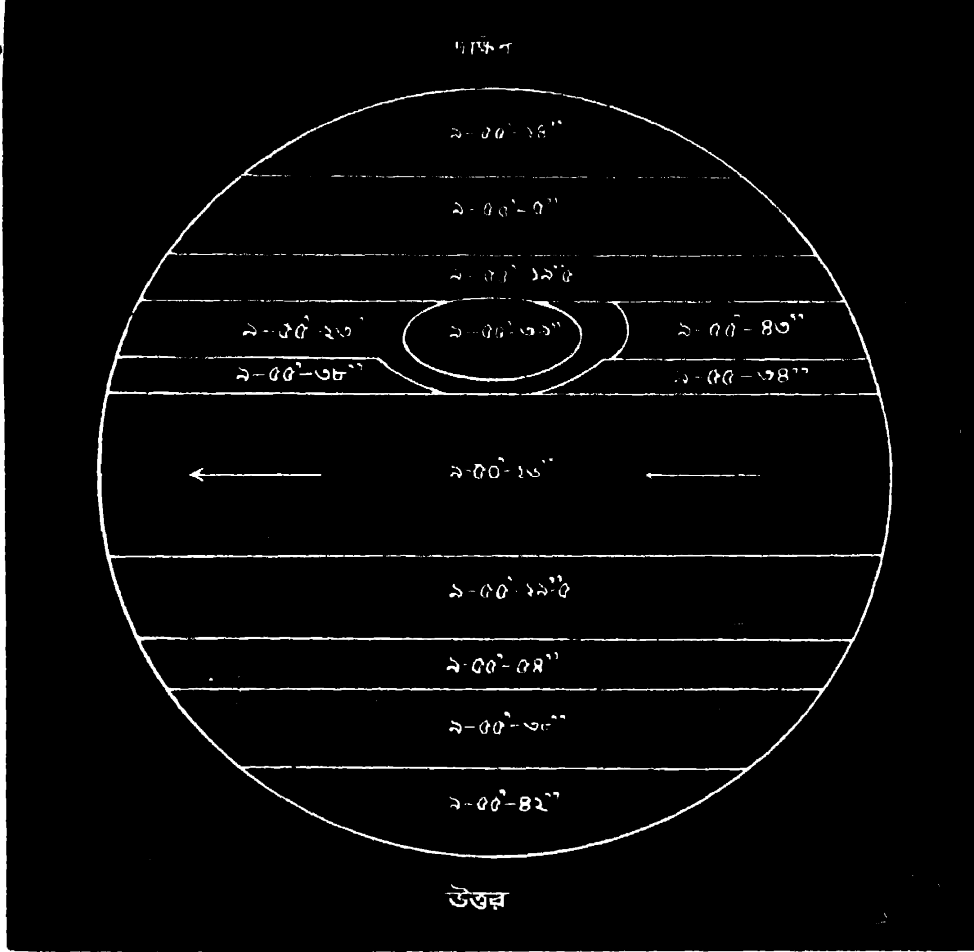


বৃহস্পতি ২১ মে—১৯০১ খৃ

সেইজন্য আগেকার পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে, ইহারও অল্পস্বল্প আলো আছে। ইহার যদি নিজস্ব আলো থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় ইহা সম্পূর্ণ বায়বীয় অবস্থায় আছে। কিন্তু জ্যোতিষীরা দেখিয়াছেন যে, কোনও একটি চাঁদ যদি বৃহস্পতির ছায়ার মধ্যে গিয়া পড়ে অর্থাৎ এই চাঁদটির উপর সূর্যের আলো যদি না পড়ে, তাহা হইলে ইহা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বৃহস্পতির নিজের আলোক কিছু নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে সেই আলো চাঁদটির উপর প্রতিফলিত হইত এবং চাদ অদৃশ্য হইয়া যাইত না। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, বৃহস্পতির যদি কোনও নিজস্ব আলোক না থাকে, তাহা হইলে ইহাকে এত উজ্জ্বল দেখায় কেন? রা এখন অনুমান করেন যে, বৃহস্পতির উপরিভাগ খুব মসৃণ বলিয়া রৌদ্রের আলো যাহা ইহার উপর পড়ে, তাহার বেশীর ভাগই প্রতিফলিত হইয়া আমাদের নিকট আসে এবং সেইজন্যই ইহাকে এত উজ্জ্বল দেখায়।

সূক্ষ্ম রেডিয়োমিটর (Radiometer) যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহগুলির উপরিভাগের তাপ মাপা যায়। কবলেণ্টজ (Coblentz) সাহেব এই যন্ত্র দিয়া মাপিয়া দেখিয়াছেন যে, বৃহস্পতির গায়ের তাপ খুব কম, কেবল—১৪০° সেন্টিগ্রেড (Centigrade) মাত্র। ০° সেন্টিগ্রেড তাপে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়, এই তাপের চেয়ে বৃহস্পতির গায়ের তাপ ১৪০° ডিগ্রী কম। ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ যে, বৃহস্পতির উপরিভাগ

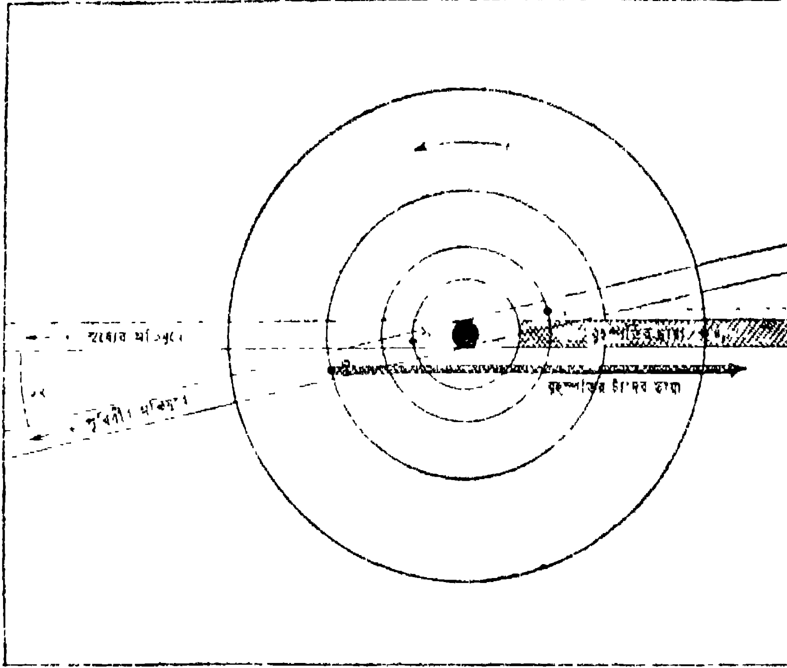
কত ঠাণ্ডা। বৈজ্ঞানিকেরা বৃহস্পতির প্রাকৃতিক অবস্থা বিষয়ে নানারূপ অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু কোনও অনুমানই সব রকমে সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় না। খুবই সম্ভব বৃহস্পতির উপরিভাগ জমাট বেড়াইতেছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এই মেঘের টুকরাগুলি ঘনীভূত তরল এমোনিয়া (Ammonia)। বৃহস্পতির দেহের প্রতিফলিত আলোক-কিরণের বর্ণচ্ছটা (Spectrum) পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে,



বৃহস্পতির বিভিন্ন অংশের ঘুরপাক খাইবার সময়

বাঁধিয়া গিয়াছে এবং এই কঠিন আবরণটির বাহিরে বায়ুমণ্ডল রহিয়াছে। আমরা আগেই বলিয়াছি যে, এই গ্রহটির গায়ের অধিকাংশ দাগই আপন আপন আকার ও স্থান বদলায় এবং সম্ভবতঃ এইগুলি মেঘ। আমরা এখন সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, মেঘখণ্ডগুলি গ্রহরাজের বায়ুমণ্ডলে উড়িয়া ইহার বায়ুমণ্ডলে এমোনিয়া আছে। ১৪০০ সেন্টিগ্রেড তাপে এমোনিয়া গ্যাস ঘন হইয়া তরল হইয়া যায়। তরল এমোনিয়ার কণিকাগুলি একত্র হইয়া মেঘের আকার ধারণ করে। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে কি কি বায়বীয় পদার্থ আছে, তাহা জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন।

তাঁহারা বৃহস্পতি হইতে আগত আলোক-রশ্মির কিরণ-চিত্র (Spectrum) অতি যত্নের সহিত পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৃহস্পতিতে কি কি পদার্থ আছে, তাহা



বৃহস্পতির চাঁদগুলির গ্রহণ ও অতিক্রমণ

এখনও তাহারা সঠিক বলিতে পারেন না। খুবই সম্ভব, ইহার বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন (Hydrogen), অক্সিজেন (Oxygen), হিলিয়াম (Helium), আরগন (Argon), নিয়ন (Neon) ইত্যাদি স্থায়ী বায়বীয় পদার্থ আছে। এমোনিয়া আছে, তাহা আগেই বলিয়াছি। সম্ভবতঃ, মিথেন (Meithane) এবং এসেটিলিন (Acetylene) গ্যাসও আছে, তবে এই বিষয়ে নিঃসন্দেহে এখনও কিছু বলা যায় না। এই বিষয়ে সঠিক খবর জানিতে হইলে ভাল করিয়া পরীক্ষা করা দরকার, কিন্তু তাহা দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য। বৃহস্পতি হইতে যে আলোক আসিতেছে, তাহার কিরণ-চিত্রে কয়েকটি বিশেষ রেখা দেখা যায়; তাহার মধ্যে প্রথমটি যে মিথেনের রেখা, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। হিসাব করিয়া দেখিলে অন্য রেখাগুলিও মিথেনের হওয়া উচিত। কিন্তু এখন পর্যন্ত ল্যাবোরেটারীতে (Laboratory) মিথেন গ্যাস লইয়া পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা শেষের রেখাগুলি দেখিতে পান নাই। ল্যাবোরেটারীতে যে মিথেন গ্যাসের চোঙ্গ ব্যবহার করা হয়, তাহা লম্বায় কয়েক ফিট মাত্র। সেইজন্য মনে হয়, শেষের রেখাগুলি এতই অস্পষ্ট থাকে যে, ঠিক্ চোখে পড়ে না। বৃহস্পতি হইতে যে আলোক দেখা যায়, তাহা কয়েক হাজার মাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া আমাদের নিকট



বৃহস্পতি—১৮ই মে, ১৯৩৪ খৃঃ

আসে। সেই কারণেই বোধ হয়, এই ক্ষেত্রে শেষের রেখাগুলি আর অস্পষ্ট

থাকে না—সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কয়েক শত গজ লম্বা একটা চোঙের মধ্যে মিথেন গ্যাস ভরিয়া যদি ইহার মধ্য দিয়া সূর্য্যের আলোক যাইবার বন্দোবস্ত কর এবং ইহার পরে এই আলোকের বর্ণচ্ছটা পরীক্ষা কর, তাহা হইলে বোধ হয় এই শেষের রেখাগুলিকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে। কিন্তু কয়েক শত গজ চোঙ সংগ্রহ করিয়া তাহার মধ্যে মিথেন গ্যাস ভরা সহজ কার্য্য নয়—ইহা দুঃসাধ্য ও ব্যয়বহুল।



বৃহস্পতি—২২এ জুন, ১৯৩৪ খৃঃ

পণ্ডিতেরা বৃহস্পতির চাঁদ কয়টির কক্ষের আকার যন্ত্রের সহিত পরীক্ষা করিয়াছেন এবং কক্ষের গঠন হইতে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বৃহস্পতির ঠিক মধ্যস্থলের ঘনত্ব উপরিভাগের ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশী। খুবই সম্ভব যে, বৃহস্পতির মধ্যস্থল তরল কিংবা বায়বীয় অবস্থায় আছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ ও উপরকার কঠিন আবরণটির ভীষণ চাপে মাঝখানের তরল পদার্থের ঘনত্ব খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের পৃথিবীরও গঠন অনেকটা এইরূপ। পৃথিবীর মধ্যস্থলের তরল পদার্থের ঘনত্ব বাহিরের কঠিন আবরণের ঘনত্বের চারিগুণ। বৃহস্পতির উপরিভাগের তাপ খুব কম বলিয়াই জেফরেস্ (Jeffreys) সাহেব অনুমান করেন যে, ঠিক শক্ত আবরণটির উপরে এক স্তর বরফ বা জল আছে এবং এই স্তরের উপরে বায়ুমণ্ডল সাজানো রহিয়াছে। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শক্ত আবরণটির ব্যাস ৫৭,০০০ মাইল হইবে। ইহার উপর ১১,০০০ মাইল পুরু বরফের স্তর আছে এবং এই স্তরের উপর ৩,৫০০ মাইল গভীর বায়ুমণ্ডল রহিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকের অনুমান অনেক সময় কবির কল্পনাকেও হার মানাইয়াছে। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক অনুমান করেন যে, বৃহস্পতির দেহে বড় বড় এমোনিয়ার সাগর আছে, এবং জমাট-বাঁধা বরফের তীরের উপর এই সকল সাগরের ঢেউগুলি আছড়াইয়া পড়িতেছে। রাসায়নবেত্তামাত্রেই জানেন যে, প্রায় জলেরই মতন এমোনিয়ার অন্য পদার্থ দ্রবীভূত করিবার ক্ষমতা আছে এবং এমোনিয়ার সাহায্যে নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে পারে। কেহ কেহ ইহাও অনুমান করেন যে, বৃহস্পতিতে এমন জীব থাকিতে পারে, যাহাদের কাছে আমাদের পক্ষে জল যেমন, এমোনিয়াও সেই রকম প্রয়োজনীয় পদার্থ। এই সকল কাল্পনিক জীবদের কাছে জল অতি উগ্র বস্তু বলিয়াই গণ্য হইবে।

বৃহস্পতির সম্বন্ধে অনেক জিনিষই জানিবার এখনও বাকী আছে। ইহার গঠন কিংবা প্রাকৃতিক অবস্থা কিরূপ, তাহা সঠিক এখনও জানা যায় নাই। জ্যোতিষীরা বৃহস্পতির বিষয়ে নানা তত্ত্ব জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন এবং সেইজন্য বিশেষ চেষ্টাও করিতেছেন। এইরূপ আশা করা যায় যে শীঘ্রই আরও অনেক বিষয় জানিতে পারা যাইবে।



আগুনের খেলা



এবার তোমাদিগকে আগ্নেয় শিলা ও আগ্নেয় পর্ব্বতের কথা বলি, শোন। ভূগর্ভের অবস্থার বিষয়ে আগে যা যা বলেছি, সমস্ত আবার একবার মনে করে নাও। পৃথিবীর বাহিরের খোলটা আজ জুড়িয়েছে বটে, কিন্তু ভেতরের তাপ এখনও অতি ভীষণ। সেখানে কঠিন পদার্থ একটুও নেই। যে পদার্থ আছে, তা সমস্তই, হয় পাঁকের মতন, নয় জলের মতন, নয় হাওয়ার মতন অবস্থায় রয়েছে। পাহাড় বল, মাটি বল, সব ভাসছে ঐ তলার তলতলে নরম পদার্থের উপর। তোমাদিগকে বলেছি যে, ক্ষিতিমণ্ডলের ভিতর বাহিরের কুঞ্চনের তফাতের জন্য পৃথিবী মাঝে মাঝে গা ভাঙ্গে। এও বলেছি যে, হিমালয় তার একদিক ক্ষয়ে বেশী হালকা হয়ে গেলে, পাশমোড়া দিয়ে নিজের ওজন ঠিক করে নেয়। কিন্তু এ ত শুধু হিমালয়ের কথা নয়! পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়, সমস্ত ডাঙ্গা-জমী, বৃষ্টির ও হাওয়ার খেলাতে ক্রমাগত তিলে তিলে ক্ষয়ে যাচ্ছে, আর তার গুঁড়োগুড়ি সব জলের তোড়ে ধুয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ছে। এই রকম করে যেই খানিকটে ওজনের কম বেশী হচ্ছে, ক্ষিতিমণ্ডল একবার গা-ঝাড়া দিচ্ছে। কোথাও জমি উঠে যাচ্ছে, কোথাও বা নেমে পড়ছে। ওজনের দাঁড়িপাল্লা সমান হয়ে যাচ্ছে! এই ব্যাপার নিরন্তর ঘটছে। তোমরা জানতেও পার না। তোমরা বুঝতে পার যখন ঝাঁকানিটা একটু বড় রকমের হয়।

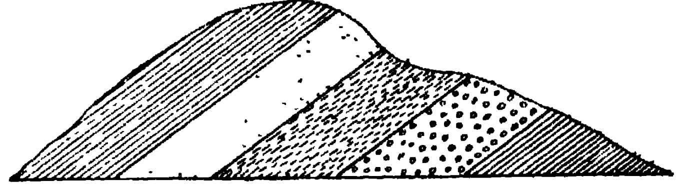
আচ্ছা, এই যে অহরহ ওঠা-নামার খেলা চলছে, এতে পুরানো শিলাস্তরগুলির কি দশা হচ্ছে? শিলাস্তরের কথা মনে আছে ত? ডাঙ্গার বালি, কাঁকর, নুড়ি, কাদা, মাটি, উদ্ভিদের ডাল-পালা, শামুক-গুগলীর খোসা, জলে ধুয়ে গিয়ে ঢুকছে সমুদ্রে, আর সেখানে তলায় থিতিয়ে পড়ছে। যুগের পর যুগ এই ব্যাপার চলছে। উপরের থাকের ভারে নীচের থাক জমে পাথর হয়ে যাচ্ছে। এই থাকগুলো প্রথমে থাকে সমতল। এক গেলাস জলে এক মুঠো কাঁকর, তার পর এক মুঠো বালি ফেলে দেখলেই বুঝবে। সমুদ্র গর্ভের স্তরগুলো সমান হয়ে পড়ে থাকবে, যে রকম তক্তা টালি আড়তে সাজান থাকে।

যদি পৃথিবীর পেটের ভেতর আগুনের ধাক্কাধাক্কি না থাকত, তা হলে পাহাড়-পর্ব্বত, ডাঙ্গা-জমী সব ক্রমশঃ ক্ষয়ে ক্ষয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে সমুদ্রের ভেতর গিয়ে পড়ত, আর ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীটা হয়ে যেত যেন এক প্রকাণ্ড তেপান্তরের মাঠ। তাতে আমাদের জীব-জগতের মোটেই কিছু সুবিধা হত না। হয়ত আমরা সব আস্তে আস্তে আবার সেই সেকেলে গোধা সরীসৃপের যুগে ফিরে যেতাম। কিন্তু সে রকম হওয়া ত সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত নয়! তাই তিনি ভূগর্ভে আগুন রেখে দিয়েছেন। সেই আগুনের ঠেলায় উঠে সমুদ্রতল পাহাড় হয়ে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, আবার অভ্রভেদী পাহাড় নেমে সমুদ্রে



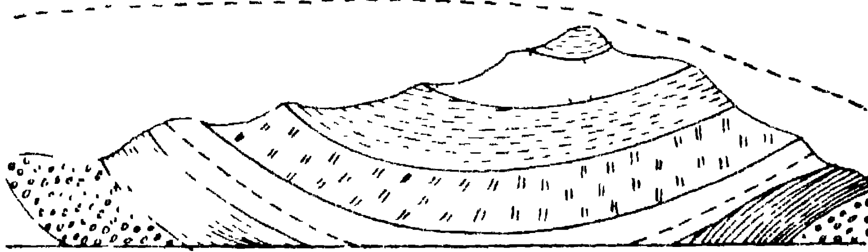
ঢুকে যাচ্ছে। এ রকম যে হচ্ছে, তার ত আর কোন সন্দেহ নেই! হিমালয়ের মাথার উপর আজও জল জন্তুর হাড় যথেষ্ট পাওয়া যায়। আবার সেকালের কত বড় বন-জঙ্গলের অবশিষ্ট দেখতে পাওয়া যায় সমুদ্রের জলের ভিতরে। পরে তোমাদিগকে একটা নক্সা এঁকে দেখাব যে, আমাদের এই ভারতবর্ষ আর তার আশ-পাশের চেহারা পুরাকালে কি রকম ছিল।

আজকে শিলাস্তরের গল্পই চলুক। স্তরগুলো প্রথমে সমতল ছিল বটে, কিন্তু আজ তাদিগকে সমতল অবস্থায় বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেননা, ভূগর্ভের আগুনের ঠেলায় জমী যেমন উঠেছে নেমেছে, স্তরগুলোও তেমনি তেরচা, ঢালু হয়ে গেছে। একদিক উঁচু হয়েছে, একদিক নীচু হয়েছে (১ নং চিত্র দেখ)। কোন কোন জায়গায় এমন দেখা গেছে যে, পুরানো থাকগুলো একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রকমে অনেক খানা জমিতে পাথরের থাকগুলো ভেতরের আগুনের ধাক্কায় এঁকে বেঁকে ঢেউ খেলানো হয়ে যায় (২ নং চিত্র দেখ। তার পর, কালের গতিতে যখন সেই জমী সাগর-গর্ভ থেকে উঠে পাহাড় হয়ে বাহিরে দাঁড়ায়, তখন ঝড়-বৃষ্টিতে আবার তারও অঙ্গ ক্ষয়ে যেতে আরম্ভ হয়। ধর খানিকটা ক্ষয়ে যাবার পরে সমস্ত প্রদেশটা ফের আগুনের চাপে নেমে নেমে সমুদ্রের ভেতর চলে গেল। তখন কি হবে, জান? সেই ভাঙ্গা-চোরা আঁকা-বাঁকা শিলাস্তরগুলোর উপর নূতন বালি মাটি, কাঁকর এসে থিতিয়ে পড়বে। আবার নূতন নূতন স্তর গড়ে উঠতে থাকবে। এই

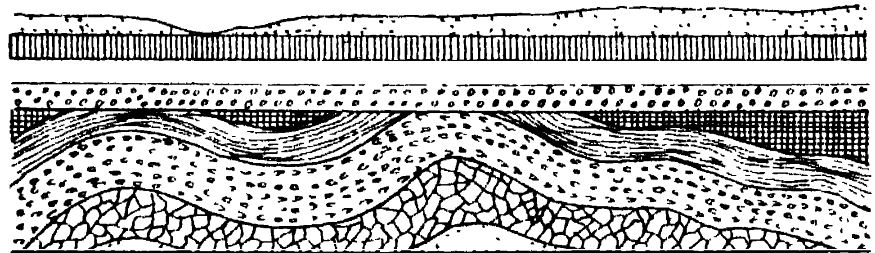


১নং চিত্র—তেরচা স্তর

নূতন স্তরগুলো হবে সমতল, কিন্তু নীচের-গুলো থাকবে ঢেউ খেলানো। যখন আবার ক্ষিতিমণ্ডলের গা-ভাঙ্গার ফলে সবটা উপরে উঠে আসবে, তখন ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা মাটি খুঁড়লেই এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাবে। পৃথিবীর অনেক জায়গায় এই জিনিস দেখা গেছে। নীচে একখানা চিত্র দিলাম, (৩ নং চিত্র) ভাল করে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। এই সবের জন্যই তোমাদিগকে আগে বলেছিলাম যে, পৃথিবীর পুরানো স্তরগুলো আজ যে সব পেঁয়াজের খোসার মতন সাজান রয়েছে, তা মনে কোরো না। কত রকমে তারা বেঁকে চুরে গেছে ভূগর্ভের আগুনের চাপে।



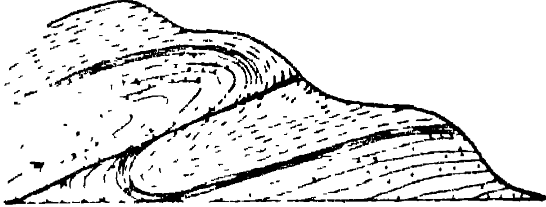
২নং চিত্র—আঁকাবাঁকা ঢেউ খেলানো স্তর



৩নং চিত্র—পুরাণো ভাঙ্গাস্তরের উপর নূতন স্তর

কখন কখন থাকগুলো একেবারে দুমড়ে যায়, কি ফেটে যায়, কি ভেঙ্গে খানিকটা হড়কে নীচের দিকে

সরে যায়। ৪নং ও ৫নং চিত্র ভাল করে দেখ। কি হয়, সেটা তোমাদের একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই। ধর তোমার ঘরের চকচকে সিমেন্টের মেঝের উপর একটা গালিচার আসন পাতা রয়েছে। তার একদিক ধরে তুমি ঠেলে দাও ত, দেখবে

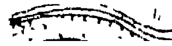
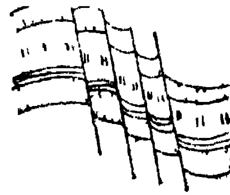


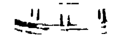
৪নং চিত্র—দুমড়ানো স্তর

যে, তোমার ঠেলার জোরে সমস্ত আসনটা সোজা সরে যাবে না, কিন্তু তার নানা জায়গায় দুমড়ে মুচড়ে যাবে। শিলাস্তরের স্তরগুলোর ঠিক এই রকম হয়। ভেতরের আগুনের ঠেলায় দুমড়ে মুচড়ে যায়। ৪নং চিত্রে একটা তীর এঁকে দেখিয়েছি, কোন্ দিক থেকে ঠেলা লাগছে। ধাক্কা যদি খুব জোরে লাগে, ত বাঁকের মাথায় ফাটি ধরে। কোনখানটায় ফাটবার সম্ভাবনা, তা সেটা কালো রেখা টেনে ছবিতে দেখিয়েছি।

তোমরা হয় ত ভাবছ, পাথর গালিচার মতন দুমড়ে যাবে কি করে! সত্যিই যায়। পণ্ডিতেরা আগে মনে করতেন যে, উপরের পাথর মাটির চাপে ভেতরের স্তরগুলো কতকটা রবারের মতন নরম তলতলে হয়ে যায়। কিন্তু আজকাল একথা বড় একটা কেউ মানেন না। এখন স্তরগুলো খুব বিস্তীর্ণ আর তার উপর ধাক্কাও লাগে বিষম, তাই তাদের দুমড়ে যাওয়া সম্ভব হয়। স্তর অল্পপরিসর হলে হত না। এটা বোঝা কঠিন নয়। তোমার গালিচার আসনখানাও যদি খেলাঘরের আসনের মতন ছোট্টটি হয় তাহলে যতই ঠেলা মার, সরে যাবে কিন্তু মোচড়াবে না।

৫নং চিত্রে দেখিয়েছি যে, ভীষণ জোরে ধাক্কা লেগে পাথরের স্তর ভেঙ্গে গেছে, আর ভাঙ্গা অংশটা নীচের দিকে হটে গেছে। এই রকমে খানিকটা যখন ভেঙ্গে পাশে কি নীচের দিকে চলে যায়, তখন সেই প্রদেশটায় একটা ছোটখাটো ভূমিকম্প হয়।



৫নং চিত্র পুরানো স্তর ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়াছে

আর বেশী কিছু এ বিষয়ে বলব না। এক দিকে যেমন ঝড়-বৃষ্টির আঘাতে পাহাড়-পর্ব্বত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে সাগরের ভেতরে জলজ-শিলার স্তর গড়ে তুলছে, অন্য দিকে তেমনি ভূগর্ভের আগুন সমুদ্রতলকে ঠেলে



গিজার

উপরে তুলে দিচ্ছে, পাহাড়কে সমুদ্রে ডোবাচ্ছে। ভাঙ্গা-গড়ার কাজ পাশাপাশি চলেছে।

ভূগর্ভের এই যে আগুন, এর নানা রকম অদ্ভুত নিদর্শন আমরা পৃথিবীময় দেখতে পাই। উষ্ণ প্রস্রবণ বা গরম জলের ঝরণার কথা তোমরা সকলেই পড়েছ, কেউ কেউ দেখেওছ। কেন না, ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় এ জিনিস আছে। সব চেয়ে বেশী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে আইসল্যাণ্ড বলে উত্তর মেরুর কাছে এক দ্বীপে। সে দেশে তার নাম গিজার। এই গিজারগুলো আমাদের সাধারণ ঝরণার মত নয়। একে গরম জলের ফোয়ারা বলতে পার। ভূঁই থেকে এত জোরে জল বেরোয় যে, অনেক ফুট উঁচু পর্য্যন্ত সে জল লাফিয়ে ওঠে। চাটগাঁ জেলায় সীতাকুণ্ড বলে এক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে—সেটা ভারী মজার জিনিস।

পাহাড়ের গা বেয়ে গরম জল ত পড়ছেই। তা ছাড়া, জলের ধারার পেছনে পাথরের ফাটল দিয়ে এক রকম গন্ধক ও কয়লার গ্যাস বেরিয়ে দিবারাত্রি দপদপ করে জ্বলছে। আগুনের শিখাগুলো একবার বড় হচ্ছে, একবার ছোট হচ্ছে। তোমাদের হাতের কাছেই এমন সুন্দর আগুনের খেলা, সুবিধা পেলেই দেখে এসো। কিন্তু দুনিয়াতে যত গরম জলের ফোয়ারা আছে, সবচেয়ে অদ্ভুত জিনিস আমেরিকার Old Faithful বলে এক ফোয়ারা। Faithful মানে ত নেমক-হালাল, বিশ্বাসী! এই প্রস্রবণটি তোমার এমন বিশ্বাসী চাকর যে, যাট থেকে আশি মিনিট অন্তর একবার করে চার মিনিট জল ছাড়ছে, আবার বন্ধ করছে, আবার ছাড়ছে। এত নিয়মিত ভাবে এই ব্যাপার ঘটছে যে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আর জল কত খানা ওঠে জান? প্রায় দেড়শতো ফুট অর্থাৎ দশ এগার তলা বাড়ীর সমান।

ভূমিকম্পের বিষয়ে তোমরা সবাই কিছু কিছু জান। সেদিন বেহারে যে প্রলয়কাণ্ড হয়ে গেল, তার কথা কে না শুনেছ। আটত্রিশ বছর আগে আমাদের উত্তর বঙ্গে প্রায় ঐ রকমই এক ভীষণ ভূমিকম্প হয়েছিল। এই দুই কম্পের একটা তফাতের কথা তোমাদিগকে বলি। উত্তর বঙ্গে যেখানে সেখানে মাটি ফেটে গরম কাদা জলের ফোয়ারা ছুটেছিল। আর বেহারে সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ মজঃফরপুরে, উঠেছিল সূক্ষ্ম সুন্দর বালির ফোয়ারা। এ তফাতের একটা কিছু যে বিশেষ গভীর অর্থ আছে, তা নয়। তবে এই দুই প্রদেশের মাটির ভেতরকার গড়ন যে আলাদা, তা এর থেকে বোঝা যাচ্ছে বই কি!

ক্ষিতিমণ্ডলের ভাঙ্গা গড়ার দিক থেকে দেখতে গেলে ভূমিকম্পটা খুব বড় জিনিস নয়। যথার্থ বড় জিনিস হচ্ছে সেই ভূগর্ভের আগুনের শক্তি—যার থেকে এই কম্পের উৎপত্তি। সত্য বলিতে কি, ভূমিকম্পের বিপদ আপদ আজকের দিনে এত বেড়ে উঠেছে ত এই জন্য যে, আমরা ইট পাথরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইমরাৎ বেঁধে তাইতে বাস করি! নইলে এমন করে এত মানুষ ধনে-প্রাণে মারা যেত না। জাপানে খুব ভূমিকম্প হয় বলে সে দেশের লোক চিরদিন কাঠ কাগজের বাড়ীতে থাকত। ইদানীং অন্য দেশের দেখাদেখি বড় বড় পাথরের বাড়ী তুলেছে। এর ফলে গতবারের বড় ভূমিকম্পে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ডই না হয়েছিল!

সে কথা থাক্। আমি তোমাদিগকে বলতে যাচ্ছিলাম যে, পৃথিবী-গর্ভের আগুনের যথার্থ স্বরূপ বোঝা যায় আগ্নেয় পর্ব্বত বা জ্বালামুখী পাহাড় হতে।

আচ্ছা, সব পাহার থেকে ত ধোঁয়া বেরোয় না, এগুলো থেকে বেরোয় কেন? এদের সঙ্গে অন্য পাহাড়ের তফাৎ কি? আমাদের প্রাচীন ন্যায়-শাস্ত্রে একটা কথা আছে, পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ—অর্থাৎ ধূম হতে বুঝতে হবে যে পর্ব্বত-গর্ভে বহ্নি আছে। কিন্তু এ একটা কথার কথা মাত্র। পর্ব্বত-গর্ভে বহ্নি নেই। বহ্নি যা আছে, তা জননী বসুমতীর গর্ভে। তোমরা নিশ্চয়ই মোটামুটি জান যে, প্রত্যেক আগ্নেয় গিরির চূড়ার উপর এক গভীর গর্ত্ত আছে। এই গর্ত্তগুলি হচ্ছে পৃথিবীর এক একটা মুখ। এই মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে ভেতরের আগুনের ঝলকা বেরোয়। তাই ত আগ্নেয়-গিরির নাম জ্বালামুখী হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে এই যে, কতগুলো পাহাড়ের মাথায় এই ছেঁদা, এই জ্বালামুখ থাকে কেন? কথাটা আবার একটু উলটো রকমের হলো! পাহাড়ের মাথায় ছেঁদা হয়েছে, এটা ত সত্য নয়। ছেঁদা আগে পাহাড় পরে। ছেঁদার থেকেই পাহাড়ের সৃষ্টি।



পর্ব্বতোবহ্নিমান্ ধূমাৎ

অন্য পাহাড়ে আর আগ্নেয় পর্ব্বতের গড়নে এই মস্ত তফাৎ। অন্য পাহাড় ভূগর্ভে থেকে ঠেলে বাহিরে এসেছে আর আগ্নেয়গিরি তিলে তিলে গড়ে উঠেছে জ্বালামুখী গহ্বরের চারিপাশে।

পৃথিবীর ভেতর যে শিলাদ্রব বা গলা পাথর আছে, তার নাম বিলেতী পণ্ডিতেরা দিয়েছেন লাভা (Lava)। এই লাভা সর্ব্বদা ভূগর্ভের প্রচণ্ড তাপেতেতে গনগনে হয়ে কোন অজানা কারণে মাঝে মাঝে এর সঙ্গে এসে মেশে জলের বাষ্প ও নানা রকম



পৃথিবীর মুখ

কয়লার গ্যাস। এই গ্যাস-মেশান লাভার জোর অতি মারাত্মক। জলের বাষ্পের যে কত শক্তি তা তোমরা জান, কেননা ঐ শক্তির বলেই রেল চলে, কলের জাহাজ চলে। কয়লার গ্যাসও তোমরা নানা রকমের দেখ। যেমন কলিকাতার রাস্তার বাতিতে যে গ্যাস জ্বলে, বিয়ে বাড়ীতে যে এসেটিলীন গ্যাস জ্বলে, আর পেট্রল গ্যাস যার জোরে মোটর গাড়ী চলে। ভূগর্ভের লাভা এই সমস্ত বাষ্প পেয়ে পাগলের মত হয়ে ওঠে, যে দিকে পারে ভেঙ্গে চুরে বেরিয়ে পড়বে বলে। কি রকম জান? তোমাদের পরিচিত সোডা লেমনেডের কথা মনে কর। সোডা ওয়াটার পদার্থটা ত আর আজগুবি কিছু নয়—কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস গোলা জল মাত্র। তবে এক বোতল জল যতখানি গ্যাস খেতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশী গ্যাস তাতে খাওয়ান হয়েছে যন্ত্রের সাহায্যে। তাই সে সুবিধা পেলেই অতিরিক্ত গ্যাসটা ছেড়ে দেবে বলে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর গর্ভে, যেখানে প্রকৃতি দেবীর কারখানায় লাভার সোডা ওয়াটার তৈরী হচ্ছে, সেখানকার চাপ হাজার হাজার যন্ত্রের চাপের চেয়েও অনেক বেশী। যখন সেই ভীষণ চাপের চোটে এক রাশি গ্যাস গিয়ে ঢোকে উত্তপ্ত গনগনে লাভার মধ্যে, তখন সে তার মাথার উপরের ক্রোশের পর ক্রোশ মাটী-পাথরকে যে কি রকম ঠেলা মারিতে আরম্ভ করে, তা তোমাদিগকে বর্ণনা করে কি বোঝাব। লক্ষ লক্ষ তোপের জোর এক হলেও তার সমান হয় কি না সন্দেহ। যেখানে একটু নরম পদার্থ পায়, কি সামান্য ফাটল পায়, কি পাথরের জোড় পায়, সেইখানে ভেঙ্গে-চুরে পথ করে নিয়ে ঐ টগবগে ফুটন্ত লাভা স্রোত উপরে চড়তে থাকে।

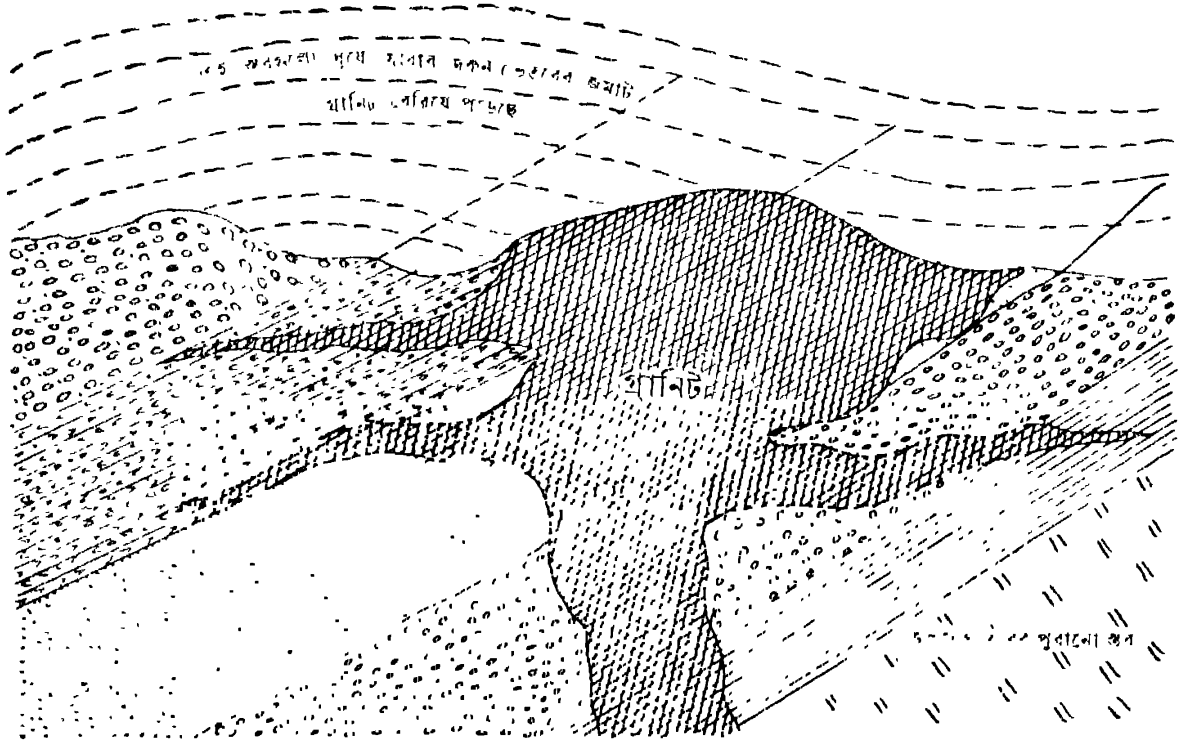
উপরে চড়তে চড়তে ফাঁক পেলেই খানিকটা খানিকটা লাভা ঢুকে পড়ে পুরাণো জলজ শিলার স্তরগুলোর মাঝে। সেইখানে চারিয়ে প'ড়ে ধীরে ধীরে শক্ত নিরেট গ্রানিট পাথরের চাতালের মতন হয়ে জমে যায়। ৬নং চিত্র দেখ। এই শক্ত নিরেট গ্রানিট হচ্ছে এক জাতীয় আগ্নেয় শিলা। এদের কথা পরে আবার বলব। এখন জ্বালামুখীর কথা বলি, শোন।

ধর, তোমার গ্যাস-মেশান লাভা স্রোতের বেশীর ভাগ ক্ষিতিমণ্ডল ছিঁড়ে ফুঁড়ে একেবারে ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারলে। তখন সে করবে কি? সেখানে ত তাকে আটকাতে বা ফেরাতে পারে, এমন কেউ নেই। বালি, কাঁকর কি কাঁচা মাটীর পরোয়া সে কি করে! যেখানে হয় এক জায়গার মাটী ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে সেই জলন্ত ফোয়ারা। আকাশ পর্য্যন্ত লাফিয়ে ওঠে আগুনের শিখা। হাজার হাজার কামানের ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে চারিদিক। জ্বালামুখীর জন্ম হল। কিন্তু তখনও আগ্নেয়গিরি মাথা তোলে নাই। সে আর এক পর্ব্ব। কি রকম, বুঝিয়ে বলি। যখন লেমনেড কি জিঞ্জারেডের বোতল খোলা হয়, তখন তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ, যে খানিকটা জল ফোঁস ফোঁস করতে করতে সশব্দে সবেগে ফোয়ারা দিয়ে লাফিয়ে ওঠে। সেই ফেনাসুদ্ধ জলের কতকখানা দূরে গিয়ে পড়ে কিন্তু বেশীর ভাগ পড়ে আবার বোতলের মুখে, পড়ে মুখের চারিপাশে গড়ায়। জ্বালামুখীরও ঠিক এই রকম হয়। লাভা, ছাই (Tuff), পাথরের চাঙ্গড়া, পাথরের চুরো যা গর্ত্ত থেকে ফোয়ারা দিয়ে বেরোয়, তার কতক বা দূরে গিয়ে পড়ে, আর কতক পড়ে গর্ত্তের মুখের চারিপাশে। একথা মনে কোরো না যেন, সে আর

কতটুক ! ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে মন্টে নুয়োভো বলে এক নূতন আগ্নেয়গিরি প্রথম আট চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু হয়ে উঠেছিল। একই গহ্বর (Crater) থেকে বারবার অগ্নি উৎপাত হয়ে কত বড় বড় প্রকাণ্ড পর্ব্বত গড়ে উঠেছে ! সিসিলি দ্বীপের এটনা এগার হাজার ফুট উঁচু। দক্ষিণ আমেরিকার এণ্ডিজে এক একটা চূড়া বিশ হাজার ফুটেরও বেশী উঁচু।

যতক্ষণ অগ্নি উৎপাতের জোর থাকে, ততক্ষণ আগ্নেয়গিরির দেহটা লাভা ও টাফ-এর স্তর দিয়ে তৈরী।

জ্বালামুখীর অগ্নিকাণ্ডের জোর একটু কমে এলে ক্রেটারের মুখ দিয়ে শুদ্ধ তরল লাভা বেরিয়ে চারদিকে গড়িয়ে পড়ে। খানিক দূর যেতে না যেতে সেই লাভা জমতে আরম্ভ হয়। আগে তোমাদিগকে জলজ শিলার স্তরের মধ্যে জমাট বাঁধা লাভার, অর্থাৎ গ্রানিটের কথা বলেছি। বাহিরে পাহাড়ের গায়ে

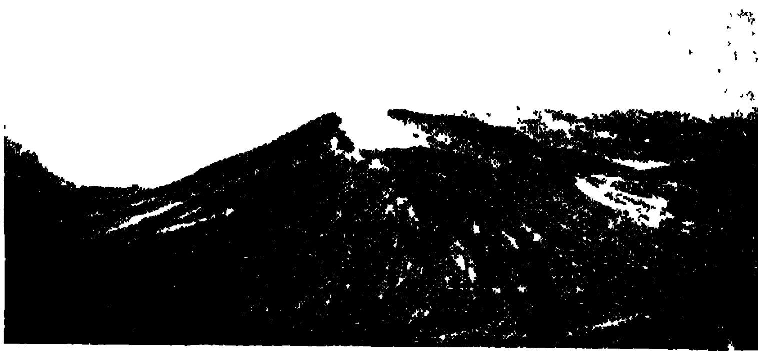


১নং চিত্র—লাভা ভূগর্ভ হইতে বাহির হইয়া পুরানো স্তরে পড়িয়া জমাট বাঁধিয়াছে

লাভা ও Tuff গর্ত্তের মধ্যে পড়তে পারে না। তাই পাহাড়ের মাথার উপরের গর্ত্তটা ঝাঁঝরার মত থেকে যায়। Tuff পদার্থটাকে আমি আগে ছাই বলেছি, কিন্তু এ নামটা ঠিক নয়। তোমরা সোহাগার খই দেখেছ কি? আগেকার দিনে এই খই মধু দিয়ে মেড়ে ঘা পোড়ায় লাগান হত। সোহাগাকে আগুনের উপর সেঁকলে সেটা গলে সাদা খইয়ের মতন এই পদার্থ হয়ে যায়। তেমনি তপ্ত লাভা যখন অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে, তখন তার খানিকটা পুড়ে এই Tuff হয়ে যায়। লাভা যেমন নানা রকমের হয়, টাফও তেমনি নানা জাতীয় হয়। জমাট বাঁধা পাথরের মধ্যে সব চেয়ে পরিচিত হচ্ছে Basalt (বাসল্ট)। গ্রানিট এর আর বাসল্ট্-এর ভেতরের গড়ন আলাদা আলাদা রকমের। বাসল্ট্-এর ভেতরটা গ্রানিট্-এর চেয়ে ঢের বেশী মোলায়েম অর্থাৎ দানাগুলো ঢের বেশী সূক্ষ্ম। গ্রানিট্ একেবারে নিরেট। বাহিরে জমাট বাঁধা পাথরের সর্ব্বাঙ্গে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। লাভাটা খোলা হাওয়ায় জমেছে কি না, তাই তার ভেতরের গ্যাসগুলো তাড়াতাড়ি যেখান দিয়ে পারে ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। পিউমিস্ বলে এক রকম আগ্নেয় শিলা আছে, তার সমস্ত দেহটাই স্পঞ্জের মতন ঝাঁঝরা। তোমরা ঝামা

ইট দেখেছ ত। তাকে কৃত্রিম পিট্রামস বলা যায়। যে কোন আগ্নেয় শিলার টুকরো নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখতে পাবে যে, তার ভেতর Augite, Felspar ইত্যাদি নানা রকম পরিচিত খনিজের দানা মিশে রয়েছে।

আচ্ছা, লাভা পদার্থ কি, তা তোমরা জান? যদি কখনও শিশি-বোতলের কারখানায় যাও, ত সেখানে গলা কাচ দেখতে পাবে। সেই গলা কাচকে তোমরা কৃত্রিম লাভা বলতে পার। জ্বালামুখী থেকে যে লাভা পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, সেটা খানিক দূর যেতে না যেতে জমতে আরম্ভ করে, একথা আগেও বলেছি। তার উপরের স্তরটা না করে জুড়িয়ে গিয়ে একটা কাচের স্তরের মত পড়ে। সে কাচ ঠিক আমাদের সার্শীর কাচের মতন। ভাঙলে ঐ অংশ গুড়ো হয়ে যায়, ভেতরে দানা নেই। কিন্তু লাভা-স্রোতের ভেতরটা জমে ধীরে ধীরে তাই তার



বিসুবিয়স পর্ব্বত

অধিকাংশেরই বেশ পরিষ্কার দানা-বাঁধা গড়ন হয়। অবশ্য একটু আধটু কাচও তার ভেতর থাকে।

এইবার তোমাদিগকে কতকগুলো আগ্নেয় শিলার নাম বলব। নামগুলো মোটামুটি জেনে রাখা ভাল। প্রথম ভূগর্ভে জমাট বাঁধা শিলা—যেমন Gabbro, Diorite এবং Granite। দ্বিতীয়—বাহিরে জমাট-বাঁধা—যেমন Basalt, Andesite এবং Rhyolite।

এর কোন কোনটাতে সিলিকনের ভাগ কম, ধাতুর ভাগ বেশী (Basalt এবং Gabbro)। আবার কোন কোনটায় ধাতু কম, সিলিকন বেশী (Rhyolite এবং Granite)। আবার কোন কোনটাতে দুটোই মাফিক-সই।

এর কোন শিলাতে কি কি খনিজ আছে তাও পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করে স্থির করেছেন। কিন্তু সে সব কথা বলে তোমাদিগকে আর বিব্রত করব না।

আচ্ছা, ধর, কোন আগ্নেয় পর্ব্বত একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বহু যুগ ধরে তার ক্রেটার থেকে আগুন ধোঁয়া আর কিছুই বেরোয় না। তখন তার কি দশা হবে? তার উপর দিয়ে বছরের পর বছর ঝড়-বৃষ্টি তুফান ত বয়ে যাবেই। তার কি কোন ফল হবে না? অবশ্য হবে। বিসুবিয়াস, ফুজিয়ামা, এট্‌না, হেক্‌লা এরা আজও রয়েছে বলে মনে কোরো না যে, আগ্নেয়গিরি একবার মাথা তুললেই চিরদিন দাঁড়িয়ে থাকবে। কত হাজার হাজার পুরানো আগ্নেয়গিরি পৃথিবীর উপর থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। গ্রেট বিটেন দ্বীপের পশ্চিম অংশের মাটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সেটা প্রধানতঃ জমাট লাভা ও Tuff দিয়ে তৈরী। অথচ দ্বীপটার মধ্যে কোথাও একটা মরা জ্বালামুখীর ক্রেটার অবধি দেখতে পাওয়া যায় না। যুগের পর যুগ ঝড়-বৃষ্টির ফলে ক্রেটার সব বুজে গেছে, পাহাড়গুলো সব [illegible]য়ে ভূমিসাৎ হয়ে গেছে।

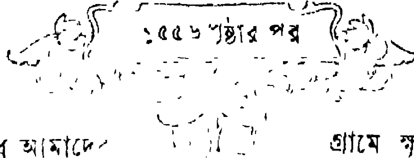
অবশ্য একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে, ঝড়, বৃষ্টি জলে পাথরের স্তরকে যত সহজে ধ্বংস করতে পারে, আগ্নেয় শিলাকে তত সহজে পারে না। এই ত প্রতি বছর বর্ষাকালে হিমালয়ের উপর পাহাড় ধ্বসার এত ধুম পড়ে যায়, অথচ দাক্ষিণাত্যের ঘাটগুলো দাঁড়িয়ে থাকে অচল অটল।





অমর জীবন

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস


১৫৫৬ পৃষ্ঠার পর

ভাগীরথীর তীরে দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরের নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে। আজকাল দক্ষিণেশ্বরের নাম শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশের লোকেরাই জানেন। গঙ্গার তীরে সারি সারি শিবের মন্দিরের মাথার উপর দিয়া সেখানকার কালীবাড়ীর বড় মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ে। এই কালীবাড়ীতে প্রত্যহ শত শত যাত্রী আসেন। আমাদের দেশের লোকেরাই যে শুধু আসেন, তা নয়, বিদেশের অনেক লোকও এখানে আসেন। কেন আসেন, জান? এখানে এক মহাপুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল রামকৃষ্ণ পরমহংস। সেই মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে থাকিতেন বলিয়া এই স্থান পুণ্য তীর্থে পরিণত হইয়াছে, তাই এখানে এত লোক আসে।

হুগলী জেলায় কামারপুর গ্রাম। এই গ্রামটি জাহানাবাদ মহকুমার অন্তর্ভূত। সেই গ্রামে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামে এক নিষ্ঠাবান্ দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ক্ষুদিরামের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম চন্দ্রাদেবী। ফাগুনের এক শুক্লা নিশায় দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ যখন আকাশে ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেই শুভ সুন্দর পুণ্য মুহূর্তে নিশার প্রথম ভাগে রামকৃষ্ণ



কামারপুকুর—রামকৃষ্ণ পিত্রালয়

জন্মগ্রহণ করেন (১৭৫৬ শকের ১০ই ফাল্গুন)। ক্ষুদিরাম কিছুদিন পূর্ব্বে গয়া তীর্থে গমন করিয়াছিলেন, যেদিন তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, সেইদিনই রামকৃষ্ণ জন্মলাভ করেন। সেজন্য আদর করিয়া পুত্রের নাম রাখিলেন গদাধর। তাঁহার আরও দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার পড়াশুনায় বেশ ভাল ছিলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন।

গদাই ছেলেবেলা হইতেই যেন কেমন একটু ভিন্ন-প্রকৃতির ছিলেন। পাঠশালায় যাইতেন কিন্তু পড়ার দিকে তাঁহার মন ছিল না। কোথাও হরির নাম শুনিলে, কোথাও শ্যামা-সঙ্গীত শুনিলে তাঁহার মন কেমন হইয়া যাইত। প্রতিমা গড়িতে ছিল তাঁহার একটা স্বাভাবিক নৈপুণ্য। আর ছিল তাঁহার অদম্য সাহস—ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। শ্মশানে মশানে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতেন।

গদাধরের বয়স যখন দশ এগার বৎসর, সে সময়ে তাঁহার মধ্যে ধর্ম্মের ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। যদি শুনিতেন, যে গ্রামে কোথাও যোগী বা সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাহা হইলে সেই যোগী বা সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া বসিয়া থাকিতেন। পিতা পরিবারের জন্য নূতন কাপড় দিয়াছেন, তাহা ছিঁড়িয়াই বালক গদাই কৌপীন করিয়া পরিতেন। কোথাও কথকতা হইতেছে—কোথাও কেহ পুরাণ বা শাস্ত্রের কথা আলোচনা করিতেছেন — সেখানে যাইয়া বালক নিবিষ্ট মনে সব কথা শুনিতেন। একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। বাড়ীতে আসিয়া বাবা-মার কাছে, সঙ্গীদের কাছে, সেই সব পৌরাণিক উপাখ্যান বলিয়া যাইতেন।



দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী

গদাধরকে গ্রামের লোকেরা স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আদর করিয়া ডাকিতেন, গদাই। পাঁচ বৎসরের সময় গদাধর পাঠশালায় পড়িতে গেলেন, কিন্তু সে সময় আত্মীয়-স্বজন কেহই গদাধর নামটা পছন্দ করিলেন না—তখন তাঁহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাখা হইল রামকৃষ্ণ। এই রামকৃষ্ণ নামই এখন পৃথিবীর সব দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বালক ছেলেবেলা ঠাকুর গড়িয়া পূজা করিতে, গান করিতে এবং দেবতাদের মন্দিরে মন্দিরে দেব দর্শন করিতে তাঁহার একান্ত আগ্রহ দেখা যাইত। দীক্ষার পর তিনি মাঝে মাঝে যখন গৃহদেবতার পূজা করিতেন, তখন তাঁহার মন যেন কোন্ এক দেবলোকে চলিয়া যাইত।

রামকৃষ্ণের বড় ভাই রামকুমার ছিলেন পণ্ডিত মানুষ, তিনি কলিকাতা যাইয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া

শাস্ত্রালোচনা করিতেন। রামকৃষ্ণ কিছুদিন দাদার কাছে কলিকাতাতে ছিলেন। রামকুমার চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া সাংসারিক অবস্থার কোন উন্নতি করিতে না পারিয়া যখন রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে কালীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁহার পূজারির পদ গ্রহণ করেন। দাদার সহিত রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে আসেন। দক্ষিণেশ্বরের পূজারির পদ গ্রহণ করিবার পর রামকুমারের সাংসারিক অবস্থার অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়। তখন তিনি ভ্রাতা রামকৃষ্ণের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং হুগলী জেলার জয়রামবাটী গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। দুর্ভাগ্য এমনি যে, এই বিবাহের অল্প দিন পরেই রামকুমারের মৃত্যু হইল।

রামকুমারের মৃত্যুর পর রাণী রাসমণির জামাতা মথুর বাবু রামকৃষ্ণের সরল সুন্দর মূর্ত্তি ও অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিতে থাকেন। তিনি কিছুকাল পরে আবার রামকৃষ্ণকেই মায়ের পূজার জন্য নিযুক্ত করিলেন। এই ভাবে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্ত রামকৃষ্ণ পূজা করিতে করিতে ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন, পৃথিবী হইতে যেন কোথায় চলিয়া যাইতেন! কখনও ফুল-চন্দন দিয়া ঠাকুর সাজাইতেন, কখনও আরতি করিতে করিতে নৃত্য করিতে থাকিতেন, কখনও ভক্তিভরে মা মা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। একদিন পূজা করিতে বসিয়া পুষ্প ও চন্দনাদি দেবীমূর্ত্তির মাথায় না দিয়া নিজের মাথায় দিলেন। আর একদিন ভাবহারা রামকৃষ্ণ দেবীর বেদীর উপরে যাইয়া বসিয়াছিলেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মথুর বাবুর রামকৃষ্ণের প্রতি আরও ভক্তি বাড়িয়া গেল, তিনি তাঁহাকে বিশেষ আদর ও যত্ন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে গঙ্গাতীরে পঞ্চবটী মূলে রামকৃষ্ণ তাঁহার তপস্যার স্থান করিয়া লইলেন। কথিত আছে তোতাপুরী বাবা নামে একজন সন্ন্যাসীর নিকট তিনি



সারদা দেবী

তখন দীক্ষা লইয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর পশ্চিমদিকে এক বিশাল বট তরুর বিস্তৃত ছায়াতলে তিনি তাঁহার আসন স্থাপন করিয়া কঠোর সাধনায় ব্রতী হইলেন। তোমরা কখনও দক্ষিণেশ্বর বেড়াইতে গেলে 'পঞ্চবটী তলা' দেখিয়া আসিতে ভুলিও না। নীরব ও নির্জ্জন, ছায়াশীতল সেই স্থানটি দেখিলে হৃদয় ভক্তি ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। প্রায় আট

দশ বৎসর কাল দিন নাই, রাত্রি নাই, অশ্রান্তভাবে সাধনা ও তপস্যা করিয়াছিলেন। বৈরাগ্য ও চিত্ত-শুদ্ধির জন্য নানারূপ ক্লেশ করিতেন। তাঁহার একজন সহচর লিখিয়াছেন—"দশ বৎসর তাঁহাকে রীতিমত নিদ্রা যাইতে দেখা যায় নাই, তাঁহার শরীরে এইরূপ তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, শীতকালের রাত্রিতেও তাঁহার গায়ের তাপ দূর করিবার জন্য তাঁহার গায়ে মাখন মাখান হইত। অনেক দিন সূর্য অস্ত যাইবার সময় তিনি ভাগীরথীর তীরে বসিয়া—'মা, দিন তো চলে গেল, কিছুই যে, হলো না,"—বলিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেন। অনেক দিন পরে তাঁহার একজন ভক্ত যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ঈশ্বর লাভের উপায় কি? তখন পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন "ব্যাকুলতাই ঈশ্বর লাভের উপায়। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন ব্যাকুলতা হয় না।"

রামকৃষ্ণ ছিলেন জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ। তাঁহার কোন কিছুর প্রতিই কোন আকর্ষণ ছিল না। যখন সাধন করিতেন, তখন 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিয়া গঙ্গার জলে টাকা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। মথুর বাবু তাঁহাকে অনেক ভাল ভাল কাপড় ও শালদোশালা দিয়াছিলেন। তাহা তিনি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। পরে তাঁহার এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, টাকা বা মোহর স্পর্শ করিলে তাঁহার হাত অসাড় হইয়া যাইত। একদিন এক মুহূর্তের জন্যও তিনি খাওয়া-পরার কথা ভাবেন নাই। কখনও কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই। সংসারের প্রতি তাঁহার একান্ত বিরাগ ছিল। সংসারী লোক-দিগকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না।

পরমহংসদেবের কাছে ধনী, বড়মানুষ, জ্ঞানী ও পণ্ডিত বলিয়া কিছু ছিল না। তিনি কাহাকেও ভয় করিতেন না। সকলকে স্পষ্ট কথা বলিতেন, অনেক সময় [illegible]র সত্য শুনাইয়া দিতেন।

একবার একজন বিখ্যাত ধনী তাঁহার নিকট আসিয়া দুই চারিটি কথাবার্তা বলিয়া বলিলেন যে, "দেখিতেছি, আপনার অন্নবস্ত্রের ক্লেশ হয়, আমি কয়েক হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজ আপনার জন্য রাখিতে চাই, তাহার সুদে আপনার নিয়মিত ব্যয় নির্বাহ হইবে, তাহা হইলে আর আপনার কোন কষ্ট হইবে না। এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণ সেই ধনীর মুখের দিকে এমনভাবে কটমট করিয়া তাকাইয়া রহিলেন যে, তাহাতে বড় লোকটির মুখ চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বিষণ্ণ ভাবে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।

রামকৃষ্ণ ছিলেন শিশুর মত সরল। তিনি ঈশ্বর-দর্শন যোগ ও প্রেমের গভীর কথা বলিতে বলিতে এবং গান করিতে করিতে প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন। সমাধিস্থ হইয়া জড়-পুত্তলিকার মত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিলে পুণ্যের সঞ্চার হইত। কত পাপী তাপী যে তাঁহার কাছে আসিয়া জীবনকে পবিত্র ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রামকৃষ্ণ পুঁথি পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করেন নাই, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতগণ তাঁহার কাছে মাথা নত করিয়াছে। তিনি গ্রাম্য ভাষায়, সহজ সরল মিষ্ট কথায় দৃষ্টান্ত সহযোগে অতি সুন্দর গভীর বিষয়গুলির তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এমন ভাবের মাধুর্য ছিল যে, কাছে বসিলে মনের শোক, দুঃখ, বিষাদ ও গ্লানি ভুলিয়া যাইতে হইত। অনেক সময় ঈশ্বরের নাম করিবামাত্র তাঁহার সমাধি হইত। তখন তাঁহার চক্ষুতে পলক থাকিত না, আর দুই চক্ষু বহিয়া প্রেমের ধারা বহিত। মুখের মধুর হাসি সে ছিল এক অপূর্ব দৃশ্য।

একদিন পথ দিয়া যাইতে যাইতে রামকৃষ্ণ দেখিলেন একজন লোক কুড়ুল দিয়া একটি গাছ কাটিতেছে, দেখিয়াই তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন—"আমার মা যে এই গাছে বিরাজ করিতেছেন, তাঁর গায়ে যে এই কুড়ুলের আঘাত লাগিতেছে।" পাতাটি ছিঁড়িতে, ফুলটি ছিঁড়িতে তাঁহার প্রাণে বেদনা লাগিত—ফুলের শোভার মধ্যে তিনি জগন্মাতার মুখের হাসি প্রতিভাত হইতে দেখিতেন। তিনি বলিতেন—"আমার কালী চিন্ময়ী, আমার মা ঘন সচ্চিদানন্দা, যাহা বৃহৎ ও গভীর, তাহাই কালবর্ণ, সুবিস্তৃত আকাশ কালবর্ণ, সুগভীর সমুদ্র কালবর্ণ। আমার কালী সর্বব্যাপিনী।"

পরমহংসদেবের মধ্যে যেমন শাক্ত ভাব, তেমনি বৈষ্ণব ভাব, আর তেমনি ছিল ঋষিভাব। সাধারণ সাধু সন্ন্যাসীদের মত তিনি গৈরিক বস্ত্র পরিয়া ও নানা প্রকার আড়ম্বর করিয়া থাকিতেন না। পরনে একখানা লালপেড়ে ধুতি মাত্র ব্যবহার করিতেন।

দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ের এক পাশে গঙ্গার তীরে একটি একতলা ঘরে তিনি বাস করিতেন। কোথাও বড় একটা যাইতেন না। মাঝে মাঝে কামারপুকুরে

যাইতেন। একবার মথুর বাবুর সহিত নানা তীর্থ বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ আপনার ভাবে আপনি মগ্ন থাকিতেন। কখনও কখনও যেখানে ধর্মপ্রসঙ্গ হইত সেখানে যাইতেন। অথচ সে সময়ে বাঙ্গালা দেশের কোথায় কি ধর্মান্দোলন হইতেছে, সে সংবাদ রাখিতেন। একবার কলিকাতার আদিব্রাহ্মসমাজে গিয়া কেশবচন্দ্র সেনকে বেদীর উপর উপাসনা করিতে দেখিয়া বলেন,—"কেশবের মনটা বঁড়শীতে মাছ গেঁথেছে, তার ফাতনা ডুবেছে।" সেই সময় হইতেই তিনি কেশবচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পরিচয় হয় নাই।

১৮৭৫ সালের মার্চ মাসে একদিন বেলা ৮।৯ টার সময় পরমহংসদেবের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎভাবে পরিচয় লাভ হয়। সে ঘটনাটি বড় সুন্দর, এখানে বলিতেছি। কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পরমহংস প্রথমতঃ তাঁহার কলুটোলার বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া জানিতে পারিলেন—কেশবচন্দ্র বেলঘরিয়া জয়গোপাল সেনের বাগান-বাড়ীতে প্রচারকগণের সহিত সাধন-ভজন করিতেছেন। ইহা শুনিয়া পরমহংসদেব সেখানে গমন করেন। তখন কেশবচন্দ্র বন্ধুদের সহিত সরোবরের বাঁধান ঘাটে বসিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ একখানা ঠিকা গাড়ী করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। প্রথম হৃদয় গাড়ী হইতে নামিয়া কেশবচন্দ্রকে যাইয়া বলেন যে, "আমার মামা হরির নাম শুনিতে ভালবাসেন, মহাভাবে তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে। তিনি আপনার মুখে ঈশ্বরের গুণ-কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন।" এই বলিয়া হৃদয় ভট্টাচার্য্য পরমহংসদেবকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তখন তাঁহার পরিধানে একখানা লাল পাড়ওয়ালা ধুতি মাত্র ছিল। পিরান বা দ্বিতীয় বস্ত্র গায়ে ছিল না। ধুতির কোঁচার খুলিয়া কাঁধে ফেলিয়াছিলেন, দেহ জীর্ণ ও দুর্ব্বল। কেশবের সঙ্গীরা তাঁহাকে দেখিয়া একজন সামান্য লোক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি নিকটে আসিয়াই বলেন যে, "বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করিয়া থাক, সে দর্শন কিরূপ, আমি জানিতে চাহি।" এইরূপে সৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হয়। পরে পরমহংসদেব একটি রামপ্রসাদী গান করেন, গান করিতে করিতে তাঁহার সমাধি হয়। তখন সমাধির ভাব দেখিয়া কেহই ইহা বুঝিতে পারেন নাই। কেশবের সঙ্গীরা উহা ভেল্কী মনে করিয়াছিলেন। সমাধির অল্প পরে হৃদয় ভট্টাচার্য্য উচ্চৈস্বরে ওঁ ওঁ বলিতে থাকেন ও সকলকে সেইরূপ ভাবে ওঁ ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। তখন তাঁহারাও সকলে ওঁ ওঁ বলিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব চৈতন্য লাভ করিয়া হাসিয়া উঠেন এবং গভীর কথা সকল বলিতে থাকেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, রামকৃষ্ণ একজন স্বর্গীয় পুরুষ, তিনি সহজ মানুষটি নন্। তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আমোদে মত্ত হইয়া সকলে স্নান উপাসনা ভুলিয়া গেলেন। সেদিন বেলা শেষে তাঁহারা স্নান আহার



কেশবচন্দ্র সেন

করেন। পরমহংস সেদিন বলিয়াছিলেন—"গরুর পালে অন্য পশু আসিলে গরু শিং দিয়া গুঁতাইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু গরু আসিলে স্বজাতি বলিয়া গা চাটাচাটি করে।" "বেঙ্গাচির লেজ খসিয়া পড়িলেই ডাঙ্গায় লাফিয়ে বেড়ায়।" সাধু সাধুজনে বেশ চিনিতে পারেন। পরমহংসদেবকে দেখিয়া কেশবচন্দ্র যেমন মুগ্ধ হইলেন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি তেমনি আকৃষ্ট হইলেন। . হইতেই উভয়ের আত্মার গূঢ় যোগ হয়। সময়ে সময়ে কেশবচন্দ্র দলে-বলে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের নিকট যাইতেন, পরম-হংসও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া কেশবচন্দ্রের বাড়ী

আসিতেন। পরমহংসদেব কেশবচন্দ্রের বাড়ী আসিলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য কেশবচন্দ্রের প্রতিবেশী, আত্মীয়, বন্ধু প্রভৃতি লোক আসিয়া জুটিত, লোকের ভিড় জমিয়া যাইত। পাঁচ সাত ঘণ্টা ব্যাপিয়া ধর্ম্ম প্রসঙ্গে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইত।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১২৮৮ সালের ১৬ই আশ্বিন তারিখের 'ধর্ম্মতত্ত্বে' পরমহংস সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"এই মহাত্মাকে (পরমহংসকে) যতবার



সঙ্গীত প্রাণে সমাধিস্থ রামকৃষ্ণ

ছিলেন—"এই মহাত্মাকে (পরমহংসকে) যতবার দেখিয়াছি, তাঁহার উচ্চ জীবন দেখিয়া অবাক হইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি তিনি একজন প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ—যোগাত্মা। ইঁহার মন সর্ব্বদাই ভগবানেতে সংযুক্ত থাকে। তিনি ছেলের মত সরল এবং ঈশ্বর-প্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মত হন। তিনি কখন হরি বলিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের স্থায় নৃত্য করেন, কখনও মা কালী বলিয়া অত্যন্ত প্রেমে ভগবানকে ডাকিয়া শাক্ত ধর্ম্মের আদর্শ কি, তাহা দেখান। আবার কখন পুরান যোগীদের মতন নিরাকার ব্রহ্মেতে নিমগ্ন হইয়া যান।"

প্রতি বৎসর নব-বিধান সমাজের বার্ষিক উৎসবের পরে একদিন কেশবচন্দ্র দলবলসহ দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া কীর্ত্তন করিতেন। এক বৎসর ঐ উপলক্ষে ষ্টীমার-যোগে কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন কেশবচন্দ্র সদলবলে আসিতেছিলেন, তখন রামকৃষ্ণ তাঁহার বসিবার ঘরে বসিয়া বরিশালের ভক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতির সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। দূর হইতে কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সকলকে ছাড়িয়া রামকৃষ্ণ দৌড়াইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন ও ষ্টীমার কিনারায় লাগিবামাত্র তাহাতে উঠিয়া কেশবকে জড়াইয়া "তুমি শ্যাম, আমি রাধা," বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কেশবচন্দ্রের বাটীতে যাইয়াও তিনি অনেকবার কেশবের হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্রের মাতাকে পরমহংস দেব 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। অনেক সময় নিজে চাহিয়াই লুচি, তরকারী প্রভৃতি খাইতেন। রামকৃষ্ণ কুল্পী-বরফ খাইতে বড় ভালবাসিতেন। একবার কেশবের বাড়ী আসিয়া কুল্পী-বরফ খাইতে চান। তখন কুল্পীওয়ালা কেহ সেখানে ছিল না। কেশব অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কি আশ্চর্য্য, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে একজন কুল্পীওয়ালা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কেশব মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের জন্য বরফ পাঠাইয়া দিতেন।

পরমহংসদেব সুরসিক ছিলেন। উপমা দিয়া এমন সুন্দরভাবে কথা বলিতেন যে, লোকে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না। তিনি জিলাপী খাইতে খুব ভালবাসিতেন। একবার কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে আহারাদির পর তিনি বলিলেন—"আমার পেট পর্য্যন্ত পূর্ণ, আর একটি সর্ষপ পরিমাণ খাদ্যের সংস্থান নাই, তবে জিলাপী হইলে পথ হইতে পারে।" একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"যখন পথ নাই, তখন জিলাপীর পথ কেমন করিয়া হইবে?" উত্তরে রামকৃষ্ণ বলিলেন, "যেমন রাস্তায় খুব গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় থাকিলেও লাট সাহেবের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে অন্য অন্য গাড়ী সরিয়া স্থান করিয়া দেয়, তেমনি জিলাপী খাইবার পথ হবে, অন্য খাদ্য দ্রব্য জিলাপীকে সম্মান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে।"

কেশবচন্দ্রের জননীর "আত্মকথা" নামক পুস্তকে পরমহংসদেব সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে। এখানে তাহার সামান্য কিছু উদ্ধৃত করিলাম।—"ঐ কলুটোলায় তেতালার ঘরে প্রথমে আমি তাহাকে (পরমহংসকে) দেখি। কেশবের কাছে এসে তিনি কেশবের হাত ধরে নাচিতেন ও গাহিতেন। * * তাহাকে আমার বড় ভাল লাগিত। আমি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতাম। তিনি কত যে ভাল ভাল কথা



শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

বলিতেন, তাহা এখন আমার মনে নাই। একবার বলিয়াছিলেন—'দেখ মা, ভায়ে ভায়ে দড়ি ধরে মাপে আর বলে, এদিকটা তোর আর ঐদিকটা আমার। কিন্তু কার জায়গা মাপছে, আর কেইবা নেয়, সেটা কিছু ঠিক করে না।'

প্রসিদ্ধ কর্মবীর স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ) এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সহিত গাঢ়ভাবে মিলিত ছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের নিকট যাতায়াত করিতেন। নরেন্দ্রনাথ বেশ গান গাহিতে পারিতেন। একদিন উপাসনার সময় নরেন্দ্র গান গাহিতেছিলেন। পরমহংসদেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রের গান শুনিয়া তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলেন। রামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করিবার পর নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন এবং রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য হন। স্বামী বিবেকানন্দ সেবাকার্যে নিজ জীবন ঢালিয়া দিয়া, ভারতের সর্বত্র সেবাশ্রম স্থাপন করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন। ইনি একজন ক্ষণজন্মা তেজস্বী পুরুষ ছিলেন।

পরমহংস গুরুগিরিকে ঘৃণা করিতেন। তাহার প্রতি আকৃষ্ট লোকদিগকে 'শিষ্য' বলিতেন না।



স্বামী বিবেকানন্দ

মৃত্যুর পূর্বে তাহার শিষ্য-সংখ্যা তেমন বেশী ছিল না। কিন্তু শিক্ষিত যুবকগণ অনেকেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

রামকৃষ্ণের বিনয় ছিল অতি চমৎকার। কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে পূর্বেই তিনি নমস্কার করিতেন। তাঁহার উপদেশ-বাণী এবং তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিষয় সংবাদ পত্রাদিতে লেখা হয়, তাঁহার ফোটোগ্রাফ তোলা হয়, তিনি এইরূপ ইচ্ছা করিতেন না। সমাধির অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য না হইলে তাঁহার ফোটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারে নাই। সমাধি হইলে তিনি কি উপবিষ্ট, কি দণ্ডায়মান, সকল অবস্থাতেই স্পন্দহীন স্থিরভাবে থাকিতেন।

21—F. 4

পরমহংস যথার্থই সরল শিশুর ন্যায় ছিলেন। এক বার ছোট শিশুটির মত তাঁহার ষ্টীমারে চড়িবার ইচ্ছা হইল। কেশবচন্দ্র কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধুর সঙ্গে ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংসদেবকে তুলিয়া লইলেন। পরমহংসদেব ষ্টীমারের ঝক্ ঝক্ শব্দ শুনিবার জন্য উৎসুক ছিলেন, তাহা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে কোন বন্ধু জাহাজ হইতে দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়া দেখিতে বলিলেন। তিনি তখন বলিলেন—"আমার মন ঈশ্বরে ডুবিয়া আছে, তুমি কি বল, আমি তাহা হইতে উঠাইয়া লইয়া এই দূরবীক্ষণে বদ্ধ করিব ?"

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে পরমহংস দেবের গলায় ক্ষতরোগ (cancer) দেখা যায়। তাহাতে তিনি বড়ই কষ্ট পান। বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, ভক্ত ও সেবকেরা তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে থাকিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পীড়ার কোন উপশম হইল না। ক্রমে ক্রমে আহার বন্ধ হইল। সামান্য পানীয়টুকুও তিনি পান করিতে পারিতেন না। স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য তাহাকে কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে আনা হইল, কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তনেও দারুণ রোগের কোনও প্রতিকার হইল না। দেখিতে দেখিতে শরীর ক্রমশঃ জীর্ণশীর্ণ হইতে লাগিল। তারপর ১২৯৩ সালের, ৩১শে (ইংরাজী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে) শ্রাবণের রবিবার সংক্রান্তি দিবসে সন্ধ্যার শেষ মুহূর্ত্তে দিব্যধামবাসী রামকৃষ্ণ দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। শ্রাবণের আকাশ কালো মেঘে মুখ ঢাকিল।

১লা ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় কাশীপুরের বাগানবাড়ী হইতে তাঁহার দিব্যদেহ বরাহনগরের শ্মশানঘাটে নীত হইল। কলিকাতা হইতে শত শত লোক আসিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিলেন। শ্মশানে তাঁহার পবিত্রদেহের পার্শ্বে বসিয়া ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্ম্মা) সঙ্গীত করিলেন। চিতাশয্যায় স্থাপন করিবার সময় সেই পবিত্রদেহের পদ ধারণ করিয়া ভক্তবৃন্দ ভক্তির সহিত শেষ প্রণাম করিলেন। পরমহংসদেবের চোখ দু'টি আধ আধ খোলা—মুখে মৃদু মধুর হাসিটি ফুটিয়াছিল,—বোধ হয় তিনি সমাধির অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। সন্ধ্যাকালে গঙ্গার তীরে পবিত্র অগ্নি, রক্তশিখা বিস্তার করিয়া নাচিতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইয়া গেল।

একদিন দুঃখিনী জননীর কোল আলো করিয়া যে মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল, আজ তাঁহার নাম বিশ্বজগতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে, ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ স্থানে, আমেরিকার সুদূর প্রান্তেও এখন রামকৃষ্ণ মঠ ও সেবা-ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাঁহার জন্ম-তিথি ও মৃত্যুতিথিতে ভক্তগণ, কীর্ত্তন, পূজা-অর্চ্চনা, দরিদ্রনারায়ণের সেবা প্রভৃতি করিয়া যথার্থভাবে মহাপুরুষের স্মৃতির পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার শতবার্ষিকী স্মৃতি-উৎসবও হইয়াছে।

রামকৃষ্ণের বাণী

সমুদ্রে রত্ন আছে যত্ন চাই, ঈশ্বর সংসারে আছেন সাধন চাই।

যে গরুর মাথায় গোরচনা থাকে, সে দলের অন্য অন্য গরুর আগে আগে চলে। সেইরূপ যে ব্যক্তির মহত্ত্ব আছে তিনিই অপর সকলের নেতা হন।

ঝিকুনে কাটি দ্বারা যেমন মাঝে মাঝে উনন নেড়ে দিতে হয়, তাতে নিব নিব আগুন উস্কে উঠে, সেইরূপ মাঝে মাঝে সাধু-সঙ্গ দ্বারা মনকে সতেজ করা চাই। কামারের জাঁতার আগুন মাঝে মাঝে তোয়ে রাখতে হয়।

ছুতরের স্ত্রী যেমন ধান সিদ্ধ করে, উনুনে কাঠ গুঁজে দেয়, ঢেঁকি দিয়ে সিদ্ধ ধান চাল করে, আবার হাত দিয়ে ধান নেড়ে দেয়, এদিকে স্বামীর সঙ্গে ঘরকন্নার কথা কয়, কিন্তু তার দৃষ্টি থাকে হাতের দিকে; সেইরূপ ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে সংসারের সমুদয় কাজকর্ম্ম করিতে হয়।

আকাশের জল নির্ম্মল ও পরিষ্কার, যেমন ছাদ ও নল দিয়ে বের হয় সেইরূপ হয়ে থাকে, ঘোলা বা পরিষ্কার। এইরূপ বিকৃত হৃদয়ে পড়েই ধর্ম্ম বিকৃত হয়।

কাকেও ডেকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মপথে আনা যায় না। মন যখন ব্যাকুল হয়, তখনই সে ধর্ম্মপথে যায়।

একজন দুঃখী কাঠুরিয়া বনের কিনারায় কাঠ কাটছিল, তাহার দুঃখ দেখে একজন পথিক ব্রাহ্মণ তাকে বলেন, বাপু, এগিয়ে যাও। কাঠুরিয়া ব্রাহ্মণের কথায় বনের ভিতরে চলে গেল। যেতে যেতে এক চন্দন বনে যেয়ে উপস্থিত হল। সেদিন সে অনেক চন্দন কাঠ আহরণ করল। তাতে তার পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ লাভ হল। পরদিন সে ভাবল, ঠাকুর তো আমাকে কেবল অগ্রসর হয়ে যেতে বলেছেন, আমাকে শুধু চন্দন কাঠ তুললে চলবে না। সে আরও চলতে লাগল। যেতে যেতে এক তামার খনিতে যেয়ে পৌছল। সেদিন সে যত পারল তামা তুলে আনল, তাতে আরও দশগুণ লাভ হল। কাঠুরিয়া এইভাবে দিনের পর দিন চলতে চলতে একে একে রূপোর খনি, সোনার খনি ও হীরক খনি-তে যেয়ে পৌছল এবং সোনা, রূপা, হীরা প্রভৃতি লাভ করে সে মহা ধনী হয়ে উঠল। ধর্ম্মের রাজ্যেও ক্রমশঃ অগ্রসর হতে হয়, তাতেই মহালাভ হয়ে থাকে।

কুকুরের লেজ হাজার বার টানলেও যেমন সোজা করা যায় না, তেমনি মন্দলোকের মন কিছুতেই ভাল হয় না।

শিশু ছেলে যেমন লাল চুষী পেয়ে তাতে ভুলে থাকে, যখন সে চুষী ফেলে মা বলে চেঁচিয়ে ওঠে, তখন মা তার নিকটে আসেন ও তাকে বুকে করে স্তন্য দান করেন। এইরূপ সংসারের অনেক চক্‌চকে সামগ্রী আছে, লোকে ছেলে মানুষের ন্যায় তাই পেয়ে ঈশ্বরকে ভুলে থাকে। ভগবান্‌কে কাতর প্রাণে ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়।

*   *   *   *

বই পড়ে ভক্তি লাভ হয় না। পাঁজীতে লেখা আছে এত আড়া জল, কিন্তু সমুদয় পাঁজিখানি পেষণ করলেও এক ফোঁটা জল বের হয় না।

*   *   *   *

মানুষ বালিসের খোলের ন্যায়, কোন খোল সাদা, কোনটা কাল, কোনটা রাঙা, কিন্তু সকল খোলের ভিতরেই এক তুলো। এইরূপ সকলের মধ্যে ঈশ্বর আছেন।

*   *   *   *

মানুষ অর্থে মন্ হুষ অর্থাৎ যার হুস আছে সে-ই মানুষ।

জাহাজের কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে থাকে তাতে জাহাজের দিগ্‌ভ্রম হয় না, তেমনি ঈশ্বরকে লক্ষ্য করে জীবন-তরী চালাবে।

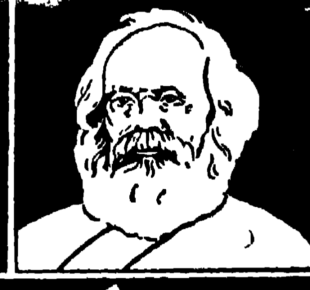
অট্টালিকার ছাদে যেমন মই, বাঁশ সিঁড়ি, দড়ী প্রভৃতি নানা উপায়ে ওঠা যায়, তেমনি ঈশ্বরের রাজ্যে যাবার সহজ ও কঠিন নানাবিধ উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রে এক এক প্রকার পথ আছে।

ছেলেরা লুকোচুরি খেলে। যে বালক বুড়িকে একবার ছুঁতে পারে, সে যেখানে দৌড়ে যাক না কেন, চোর ধরলেও তার কিছু হয় না। একবার ঈশ্বরকে ধরে মানুষ পরে সংসারে বিচরণ করলে সহস্র প্রলোভনের মধ্যেও তার কিছু হবে না।

দুধে মাখন আছে শুধু এই কথা বললে মাখন পাওয়া যায় না। মাখন বের করতে হলে দুধকে দই করতে হয়, পরে সংঘর্ষণ করলে তা হতে মাখন বের হবে। একপ যদি কিছু লাভ করতে চাও, তদুপযোগী সাধন করতে হবে।

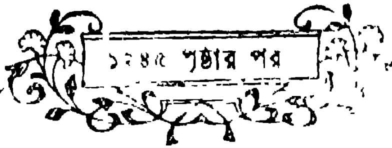






 **রাজনৈতিক আদর্শ** 

সমষ্টিবাদ


১২৪৫ পৃষ্ঠার পর

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটা যুগ ছিল যখন মানুষ প্রধানতঃ নিজ স্বার্থচিন্তাতেই ব্যস্ত থাকিত সে শুধু ভাবিত নিজের কথা—কি করিয়া নিজে জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবে, কি করিয়া নিজের পরিবার বা সমাজকে সে উন্নত করিতে পারিবে। নিজের একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে আর সকলেই ছিল তাহার কাছে শত্রুতুল্য এবং তাহাদিগকে যে কোন প্রকারে ব্যাহত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করাই ছিল তখন প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য।

এই যে যুগের কথা বলিতেছি, ইহা বেশীদিনের কথা নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য দেশসমূহেও এক শত বৎসর পূর্ব্বে মানুষ এই প্রকার স্বার্থপ্রণোদিত ভাবে চিন্তা করিত, কাজ করিত। এই প্রকার চিন্তা করা বা কাজ করার মধ্যে যে কোনপ্রকার সঙ্কীর্ণতা আছে, তাহা তাহাদের মনে কখনও স্থান পাইত না। তাহারা ভাবিত এবং দেখিত যে মানুষ প্রধানতঃ নিজের চেষ্টাতেই বড় হইতে পারে, কেহ কাহাকেও সাহায্য করিয়া বড় করিতে পারে না।

কিন্তু ধীরে ধীরে এই চিন্তাধারার একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। যে সমস্ত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে এই পরিবর্ত্তন সুরু হইল, তাহারই কথা প্রথমে বলিতেছি।

পূর্ব্বে বিদেশে যাতায়াত করা সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ ছিল না। একশত বৎসর আগে রেল গাড়ী বা ষ্টিমারের সৃষ্টি হয় নাই—পালতোলা নৌকা, জাহাজ এবং ঘোড়ার গাড়ীই ছিল তখনকার প্রশস্ত যানবাহন। আর আজকাল যেমন সর্ব্বত্রই টেলিফোন, রেডিওর ছড়াছড়ি, তখন তাহাও কিছু ছিল না, বস্তুতঃ, টেলিফোন রেডিও জাতীয় আবিষ্কারগুলি যে কখনও সম্ভবপর হইতে পারে, তাহাই লোকে ভাবিতে পারিত না। ফল হইয়াছিল এই যে, এক দেশের লোকের সহিত অন্যদেশের লোকের আলাপ-পরিচয় খুবই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং একদেশের মধ্যে একগ্রাম হইতে অন্যগ্রাম বা একসহর হইতে অন্যসহরে যাতায়াত ছিল খুবই কম। তাহা ছাড়া রেল-ষ্টীমারের দৌলতে আজকাল ধনি-নির্ধন, উচ্চ-নীচ সকলের পরস্পর মেলামেশার যতটা সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছে, তাহাও তখন ছিল না। তাই সকলেই নিজেদের ব্যক্তিগত বা সমাজগত সুখদুঃখ লইয়াই ব্যস্ত থাকিত, ছোট গণ্ডীর বাহিরে যে প্রকাণ্ড একটা সমষ্টি, একটা বিশাল এবং বৃহত্তর সমাজ আছে, তাহা কাহারও মনে হইত না।

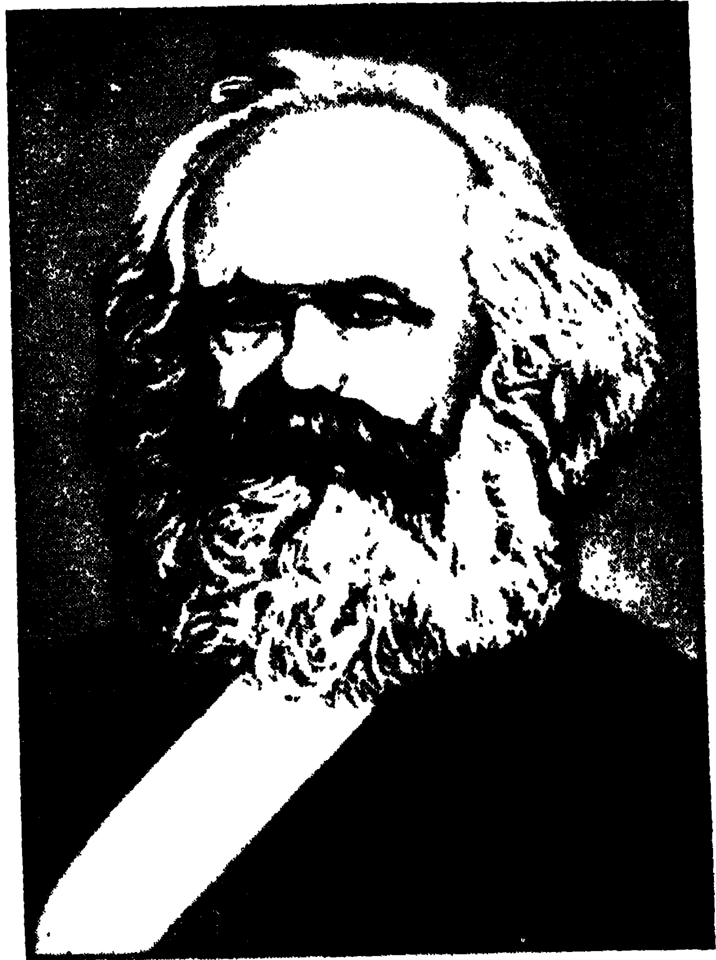
রেল ষ্টীমারের প্রচলনের পর যখন দেশ বিদেশের সহিত পরিচয়ের দ্বার খুলিয়া গেল, তখন লোকে নূতন ভাবে ভাবিতে সুরু করিল। আগে যাহারা নিজেদের কথা, নিজেদের অভাব-অভিযোগ লইয়াই মত্ত থাকিত, তাহারা বিদেশের লোকদের কথা ভাবিতে আরম্ভ করিল। আর যাহারা দরিদ্র ও নীচ, তাহারা দেখিল যে, সকল দেশের একটা দরিদ্র অনুন্নত শ্রেণী আছে, যাহার উপর ধনীরা প্রভুত্ব করিয়া বেড়ায়। ধনি-নির্ধন, উচ্চ নীচে এই পার্থক্যটা অনেক মনীষীর কাছে সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া এই অশোভন পার্থক্যটাকে দূর করা যায়। তাঁহাদের চিন্তাধারা নিবদ্ধ হইল সম্পূর্ণ নূতন রকমের একটা আদর্শবাদে যাহার নাম হইতেছে সমষ্টিবাদ (Socialism)।

সমষ্টিবাদ

সমষ্টিবাদের মোটা কথা হইতেছে এই যে, মানুষ স্বতন্ত্র একটা জীব নয়। তাহার প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি ব্যবহার সমাজের অন্যান্য অনেক মানুষের জীবনের সুখ দুঃখকে নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই, নিজেকে সমষ্টির একটা অংশ ভাবে দেখাই হইতেছে তাহার প্রধান কর্তব্য। যে দেশে বা রাষ্ট্রে এই সমষ্টিবোধটা নাই, সে দেশেই উচ্চ নীচের পার্থক্য খুব বেশী। এই প্রকার বৈষম্য, এই জাতীয় অসাম্য কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নয়, এবং ইহা দূর করিবার একমাত্র পথই হইতেছে সমষ্টিগতভাবে সমাজকে, রাষ্ট্রকে, জীবন প্রণালীকে গঠিত করা। যেদিন শাসক সম্প্রদায় সমষ্টির প্রতিভূ ভাবে রাষ্ট্র সেবা করিবেন এবং সকল কলকারখানা পরিচালনা করিবেন, সেইদিন সকল অসাম্য এবং বৈষম্য দূর হইয়া যাইবে।

এই যে নীতি, ইহা সমষ্টিবাদীদের লেখায় নানা প্রকারে নানা ভঙ্গীতে দেখা যায়। সমষ্টিবাদের প্রধান পুরোহিত কার্ল মার্ক্স Karl Marx এই নীতিগুলিকে খুব জোর দিয়া বিশেষ এক ভঙ্গীতে প্রচার করিয়াছিলেন।

কার্ল মার্ক্স ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দী মধ্য ভাগের লোক। তাঁহার লেখা বিশেষত্ব এই যে সমষ্টিবাদের নীতিগুলি তিনি বৈজ্ঞানিক একটা পোষাকে তাঁর জগতের সম্মুখে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে যাঁহারা সমষ্টিবাদ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের লেখার মধ্যে এই বৈজ্ঞানিকতার খোলস ছিল না। তাই সে-সমস্ত লেখায় বর্ণিত রাষ্ট্র বা সমাজকে লোকে অসম্ভব এবং অলীক বলিয়া ভাবিত। কিন্তু কার্ল মার্ক্স ছিলেন সেই যুগের লোক যে যুগে বিজ্ঞানের চর্চা খুবই বাড়িয়াছিল। কাজেই, তাহার লেখায় বৈজ্ঞানিকতার গন্ধ ছিল খুব এবং সেই গন্ধ আছে বলিয়াই লোকে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের সহিত তাঁহার লেখা পড়িয়া আসিয়াছে।



কার্ল মার্ক্স

কার্ল মার্ক্স সমষ্টিবাদের যে নীতি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার মোটা কথাগুলি এখন বলিব। সেটা বুঝিতে হইলে গোড়ায় অর্থনীতি (Economics)-এর কয়েকটা বিষয় ব্যাখ্যা করা দরকার।

তোমরা জান কয়েকজন লোকে জিনিষ তৈরী করে, আর পৃথিবীর বাকী সব লোক তাহা পয়সা দিয়া কিনে। ক্রেতারা জিনিষের যে দাম দেয়, তাহা প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে তাহাদের নিজেদের চাহিদার (demand) উপর। যদি কোন জিনিষের চাহিদা বাড়ে, তাহা হইলে তাহার দাম বাড়িয়া যায়, আবার ক্রেতারা যদি মনে করে সেই জিনিষের প্রয়োজন খুব অল্প, তাহা হইলে তাহার দাম কমিয়া যায়। চাহিদা অনুসারে জিনিষের দামের উত্থান পতন সব সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়।

এ হইতেছে প্রত্যক্ষ ব্যাপার। চাহিদা ছাড়াও আর একটা ব্যাপার আছে যার প্রভাব জিনিষের দামের উপর সব সময়েই পরিলক্ষিত হয়। সে হইতেছে জিনিষ তৈরী করিবার খরচ (cost of production)। একটা জিনিষের দাম যদি তাহা তৈরী করিবার খরচের

চেয়ে কম হইয়া যায়, তাহা হইলে নির্মাতাদের লোকসান হয়, সে তাহা আর তৈরী করে না। বাজারে সেই জিনিসের আমদানী তখন কমিয়া যায় এবং তাহার ফলে জিনিসটার দাম তখন এমন একটা সীমারেখায় আসিয়া পৌঁছে যে, তাহা তৈরী করিবার খরচা উঠিয়া আসে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পরোক্ষভাবে তৈরী করিবার খরচই জিনিসের দামকে নিয়ন্ত্রিত করে।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হাতে যন্ত্রপাতি, কলকারখানা এবং নানা রকম মূলধনের সংখ্যা বাড়িয়াছে। অনেক জিনিস তৈরী করিতে যে খরচ, তাহার অনেকখানিই যায় এই যন্ত্রপাতি এবং মূলধনের দাবী মিটাইতে এবং যারা জিনিস তৈরী করে সেই শ্রমিকদল বেতনস্বরূপ খুব কম টাকাই পায়। অর্থাৎ বাজারে ক্রেতারা যে দাম দেয় তাহার অতি সামান্য একটা অংশ মাত্র পায় যাহারা নিজেদের পরিশ্রম, যত্ন ও চেষ্টা দিয়া জিনিসটা তৈরী করিয়াছে, তাহারা।

এই যে একটা অসঙ্গতি, এটা কার্ল মার্ক্স-এর চোখে লাগিয়াছিল অত্যন্ত কঠিনভাবে। তিনি বলিলেন যে, একটা জিনিসের যে দাম হয়, তাহার সমস্তটাই প্রাপ্য হইতেছে সেই জিনিসটার নির্মাতাদের। কারণ, তাহারা নিজেদের অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দিয়া তাহা তৈরী করিয়াছে। যাহারা ব্যবসায়ী, যাহারা মূলধনের অধিকারী, তাহারা শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য দিতেছে না, এই বলিয়া তিনি প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন অত্যন্ত তীব্রভাবে। তিনি বলিলেন যে, মূলধনের অধিকারীরা অন্যায়ভাবে শ্রমিকদের দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছেন এবং শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ নয় বলিয়া এই অন্যায়ের কোন প্রতিবাদ করিতে পারিতেছে না। তাহারা যেন হতাশভাবে ঘানির বলদের মত মূলধনের অধিকারীদের যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া মরিতেছে।

এরকম হইল কেন? মার্ক্স তাহার উত্তর দিলেন মানুষের ইতিহাসের এক নূতন ব্যাখ্যা করিয়া। এককালে মানুষে মানুষে সম্পর্ক খুবই সহজ ও সরল ছিল কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত শিল্পবিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইলে নানা রকম গলদের সৃষ্টি হইল। কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষের হাতে চলিয়া গেল সমস্ত যন্ত্রপাতি, কলকারখানা এবং মূলধনের অধিকার এবং তাঁহারা শ্রমিকদিগকে যথেচ্ছভাবে খাটাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের অধীনে আসিয়াও শ্রমিকদের উপায় ছিল না। কারণ, আগেকার মত কুটীর শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল এবং যন্ত্রপাতি-ভরা কারখানাতে আসাই ছিল তাহাদের অন্ন-বস্ত্র যোগাড় করার একমাত্র উপায়। তাহা ছাড়া তাহাদের নিজেদের মধ্যে কোন প্রকার সংঘবদ্ধতা না থাকায় তাহারা কিন্তু দৃঢ়সংঘবদ্ধ মূলধনের অধিকারীদের যে কোন প্রকার সর্তে কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

মার্ক্স বলিলেন যে, এই প্রকার অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। সমাজ কখনও স্থিতিশীল নয়, তাহার পরিবর্তন ঘটে। মার্ক্স উপদেশ দিলেন যে, পরিবর্তনের জন্য বসিয়া থাকিলে চলিবে না, নিজেদের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় যত শীঘ্র সম্ভব পরিবর্তন আনিতে হইবে। প্রথমতঃ, শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ, তাহাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে যে, মূলধনের অধিকারিগণ যেন তাহাদের সাহায্য ছাড়া কিছুতেই তাহাদের কলকারখানা চালাইতে না পারে। যখন সমাজের অবস্থা এই প্রকার হইবে, তখন একদিন অবসর বুঝিয়া শ্রমিকের দল বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে এবং মূলধনের অধিকারী-দিগকে তাহাদের আসন হইতে বিচ্যুত করিবে। মূলধনের অধিকারীরা যখন রঙ্গভূমি হইতে অপসৃত হইবে, তখন শ্রমিকদল তাহাদের নিজেদের সমাজ এবং রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা করিবে এবং সংঘবদ্ধভাবে সমস্ত কল-কারখানা ও মূলধন ব্যবহার করিবে। তখন মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে কোন প্রকার কৃত্রিম বৈষম্য বা অসাম্য থাকিবে না, সকলে সমান সুযোগ লাভ করিয়া রাষ্ট্র বা সমাজের হিতার্থে নিজেদের বুদ্ধি ও পরিশ্রম নিয়োজিত করিতে পারিবে। সমষ্টিই হইবে তখন প্রভু, সমষ্টির কল্যাণই হইবে তখন রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

এই হইতেছে সমষ্টিবাদীদের মোটামুটি আদর্শ। কিন্তু এই আদর্শে উপনীত হইবার পথ কি এবং কোথায়, সে বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রধান দুইটা মতভেদের কথাই এখানে আলোচনা করিব।

এক শ্রেণীর সমষ্টিবাদীরা বলেন যে, সাম্যের আদর্শে পৌঁছিবার পথ হইতেছে একটা বিপ্লব, একটা যুদ্ধ, একটা বিদ্রোহ। সমাজে ধনিক ও শ্রমিকদের যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা মূলগত এবং কোন সহজ উপায়ে তাহা দূর করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ছোট-খাট সমাজ-সংস্কারে শ্রমিকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটা অসুবিধা দূর হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের প্রধান দুঃখ মোচন তাহাতে হইবে না। ধনিকেরা ছলে, বলে, কৌশলে শ্রমিকদের শোষণ করিয়া লইতেছে।

সাধারণ সমাজ-সংস্কারে এই সর্ব্বগ্রাসী শোষণ-নীতি বন্ধ করা মানুষের সাধ্যাতীত।

এই হইল বিপ্লবী সমষ্টিবাদের কথা। দ্বিতীয় শ্রেণীর সমষ্টিবাদীরা এই প্রকার বিপ্লবে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, বিবর্ত্তন (evolution) ই হইতেছে আদর্শে পৌঁছিবার একমাত্র পথ। সমাজ বা রাষ্ট্র একদিনের তৈরী জিনিষ নয়—যুগযুগান্তের চেষ্টা, সংস্কার ও পরিবর্ত্তনে তাহার প্রতিষ্ঠা। এই সমাজকে অসাম্য হইতে সাম্যের পথে লইয়া যাইতে হইলে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে, উতলা হইলে চলিবে না। অসংযত বিদ্রোহ বা বিপ্লবে সমাজের মূলভিত্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং তখন নূতন একটা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বিপ্লবী সমষ্টিবাদীদের প্রধান প্রচারক হইতেছেন কার্ল মার্ক্স। তাঁহার মৃত্যুর পর দুইজন লোক এই মতবাদ খুবই তীব্রভাবে প্রচার করিয়াছিলেন—তাঁহাদের নাম লেনিন (Lenin) এবং প্রিন্স ক্রোপোটকিন (Prince Kropotkin)। ইঁহারা উভয়েই রাশিয়াদেশের লোক এবং ইঁহাদের মতবাদই আজকাল বোল্‌শেভিক মতবাদ (Bolshevism) বলিয়া পরিচিত।

বিপ্লবী সমষ্টিবাদীদের পথ যে কতখানি বিপদসঙ্কুল ও সমাজের পক্ষে কত ক্ষতিকর, বর্ত্তমান রাশিয়ার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। বিগত মহাযুদ্ধের শেষ ভাগে লেনিন্‌প্রমুখ বিপ্লবীর নেতৃত্বে রাশিয়ার পুরাতন রাষ্ট্র-সমাজ ব্যবস্থা একেবারে ছারখার হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে কত লোক যে কত প্রকার দুঃখভোগ করিয়াছিল, কত লোক যে বিনা বিচারে বিনা অপরাধে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার পর সাম্যবাদের দোহাই দিয়া সেখানে যে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার কঠোরতায় অনেক রাশিয়ানের জীবনই আজকাল দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, যে রাশিয়া প্রায় আঠার বৎসর পূর্ব্বে শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতেছে, এই কথা দম্ভভরে জগতের সম্মুখে প্রচার করিয়াছিল, সেই রাশিয়াই আজ ধনিক-রাষ্ট্রসমূহের সব কয়টা নীতির আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। বিপ্লবের দ্বারা যে সাম্য বা সমষ্টির কল্যাণ লাভ করা যায় না, রাশিয়ার ইতিহাসই তাহার প্রধান সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

বিবর্ত্তনী সমষ্টিবাদীদের নির্দ্দেশিত পথে এই সমস্ত বিপদের সম্ভাবনা অল্প। তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন গ্রেটব্রিটেন। সেখানে বিবর্ত্তনী সমষ্টিবাদের প্রচারক হইতেছে সেখানকার শ্রমিক দল (Labour Party)। এই পার্টির লোকেরা মিঃ র‍্যাম্‌সে মেকডোনাল্ডের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে তাহাদের রাষ্ট্রে ও সমাজে সমষ্টি-বোধ ও সংঘবদ্ধতার নীতিগুলি প্রচার করিয়াছে এবং সেদিন পর্য্যন্তও করিতেছিল। তাহাদের এই সংযত ধীর এবং শান্ত চেষ্টার ফলে শ্রমিকদের অনেক অভাব



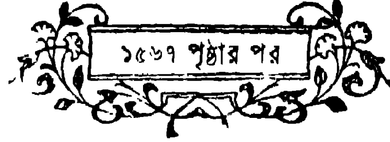
লেনিন্

অভিযোগ দূরীভূত হইয়া গিয়াছে এবং গ্রেটব্রিটেনের মত রক্ষণশীল দেশেও সবাই স্বীকার করিয়াছে যে, যাহারা শ্রমিক এবং অনুন্নত, তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলেই সমাজের কল্যাণ এবং অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা।

আসল কথা হইতেছে এই যে, সাম্য ও সমষ্টিবোধ সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে আসা সহজ ব্যাপার নয়। মানুষ স্বভাবতঃ উদার এবং স্বার্থশূন্য নহে; তাহার মধ্যে নীচতা সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থ আছে। কাজেই সমষ্টিবাদীদের আদর্শে পৌঁছিতে হইলে বহুবর্ষব্যাপী ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইবে। লেনিন্ বা মার্ক্স-এর নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া চলিলে সেই আদর্শে পৌঁছান যাইবে না। সেই আদর্শে পৌঁছিবার পথ হইতেছে সেই সমষ্টিবাদীদের পথ—যাঁহারা বিবর্ত্তনকে সত্য এবং সুন্দর বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন



হিব্রুজাতি ও ওল্ড টেষ্টামেণ্ট



সিরিয়া-রাজ্যের সেনাপতি নামনের ছিল কুষ্ঠ রোগ। সে একজন ইস্রেল-রাজকুমারীর মুখে শুনিতে পাইল যে, সামারিয়াতে একজন মহাপুরুষ আছেন। তিনি দৈবশক্তিবলে অনেক আশ্চর্য্য কাজ করিতে পারেন। তাঁহার শরণাগত হইলে তিনি তাহার রোগ সারাইয়া দিবেন। এই কথা শুনিয়া সে সিরিয়া রাজ্যের নিকট হইতে ইস্রেলরাজের কাছে একখানি পত্র লইয়া ও অনেক ধনরত্ন লইয়া সামারিয়ায় গেল। ইস্রেল-রাজ ত চিঠি পাইয়া হতবাক্‌। তিনি কি করিতে পারেন। এমন সময় এলিসার লোক আসিয়া বলিল যে,তিনি নামনকে রোগমুক্ত করিবেন। তখন নামন এলিসার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। এলিসা তাহাকে সাতবার জর্দন নদে স্নান করিতে বলিলেন, তাহা হইলেই তাহার রোগ সারিবে। একথা শুনিয়া নামনের ভয়ানক রাগ হইল। নদীতে স্নান করিলেই যদি রোগ সারিত, তবে সিরিয়ায় ত অনেক ভাল ভাল নদী ছিল! এখানে আসার কি দরকার ছিল? সে যাহা হউক,তাহার ভৃত্যেরা তাহাকে অনেক বুঝাইয়া জর্দনে স্নান করিতে রাজী করাইল। সাতবার স্নান করা মাত্র তাহার দেহ হইতে রোগের সমস্ত চিহ্ন দূর হইল। তখন সে এলিসাকে অনেক পুরস্কার দিতে চাহিল। তিনি কিন্তু কিছুই গ্রহণ করিলেন না। নামন বলিল "এখন হইতে আমি শুধু যিহোবার পূজাই করিব।"

অনেক দিন পরে সিরিয়ারাজ বেনহাদাদ সামারিয়া অবরোধ করেন। ইহার ফলে নগরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। লোকজনের আর দুঃখের সীমা থাকে না। রাজা জোহোরামের রাগ এলিসার উপর পড়িল। তিনি তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘাতক পাঠাইলেন। এলিসা তখন তাঁহার ভক্তদের মধ্যে বসিয়াছিলেন। ধ্যাননেত্রে তিনি ঘাতককে আসিতে দেখিয়া গৃহের সমস্ত অর্গল বন্ধ করিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজা স্বয়ং সেখানে আসিয়া বলিলেন, "যিহোবার ক্রোধে আমাদের এই দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। আপনি আমাদের রক্ষার জন্য কিছুই করিতেছেন না। তবে আর যিহোবার ভজনা করিয়া কি লাভ?

তখন এলিসা বলিলেন, "যিহোবার বাণী শ্রবণ করুন। কাল এমন সময়ে সামারিয়ার তোরণ-দ্বারে জলের দামে গম ও বালি বিক্রয় হইবে।" ইহা শুনিয়া রাজার একজন পার্শ্বচর বিদ্রূপ করিয়া বলিল, যিহোবা যদি স্বর্গের জানালা খুলিয়া শস্য বৃষ্টিও করেন, তবু কি এই দামে শস্য বিক্রয় দেখা আমাদের কপালে ঘটিবে? ইহাতে এলিসা উত্তর করিলেন, "হাঁ, ইহা দেখার সৌভাগ্য তোমার হইবে, খাওয়া কিন্তু ঘটিয়া উঠিবে না।"

এখন হইয়াছে কি, সামারিয়ার তোরণ-দ্বারের বাহিরে চারিজন কুষ্ঠ রোগী বসিয়াছিল। তাহারা অনাহারে শুকাইয়া মরা অপেক্ষা সিরিয়ার সৈন্যশিবিরে আহারের জন্য যাওয়া ভাল মনে করিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখে যে, লোকজন সব পলাইয়াছে; শিবির জনশূন্য। ব্যাপার এই, যিহোবা মায়াবলে

সিরিয়ার সৈন্তেরা অনেক রথচক্রের ও অশ্বের পদশব্দ শুনিতে পায়। ইহাতে তাহারা ভাবে যে হয়ত হিটাইট্ ও মিশরের রাজারা ইস্রেলরাজের সাহায্যে আসিয়াছে। এই মনে করিয়া ভয়ে তাহারা শিবির পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। কুষ্ঠরোগীরা মনের আনন্দে পান আহার করিল। তারপর যথাসাধ্য ধন-রত্ন, পোষাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহ করিয়া নগরদ্বারের প্রহরীকে এই সংবাদ দিল। প্রভাতে সহরের লোকেরা ফিরিয়া শিবিরে উপস্থিত হইয়া খুসীমত জিনিষপত্র লুঠপাট করিল। ফলে, সে দিন তোরণ-দ্বারে জলের দামে আহার্য্য বিক্রয় হইল। তবে ভীড়ের চাপে রাজার অবিশ্বাসী পারিষদ মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

* * * অনেক দিন আগে ভগবান্ এলিজাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি হাজেলকে সিরিয়ার ও জেহুকে ইস্রেলের রাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কিন্তু তিনি নিজে এই কাজ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার উত্তরীয় এলিসা পাইয়াছিলেন। কাজেই, তাঁহার উপর এলিজার অসমাপ্ত কার্য্যের ভার পড়ে। তিনি তাই ডামাস্কাস অভিমুখে রওনা হন। তিনি যখন সেখানে পৌঁছেন, তখন বেনহাদাদ রোগশয্যায় শুইয়া আছেন। তাঁহার আগমনের সংবাদ শুনিয়া সেনাপতি হাজেলকে তাঁহার নিকট পাঠান। হাজেল এলিজাকে বলিল,"মহারাজ জানিতে চান তিনি ভাল হইবেন কিনা?" ইহাতে এলিজা উত্তর দেন, "তাহাকে বলিও, তিনি আরোগ্য লাভ করিবেন—যদিও প্রকৃত পক্ষে তাঁহার মৃত্যু অবধারিত।" তারপর হাজেলের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখাতে তাঁহার চোখে জল আসিল। আশ্চর্য্য হইয়া হাজেল ইহার কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি তোমা হইতে ইস্রেলের ভয়ানক অমঙ্গল হইবে। তুমি ঐ দেশ ছারখার করিবে। তুমিই সিরিয়ার ভবিষ্যৎ রাজা।"

হাজেল বেনহাদাদের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "মহারাজ, আপনি ভাল হইবেন।" কিন্তু পরদিন তাঁহার মৃত্যু হইল এবং হাজেল রাজা হইলেন।

এদিকে জুদার জেহোসাফাট্ ২৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জেহোরাম ৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পুত্র আহাজিয়া (Ahaziah) রাজা হন। আহাজিয়া ও ইস্রেল রাজা জোরাম একযোগে হাজেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যান। যুদ্ধে আহত হইয়া ইস্রেলরাজ জেজরিলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আহাজিয়াও বন্ধুকে দেখিতে যান। এই সময় এলিসা একজন শিষ্যকে বলিলেন, "নির্মসির পুত্র জেহুকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহার মাথায় এই তেল ঢালিয়া বলিবে 'যিহোবার বাণী শোন—তিনি তোমাকে ইস্রেলের রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন'—এই বলিয়া তুমি পলাইয়া আসিবে।"

জেহু অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ-বিষয়ে পরামর্শ করিতেছিলেন। এমন সময়ে সেই শিষ্য আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। পরে তিনি তাঁহার মাথায় তেল ঢালিয়া বলিলেন, "যিহোবা তোমাকে ইস্রেলের রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। তুমি আহাবের বংশ নিঃশেষ করিবে। আর জেজ্‌বেলকে কুকুরে খাইবে।" এই কথা বলিয়া সে পলাইয়া গেল।

জেহু তখন সৈন্যাধ্যক্ষদের কাছে ফিরিয়া আসিয়া সব কথা বলিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহারা তূর্য্যধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল, "মহারাজ জেহুর জয়।" তার পর জেহু একদল তীরন্দাজ লইয়া জেজরীল অভিমুখে রওনা হইলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া জোরাম ও আহাজিয়া রথে চড়িয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হন। জোরাম জেহুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর ভাল ত?" জেহু উত্তর করিলেন, "আপনার মা যখন দেশে নানা দেবদেবীর পূজা প্রবর্ত্তন করিতেছেন তখন ভাল খবর আসিবে কোথা হইতে?" ইহা শুনিয়াই জোরাম "বিশ্বাস-ঘাতক" বলিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জেহু তাহাকে শরাঘাতে হত্যা করিলেন। ইহা দেখিয়া আহাজিয়াও পলাইলেন। কিন্তু জেহুর লোকেরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে আহত করিল। তিনি মেগিদ্দো নগরে আশ্রয় লইলেন।

এইবার জেহু জেজরীলের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া জেজবেল বলিল, "কি খবর প্রভুহন্তা?" তখন জেহুর ইঙ্গিতে তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা তাহাকে জানালা দিয়া নীচে নিক্ষেপ করিল। তাহার দেহের উপর দিয়া জেহুর শকট চলিয়া গেল। কুকুরেরা তাহার ছিন্নভিন্ন দেহ খাইয়া ফেলিল। জেহু আহাবের বংশের সবাইকে হত্যা করিলেন।

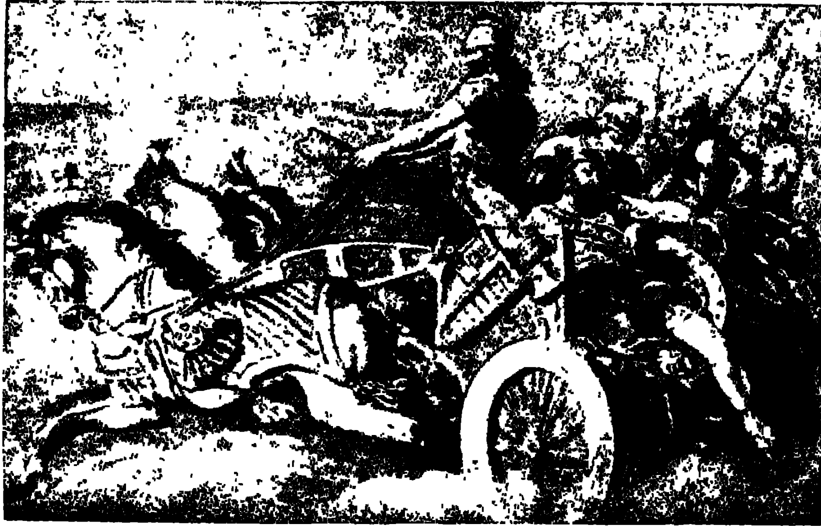
জেহু ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময় হাজেল জর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ সমুদায় ইস্রেলরাজ্যের

উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করেন। জেহুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জেহোআহাজ (Jehoahaz) রাজা হন। জেহোআহাজ পাপ পথেই চলিতে লাগিলেন। তাঁহার সময় হাজেল বারবার ইস্রেল আক্রমণ করিয়া ছারখার করিতে লাগিল। জেহোআহাজের পরে জেহোয়াস্ রাজা হন। তিনিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

এদিকে মেগিড্ডোতে আহাজিয়ার মৃত্যু হয়। তাঁহার মা আথালিয়া নিজে রাণী হইবার জন্য রাজকুমারদের হত্যা করেন। তবে আহজিয়ার ভগিনী জোহোসেবা তাঁহার শিশুপুত্র জোয়াসকে (Joash) লুকাইয়া রাখেন। জেহোসেবা ছিলেন যিহোবার মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের স্ত্রী। তাঁহার আশ্রয়ে শিশুরাজপুত্র দিন দিন নিরাপদে বড় হইতে লাগিলেন। তাহার সাত বৎসর বয়সের সময় প্রধান পুরোহিত রাণীর সৈন্যদলকে রাজকুমারের পক্ষে আনয়ন করেন। একদিন হঠাৎ সৈন্যেরা প্রাসাদ ও মন্দিরের চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল। তার পর উন্মুক্ত-তরবারীর মধ্যে শিশু জোয়াস্‌কে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়। চারিদিক হইতে সমবেত লোকেরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, "মহারাজের জয় হউক।" মুহুর্মুহু তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল।

গোলমাল শুনিয়া রাণী মন্দিরের দিকে ছুটিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে, শিশুরাজা সিংহাসনে আসীন, আর তাঁহার চারিপার্শ্বে ইস্রেলের নেতারা ও সৈন্যেরা উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। প্রজারা সবাই আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে। ইহা দেখিয়া আথালিয়া ক্রোধে ও দুঃখে নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িতে লাগিলেন ও বারবার বলিতে লাগিলেন, "কি বিশ্বাসঘাতকতা।" সৈন্যেরা তাঁহাকে মন্দিরের বাহিরে লইয়া গিয়া অশ্বপদতলে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিল। জুদার লোকেরা প্রতিজ্ঞা করিল যে, এখন হইতে তাহারা আবার যিহোবারই পূজা করিবে। বালের মন্দির ও মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। তাহার পুরোহিতকে হত্যা করা হইল।

যতদিন প্রধান পুরোহিত জেহৈয়াদা বাঁচিয়াছিলেন তিনি জোয়াস্‌কে সৎপরামর্শ দিতেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলে জুদার নেতারা জোয়াস্‌কে মন্দপথে চালিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আবার নানা দেবদেবীর পূজার প্রচলন করিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জেহৈয়াদার পুত্র জেকারিয়া তাঁহাদের ভর্ৎসনা করিলেন। ফলে জোয়াস্ তাঁহাকে মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে প্রস্তর ছুঁড়িয়া নিহত করেন। ইহার শাস্তি তাহাকে অবিলম্বে পাইতে হইল। এই বৎসর সিরিয়ার রাজা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। জুদার নেতারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। জোয়াস্ প্রভূত অর্থ দিয়া শত্রুহস্ত হইতে রেহাই পান। কয়েকদিন পর তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার ভৃত্যেরা তাঁহাকে হত্যা করে।



জোয়াসের মৃত্যু

এই সময়ে এলিসা মৃত্যু-শয্যায় শায়িত ছিলেন। ইস্রেলের রাজা জেহোয়াস্ তাঁহাকে দেখিতে গিয়া খুব কাঁদিতে লাগিলেন—"পিতা, সত্যই কি আপনি আমাদের ছাড়িয়া চলিলেন? আপনি যে আমার একমাত্র আশা-ভরসা!" এই বিলাপ শুনিয়া এলিসা উঠিয়া বসিলেন ও রাজাকে বলিলেন, "পূর্ব্বদিকের জানালা খুলিয়া শর নিক্ষেপ কর।" তিনি তীর ছুঁড়িলেন। তখন এলিসা বলিলেন, "এই শর যিহোবার। তুমি সিরিয়ার বাহিনী আফেকে বিধ্বস্ত

করিবে। মাঠের দিকে আবার শর নিক্ষেপ কর।" তিনবার তীর ছুঁড়িয়া জেহোয়া ধনুক নামাইলেন। তখন এলিসা বলিলেন, "৫।৬ বার তোমার তীর ছোঁড়া উচিত ছিল। তাহা হইতে তুমি সিরিয়সৈন্যকে একেবারে নিঃশেষ করিতে পারিতে। এখন তুমি তিন বার তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইবে।" ইহার পর এলিসা চিরনিদ্রায় শায়িত হইলেন।

ইতিমধ্যে হাজেলের মৃত্যু হইল। এলিসার ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। তিনবার জেহোয়াস হাজেলের পুত্র বেনহাদাদকে পরাজিত করিয়া জর্দনের পূর্ব্বপারাস্থিত ইস্রেলের সহরগুলি উদ্ধার করিলেন।

এদিকে জোয়াসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আমাজিয়া (Amaziah) জুদার রাজা হন। প্রথমে কিছুদিন তিনি সৎপথে চলিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি পৌত্তলিক হইয়া পড়েন। ইহাতে যিহোবা তাঁহার উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। এই সময়ে ইস্রেলরাজ জেহোয়াসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া তিনি তাঁহার হাতে বন্দী হন। জেহোয়াস্ তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া জেরুসালেমে লইয়া আসেন। প্রাসাদ ও মন্দিরের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যান। আমজিয়ার কর্ম্মচারী চক্রান্ত করিয়া তাহাকে হত্যা করে।

জুদার লোকেরা তাঁহার পুত্র উজ্জিয়াকে (Uzziah) রাজা করে। প্রথম জীবনে তিনি খুব শক্তিশালী ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময় জুদার শক্তি খুব বাড়িয়া যায় ও প্রজারা সুখে ও শান্তিতে থাকে। কিন্তু শেষবয়সে তাঁহার অহঙ্কার হয়। একদিন তিনি মন্দিরে স্বহস্তে অর্ঘ্য দিতে গেলেন। পুরোহিতেরা বাধা দিলে তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তখনই তাঁহার শরীরে কুষ্ঠরোগ দেখা দিল। পুরোহিতেরা তাঁহাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তিনিও ভয়ে পলাইয়া গেলেন। তাঁহার সিংহাসনে তাঁহার পুত্র জোথাম বসিলেন। তিনি খুব ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আহাজ রাজা হইলেন।

এদিকে জেহোয়াসের মৃত্যুর পর ইস্রেলের রাজা হইলেন তাঁহার পুত্র জোরোবোয়াম। জোরোবোয়া সিরিয়ারাজকে পরাজিত করিয়া ডামাস্কাস ও আরও অন্যান্য স্থান অধিকার করেন। তবে তিনি কিন্তু ছিলেন পৌত্তলিক। এই সময়ে আমোজ (Amos) ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে অচিরে ইস্রেলের ধনী অত্যাচারীদের শাস্তি হইবে। তাহারা বন্দী হইয়া স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে।

জেরোবোয়ামের মৃত্যুর পর পর জ্যাকারিয়া, সাল্লুম ও মেনাহেম রাজা হন। মেনাহেম অ্যাসিরিয়া-রাজ পুল্‌কে (Pul) অনেক ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়া অব্যাহতি পান। তাঁহার পুত্র পেকাহিয়া রাজা হইয়া দুই বৎসরের মধ্যে পেকা নামে একজন কর্ম্মচারীর হস্তে প্রাণ হারান। পেকার সময় অ্যাসিরিয়ারাজ টিগলাথ পিলেসার ইস্রেলের অনেক জায়গা জয় করিয়া রিউবেন, গ্যাদ, নাপথালি, মানেসা প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকদের বন্দী করিয়া অ্যাসিরিয়ায় যান।

পেকাকে হত্যা করিয়া হোসিয়া (Hoshea) রাজা হন। এই সময়ে হোসিয়া নামে একজন ঈশ্বর-জনিত মহাপুরুষ ইস্রেলবাসীদের বার বার অগ্নিময় ভাষায় সাবধান করেন। "ওগো ইস্রেল-সন্তানেরা, তোমাদের পাপের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে। তোমাদের সর্ব্বনাশ আগতপ্রায়। এখনও যিহোবার শরণাপন্ন হও—তিনি তোমাদের রক্ষা করিবেন।" কে শোনে তাঁহার কথা। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় অসৎপথে চলিতে লাগিল। হোসিয়ার রাজত্বের নবম বৎসরে সামারিয়ার পতন হয় এবং অ্যাসিরিয়ারাজ সার্গন সমগ্র ইস্রেলবাসীদের বন্দী করিয়া লইয়া যান। অন্যদেশ হইতে লোক আনিয়া এখানে স্থাপিত করা হয়।

ইস্রেলের বংশধরদের মধ্যে শুধু জুদা ও বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর লোকেরা স্বাধীন রহিল। তাঁহাদের রাজা আহাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হেজেকিয়া (Hezekiah) রাজা হন। তিনি যিহোবার শরণাপন্ন হন ও রাজ্য হইতে পৌত্তলিকতা দূর করেন। তাঁহার রাজত্বকালে সার্গনের পুত্র সেন্নাকেরিব জুদা আক্রমণ করেন। তিনি তাঁহার প্রধান সেনাপতিকে জেরুসালেম অধিকার করিতে পাঠান। তাঁহার একজন সহচর নগরের প্রাচীরের নীচে দাঁড়াইয়া নগরবাসীদের সম্বোধন করিয়া বলিল, "অ্যাসিরিয়ার রাজাধিরাজের আদেশ শ্রবণ কর। কাহারও ভরসায় তোমরা আত্ম-সমর্পণ না করিয়া অনাহারে মরিতে প্রস্তুত হইয়াছ? হেজেকিয়ার কথায় ভুলিও না—তাহার সাধ্য নাই, তোমাদের রক্ষা করে। যিহোবার ভরসাও করিও না। কাহারও ভগবান কি এপর্য্যন্ত কাহাকেও অ্যাসিরিয়া রাজের হাত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে? হামাথও আর্পাদের দেবতারা কোথায়? ...সুতরাং আমার সঙ্গে সন্ধি কর ও কর দিতে স্বীকার কর।"

হিব্রুরা কোন উত্তর দিল না। হেজেকিয়া নিজে যিহোবার মন্দিরে ধর্ণা দিলেন ও মন্ত্রী ও পুরোহিতদের ভবিষ্যদ্বক্তা ইসায়ার (Isaiah) কাছে পাঠাইলেন। ইসায়া বলিলেন, "ভগবানের বাণী শোন ; কোন ভয় নাই। অ্যাসিরিয়া-রাজের ভৃত্যের কথায় ভীত হইও না। তাঁহার প্রভাবে আসিরিয়ারাজকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং সেখানে সে নিহত হইবে।"

সেই দিন রাত্রিকালে ভগবানের দূত অ্যাসিরিয়ার শিবিরের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেলেন। প্রত্যুষে উঠিয়া লোকে দেখিল যে, অ্যাসিরিয়া শিবির মৃতদেহে পরিপূর্ণ। * সেন্নাকেরীব ভয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই ঘটনার অনেক দিন পরে তিনি যখন মন্দিরে উপাসনায় রত ছিলেন, তখন তাঁহার পুত্রেরা তাঁহাকে হত্যা করে।

ইহার পর হেজকিয়া রোগে শয্যাশায়ী হন। ইসায়া তাঁহার কাছে আসিয়া বলিলেন, "ভগবান এবার তোমার মৃত্যু নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কাজেই, তাহার জন্য প্রস্তুত হও।" ইহা শুনিয়া হেজকিয়া যিহোবার কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রার্থনায় ভগবানের প্রাণে করুণার সঞ্চার হইল। ইসায়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভগবান তোমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন, তুমি মরিবে না। তিনি তোমার রাজ্য অ্যাসিরিয়ার গ্রাস হইতে রক্ষা করিবেন।

এই সময়ে ব্যাবিলন-রাজ বালাদানের পুত্র বেরোডাক বালাদান (মোরাডাক) হেজকিয়ার কাছে পত্র ও উপঢৌকন পাঠান। তিনি ইহাতে খুব আনন্দিত হইয়া ব্যাবিলনীয় দূতদের রাজপ্রাসাদের ধনরত্ন প্রভৃতি সব দেখান। ঠিক এই সময়ে ইসায়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কাহারা ?" হেজকিয়া বলিলেন, "ইহারা ব্যাবিলন হইতে আসিয়াছে।" ইসায়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তাঁহারা কি দেখিয়াছে ?" হেজকিয়া বলিলেন, "প্রাসাদের সমস্ত জিনিষ দেখিয়াছে।" তখন ইসায়া বলিলেন, "দেখ ভগবান বলিয়াছেন যে, শীঘ্রই এই সমস্ত জিনিষ ব্যাবিলনে লইয়া যাওয়া হইবে। তোমার বংশধরদের তাহারা বন্দী করিয়া লইয়া যাইবে। তাহারা ব্যাবিলন-রাজের ভৃত্য হইবে।"

হেজকিয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মানাসে (Manasseh) রাজা হন। তিনি খুব দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন ও সর্ব্বদা অসৎপথে চলেন। তাঁহার সময় আবার নানা দেবদেবীর পূজা আরম্ভ হয়। তাহার মৃত্যু হইলে আমোন সিংহাসন অধিকার করেন। আমোন খুব পাপী ছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার ভৃত্যেরা হত্যা করে। তখন প্রজারা তাহার শিশুপুত্র যোশিয়াকে (Josiah) রাজা করে। যোশিয়া যিহোবার শরণাপন্ন হন এবং রাজ্য হইতে পৌত্তলিকতা দূর করেন। তিনি ধর্ম্মের সংস্কার সাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এই সময়ে মন্দিরের পুরোহিত হিলকিয়া মোসেসের আইনের একখানা পাণ্ডুলিপি পান। যোশিয়া রাজ্যের লোকদের সমবেত করেন। তাহাদের কাছে ইহা পাঠ করা হয়। পুনরায় ইস্রেল সন্তানেরা শপথ করে যে, তাহারা যিহোবাকেই ভজনা করিবে, তাহার নির্দ্দেশ পালন করিবে। এততেও ভগবানের ক্রোধের শান্তি হয় না। কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, হিব্রুসন্তানেরা মনে মনে পাপীই রহিয়াছে। তিনি ঠিক করিলেন যে ইস্রেলের ন্যায় জুদাকেও তিনি ত্যাগ করিবেন।"

এই সময় মিশর রাজ নেকো অ্যাসিরিয়ারাজের (ব্যাবিলনরাজ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসেন। যোশিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া মেগাড্ডাতে নিহত হন। তখন জুদার লোকেরা তাঁহার পুত্র জেহোআহাজকে (Jehoahaz) রাজা করে। তিন মাস যাইতে না যাইতে নেকো আবার ফিরিয়া আসিয়া জেহোআহাজকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইলিয়াকিন্‌কে জেহোইয়াকিন্ নাম দিয়া রাজা করেন। জুদা নেকোর করদরাজ্যে পরিণত হয়।

কিছুদিন পরে ব্যাবিলনরাজ নেবুকাদনেজ্জার জুদা আক্রমণ করেন। জেহোইযাকিম তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। তিন বৎসর পরে জেহোইয়াকিম্ বিদ্রোহ করেন। তখন ব্যাবিলন সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া নেবুকাদনেজ্জারের সম্মুখে আনয়ন করে। তাঁহার আদেশে তাহাকে হত্যা করা হয়।

তিন মাসের জন্য তাঁহার পুত্র জেহোইয়াকিন (Jehoiachin) জেরুসালেমে রাজত্ব করেন। কিন্তু নেবুকাদনেজ্জার পুনরায় জেরুসালেম অবরোধ করেন। তখন জেহোইয়াকিন সপরিবারে রাজ্যের সমস্ত কর্ম্মচারী ও নেতাদের লইয়া ব্যাবিলনরাজের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। নেবুকাদনেজ্জার ব্যাবিলনের

* অ্যাসিরিয়ার ইতিহাসে ভিন্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

মন্দির-প্রাসাদ প্রভৃতির সমুদয় ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। ফিরিবার সময় জেরুসালেমের সব নেতা ও বীরদের বন্দী করিয়া লইয়া যান। জেহোইয়াকিন কেও সপরিবারে বন্দী করিয়া ব্যাবিলনে লইয়া যাওয়া হয়। নেবুকাদনেজ্জার জেহোয়াহাজের ভ্রাতা মাত্তানিয়াকে জেদেকিয়া (Zedekiah) নাম দিয়া জেরুসালেমের রাজা করেন।

জেদেকিয়া আট বৎসর রাজত্বের পর বিদ্রোহ করে। তখন নেবুকাদনেজ্জার প্রকাণ্ড এক সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিয়া আবার জেরুসালেম অবরোধ করেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত অবরোধ চলে। শেষে ব্যাবিলনীয়েরা নগরপ্রাচীর ভগ্ন করিয়া নগরে প্রবেশ করে। তখন জেদেকিয়া ও তাঁহার যোদ্ধারা রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করেন। ব্যাবিলনীয় সৈন্যেরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া জেরিকোর কাছে তাঁহাকে বন্দী করে। তাঁহাকে ব্যাবিলনরাজের কাছে আনা হইলে তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পুত্রদের হত্যা করা হয়। জেদেকিয়ার চক্ষু উৎপাটন করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁহাকে ব্যাবিলনে লইয়া যাওয়া হয়।



জেরুসালেমের পতন

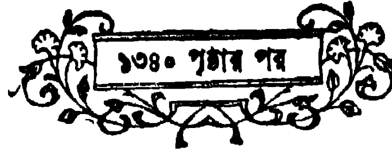


ব্যাবিলনরাজ নেবুকাদনেজ্জারের কাছে জুদার রাজা অন্ধ জেদেকিয়া

ইহার মাস কয়েক পরে ব্যাবিলনরাজের সেনাপতি জেরুসালেমের প্রাসাদ, সহযোগে ভস্মীভূত করে। তার পর জেরুসালেমের সমুদয় অধিবাসীকে বন্দী করিয়া ব্যাবিলনে লইয়া যাওয়া হয়। শুধু নিতান্ত গরীবদের চাষবাস করার জন্য রাখিয়া যাওয়া হয়। এইরূপে জুদারাজ্যের পতন হয়।



ভারতের জৈন তীর্থস্থান


১৩৪০ পৃষ্ঠার পর

বৌদ্ধদের ন্যায় জৈনদের কতকগুলি তীর্থস্থান আছে। মহাবীর বর্দ্ধমান বৈশালীর অন্তর্গত কুণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে, সন্ন্যাসের শেষ অবস্থায় তিনি তাঁহার জন্মভূমিকে ভুলিয়া যান নাই। বিয়াল্লিশটি বর্ষা-বাসের মধ্যে অন্ততঃ বারটি 'বর্ষাবাস' তিনি বৈশালীতে ছিলেন। কুণ্ডগ্রাম জৈনদের একটি তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত বৈশালীতে জন্মিয়াছেন বলিয়া মহাবীরের অপর একটি নাম ছিল বেশালাই। বৈশালী কোথায়, সে সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা বলেন। কেহ কেহ বলেন যে, মজঃফরপুর জেলার অন্তর্ভূত বর্ত্তমান বসাঢ় গ্রাম ও পুরাতন বৈশালী অভিন্ন। বোধ হয় এই অনুমানটি সত্য।



মহাবীর বর্দ্ধমান

পাবা পুরী—এইস্থানে মহাবীরের মৃত্যু হইয়াছিল। পাবা পুরীতে প্রাচীন মল্লজাতির বাস ছিল। সম্ভবতঃ পারা পুরী গোরক্ষপুর জেলার পূর্ব্বদিকে ছোট গণ্ডক নদীর তীরে অবস্থিত কাশিয়া দেশ অভিন্ন। ইহাও জৈনদিগের মধ্যে পবিত্র স্থান বলিয়া পরিচিত। পাবা, পাপা ও পাবা পুরী—একই স্থানের বিভিন্ন নাম। বিহার-নগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রায় সাত মাইল দূরে, গিরিয়কের উত্তরে দুই মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। মহাবীর যখন পাপার রাজা ষষ্ঠী-পাপের প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন, তখন তাহার মৃত্যু হয়। যেস্থানে মহাবীরের মৃত্যু হইয়াছিল, সেখানে এখন চারিটি সুন্দর জৈন-মন্দির আছে। কোন কোন পণ্ডিত, পাবা ও পাড্রোয়ানকে অভিন্ন বলেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। পাবা পুরীর প্রাচীন নাম ছিল পাপা কিংবা অপ্পা পুরী। মহাবীরের মৃত্যুর দিন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এখানে প্রতি বৎসর অপূর্ব্ব সমারোহ সহকারে দীপালি উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভারতের জৈন-তীর্থস্থান

পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ—

হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত পার্শ্বনাথ পর্ব্বত জৈনদের একটি প্রধান তীর্থস্থান। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের গাড়ীতে গ্রাণ্ডকর্ড লাইন দিয়া যাইবার সময় পার্শ্বনাথ পর্ব্বতের নীল শোভা নয়ন মুগ্ধ করিয়া দেয়। পর্ব্বতের উপরকার মন্দিরগুলি সূর্য্য-কিরণে ঝল মল করিতে থাকে। এই পর্ব্বতের উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার ফিট। পার্শ্বনাথ পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ায় জৈনদের মন্দির রহিয়াছে। পাহাড়ের নীচে মধুবাণী নামক স্থানে জৈনদের শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর এই দুই সম্প্রদায়ের নির্ম্মিত মন্দিব ও ধর্ম্মশালা আছে। এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত আস্বাস্থ্যকর। জৈনধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা পার্শ্বনাথকে শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থান মনে করে, এবং এই তীর্থ দর্শন না করিলে জীবনকে সার্থক বলিয়াই মনে করে না। পৃথিবীর নানা স্থানের লোকেরাও এই জৈনতীর্থ দেখিতে আসে। এখানকার ধর্ম্মশালার মধ্যে অনেক মন্দির আছে; তাহাতে তীর্থঙ্করগণের প্রস্তর-মূর্ত্তি রাখা হইয়াছে। কিংবদন্তী এইরূপ যে, পার্শ্বনাথ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে এই পর্ব্বতের নিম্নদেশে আসিয়াছিলেন



পাবাপুরী

এবং এইখানেই তিনি মোক্ষ লাভ করেন। পার্শ্বনাথ পর্ব্বতের অপর নাম সমেত শিখর। এই পাহাড়ে উঠিবার পথ বড় সুন্দর। পাহাড়ের গায়ে অনেক গাছপালা আছে; কোন কোন স্থানে নিবিড় বন আছে, কোথাও বা নির্ঝরের ধারা নামিয়া আসিয়াছে। উঠিবার পথে একটি জৈন মন্দিরও আছে। যাত্রীরা অনেকেই হাঁটিয়া বা ডুলিতে আরোহণ করিয়া পাহাড়ের উপরে উঠিয়া মন্দির দর্শন করেন। রাত্রিকালে মধ্যে মধ্যে মন্দিরের আশে পাশে বন্য পশু দেখিতে পাওয়া যায়। গিরিডি ও হাজারিবাগ হইতে মোটর যোগে এই স্থানে যাওয়া যায়। এখন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল-পথের পার্শ্বনাথ ষ্টেশন হইতে এই তীর্থটি বেশী দূরে নহে।



পার্শ্বনাথ পর্ব্বতের দৃশ্য

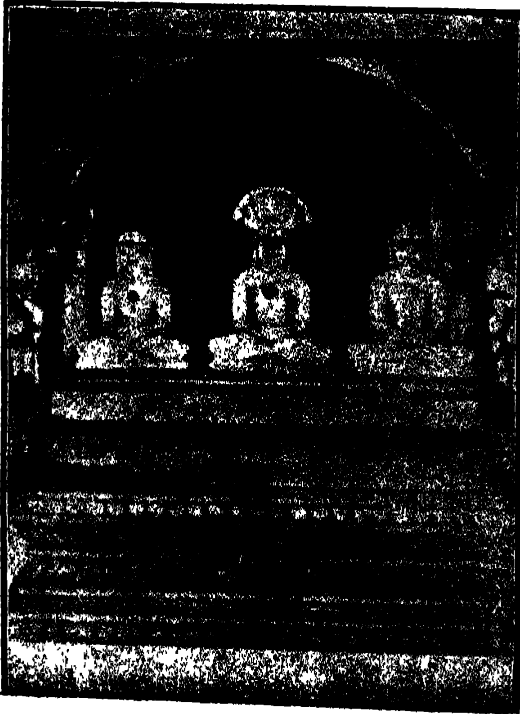


পার্শ্বনাথ পর্ব্বতের একটি জৈন মন্দির

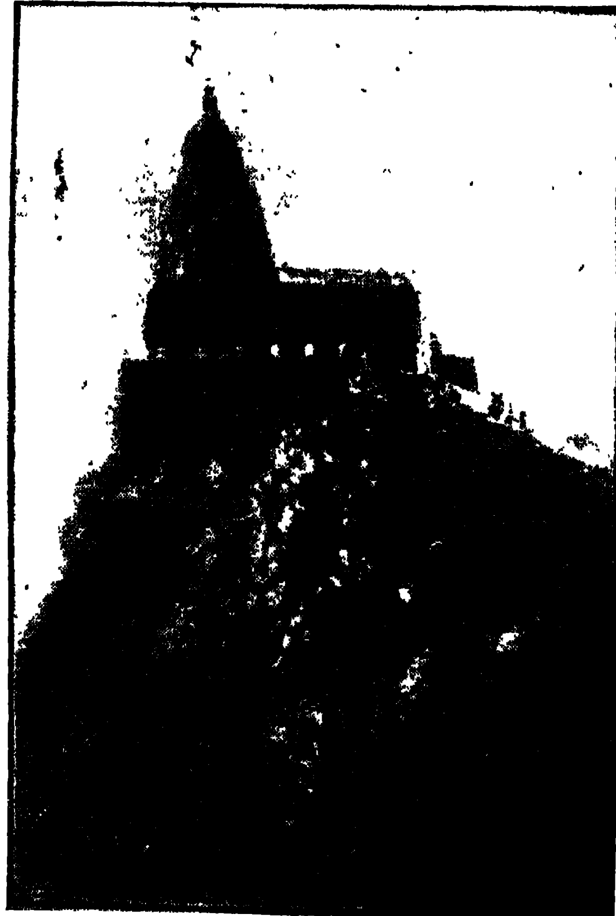
হইতে যাত্রীরা নালন্দা বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যায়। রাজগীর একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানকার জলবায়ু খুব ভাল।

রৈবতক—গুজরাটের অন্তর্গত জুনা-গড়ের সন্নিকটে অবস্থিত গির্ণার এবং রৈবতক পর্ব্বত অভিন্ন। এই স্থানে নেমিনাথের জন্ম হয়। জৈনদিগের পাঁচটি প্রধান তীর্থের মধ্যে ইহা একটি। এই স্থানে নেমিনাথের এবং পার্শ্বনাথের মন্দির

রাজগীর—পাটনা-বক্তিয়ারপুর লাইনে রাজগীর ষ্টেশন অবস্থিত। ইহাও জৈনদিগের একটি পবিত্র স্থান। সুপ্রসিদ্ধ জৈন ধর্ম্মাবলম্বী নাহার পরিবার এই স্থানে যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এখান



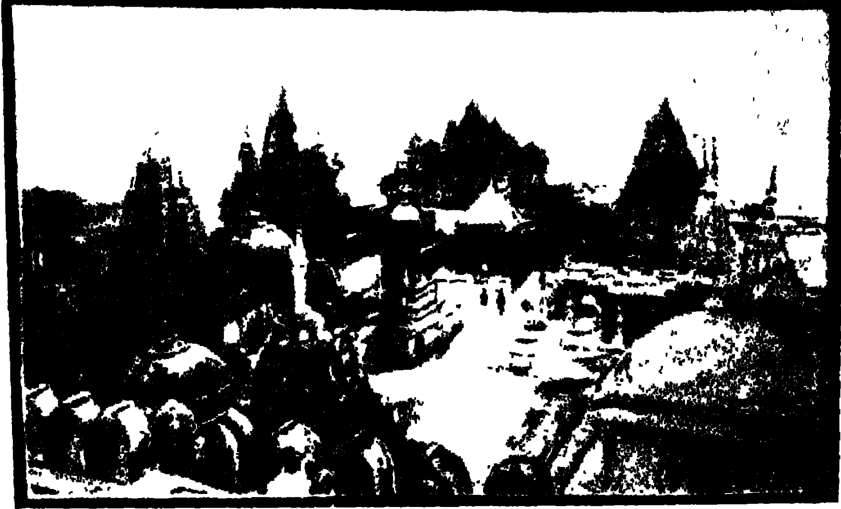
পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি



পর্ব্বত চূড়ার উপরে পার্শ্বনাথের মন্দির

আছে। কথিত আছে, এখানে দত্তাত্রেয় ঋষির আশ্রম ছিল। এই পর্ব্বতের নীচ দিয়া সুবর্ণরেখা নদী প্রবাহিত। নেমিনাথের অনেক প্রবীণ বয়সে এই স্থানে মৃত্যু হয়। তিনি রাজা দত্তাত্রেয়ের গুরু ছিলেন। গির্ণার পর্ব্বতে একটি পদচিহ্ন আছে এবং ঐ পদ চিহ্নটি 'গুরুদত্তচরণ' নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন। এখানে শ্রীচৈতন্যদেব আসিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদও আছে।

শত্রুঞ্জয় পর্ব্বত—ইহা জৈনদিগের একটি পবিত্র স্থান। কাথিয়াবাড়ের পঞ্চ পর্ব্বতের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র। ইহার পূর্ব্ব দিকে পলিতানা নগর অবস্থিত। বহু অর্থব্যয়ে বাগ্‌ভটদেব শত্রুঞ্জয় মন্দির মেরামত করিয়াছিলেন। এখানকার চৌমুখ মন্দিরটি পাহাড়ের উপরকার সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ।



শত্রুঞ্জয় পর্ব্বত



আবু তীর্থ

সোমনাথ দেশ—জুনাগড়ের অন্তর্গত সোমনাথ দেশও জৈনদের তীর্থস্থান। ইহা চন্দ্র-প্রভাস নামে পরিচিত। পূর্ব্বে এই স্থানে একটি কাঠের মন্দির মাত্র ছিল, পরে ঐ মন্দিরটিই প্রস্তর-নির্ম্মিত হইয়াছে।

আবু পর্ব্বত—ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দিকে যেমন পার্শ্বনাথ পর্ব্বত, তেমনি পশ্চিম দিকে আবু পর্ব্বত। এই পর্ব্বত রাজপুতানার শিরোহী রাজ্যের অন্তর্গত। আরাবল্লী পর্ব্বত শ্রেণীর নিকটবর্ত্তী মারওয়ারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। আবু পর্ব্বতের উচ্চতা প্রায় ৫৬৫০ ফিট। ইহা জৈনদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান। এখানে দিলওয়ারা অবস্থিত। এখানে জৈনদের পাঁচটি মন্দির আছে, তাহার মধ্যে দুইটি ভারতবর্ষের সমুদয় জৈন মন্দির অপেক্ষা সুন্দর। এই মন্দির দুইটি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং নানা কারুকার্য্য খচিত। ১০৩১—১১৯৭ খৃষ্টাব্দে মন্দির দুইটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবু পর্ব্বতের ৪০০০ হাজার ফিট উঁচুতে একটি হ্রদ আছে। এক সময়ে এখানে নাকি বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম ছিল। এই পর্ব্বতের

প্রাচীন ও আধুনিক মন্দির আছে। তাহাদের দুই একটির কথাও এখানে বলিলাম।

উড়িষ্যা অঞ্চলে ভুবনেশ্বরের নাম তোমরা জান। ভুবনেশ্বর হইতে পাঁচ ছয় মাইল মাত্র দূরে উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরি নামে পাশাপাশি দুইটি পাহাড় আছে। উদয়গিরির উচ্চতা ১১০ ফিট আর খণ্ডগিরির



অচলগড় আবু পর্ব্বত

উপরেই অম্বা ভবানীর সুবিখ্যাত মন্দির এবং সঙ্গদেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

চন্দ্রগিরি—চেঙ্গল জেলার নিকটে চন্দ্রগিরি অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম ছিল জয়চগা। ইহাও জৈনদের একটি তীর্থস্থান।

খণ্ডগিরির জৈন মন্দির—এসমুদয় তীর্থস্থান ছাড়া জৈনদের আরও কয়েকটি



চন্দ্রগিরি



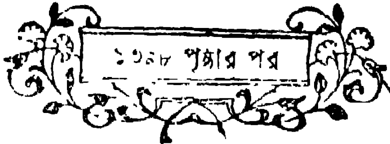
আবু পাহাড়ের উপরিস্থিত হ্রদ

উচ্চতা ১৩৩ ফিট। খণ্ডগিরির উপরে পাহাড়ের গা খোদাই করিয়া কয়েকটি জৈনমন্দির, সে আগে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পার্শ্বনাথের মন্দির—কলিকাতার পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথের বাগানে যে সুন্দর মন্দির আছে তাহার মধ্যে জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি আছে। একটি সুন্দর বাগানের ভিতর এই মন্দিরটি অবস্থিত। প্রায় প্রত্যেক দিনই নানাদেশের নানা জাতীয় লোক আসিয়া এই মন্দির দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।



সাইবেরিয়া


১৩২৮ পৃষ্ঠার পর

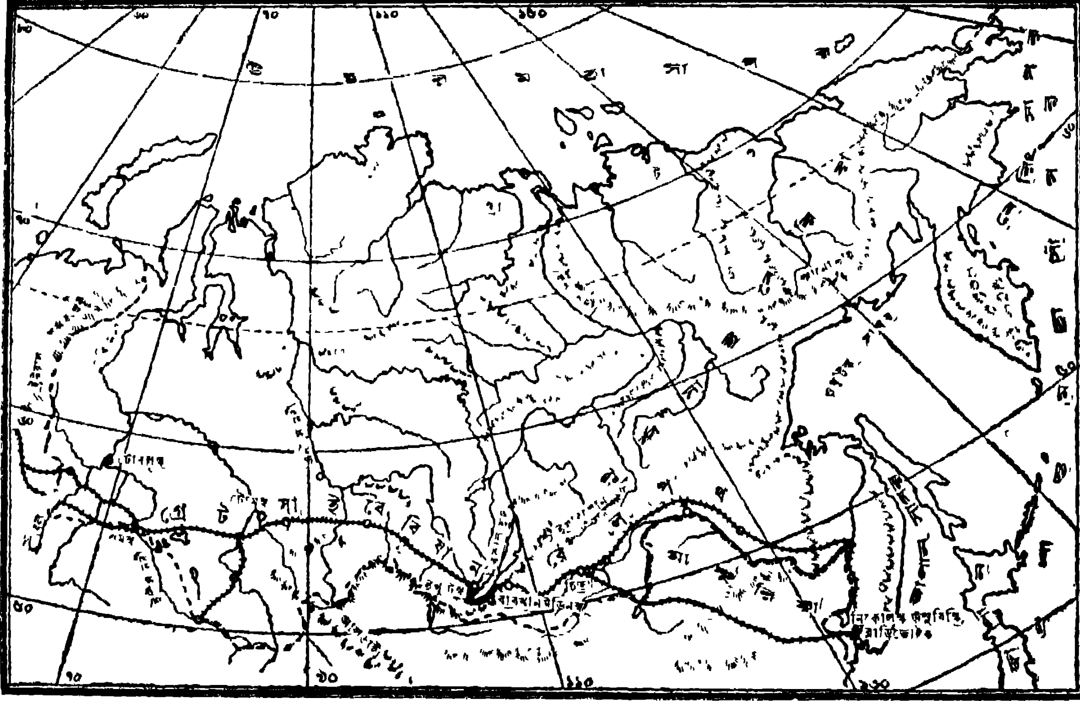
তিব্বতের উ ... । সাইবেরি ... ইহার পরিমাণফল ১,৬১১,৪৮ বর্গ-মাইল। এই দেশের পশ্চিমে ও দক্ষিণে পর্ব্বত, আর উত্তর পূর্ব্বে সমুদ্র। এসিয়ার উত্তর ভ ... সমতলভূমি কিন্তু উহার মধ্যস্থল পর্ব্বতাকীর্ণ ... । এই অংশে 'পামির' (Roof of the world অর্থাৎ কিনা পৃথিবীর ছাদ) নামে অভিহিত সর্ব্বোচ্চ মালভূমি অবস্থিত। পামিরের চারিদিকে বেড়িয়া বড় বড় পর্ব্বতশ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে। পামিরকে মধ্য-এসিয়ার পর্ব্বতশ্রেণীর কেন্দ্র এইরূপ বলা যাইতে পারে। পশ্চিম দিকে পামির ক্রমশঃ নামিয়া আসিয়া ইরাণের (পারস্য) মালভূমির সহিত মিশিয়াছে। আবার সেখান হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া পারস্য ও আর্ম্মেনিয়ার উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পামিরের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী ঢেউয়ের মত একটির পর একটি এমনি ভাবে চলিয়া গিয়াছে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর ও কিউএনলন-বেষ্টনীকৃত গোবি মরুভূমি। উত্তর দিকের পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে থিয়ানশান ইয়াব্লোনয় এবং স্তানোভয় পর্ব্বত প্রভৃতি প্রধান। পামির পর্ব্বতশ্রেণীর কোন কোনটির উচ্চতা ১৬,০০০ ফিট হইতে ১৮,০০০ ফিট।

সাইবেরিয়ার মধ্যে ওবি, এনিসি ও লেনা এই তিনটি নদীই প্রধান। ওবি নদী আলতাই পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সাইবেরিয়ার মালভূমির উপর দিয়া উত্তরদিকে প্রবাহিত হইতে হইতে আর্কটিক (Arctic) বা উত্তর মহাসাগরে যাইয়া পৌঁছিয়াছে। এই নদীর দৈর্ঘ্য ২,০০০ মাইল, ইহার মধ্যে ১,৬০০



পামির বা পৃথিবীর ছাদ

মাইল পর্যন্ত নৌকা চলাচল করিতে পারে। ওবি নদীর বুক দিয়া এখন যাত্রী লইয়া ষ্টীমার যাতায়াত করে। ওবির টোবল নামে একটি উপনদী আছে। ইহার তীরে টোবলস্ক ও মস্কনগর অবস্থিত। সাই-



সাইবেরিয়ার মানচিত্র

বেরিয়ার এই তিনটি নদীর বেশ বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য নদী যেমন উৎপত্তিস্থান হইতে বাহির হইয়া সাগরে মিলিত হয়, ইহারাও তেমনই দেশের দক্ষিণাংশ হইতে বাহির হইয়া উত্তর মুখে বহিয়া আর্কটিক মহাসাগরে পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে। আর্কটিক সাগর বারমাসই বরফে ঢাকা থাকে। এমন কি গ্রীষ্মকালেও নদীগুলির মুখের দিকের বরফ গলে না। কাজেই, নদীর জল বাহির হইবার কোনও পথ না পাইয়া দুই কূল প্লাবিত করিয়া বহিয়া যায়। ওবিকে সাধারণ কথায় ওব্‌ও বলে। গ্রীষ্মকালে দু'এক মাসের জন্য পশ্চিম ইউরোপ হইতে ষ্টীমার ও জাহাজ কারা সাগরের মধ্য দিয়া ওবি উপসাগরের পথে



ওবি নদীর একটী দৃশ্য

ওবি নদীতে আসিয়া পড়ে। গ্রীষ্মের পর নৌকা ও জাহাজ চলাচল করিতে পারে না। সাধারণতঃ ওবি নদীর পাড়ের গ্রামবাসীরা খেয়া নৌকায় এপার ওপার হয়।

ওবি নদীর দুইদিকে বিস্তৃত সমতল ভূমি। কোথাও পল্লীগ্রাম—সে নদীর তীর হইতে অনেকটা দূরে অবস্থিত। লোকজনের বসতি বড়ই কম,—অনেকটা জায়গা জুড়িয়া জলাভূমি ও বন-জঙ্গল। বনাকীর্ণ ঝোপ-জঙ্গলে ভরা ঐ রকম জায়গাকে দেশী ভাষায় 'টাইগা' (Taiga)। এনিসে বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ হইতে পশ্চিমে যাইয়া সাইবেরিয়ার সমতল ভূমি দিয়া উত্তর মহাসাগরে পড়িয়াছে।



ওবি নদীর বুকে যাত্রী জাহাজ

দুই দেশকে এসিয়ার রুশিয়া বলিয়া থাকে। কেননা, এই দেশ দুইটি রাশিয়া রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। সাইবেরিয়ায় শীত অত্যন্ত বেশী। উত্তর মেরুর শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া এখানকার দারুণ শীত সহ্য করিবার শক্তি সকলের থাকে না। উত্তর সাইবেরিয়ার তুষারাবৃত মরুভূমির নাম তুন্দ্রা ভূমি (Tundra)। তুন্দ্রার দক্ষিণে বন-প্রদেশ।

আল্তাই পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়াটির উচ্চতা ১৪,৯০০ ফিট।

সন্ধ্যার সময় সূর্য্যের দীপ্তি যখন নিবিয়া আসে, ধীরে ধীরে অন্ধকার চারিদিক ঢাকিয়া ফেলে, তখন সাইবেরিয়ার প্রবল নির্জ্জনতা নীরবতার এক গম্ভীর মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে।

অনেক সময় নদীর তীরে কাঠ ব্যবসায়ীদের কাঠের সারি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব কাঠ নানাদেশে চালান দেওয়া হয়।

সাইবেরিয়া ও তুর্কিস্থান, এই



ওবি নদীর খেয়া নৌকা



সূর্য্যাস্ত দৃশ্য—ওবি নদী

এই পর্ব্বতের চারিদিকে তুষার নদী। কোথাও গিরিসঙ্কট, কোথাও বিশাল বন—এইরূপ ভাবে আল্তাই পাহাড়ের বিচিত্র শোভা বিদ্যমান্। আল্তাই পর্ব্বত যেমন সেই আদি যুগের বিরাটত্ব ও বিশালত্ব লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। নীরব ও নির্জ্জন এই পার্ব্বত্য প্রদেশ—গাছের পাতায় পাতায় সর্ সর্ সোঁ সোঁ শব্দ করিতে করিতে বাতাস বহিয়া যাইতেছে। নবীন যুগের কোনও সভ্যতার হাওয়া এখানে আসিয়া পৌঁছায় নাই। এ অঞ্চলের মানুষদের অনেকেরই হইতেছে ভেড়ার চামড়া বা ভালুকের চামড়ার নির্ম্মিত পোষাক-

বৈকাল হ্রদ (Baikal)—দক্ষিণ সাইবেরিয়াতে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ১,৩৮০০ বর্গ-মাইল। সমুদ্র সমতল হইতে বৈকালের উচ্চতা ১,২০০ ফিট। পৃথিবীতে যে ছয়টি বৃহদায়তন হ্রদ আছে বৈকাল তাহার অন্যতম। আয়তনে ইহা ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই হ্রদের এক তীর হইতে অন্য তীর দেখিতে পাওয়া যায় না। সুপিরিয়র (Superior) হ্রদের ন্যায় উহা আয়তনে অত বড় না হইলেও পৃথিবীর মধ্যে বৈকাল হ্রদের নানা কারণেই বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। বৈকালের চারিদিকে পাহাড়। পূর্ব্বে এই হ্রদের পশ্চিম দিক হইতে মাঞ্চুরিয়া পর্য্যন্ত যাতায়াতের কোন পথই ছিল না।



কিরঘিজ বালকেরা খেলা করিতেছে

শীতকালে হ্রদের উপরে বরফ জমিয়া যায়, এবং সে সময়ে চন্দ্রালোকে শাদা বরফে-ঢাকা হ্রদের বুকে অপূর্ব্ব শোভা হয়। এখন বৈকাল হ্রদের

পরিচ্ছদ। ইহারা তাহাদের ভেড়া, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর সাহায্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ



কাঠের গুদাম

করে। ভেড়া ও গরুর দুধ ইহারা অত্যন্ত ভালবাসে। কৌমিস (Koumiss) নামক এক প্রকার সুরা ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়। সময় সময় ইহারা কৃষিকার্য্যও করে।

এ অঞ্চলের কালমুক্ (Kalmuk) বা কিরঘিজ (Kirghiz) জাতীয় লোকেরা বড় একটা হাঁটাহাঁটি করে না। ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া চলাফেরা করাই হইতেছে ইহাদের দৈনন্দিন রীতি। কিরঘিজেরা জাতিতে মোঙ্গল। এই জাতীয় লোকেরা চীন দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে ভলগা (Volga) নদীর তীর পর্য্যন্ত প্রায় ৩,০০০,০০০ বর্গ মাইল পরিমাণ স্থান জুড়িয়া বাস করিতেছে। কিরঘিজেরা দুই শাখায় বিভক্ত—এক শাখা কারা (Kara) বা কালো কিরঘিজ এই নামে পরিচিত। ইহাদের তাঁবুর রঙ, ঘোড়ার রঙ, এ সকল হইতেও অনেক সময় এইরূপ নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই পাহাড়ের পথে নানাজাতীয় জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। উপত্যকার মধ্য দিয়া উটের সারি পিঠে বোঝা লইয়া চলিয়া যাইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পাখীও অনেক আছে। বাজ পাখী, ঈগল পাখী এবং অনেক জাতীয় পাখী পাহাড়ের গায়ে বনে বনে বিচরণ করে। আলতাই পাহাড়ের কোথায় কি আছে, সে বিষয়ে তেমন ভাবে কোনরূপ অনুসন্ধান করা হয় নাই। হইলে হয়ত অনেক খনিজ দ্রব্যাদির সন্ধান মিলিত।

তীর দিয়া পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে।



বৈকাল হ্রদের তীরে রেলপথ

এই হ্রদের চারিদিকে গভীর বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী। বৈকালের চারিদিক বেড়িয়া নির্জ্জনতা বিরাজমান। সময় সময় জলোচ্ছ্বাসে পাড় ধ্বসিয়া পড়ার শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে।

আরল সাগর (Aral Sea)—সাইবেরিয়ার উত্তর-পশ্চিমদিকে অবস্থিত। কাস্পিয়ান সাগরের তটরেখা হইতে ইহার উচ্চতা ১১৭ ফিট্, এবং কৃষ্ণসাগর হইতে ৩৩ ফিট্।

বল্‌খাস হ্রদ (Balkhash)—সমুদ্র-তটরেখা হইতে ৫১৪ ফিট উচ্চ। ইস্‌সিক্‌কুল হ্রদের উচ্চতা সমুদ্র তটরেখা হইতে ৪৪৮০ ফিট। ভূ-মধ্যস্থিত হ্রদসমূহের মধ্যে ইস্‌সিক্‌কুল (Issik Kul) হ্রদ সব চেয়ে বড়

কিরঘিজদের কথা বলিয়াছি। সাইবেরিয়ায় বুরিয়াৎ নামে একজাতীয় লোক বাস করে ইহারা যাযাবর জাতীয় লোক—আজ এখানে,

বুরিয়াৎ

কাল সেখানে, এই ভাবে তাহারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। বুরিয়াৎদের মধ্যে একটা অদ্ভুত রীতি প্রচলিত আছে। যদি কোনও বুরিয়াৎ সর্দ্দারের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার ঘোড়াটিও কবরের পাশে বাঁধিয়া রাখে—ঘোড়াকে কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয় না। ইহাদের অভিপ্রায় এই যে, ঘোড়া যেন না খাইয়া মারা যায়, কিন্তু সর্দ্দারের উত্তরাধিকারীরা কৌশল করিয়া এমন আল্‌গা করিয়া ঘোড়াটিকে বাঁধিয়া আসে যেন সে সহজেই দড়ি ছিঁড়িয়া চলিয়া আসিতে পারে। সাইবেরিয়ার প্রায় সর্ব্বত্রই বুরিয়াৎদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব সাইবেরিয়ার চিতা (Chita) নামক স্থানে অনেক বুরিয়াৎ বাস করে।

বুরিয়াৎদের মত পূর্ব্ব সাইবেরিয়া ও মধ্য-সাইবেরিয়ায় তুঙ্গাস্ (Tungus) নামে এক জাতীয় লোক বাস করে। ইহাদিগকে এনিসি (Yenises) নদীর তীরবর্ত্তী ভূখণ্ড হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মোঙ্গল ও তাতারের সংমিশ্রণে এই জাতির উৎপত্তি বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ইহাদের মুখ চেপ্টা, নাক ছোট, ঠোট পাতলা, ক্ষুদ্র চক্ষু, এবং গায়ের রঙ



একজন বুরিয়াৎ ও তাহার সঙ্গী চারি জন পুরুষ স্ত্রী

অনেকটা ময়লা। তুঙ্গাসেরা খুব খোসমেজাজী, সাহসী, বিনয়ী, আত্মনির্ভরশীল, শিকার প্রিয় এবং অতিথি-



পূর্ব্ব সাইবেরিয়ার অধিবাসী বুরিয়াৎগণ

নানা দামী ও জমকালো পোষাক পরিয়া অভিনয় করে। একজন লোক অভিনয়ের পূর্ব্বে কোন্ দৃশ্যটি অভিনীত হইবে এবং তাহাতে কি কি বিষয় থাকিবে, সে বিষয় বর্ণনা করিয়া যায়। দর্শকদের মধ্যে মোঙ্গল, তাতার, বুরিয়াৎ, রুশদেশের লোক,—এমন কি দুই চারিজন ইউরোপীয়ও দেখা যায়। এই সব মেলায় রুশ দেশের বেদে মেয়েরা



পূর্ব্ব সাইবেরিয়ার তুঙ্গাস বালিকা

বৎসল। ইহারা সুচবাচির গভীর অরণ্যের মধ্যে বাস করিতে ভালবাসে।

সাইবেরিয়ার পূর্ব্ব অঞ্চলের মালভূমিতে অনেক সোনার খনি আছে। পশ্চিম সাইবেরিয়াতে গম, মাখন, ডিম প্রভৃতি রপ্তানি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই, তখন সাইবেরিয়ার লোকেরা তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া রুশিয়া ও চীনে বাণিজ্য করিতে যাইত কিংবা সীমান্ত প্রদেশের কোনও সহরের মেলাতে আসিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। তাহারা মেলায় তাঁবু খাটাইয়া বাস করে। মেলায় নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। খোলা মাঠে চীনা অভিনেতারা অভিনয় করিয়া জনতার মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি করে। এই অভিনয়ে কোনও দৃশ্য পটের প্রয়োজন হয় না। অভিনেতারা



সাইবেরিয়া ও চীনের সীমান্ত প্রদেশের মেলা

নানারূপ নাচ গান করিয়া ও অতিশয় সামান্য জিনিষ বেশী দামে বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে।

সাইবেরিয়ার কৃষকদের মধ্যে নানাজাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের আদিম অধিবাসীরা ত আছেই, তা ছাড়া, রুশদেশের লোকদের সংখ্যাও খুব বেশী। সাইবেরিয়া রুশসাম্রাজ্যভুক্ত হইবার পর হইতে রুশের দণ্ডিত অপরাধী এবং অন্যান্য নানাশ্রেণীর

লোকেরা এদেশের অপরিমিত জমি-জমা দখল করিয়া চাষ-আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই ভাবে এদেশে ইউরোপীয় রাশিয়ার বহুলোকের বাসভূমি হইয়াছে। কৃষকেরা এই শীতের দেশে বেশ শান্তি-সুখেই বাস করিতেছে। ছোট ছোট কৃষক ছেলেমেয়েরা বরফে ঢাকা পথে ঘাটে ও মাঠে মনের আনন্দে খেলা করিয়া বেড়ায়। পৃথিবীব্যাপী মহা-সমরের পূর্বে প্রতিবৎসর ১,০০,০০০ একলক্ষ পরিশ্রমী রুশ কৃষক সাইবেরিয়াতে আসিত। সাইবেরিয়ার শহরগুলির মধ্যে নোভো সিবিরস্ক (Novo Sibirsk), ওমস্ক (Omsk)



রুশ দেশের বেদেনী

রাজধানী তোমস্ক (Tomsk) এবং ইরখুটস্ক (Irkutsk) এ কয়টি প্রধান। ইরখুটস্ক নগরীটিকে সাইবেরিয়ার প্যারী (The Paris of Siberia) এই



চীনা থিয়েটার

রূপ বলা হইয়া থাকে। ইরখুটস্ক রেল-ষ্টেশনটি দেখিতে



সাইবেরিয়ার কৃষক

অতি সুন্দর। এই সহরের পথেই রুশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যান্ত দীর্ঘ রেলপথ চলিয়া গিয়াছে।



পশ্চিম সাইবেরিয়ার কৃষকদের ছেলেমেয়ে

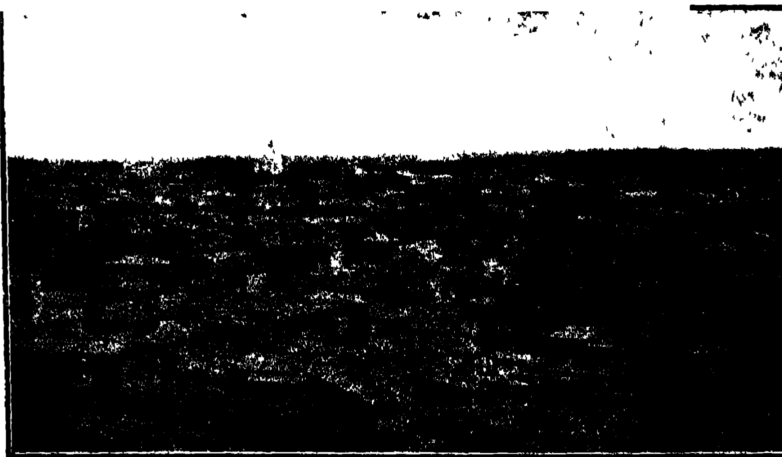
হইতে কর আদায় করিতেন। লেনিনগ্রাড্ হইতে ইরখুটস্কের দূরত্ব ৩,৭০২ মাইল। নদীর উপর নৌকায় ভাসমান সেতু আছে। এই সেতু গ্রীষ্মকালে ব্যবহৃত হয়। ইরখুটস্ক লেনা নদীর তীরে অবস্থিত।

অব নদীর উপনদী ইরটিশের তীরে ওমস্ক সহর। ওমস্ক পূর্ব্বে পশ্চিম সাইবেরিয়ার রাজধানী ছিল। মধ্য রুশিয়া এবং তুর্কিস্থানের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া ইহার বেশ প্রাধান্য আছে। গ্রীষ্মকালে এই সহরের বুকের উপর দিয়া যেমন অতি বেগবান বালুর ঝড় বহিয়া যায়, তেমনি আবার শীতকালে তুষার ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া থাকে।

ইরখুটস্ক সহরের সাধারণ দৃশ্য দেখিতে অতিশয় মনোরম। এ[illegible] সহরের গির্জা গুলি দূর হইতে দেখা যায়। [illegible] শতাব্দীতে ইহা [illegible] কাঠ দিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছিল। তার [illegible] বৎসর পরে [illegible] প্রস্তর দ্বারা [illegible] হইয়াছে। ইরখুটস্ক [illegible] [illegible] [illegible] ছিল, [illegible] হইয়াছিল। [illegible] জন্য [illegible] করিয়াছিলেন। এখান হইতেই তাঁহারা বুরিয়াৎদের কাছ



ইরখুটস্কের ষ্টেশন



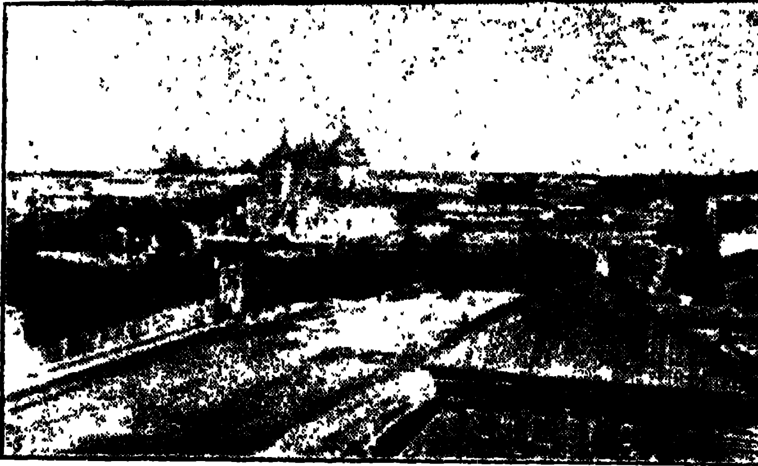
ইরখুটস্ক সহরের সাধারণ দৃশ্য

ইরখুটস্কের পাঁচ মাইল দূরে ভোজনেসেনস্কি (Voznesens-ki) নামক স্থানে একটি মঠ আছে। কথিত আছে যে, এই মঠটির মধ্যে সেন্ট ইনোসেন্টের (St. Innocent) অস্থি সমাহিত আছে। ১৬৭২ খৃঃ ভোজনে-সেনস্কির মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মঠটি দেখিতে অতি সুন্দর

ও নানাকারুকার্য্য খচিত। বৈকাল হ্রদের তীরে বারখনিউভিনস্ক (Verkhne-uvinsk) নামে একটি সহর আছে। সহরটি আকারে ছোট কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর। এই ক্ষুদ্র নগরীটি ইরখুটস্ক হইতে ৩০০ তিন শতমাইল দূরে অবস্থিত। সাইবেরিয়ার প্রান্তে নিকোলস্ক উস্থরিস্কি (Nikolsk Ussuriskii) নামে একটি ছোট সহর আছে। এই সহরের লোক-সংখ্যা মাত্র ৫০,০০০ হাজার। এখানে কস্তুরী মৃগশিকারের জন্য এবং বন্য শূকর শিকার করিবার জন্য অনেক দেশের লোক আসিয়া থাকে। এখানকার রেল-ষ্টেশনটি বড় সুন্দর। সাইবেরিয়ার সহরগুলি সম্বন্ধে এখানে আরও দুই একটি কথা বলিতেছি।



ভাসমান সেতু—ইরখুটস্ক



ওমস্ক সহর

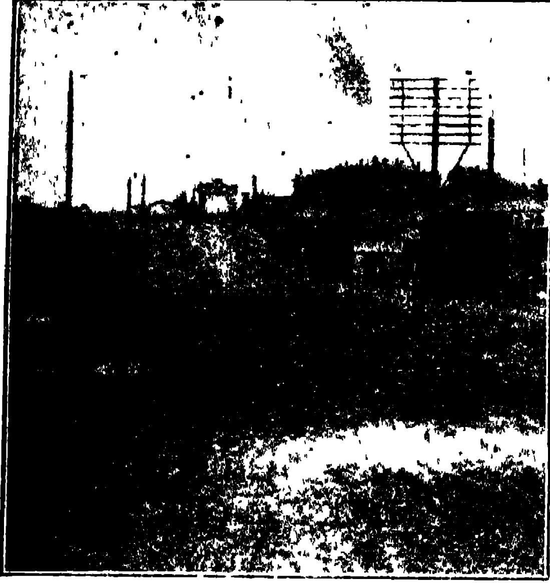


ভোজ্‌নেসেন্‌স্কির মঠ

পশ্চিম সাইবেরিয়ার টোবোলস্ক (Tobolsk) সহরটি দেখিতে অতি সুন্দর। ইহা ইরটিশ নদীর তীরে অবস্থিত। টোমস্ক সহরের খ্যাতি উহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ও এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য। ইরখুটস্ক নগরের জনসংখ্যা ১,৯০,০০০ জন। এই নগরে সাইবেরিয়ার বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। পশুলোম-জাত দ্রব্যাদি এবং চর্ম্ম ও কাষ্ঠের ব্যবসায়ের জন্য সহরের খুব প্রসিদ্ধি আছে। ইরখুটস্কের আলেকজেন্ড্রিয়া পার্কটি বড় সুন্দর। এখানে সহরের লোকেরা সন্ধ্যায় ও অপরাহ্নে বেড়াইতে আসে। এখানে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার ও ব্যায়াম করিবার নানারূপ সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

ইরখুটস্কের পথ-ঘাট দেখিতে অতি সুন্দর ও সুপ্রশস্ত। এখানকার সৈনিক নিবাসে অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্য প্রভৃতি বাস করে। চিতা (Chita) নামে ছোট সহরটি সাইবেরিয়ার রেল-পথের ধারে অবস্থিত। ভ্লাডিভোষ্টক (Vladivostock) সহরের

লোক-সংখ্যা ৯১,০০০, ইহা জাপান সাগরের



বারখানিডাভিনস্কের একটি পথ

তীরে অবস্থিত। এখানেই সাইবেরিয়ার রেলপথ আসিয়া শেষ হইয়াছে। এখান হইতে বৈকাল হ্রদের তীর দিয়া সেকালের পেট্রোগাড এখন লেনিনগ্রেড (Leningrad) পর্যন্ত রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। ছবিতে দেখ, লেনিনগ্রেডের দিকে ব্লাডিভোষ্টক পর্যান্ত একখানা রেলগাড়ী যাইতেছে। ব্লাডিভোষ্টক হইতে রেলগাড়ী মোস্কো (Moscow) হইয়া লেনিনগ্রেডে যায়। এই পথের দূরত্ব ৬০০০ মাইল। পৃথিবীর মধ্যে গ্রেট-সাইবেরিয়ার এই রেলপথই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতম রেলপথ। এই রেলপথ টোবোল্স্ক, ওমস্ক, টোমস্ক, নোভো-সিবিরস্ক, ইরখুটস্ক প্রভৃতি সহরের মধ্য দিয়া নানাদিগ্-দেশে নানাগতিতে চলিয়া গিয়াছে। কিরঘিজ গণতন্ত্রের রাজধানী ওরেন্‌বার্গ (Orenburg)। জনসংখ্যা ১,৪৭,০০০, ইউরাল নদীর তীরে অবস্থিত।



নিকোলস্ক উস্সুরিস্কির রেল ষ্টেশন

সাইবেরিয়ার প্রাচীন ইতিহাস বলিতে তেমন কিছুই নাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্যান্ত এদেশের সম্বন্ধে পৃথিবীর অন্যদেশের লোকেরা তেমন কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সময় সময় ইউরোপীয় রাশিয়া হইতে বণিকেরা ও দস্যু-দল বাণিজ্য করিতে কিংবা লুঠতরাজ করিতে এ দেশে আসিত। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ইয়ারমাক (Yermak) নামে একজন দস্যু সর্দার তাহার দলবল লইয়া সাইবেরিয়াতে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। ইহার পর হইতে হয় জয়-যাত্রা কিংবা উপনিবেশ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া ইউরোপীয় রাশিয়ার ও অন্যান্য দেশের লোকেরা আসা-যাওয়া করিতে থাকে, কিন্তু এই সব ঘটনা সম্পর্কে কেহ কোনরূপ লক্ষ্যই করে নাই।



আজের জেঙ্কাবিয়া পার্ক—ইরখুটস্ক—ছেলেরা খেলিতেছে

সাইবেরিয়ার লোকেরা এ সম্বন্ধে কোনরূপ বাধা দেয় নাই, বাধা দিবার ক্ষমতাও তাহাদের ছিল না। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অসভ্য এবং সাইবেরিয়ার ন্যায় বিস্তৃত-দেশে নানাদিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে তাহারা বাস করিত। কাজেই, ইতিহাসের দিক্

দিয়া তেমন কিছুই এদেশের নাই। রাজনীতির দিক দিয়া এদেশে অনেক পরিবর্ত্তন এদেশের আদিম অধিবাসীদের সহিত রুশীয় ঔপনিবেশিকদের মিশ্রণে কোনরূপ ক্ষতির কারণ হয় নাই। সাইবেরিয়ার ঔপনিবেশিক রুশদের সহিত ইউরোপীয় রুশের লোকের যে বেশী কিছু তফাৎ আছে, তাহা মনে হয় না।



একদল রক্ষী পদাতিক সৈন্য—ইরখুটস্ক

এক সময়ে ইউরোপীয় রুশ হইতে নির্ব্বাসিত লোকেরা সাইবেরিয়াতে আসিত। এইরূপ নির্ব্বাসিত দলের মধ্যে থাকিতেন অনেক পণ্ডিত লোক। তাঁহারা সাইবেরিয়াতে আসিয়া এদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার নূতন আলো আনিয়া দিলেন। তাঁহারই ফলে সাইবেরিয়ার লোকেরা নানাদিক দিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে।



ব্লাডিভোষ্টকের রেল ষ্টেশন

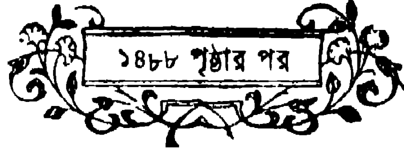
সংসাধিত হইয়াছে।

সাইবেরিয়াকে সোণার দেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানকার সোণার খনির জন্য বিদেশীয়েরা এদেশের নাম দিয়াছেন "Land of Gold". বা সোণার দেশ। সোণা, কয়লা এবং লোহ এই তিনটি এদেশের খনিজ দ্রব্যের মধ্যে প্রধান।

সাইবেরিয়ায় বরফে ঢাকা পাহাড়, বিস্তৃত সমতল ভূমি এবং বন জঙ্গল বিদেশীয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে। এত বড় বিরাট দেশে লোক-সংখ্যা দশ কোটির বেশী নহে।



ভারতে শক, পহ্লব ও কুষণরাজগণের অধিকার



ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে পঞ্জাব বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। দীর্ঘকাল যাবৎ এই প্রদেশ বিদেশীয় রাজশক্তির কেন্দ্রভূমি ছিল। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বিদেশীয় গ্রীক রাজাদের কথা বলিয়াছি। এই গ্রীকেরা কপিশা (Kafiristan), গান্ধার (Peshawar ও Rawalpindi), শাকল (Sialkot) ও পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানে নিজেদের রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই গ্রীকরাজগণ হয় এবুক্রতিদ (Eukratides), না হয় দিমিত্রিয়ের Demetrios) বংশধর। দিমিত্রিয়ের বংশে অনেক রাজা হইয়াছিলেন। ইহাদের নাম ইহাদের মুদ্রা হইতে অবগত হওয়া যায়। এই সকল মুদ্রায় গ্রীক ও খরোষ্ঠী অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি অঙ্কিত আছে। এই বংশের প্রসিদ্ধ রাজার নাম মিলিন্দ (Menander)। ইহার রাজধানী ছিল শাকল বা শাগল। মিলিন্দ পঞ্হো (মিলিন্দপ্রশ্ন) নামক একখানি পালি ভাষার গ্রন্থে মিলিন্দ নামক শাগল বা শাকল দেশের রাজার সহিত বৌদ্ধাচার্য্য নাগসেনের কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে ও কাশ্মীর-দেশীয় কবি ক্ষেমেন্দ্র-রচিত 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতায়' মিলিন্দের নামের উল্লেখ আছে। মিলিন্দ নিঃসন্দেহ একজন পুণ্যাত্মা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভস্মাবশেষ ভিন্ন ভিন্ন নগরসমূহের মধ্যে বি-ক্ত হইয়াছিল। তোমরা দেখ, একজন বিদেশী রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ধর্ম্মানুরাগের জন্য কিরূপ প্রজারঞ্জক হইয়াছিলেন। মিলিন্দ-প্রশ্ন অনুসারে মিলিন্দের কাল বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পাঁচ শত বর্ষ পরে। অর্থাৎ তিনি খৃ-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। অনেকে কিন্তু তাঁহাকে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক মনে করেন। কিন্তু যে গ্রীক রাজার সহিত শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্রের সংঘর্ষ হইয়াছিল, তিনি বোধ হয় দিমিত্রিয়। মিলিন্দের সময় দিমিত্রিয়ের অনেক পরেই ধরা উচিত।

দিমিত্রিয়ের বংশধরেরা শাকল ও পঞ্জাবের অভ্যন্তরস্থ বিস্তৃত অংশে রাজত্ব করিতেন। এবুক্রতিদ (Eukratides) এর বংশধরেরা তক্ষশিলা (আধুনিক Taxila), পুষ্করাবতী (Charsadda), কপিশা (Kafiristan) ও বাহ্লীক (Bactria) শাসন করিতেন। এই বংশেও অনেক রাজা হইয়াছিলেন। শেষ রাজার নাম হেরময় (Hermaios)। ইঁহাদের নাম ছাড়া আর কিছুই জানিবার উপায় নাই।

গৃহ বিচ্ছেদের ফলে গ্রীক রাজারা শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে 'শক' নামক একটি জাতি গ্রীকদিগকে কপিশা ও গান্ধার হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। এই শকেরা প্রথমে একটি যাযাবর জাতি ছিল। ইহারা মধ্য এশিয়ার সিরদরিয়া নামক নদীর উত্তর তটে চীনরাজ্যের সীমান্তে বাস

কবিত এবং ইউচি নামক অপর একটি যাযাবর জাতির দ্বারা পরাজিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অভিযান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে ইহারা বাহ্লীক বা ব্যাক্‌টি্রয়া অধিকার করিয়াছিল। বাহ্লীক হইতে তাহারা পূর্ব্বে এবং দক্ষিণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের একটি দল কিপিন (অর্থাৎ কপিশা গান্ধার) অধিকার করিয়াছিল। আর একটি দল হেলমণ্ড নদীর উপকূলে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই উপনিবেশটি জাতির নামানুসারে শকস্থান (আধুনিক Seistan) নামে পরিচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বদিকে পার্থিয়ানদের রাজ্যেও শক জাতিরা প্রবেশ লাভ করিয়া প্রভূত ক্ষমতাশালী হইতে সমর্থ হইয়াছিল। পার্থিয়ানদের সহিত সংঘর্ষে জয়লাভ করিয়া তাহারা একটি নূতন অব্দের স্থাপনা করিয়াছিল। এই অব্দের প্রারম্ভ ১৫০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের কাছাকাছি।

এই বর্ব্বর জাতি ভারতবর্ষে দলে দলে ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবেশ করিয়াছিল ও সিন্ধু, মালব, পঞ্চনদ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিল। ইহাদের উল্লেখ মহাভারত, রামায়ণ, মনুসংহিতা, মহাভাষ্য ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহাদের রাজাদিগকে 'সাহি' (যাহা হইতে 'শাহ' কথাটা আসিয়াছে) বলা হইত। এই সাহিরা উজ্জয়িনীর এক পাপিষ্ঠ রাজা গর্দ্দভিলকে পরাজিত করিয়া মালবদেশে চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। পরে বিক্রমাদিত্য নামক ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা তাহাদিগকে এই দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া একটি সংবৎ স্থাপন করিয়াছিলেন, একথা একটি জৈন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। হইতে পারে এই প্রতিষ্ঠিত সংবৎটিই বিক্রম সংবৎ। সিন্ধু দেশটা শকদের অধিকারে অনেক দিন যাবৎ ছিল। খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে লিখিত পেরিপ্লাস (Periplus of the Erythream sea) নামক একটি ভৌগোলিক গ্রন্থে সিন্ধুদেশকে Indo Scythia নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

শকবংশীয় রাজাদের অনেকগুলি মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রার মধ্যে মোঅ নামক একজন শকরাজের মুদ্রা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তক্ষশিলায় প্রাপ্ত একখানি তাম্রলিপিতে মোগ নামক জনৈক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মোগ এবং মোঅ একই ব্যক্তি। মোঅর কাল সম্বন্ধে বড়ই মতভেদ আছে। তক্ষশিলার তাম্রলিপি কোনও এক অজ্ঞাত অব্দের ৭৮ বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পার্থিয়া বিজয়ের পর শকেরা একটি নূতন অব্দের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই অব্দটির প্রারম্ভ ১৫০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের কাছাকাছি হইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মোগ ৭২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের কাছাকাছি (১৫০—৭৮) জীবিত ছিলেন। এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

মোগ একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন, সন্দেহ নাই। তক্ষশিলায় তাঁহার অধীনে লিয়াক কুশুলক নামক একজন মহাক্ষত্রপ শাসন করিতেন। এই প্রকার ক্ষত্রপ-শাসনের কথা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তক্ষশিলায় ক্ষত্রপবংশ বহুকাল যাবৎ শাসন করিয়াছিল।

মোগর সমসাময়িক হয় ত তাহারই বংশজাত ভনোন নামক আর একজন শকরাজ আধুনিক আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশে শাসন করিতেন। ভনোন মোগর ন্যায় একজন রাজাধিরাজ ছিলেন। তাঁহার অধীনে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে স্পলহোর ও স্পালিরিষ নামক তাঁহার দুইটি ভ্রাতা রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ শাসন করিতেন। স্পলহোরের মৃত্যুর পর ভনোনের ভ্রাতুষ্পুত্র স্পলগদম পিতৃব্যের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যের কিয়দংশ শাসন করিতে লাগিলেন। ভনোন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্পালিরিষ রাজাধিরাজের পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্পালিরিষের সহযোগী রূপে অয় নামক একজন রাজা রাজ্যের অংশবিশেষ শাসন করিতেন। অয় নামক একজন রাজা মোগর পরবর্ত্তীকালে পঞ্জাবের রাজা হইয়াছিলেন। স্পালিরিষের সহযোগী অয় এবং পঞ্জাবের অয় অভিন্ন ব্যক্তি। অয়কে সাধারণতঃ জাতিতে পহ্লব (Parthian) ধরা হয়। ভারতবর্ষের লোকেরা অবশ্য শক ও পহ্লবদের মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য করিত না। এমন কি, মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের লোকেরা যে কোন বিদেশীয় জাতিকে শক নামে অভিহিত করিত।

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে পার্থিয়ার রাজা প্রথম মিথ্রডেটিস্ সিন্ধুনদের তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। শক জাতির ন্যায় পার্থিয়ান বা পহ্লব জাতিও ভারতবর্ষের অনেক স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। শকদের পর পঞ্জাব পহ্লব রাজাদের অধিকারে আসিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে

সিন্ধুদেশের নিম্নভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পহ্লব রাজগণ পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদাই বিবাদে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এই জাতি সিন্ধুনদের পশ্চিমে গ্রীক রাজ্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ধ্বংস করিয়া নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

অয় (Azes) অতিশয় শক্তিশালী রাজা ছিলেন। হয়ত তিনি একটি স্বতন্ত্র অব্দও প্রচলিত করিয়াছিলেন। এই রাজার নানা প্রকার রজত ও তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তোমাদিগকে এইখানে বলিয়া রাখি যে, গ্রীক, শক ও পহ্লব রাজাদের বিষয় আমরা যাহা কিছু জানি তাহার অধিকাংশ মুদ্রার প্রমাণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রার একদিকে রাজার নাম ও উপাধি গ্রীক অক্ষরে, ও অন্য দিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে অঙ্কিত আছে। শক, পহ্লব ও কুষণ রাজগণ গ্রীকরাজাদের পরবর্ত্তী ছিলেন ও তাঁহাদের অধিকৃত দেশসমূহে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এইজন্য নিজেদের মুদ্রায় তাঁহারা গ্রীক লিপির ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তা ছাড়া ইহাদের নিজস্ব কোনও লিপি ছিল না। তাঁহাদের অধিকৃত দেশসমূহে বহুকাল যাবৎ গ্রীক লিপিরই প্রচলন ছিল।

মহারাজ অয়ের কাল লইয়া এখনও পণ্ডিতদের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছে। তোমরা মোটামুটি তাহার সিংহাসনারোহণের সময় ৫৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের কিছু পূর্ব্বে ধরিতে পার।

অয়ের পরবর্ত্তী রাজার নাম অয়িলিষ। অয়িলিষের পর আর একজন রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহার নামও অয়। অতএব তাঁহাকে অয় দ্বিতীয় (Azes II) বলা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই সকল পহ্লব নৃপতিদের অস্তিত্ব কেবল মাত্র মুদ্রার প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। এই প্রমাণ অত্যন্ত জটিল ও তোমাদের বোধগম্য হইবে না। কেহ কেহ অয় নামক দুইজন রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। আবার কেহ কেহ অয় এবং অয়িলিষ একই রাজার নাম ছিল বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু অয়ের কাল ৫৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বে ধরিলে তাঁহার পরবর্ত্তী একাধিক রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়, নচেৎ অয়ের কাল অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ে।

শকরাজ অয় দ্বিতীয়ের (Azes II) এক প্রকার তাম্রমুদ্রায় অয়ের সহিত তাঁহার সেনাপতি (গ্রীক ভাষায়, (Strategos) ইন্দ্রবর্ম্মার পুত্র অশ্পবর্ম্মার নাম অঙ্কিত আছে। আবার গুডফর নামক আর এক রাজার কতকগুলি মুদ্রার একদিকে গুডুফরের নাম ও অপরদিকে ইন্দ্রবর্ম্মার পুত্র অশ্পবর্ম্মার নাম অঙ্কিত আছে। অতএব তোমরা সহজেই অনুমান করিতে পার যে, গুডুফর (Gondopheres) নামক একজন রাজা দ্বিতীয় অয়ের অব্যবহিত পরেই শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গুডুফর (Gondopheres) একজন উল্লেখযোগ্য রাজা। ইনি জাতিতে পহ্লব (Parthian) ছিলেন। তাঁহার একটি শিলালিপি উত্তর পশ্চিম-সীমান্তের তখ্ত-ই বাহাই Takht i-Bahai নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপিটি কোনও অব্দ বিশেষের ১০৩ বর্ষে এবং রাজা গুডুফরের ২৬ রাজ্যাঙ্কে (অর্থাৎ তিনি তখন ২৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই অব্দকে অনেকে বিক্রমাব্দ ধরে। বিক্রমাব্দের আরম্ভ খৃষ্টের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে। সে হিসাবে লিপিটির কাল ৪৬ খৃষ্টাব্দ (১০৩ হইতে ৫৭ কে বিয়োগ করা হইতেছে) এবং গুডুফরের সিংহাসনারোহণের কাল দাঁড়াইতেছে ২০ খৃষ্টাব্দ (৪৬-২৬)।

রাজা গুডুফর সম্বন্ধে একটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী প্রবাদ আছে। কথিত আছে, যিশুখৃষ্টের বারজন শিষ্য খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে প্রচার কার্য্যের ভার সেণ্ট টমাসের উপর পড়িয়াছিল। তিনি তথায় যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এদিকে ভারতবর্ষের রাজা গুডুফরের একটি নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইবার ইচ্ছা হইল। রাজার প্রাসাদ রাজার যোগ্য হওয়া চাই ত। আবার যে সে রাজা নহে—গুডুফরের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। গুডুফর ভারতবর্ষে সুদক্ষ শিল্পী খুঁজিয়া পাইলেন না। অথবা তাঁহাদের উপর তাঁহার আস্থা হইল না। বিশেষতঃ, তিনি বিদেশী রাজা। তাঁহার রুচি ভারতবর্ষের লোকদের হইতে একটু ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি হব্বান নামক একজন সওদাগরকে পশ্চিমের কোনও দেশে একটি সুদক্ষ শিল্পীর অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। এদিকে যিশুখৃষ্ট জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার শিষ্য সেণ্ট টমাসের ভারতবর্ষে যাইবার ইচ্ছা নাই। তখন শিষ্যের অনিচ্ছা দূর করিবার জন্য তিনি একটি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিলেন। গুডুফরের প্রেরিত সওদাগর হব্বান একজন সুদক্ষ স্থপতির অনুসন্ধানে আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি স্বপ্নে

তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন ও সেণ্ট টমাসকে তাঁহার হস্তে বিক্রয় করিয়া দিলেন। সেণ্ট টমাসকে, রাজা গুডুফরের ভৃত্যরূপে অবস্থান করিয়া তাঁহার নিমিত্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই। অগত্যা টমাস্ হাব্বানের সহিত জলপথে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনুকূল বায়ুর সাহায্যে তাঁহাদের জাহাজ শীঘ্রই সন্দ্রুক নামক বন্দরে আসিয়া পৌঁছায়। সেখানকার রাজকন্যার তখন বিবাহোৎসব চলিতেছে। সেণ্ট টমাস ও হাব্বন বিবাহোৎসবে যোগদান করেন ও বর-কন্যা উভয়কেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হন। সেখান হইতে তাঁহারা গুডুফরের রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেণ্ট টমাস্ প্রতিশ্রুত হইলেন যে, তিনি ছয় মাসের মধ্যেই রাজার জন্য একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। রাজা তাঁহাকে খরচা স্বরূপ কিছু অর্থ দান করিলেন। সে সমস্তই টমাস গরীব দুঃখীকে দান করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ ব্যবহারের জন্য রাজা কৈফিয়ত তলব করিলেন। তখন টমাস উত্তর দিলেন, "রাজন, আমি যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছি তাহা অপার্থিব। তাহা আপনার ইহলোকের বাসের নিমিত্ত নহে। যে অর্থ আপনি দিয়াছেন, আমি সমস্তই দান করিয়া ফেলিয়াছি। এই দানের পুণ্যে আপনার বাসের নিমিত্ত স্বর্গে অক্ষয় প্রসাদ গড়িয়া উঠিতেছে।" এই উত্তরে রাজা এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা এবং আরও বহুসংখ্যক প্রজা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এই প্রবাদটির মূলে কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। যাহা হউক, মুদ্রা ও লিপির প্রমাণ অনুসারে আমরা গুডুফরের যে কাল নির্দ্দেশ করি, তাহা এই প্রবাদের দ্বারা সমর্থিত হয়।

গুডুফরের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অবদশ কিছু কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু ইনি গুডুফরের কতকাল পরে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি নির্দ্ধারিত হয় নাই।

অবদগশের পর আর্থাগ্ন (Orthagnes) পকুর (Pakores) প্রভৃতি পহ্লব রাজগণের নাম মুদ্রা হইতে পাওয়া যায়। ইহার পঞ্জাবে পহ্লব শাসনের অবসান হয় ও কুষণবংশীয় রাজারা পাঞ্জাব অধিকার করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পহ্লব রাজারা সিন্ধুদেশে প্রথম খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের শেষভাগেও রাজত্ব করিতেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে বিবাদ লাগিয়াই থাকিত।

উত্তর ভারতের ক্ষত্রপ-বংশ—মোগ, অয় প্রভৃতি রাজগণের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তগণকে ক্ষত্রপ নামে অভিহিত করা হইত। এই ক্ষত্রপেরা পরে স্বাধীন হইয়া স্বনামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই ক্ষত্রপদিগকে ঐতিহাসিকগণ পাশ্চাত্য বা Western ক্ষত্রপগণ হইতে পৃথক করিবার জন্য উত্তরীয় বা Northern ক্ষত্রপ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। উত্তরীয় ক্ষত্রপদের অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বংশের পরিচয় লিপিও মুদ্রার প্রমাণ হইতে পাওয়া যায়।

একটি ক্ষত্রপ বংশ কপিশাতে (Kafiristan) শাসন করিত। পঞ্জাবেও কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষত্রপ বংশ শাসন করিত। একটি ক্ষত্রপ বংশ তক্ষশিলায় শাসন করিত। তক্ষশিলার ক্ষত্রপদের মধ্যে লিয়াক কুসুলক ও তাঁহার পুত্র পাটিকের নাম পাওয়া যায়। লিয়াক শকরাজ মোগের অধীনে শাসন করিতেন। তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত যে তাম্রলিপির কথা একটু পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি, তাহাতেই কুসুলক ও পাটিকের নাম পাওয়া যায়।

তক্ষশিলায় ক্ষত্রপবংশ ছাড়া পুষ্করাবতীতে আর একটি ক্ষত্রপবংশের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তা ছাড়া অয়র প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তদ্বয় ইন্দ্রবর্ম্মা ও অশ্ববর্ম্মার কথা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইঁহাদের পদবী যদিও স্ত্রতেগ (Strategos) ছিল, তথাপি ক্ষত্রপদের তালিকার মধ্যে ইঁহারা উল্লিখিত হইতে পারেন।

কপিশা ও পঞ্জাবের ক্ষত্রপবংশ ছাড়া মথুরায় একটি বিখ্যাত ক্ষত্রপবংশ শাসন করিত। মথুরার ক্ষত্রপদের মধ্যে রাজুবুল ও শোড়াসের নামে সুপরিচিত। রাজুল, রাজবুল বা রঞ্জবুলের নাম লিপি ও মুদ্রা হইতে পাওয়া যায়। লিপিতে তাঁহাকে মহাক্ষত্রপ বলা হইয়াছে। কিন্তু কোনও কোনও মুদ্রায় তাঁহাকে "রাজাধিরাজ স্ত্রতের" অর্থাৎ রাক্ষাকর্ত্তা (Saviour) বলা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। রাজুবুলের পুত্রের নাম শোড়াস। পিতা যখন মহাক্ষত্রপ ছিলেন, পুত্র তখন ক্ষত্রপ নামে অভিহিত হইতেন। পরে ইনিও মহাক্ষত্রপ হইয়াছিলেন। রাজুবুল ও শোড়াসের অনেক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। শোড়াসের কাল সাধারণতঃ

১৫ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করা হয়। মহাক্ষত্রপ রাজুবুলের কাল ২৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ ধরা যাইতে পারে।

উপরে যে সমস্ত মহাক্ষত্রপদের নামের সহিত তোমাদের পরিচয় হইল, ইহারা সকলেই শক, না হয় পহ্লব জাতীয় ছিলেন। আবার নহপান, চষ্ঠন, রুদ্রদামন প্রভৃতি পশ্চিমের ক্ষত্রপগণও শক জাতীয় ছিলেন। তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের এক বিস্তৃত অংশ শক ও পহ্লব জাতির রাজাদের অধীনে ছিল। ইহা অবশ্য স্বাভাবিক যে, ভারত-সভ্যতার উপর এই সকল শক রাজাদের কিছু না কিছু প্রভাব পড়িয়াছিল। শক রাজাদের কালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আনীত নূতন প্রকার শাসনবিধি প্রচলিত হইয়াছিল। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিদেশীয় ক্ষত্রপ শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। নূতন নূতন কর্ম্মচারীর নামের যথা—স্ত্রতেগ, (Greek strategos)-এর সহিত আমরা পরিচিত হই। তাহার পর শক রাজাদের 'রাজাধিরাজ' পদবী বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল। আসমুদ্র-হিমাচলের একচ্ছত্র রাজা অশোকবর্দ্ধন কেবলমাত্র 'রাজা' উপাধিতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। ভারতে শক রাজারাই সর্ব্বপ্রথম এই প্রকার স্পর্দ্ধাসূচক পদবীর ব্যবহার করিয়াছিল।

এইবার তোমাদিগকে কুষণবংশীয় রাজাদের কথা বলিব। এই প্রবন্ধের আরম্ভেই বলা হইয়াছে, ইউচি নামক একটি যাযাবর জাতি প্রথমে চীন দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বাস করিত। ইহাদিগের নিকটেই 'হিউংনু' নামক আর একটি যাযাবর জাতি বাস করিত। এই হিউংনু জাতিই পরবর্ত্তিকালে ভারতবর্ষে হূন নামে পরিচিত হইয়াছিল ১৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের কাছাকাছি ইউচি জাতি হিউংনু জাতি কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল ও পশ্চিম দিকে গমন করিয়া বক্ষু (Oxus) নদীর তীরে বাস করিয়াছিল। ১২৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের পরেও তাহারা বক্ষু নদীর উত্তর তটেই অবস্থান করিতেছিল। ইহার কিছুকাল পরেই বক্ষু নদী পার হইয়া তাহারা বাহ্লীক দেশের রাজধানী অধিকার করিয়াছিল। এই সময় তাহাদের জীবন-যাত্রার ধারার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাহারা যাযাবরত্ব পরিত্যাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে থাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল ও পশ্চিমে পার্থিয়া হইতে পূর্ব্বে কাবুলের উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়েই তাহারা পাঁচটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। এই পাঁচটি শাখার একটির নাম কুষণ বা কুষাণ (চীন ভাষায় কুইশুয়াং)। এই ঘটনার পর প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত তাহাদের সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। এক শত বৎসর পরে ইউচি জাতির কুষণ শাখার অধিপতি কিউ-চিউ-কিও অন্য চারিটি শাখার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং 'রাজা' (চীন ভাষায় wang) পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিউ চিউ-কিও, অন্-সি (বোধ হয় পার্থিয়া), পোট (গজনি), কাও-ফু (কাবুল) এবং কিপিন (কপিশা ও গান্ধার) জয় করিয়াছিলেন। অশীতি বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র কাও চিং-তাই ভারতবর্ষ জয় করিয়া তথায় ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা চীনদেশীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। চীন দেশের হন রাজ-বংশের ইতিহাসে কুষণ বংশের বিবরণ পাওয়া যায়। এই ইতিহাসে উল্লিখিত কিউ চিও কিও ও ভারতে প্রাপ্ত মুদ্রাসমূহের কুজুল কদফিস (Kujula-kadphises) বা কুযুল কদফিস (Kozola (kadaphes) একই ব্যক্তি। কুযুল কর এবং কুষণ বফস ইঁহারই নামের রূপান্তর মাত্র। ইনিই প্রথম কুষণ সম্রাট।

কুযুল কদফিস কাবুলের শেষ গ্রীক রাজা হেরময় (Hermaios)-কে পরাজিত করিয়া উক্ত দেশের উপর নিজের অধিকার স্থাপিত করেন। পরে তিনি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তক্ষশিলা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। হয় ত তক্ষশিলার পূর্ব্বেও তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

চীনদেশীয় দ্বিতীয় হন রাজবংশের ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কুযুল কদফিস ২৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি নিজের জয়যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তার পর তিনি অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন। এই সকল জয়লাভ অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হয় নাই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পঞ্জিতর (Panjitar) নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি লিপিতে ও তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত একখানি রজতপত্রে উৎকীর্ণ খরোষ্ঠী লিপিতে একজন কুষণ

রাজার উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহার নাম দেওয়া নাই। লিপিদ্বয়ের অজ্ঞাতনামা কুষাণরাজ প্রথম কদফিস (Kodaphises I) হইতে পারেন। লিপি দুইটিতে তারিখ দেওয়া আছে। কিন্তু কোনও সন বা অব্দের উল্লেখ নাই। পঞ্জির লিপিতে ১২২ ও তক্ষশিলার লিপিতে ১৩৬ এই তারিখ পাওয়া যায়। এখন যদি কোনও কোনও পণ্ডিতের মত অবলম্বন করিয়া উক্ত তারিখ দুইটিকে বিক্রমাব্দের ধরা হয়, তাহা হইলে লিপি দুইটি ৬৫ ও ৭৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া স্বীকৃত হয় ও কুযুল কদফিস উক্ত বর্ষে জীবিত ছিলেন বলিয়া ধারা হয়। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ৪৭ খৃষ্টাব্দে গুডুফর তক্ষশিলায় রাজত্ব করিতেছিলেন। অতএব কদফিসের পক্ষে ৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তক্ষশিলা জয় করা সম্ভবপর হয় নাই। এই সমস্ত আলোচনা হইতে তোমাদের প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনা সমূহের কাল নির্ণয় করা যে কত দুরূহ, তাহার একটা ধারণা হইবে। আপাততঃ তোমরা এইটুকু ধরিয়া রাখ যে, কুযুল কদফিস ২৫ খৃষ্টাব্দে জয়-যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন ও ৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তক্ষশিলা অধিকার করিয়াছিলেন। ৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল। মৃত্যুর সময় তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন।

কুযুল কদফিসের মুদ্রায় রোমের প্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি হয়ত রোমক-সম্রাট অগাষ্টস্ বা টাইবেরিয়সের মুদ্রার অনুকরণ করিয়াছিলেন। রোমের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সূত্র অনেক দিন হইতে বিদ্যমান ছিল। ষ্ট্রাবো, প্লিনি ও পেরিপ্লাস্ প্রণেতা প্রভৃতি বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের মতে রোমের ভারতের, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্য-সম্বন্ধ অনেক কাল হইতে স্থাপিত ছিল। প্লিনি একজন রোমান ছিলেন, তিনি ন্যাচারল হিষ্টী (Natural History) নামক ৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থে এই বলিয়া বিলাপ করিয়াছেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসীদের বহু অর্থ ভারতে উৎপন্ন বিলাস দ্রব্যের বিনিময়ে ভারতবাসীদের হস্তগত হইত। আর আজ আমরা বিলাপ করিতেছি যে, বিদেশীয় বিলাস-দ্রব্যের বিনিময়ে আমাদের ভূরি ভূরি অর্থ বিদেশের লোকদের হস্তগত হইতেছে। ইহাকেই বলে ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন। কুযুল কদফিসের কেবল তাম্রমুদ্রাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি স্বীয় মুদ্রায় 'মহারাজ,' 'রাজাধিরাজ' ও 'সচধ্রমঠিত' অর্থাৎ সত্যধর্ম্মস্থিত (সত্যধর্ম্ম অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মনিষ্ঠ)—এই সকল উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মুদ্রায় গ্রীক দেবদেবীর মূর্ত্তি ছাড়া বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিও পাওয়া যায়।

কিউ চিউ-কিও বা কদফিস প্রথমের পুত্র যেন কাও চিং তাই পিতার পরে কুষণ সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনিই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিম কপিশ বা হিম কপিশ Wema Kadaphises বা Kadaphises II)। চীনদেশীয় ইতিহাসানুসারে ইনি তিয়েন চু অর্থাৎ হিন্দুদের দেশ জয় করিয়া তাঁহার সেনাপতিকে তথায় শাসন করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিমকপিশ বা কদফিস দ্বিতীয়ই শক কালের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই শক কালের প্রারম্ভ ৭৮ খৃষ্টাব্দে। বিম কদফিস একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। তিনি অনেকগুলি যুদ্ধে বিপুল সাহসের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে সমস্ত যুদ্ধে সাফল্যলাভ করা ঘটিয়া উঠে নাই। ভারত বিজয়ের পর তাঁহাকে চীনের বিপুল বাহিনীর সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। চীন-সম্রাট ১২৫-১১৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে বক্ষুনদীর তীরে ইউচি জাতির নিকট চাং-কিয়েন নামক দূত প্রেরণ করেন। এই ঘটনার পরে প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত চীনের সহিত পশ্চিমের দেশসমূহের সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম হন বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্বন্ধের অবসান হয়। ইহার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে চীন-সম্রাটের প্রতিপত্তির পুনরায় বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই সময় চীন-রাজের সেনাপতি পান্ চাও দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন ও রোমক সাম্রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়ী সেনা অগ্রসর হয়। তিনি জয়ের পর জয় লাভ করিয়াছিলেন। খোটান, খাসগড় ইত্যাদি প্রদেশ তাঁহার করতলগত হয় ও চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। এই সকল বিজয়ের কাল ৭৩ হইতে ১০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। চীনরাজের এই শক্তি বৃদ্ধিতে কুষণ-রাজ কদফিস দ্বিতীয় নিজেকে চীন-সম্রাটের সমকক্ষ মনে করিতেন ও সেই কারণে তিনি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি নির্ভয়ে চীন-সম্রাটের দুহিতার প্রাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। চীন সেনাপতি পান্-চাও এই প্রস্তাবকে বিশেষ অপমানজনক মনে করিয়া কদফিসের দূতকে ধৃত করিয়া চীন-সাম্রাজ্যে পাঠাইয়া দেন। এই কারণে ভারতেশ্বর ও চীন-

সম্রাটের মধ্যে ঘোর সংগ্রাম বাধিয়া যায়। সেনাপতি সিব অধিনায়কত্বে বিম কদফিস সত্তর হাজার সৈন্য চীন-সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সৈন্য খাসগড় অথবা ইয়ারখন্দ নামক স্থানে ধ্বংস হয়। কদফিস দ্বিতীয় এই পরাজয়ের ফলে চীন-সম্রাটকে কর দিতে বাধ্য হন।

৯৯ খৃষ্টাব্দের পর ভারতীয় দূতেরা রোমসম্রাট ট্রাজানের নিকট গমন করেন বলিয়া একটি প্রাচীন ইতিহাসে প্রকাশিত আছে। বোধ হয়, কদফিস দ্বিতীয়ের দ্বারাই এই দূতেরা প্রেরিত হইয়াছিল। ইয়েচি জাতির বিজয়ের ফলে রোম ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যের স্থলপথ উন্মুক্ত হয়। কদফিস দ্বিতীয় রোম সম্রাটদের মুদ্রার অনুকরণে স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই সকল মুদ্রার অনেক গুলিতে একদিকে বিভিন্ন প্রকারের রাজার মূর্ত্তি আছে ও অপর দিকে ত্রিশূল হস্তে বৃষের পার্শ্বে দণ্ডায়মান শিবের মূর্ত্তি আছে। কোনও কোনও মুদ্রায় "মহরজস, রজতিরজস সর্ব্বলোক ঈশ্বরস, মহিশ্বরস, বিম কাঠ্‌ফিসস্" এই লিপিটি খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে অর্থাৎ বিম কদফিস, মহারাজ রাজাধিরাজ, মাহেশ্বর ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হইতেন। এই উপাধিগুলির মধ্যে মাহেশ্বর উপাধি উল্লেখযোগ্য। 'মাহেশ্বর' শব্দের অর্থ মহেশ্বর অর্থাৎ বিম কদফিস হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শিবের উপাসক বা শৈব হইয়াছিলেন। একজন বিদেশী রাজা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শৈব মতের অনুযায়ী হইয়াছিলেন, ইহা জানিয়া তোমাদের মনে বেশ একটু বিস্ময় ও আনন্দের ভাব আসিতেছে না কি? তোমরা জানিয়া রাখ যে, সে কালে হিন্দুধর্ম্ম বেশ উদার ছিল; শক ও যবনেরা (অর্থাৎ গ্রীকেরা) হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করিয়াছিল। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মতে তাহারা উচ্চ শ্রেণীর শূদ্র ছিল, তাহাদের ব্যবহৃত পাত্র মাজিলেই শুদ্ধ হইত। শক যবনদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও বৌদ্ধশ্রমণদিগকে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করিয়া আত্মার কল্যাণ সাধন করিতেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভিলসা নগরে একটি শিলাস্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। শিলাস্তম্ভের গাত্রে খোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ ও তক্ষশিলাবাসী ভক্ত দিয়েনের (Dion) পুত্র হেলিওদোরস্ (Heliodoros) নামক গ্রীক-দূত কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। হেলিওদোর মহারাজ আন্তি আলিকেতের নিকট হইতে রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের নিকট তাঁহার রাজ্যের চতুর্দ্দশ বৎসরে আগমন করিয়াছিলেন। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ভাগভদ্র শুঙ্গবংশের অন্যতম রাজা। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে না কি যে, গ্রীক-দূত বাসুদেবের ভক্ত ছিলেন? আরও অন্যান্য অনেক প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, বিদেশী রাজা ও প্রজা উভয়েই হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিম কদফিসের সাম্রাজ্যের সীমা সঠিক নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। হইতে পারে, তাঁহার সাম্রাজ্য বারাণসী অবধি বিস্তৃত ছিল। তিনি ন্যূনাধিক ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজার নাম কনিষ্ক।



পথ-হারা

(১৫৮৭ পৃষ্ঠার পর)



আজকে আমি কত দূরে
যে গিয়েছিলেম চলে,'
যতই তুমি ভাবতে পারো
তার চেয়ে সে অনেক আরো—
শেষ করতে পারব না তা'
তোমায় বলে, বলে'।

*　*　*

অনেক দূর সে—আবো দূর সে—
আরো অনেক দূর।
মাঝ খানেতে কত যে বেত,
কত যে বাঁশ কত যে ক্ষেত,
ছাড়িয়ে ওদের ঠাকুর-বাড়ী
ছাড়িয়ে তালিমপুর।



পেরিয়ে গেলাম যেতে যেতে
সাত কুশী সব গ্রাম ;
ধানের গোলা গুণব কত
জোদ্দারদের গোলার মত,
সেখানে যে মোড়ল কা'রা
জানি না তার নাম।



একে একে মাঠ পেরলুম
কত মাঠের পরে !
তার পরে উঃ—বলি মা শোন
সামনে এল প্রকাণ্ড বন,
ভিতরে তার ঢুকতে গেলে
গা ছম্‌ছম্‌ করে।



জামতলাতে বুড়ি ছিল,
বললে "খবরদার !"
আমি বল্লাম বারণ শুনে
"ছপণ কড়ি এই নে গুণে !"
যতক্ষণ সে গুণতে থাকে
হয়ে গেলাম পার।

কিছুরি শেষ নেই তো কোথাও
আকাশ পাতাল জুড়ি,'
যতই চলি যতই চলি
বেড়েই চলে বনের গলি,
কালো মুখোস-পরা আঁধার
সাজ্‌লো জুজুবুড়ী।



খেজুর গাছের মাথায় বসে'
দেখ্‌ছে কারা ঝুঁকি,'
কা'রা যে সব ঝোপের পাশে
একটু খানি মুচকে হাসে
বেঁটে বেঁটে মানুষগুলো
কেবল মারে উঁকি।

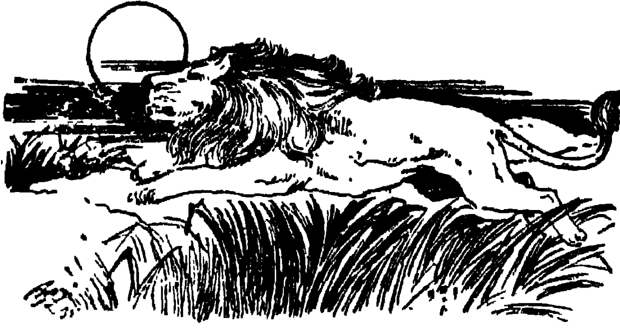


আমায় যেন চোখ টিপ্‌চে
বুড়ো গাছের গুঁড়ি।
লম্বা লম্বা কা'দের পা যে
ঝুলছে ডালের মাঝে মাঝে,
মনে হচ্ছে পিঠে আমার
কে দিল সুড়্‌সুড়ি।

ফিস্‌ফিসিয়ে কইছে কথা
দেখতে না পাই কে সে।
অন্ধকারে দুদ্দাড়িয়ে
কে সে কারে যায় তাড়িয়ে
কি জানি কি পা চেটে যায়
হঠাৎ কাছে এসে।



ফুরায় না পথ ভাবচি আমি
ফিরব কেমন করে ?'
সামনে দেখি কিসের ছায়া,—
ডেকে বলি "শেয়াল ভায়া,
মায়ের গায়ের পথ তোরা কেউ
দেখিয়ে দে না মোরে।"



কয় না কিছুই চুপটি করে'
কেবল মাথা নাড়ে।
সিঙ্গি মামা কোথা থেকে
হঠাৎ কখন এল ডেকে
কে জানে মা 'হালুম করে'
পড়ল যে কা'র ঘাড়ে।



বল্ দেখি তুই, কেমন করে'
ফিরে পেলাম মাকে ?
কে জানে না কেমন করে'—
কানে কানে বল্‌ব তোরে ?—
যেমনি স্বপন ভেঙ্গে গেল
সিঙ্গি মামার ডাকে।

ছেলে-ভুলানো ছড়া



ও পাড়ার ময়রা বুড়ো।
রথ করেছে তের-চূড়ো॥
তোরা রথ দেখ্‌তে যা।
তোদের হলুদ-মাখা গা॥

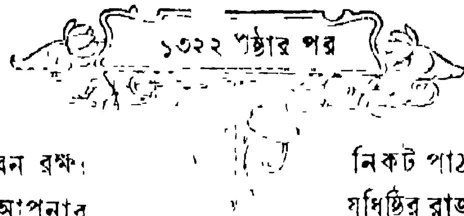
আমরা পয়সা কোথা পাব।
আমরা উল্টো রথে যাব।







মহাভারত


১৩২২ পৃষ্ঠার পর

খাণ্ডব দাহনে যে কয়টি প্রাণী বাঁচিয়াছিল, ময়দানব তাহাদের অন্যতম। ময়দানব হাত যোড় করিয়া বলিলেন, হে মহাবীর অর্জ্জুন। আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, এখন বলুন আমি আপনার কি উপকার করিব। অর্জ্জুন বলিলেন, আমি উপকারের প্রত্যাশায় আপনার জীবন রক্ষা করি নাই—কর্ত্তব্য বোধেই করিয়াছি, সুতরাং আমি তাহার প্রতিদান চাহি না। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলোচনায় ময়দানব খাণ্ডবপ্রস্থে এক অদ্ভুত পূর্ব্ব সভা নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, স্থির হইল।

ইতিপূর্ব্বে দানবগণ বিন্দুসরোবরের তীরে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ-সভা তৈয়ারি করিতে যে সকল জিনিষ লাগিয়াছিল, তাহা সেইখানেই ছিল। ময়দানব তাহা হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়া এক যজ্ঞসভা প্রস্তুত করিলেন। অপূর্ব্ব সুন্দর যজ্ঞ-সভা, এমন সভা কেহ কখনও দেখে নাই। যজ্ঞ সভাটি কিরূপ হইয়াছিল, শোন। সভা-ভূমি লম্বায় হইয়াছিল পাঁচ হাজার হাত। ঐ সভার মধ্যে যে সব থাম ছিল, তাদের মধ্যে কতকগুলি মানুষ ও দৈত্যের আকারের, কতকগুলি গাছের মত উঁচু, মণি-মাণিক্য জড়ানো। এই সভা নির্ম্মাণ করিতে ময়দানবের চৌদ্দ মাস সময় লাগিয়াছিল। খাণ্ডবপ্রস্থে কিছুদিন পরম-সুখে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় চলিয়া গেলেন।

একদিন যুধিষ্ঠির ভাইদিগকে লইয়া ঐ সভায় প্রবেশ করিলেন। দিন দিন পাণ্ডবদের সুখ ও সৌভাগ্য বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সংবাদ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠানো হইল। শ্রীকৃষ্ণ আসিলে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা জানাইয়া বলিলেন, তোমার সম্মতি না পাইলে ত আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না, তাই তোমাকে ডাকিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথা সমর্থন করিয়া বলিলেন কিন্তু এই যজ্ঞ করিবার পক্ষে বাধা একমাত্র মগধের রাজা জরাসন্ধ। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের সমস্ত বিষয় জানাইলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, এই জরাসন্ধ আমার মামা কংসের শ্বশুর। যাদবদের উপর অত্যাচার করিলে আমি কংসকে বধ করিয়াছিলাম। এইজন্য জরাসন্ধ আমাদের উপর অত্যাচার করে। তাহার ভয়েই আমরা মথুরা হইতে পলাইয়া আসিয়া দ্বারকায় বাস করি। বলদৃপ্ত রাজা জরাসন্ধ, শিশুপাল, ভগদত্ত প্রভৃতি রাজাকেও আপনার বশীভূত করিয়াছে। সুতরাং আপনার যজ্ঞ পূর্ণ করিতে হইলে সকলের আগে এই জরাসন্ধকে বধ করিতে হইবে। প্রথমে ইহার উপায় দেখুন—পরে যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করিবেন। কাজেই, যুধিষ্ঠিরকে মগধের রাজার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইতে হইল। কৃষ্ণ ও ভীম হইলেন সেই সৈন্যদলের সেনাপতি। শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন এই তিন জনে স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে ইন্দ্র-প্রস্থ হইতে যাত্রা করিলেন এবং একে একে নানা দেশ উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গা আর শোণ পার হইয়া শেষে মগধে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরের তোরণ-দ্বারে

একটি চৈত্য জয়স্তম্ভ, আর তিনটি খুব বড় ডঙ্কা ছিল, সেগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহারা নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, এক মালী ফুলের মালা বিক্রী করিতেছে, তাহা হইতে জোর করিয়া তিন গাছি মালা লইয়া গলায় পরিলেন। এইরূপে তাঁহারা তিন জনে জরাসন্ধের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যথাসময়ে জরাসন্ধ আসিয়া স্নাতক ব্রহ্মণবেশী ভীমার্জ্জুনের পূজা করিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা কথা কহিলেন না। কৃষ্ণ বলিলেন—আমার সঙ্গী এই দুইটি ব্রাহ্মণকুমার, রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে তাঁহারা কথা কহিবেন না।

জরাসন্ধ কে ছিলেন, জান? জরাসন্ধ মগধের রাজা বৃহদ্রথের পুত্র। রাজা বৃহদ্রথের দুই রাণী ছিলেন। চণ্ডকৌশিক মুনি রাজা বৃহদ্রথের উপর সন্তুষ্ট হইয়া একটি আমফল দেন। রাজা বৃহদ্রথ ঐ আমফল আধ আধ খানি করিয়া দুই রাণীকে খাইতে দেন। সেইজন্য উভয় রাণী আধ আধ খানি সন্তান প্রসব করেন। রাজা বৃহদ্রথ তাহা শ্মশানে ফেলিয়া দেন। জরা নামক রাক্ষসী শ্মশানে উপস্থিত হইয়া ঐ আধ খানি সন্তানকে জোড়া লাগাইতেই ঐ সন্তান বাঁচিয়া উঠে। পরে রাক্ষসী ঐ সন্তান মহারাজ বৃহদ্রথকে দিয়া বলে, সন্ধিস্থল ভেদ না করিলে এই সন্তান মরিবে না। বলিয়া জরা রাক্ষসী চলিয়া গেল। জরা রাক্ষসীর দ্বারা উভয় রাণীর গর্ভ-প্রসূত আধ আধ সন্তান মিলিত হইয়াছিল বলিয়া ইঁহার নাম হয় জরাসন্ধ।

এইবার জরাসন্ধের কেমন সন্দেহ হইল। তাঁহারা যে গুপ্তবেশী, ইহা জানিতে জরাসন্ধের বাকী রহিল না। 'আসিবে শত্রুর ঘরে গুপ্ত বেশ ধরে' শ্রীকৃষ্ণ এই নীতি-বাক্য বলিয়া তাঁহাদের আসিবার উদ্দেশ্য জানাইলেন এবং বলিলেন, তুমি সাম্রাজ্য-গর্ব্বে অন্ধ হইয়া নিরীহ দুর্ব্বল রাজগণকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ ও মনে করিয়াছ তুমি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, কিন্তু ইহা তোমার ভুল। তুমি যে সকল রাজাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া হস্তিনার রাজা যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার কর, নচেৎ ইঁহাদের সহিত যুদ্ধ কর। তোমার সম্মুখে এই দুইটি কর্ত্তব্য রহিয়াছে। কোন্ কর্ত্তব্য গ্রহণ করিবে, স্থির কর। জরাসন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিলেন।

নিশীথরাত্রে ভীমের সহিত জরাসন্ধের যুদ্ধ হইবে,— মুহূর্ত্তের মধ্যে এই সংবাদ সকলেই শুনিতে পাইল। কি ভয়ানক যুদ্ধ হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতে ভীম জরাসন্ধের সন্ধিস্থল ভেদ করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন। জরাসন্ধের মৃতদেহ সেইখানেই রাখিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ বন্দী রাজা-দিগকে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহারা সকলেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, ভীমার্জ্জুনের সহিত খাণ্ডবপ্রস্থে ফিরিয়া আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, এখন আপনার রাজসূয় যজ্ঞ করিবার আর কোনো বাধা নাই। এই বলিয়া তিনি দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন।

রাজসূয় যজ্ঞের দিন ঠিক হইল। মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্বয়ং এই যজ্ঞে প্রধান পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিলেন। দেশ বিদেশের রাজা-রাজড়ারা, ইষ্টমিত্র-কুটুম্ব সকলেই এই যজ্ঞ দেখিবার জন্য আসিলেন। যুধিষ্ঠির আত্মীয়-গণের প্রত্যেকের উপরে এক একটি ভার অর্পণ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনের উপর আনীত উপহার-দ্রব্যগুলি লইবার ভার দেওয়া হইল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পা ধোয়াইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিলেন। দুঃশাসন লইলেন লোকজনের খাওয়া দাওয়ার ভার। অশ্বত্থামার উপর পড়িল ব্রাহ্মণসেবার ভার। বাসের ভার পড়িল বিদুরের হাতে। গরীব দুঃখী ও ব্রাহ্মণ-গণের দানের ভার লইলেন কৃপাচার্য্য। ভীষ্ম ও দ্রোণ সকলের উপর পরিদর্শনের ভার লইলেন।

দুর্য্যোধন যজ্ঞ-সভার অপূর্ব্ব সমারোহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

একটি ঘরে স্ফটিকের মেঝে ছিল। তাহাতে স্ফটিকের পদ্মফুল ছিল। দুর্য্যোধন তাহা জল মনে করিয়া পা রাখিয়া পড়িয়া যান। ভীম ইহা দেখিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন।

আর এক স্থানে জল ছিল। তাহাকে স্ফটিক মনে করিয়া কাপড় পরিয়াই তিনি সেইখানে উপস্থিত হন। তাহাতে তাঁর কাপড় চোপড় সব ভিজিয়া যায়। ইহা দেখিয়া সহদেব হাসিয়া উঠিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনের হৃদয়ে যেন কাঁটা বিঁধিতে লাগিল। আবার—

স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন।
দ্বার হেন ভাবিয়া চলিল দুর্য্যোধন॥
ললাটে প্রাচীর লাগি পড়িল ভূতলে।
তা দেখি হাসিল পুনঃ সভাস্থ সকলে॥

এমন সময়ে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া গেল রাজসূয় যজ্ঞে যিনি সকলের অপেক্ষা বড়, তাঁহাকে প্রথমে

অর্ঘ্য দিতে হয়। মহামতি ভীষ্মের কথায় শ্রীকৃষ্ণকে সকলের আগে অর্ঘ্য দেওয়া স্থির হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই প্রাধান্য চেদির রাজা শিশুপালের সহ্য হইল না। শিশুপাল ইহার প্রতিবাদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অনেক অপমানকর কথা শুনাইল। শ্রীকৃষ্ণ এই অপমানকর কথায় কুপিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। দুই জনে খুব যুদ্ধ হইল। কৃষ্ণ শিশুপালকে সভার মধ্যেই বধ করিলেন। শিশুপালের এইরূপ পরিণাম দেখিয়া সকল রাজাই যুধিষ্ঠিরকে "সম্রাট্" বলিয়া স্বীকার করিলেন। পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণকেই অর্ঘ্য দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। কৌরবগণ, এবং অন্যান্য রাজারা সকলেই নিজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

যুধিষ্ঠিরের এরূপ সৌভাগ্য দেখিয়া দুর্যোধনের প্রাণে ভয়ানক দুঃখ হইল। এখন কি করা উচিত, কেমন করিয়া পাণ্ডবদের এই সৌভাগ্য নাশ করা যায়, ইহা স্থির করিবার জন্য দুর্যোধন মাতুল শকুনিকে নিজের প্রাণের বাসনা জানাইলেন।

শকুনি বলিল, এমন কেহ নাই, যে সম্মুখ যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পারে। তবে আমি এক উপায় জানি। যাহা অবলম্বন করিলে যুধিষ্ঠিরকে জয় করা খুব কঠিন হবে না। যুধিষ্ঠির পাশা খেলিতে খুব ভালবাসেন। কিন্তু তিনি তাহাতে বিশেষ নিপুণ নহেন। আমিও জুয়াখেলায় বিশেষ দক্ষ না হইলেও জুয়া যাহারা খেলে তাহাদের গুরু হইতে পারি কেননা, এ বিষয়ে আমার বিশেষ দক্ষতা আছে। এই কথা বলিয়া শকুনি দুর্যোধনের নিকট পাশা খেলার কথা তুলিল। সব কথা শুনিয়া দুর্যোধনের আনন্দের সীমা নাই। দুর্যোধন পাশা খেলিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া পাঠাইবেন ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু পিতার অমতে ত কিছুই করিতে পারেন না। কাজেই, ধৃতরাষ্ট্রের মত জিজ্ঞাসা করিতে হইল।

ইচ্ছা না থাকিলেও দুর্যোধনের এইরূপ নির্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্র পাশা খেলিতে সম্মতি দিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের ছোট ভাইএর নাম ছিল বিদুর। বিদুর বড়ই ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। বিদুর কিন্তু ইহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন। বিদুর বলিলেন, মহারাজ! আমি কিন্তু এই পাশা খেলায় ভয়ানক বিপদ দেখিতেছি। আমার মনে হয়, এই পাশা খেলায় আপনি সম্মতি দিলে একটা বিবাদের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। এখনও সময় আছে, আপনি এইরূপ অন্যায় কাজ হইতে দিবেন না। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় ছিল না।

বিদুরকেই পাশা খেলার নিমন্ত্রণ দিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইতে হইল। প্রথমে যুধিষ্ঠির পণ রাখিয়া পাশা খেলিতে রাজী হন নাই। কিন্তু তাঁহার নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধেই হউক বা পাশা খেলিতেই হউক, তাঁহাকে আহ্বান করিলেই তিনি যাইবেন। এজন্য ইচ্ছা না থাকিলেও যুধিষ্ঠির ভাইদিগকে ও দ্রৌপদীকে লইয়া পাশা খেলিবার জন্য হস্তিনাপুরে আসিলেন।

যথা সময়ে পাশা খেলা আরম্ভ হইল। এই খেলা দেখিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং বিদুর আসিয়া যথাস্থানে বসিলেন। কি যেন সর্ব্বনাশ ঘটিবে মনে করিয়া বিদুরের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি ঐ স্থানে না আসিয়া উপায় ছিল না।

পাশা খেলায় শকুনির চক্রান্তে যুধিষ্ঠির রাজ্যধন, সম্পত্তি সব হারিয়া গেলেন। এই সময়ে বিদুর বলিয়া উঠিলেন, মহারাজ! দুর্যোধনের জন্ম সময়ের কথা মনে করুন। দুর্যোধন হইতে আপনার কুলক্ষয় হইবে, এজন্য আমি তখনই ইহাকে ত্যাগ করিবার জন্য বলিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি পুত্র স্নেহে অন্ধ হইয়া ইহাকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখনও সময় আছে, আপনি এখনও ইহাকে ত্যাগ করুন—বংশ নাশ করিবেন না, মহারাজ। পাপাত্মা শকুনি অন্যায়ভাবে পাশা খেলিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজ্যধন সবই অপহরণ করিয়াছে।

এই কথায় দুর্যোধন খুবই রাগিয়া গিয়া বিদুরকে তিরস্কার করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র কেমন হতবুদ্ধির মত হইয়া গিয়াছিলেন; তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠিরও এদিকে কান না দিয়া নকুল-সহদেবকে পণ রাখিলেন। যুধিষ্ঠির তাহাও হারিয়া গেলেন। এইবার শকুনি নানাকথা বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। এই বিদ্রূপ-বাক্য যুধিষ্ঠিরের অসহ্য হওয়ায় পাগলের মত হইয়া ক্রমে ভীম ও অর্জ্জুনকে, আপনাকে অবশেষে দ্রৌপদীকেও পণ রাখিলেন ও হারিয়া গেলেন।

দুর্যোধন একেবারে জ্ঞান হারাইয়াছিলেন। তিনি কুলবধূ দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত অপমান করিতে উদ্যত হইলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে সভায় আনিলেন। তাঁহার পরিহিত বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত!—কিন্তু বিধাতা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া-

সভায় আনিয়াছিলেন। দুর্যোধন দ্রৌপদীকে উরু প্রদর্শন করিয়াছিলেন—এ অপমান ভীম সহিলেন বটে কিন্তু সভাস্থলে প্রতিজ্ঞা করিলেন—"আমি দুঃশাসনের বুকের রক্ত পান করিব। আমি দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করিব।' দ্রৌপদীও প্রতিজ্ঞা করিলেন—এই অপমানের প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি বেণী বাঁধিব না।' ভীম দ্রৌপদীর এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"আমি পণ করিলাম দুঃশাসনের রক্তে রাঙ্গা হাতে আমি তোমার বেণী বাঁধিয়া দিব। যদি না পারি, তাহা হইলে আমার নাম ভীম নহে।"

এই সময়ে ভীম দ্রৌপদীর ব্যথাকাতর মুখখানি দেখিয়া আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, রে দুষ্ট দুঃশাসন! আমি যুদ্ধভূমিতে তোর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্ত পান করিব এবং সেই তপ্ত রক্তরঞ্জিত হস্তে দ্রৌপদীর কেশ সংস্কার করিব।

অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চ পাণ্ডবকে ও দ্রৌপদীকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

এই সময়ে দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া বলিল, মহারাজ! এ আপনি কি করিলেন। যে ব্যবহার আমরা পাণ্ডবদের উপর করিয়াছি, তাহারা কি তাহা ভুলিয়া যাইবে, মনে করেন? ইহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন অনেক আলোচনায় পুনরায় পাশা খেলা হইবে স্থির হইল। এই বারের খেলায় বারো বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস, এই পণ রহিল। বলা বাহুল্য, এবারের খেলাতেও যুধিষ্ঠির হারিয়া গিয়া বনবাসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু বলিলেন—বনবাসের পর যুধিষ্ঠির ফিরিয়া আসিলে রাজ্য পাইবেন। এই সময়ে কৌরব পক্ষের অনেকেই পাণ্ডবগণকে শুনাইয়া শুনাইয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া মর্ম্মপীড়িত পাণ্ডবগণ প্রত্যেকে এক এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্রৌপদীর সহিত বনবাসে চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে তাঁহারা কুরুক্ষেত্রের নিকটে সরস্বতী নদীর তীরে কাম্যক বনে বাস করিতেছিলেন। মাতা কুন্তী বিদুরের বাড়ীতে রহিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বাড়ীতে তাঁহার স্থান হইল না।

এই সময়ে পাণ্ডবগণের বনবাসের সংবাদ দ্বারকায় পৌঁছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ শুনিয়া যাদবগণকে লইয়া পাণ্ডবগণের সহিত দেখা করিবার জন্য কাম্যক বনে আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের শোকের সাগর উথলিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে আশ্বাস দিয়া দ্রৌপদিকে নানা কথায় বুঝাইয়া পুনরায় দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন।

একবার ব্যাসদেব আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতি নামক এক মন্ত্র দিয়া বলিলেন, কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমাদিগকে রাজ্য লাভ করিতে হইবে। এই জন্য এই মন্ত্র আমি তোমাকে দিয়া গেলাম। তুমি মন্ত্র অর্জ্জুনকে দিয়ো। অর্জ্জুন এই মন্ত্র প্রভাবে ইন্দ্র ও মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া নানারূপ দিব্য অস্ত্র লাভ করিবে এবং এই সকল অস্ত্র তোমাদের ভবিষ্যৎ রাজ্য লাভের সহায় হইবে। এই বলিয়া ব্যাসদেব চলিয়া গেলেন।

কয়েক দিন পরে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে প্রতিস্মৃতি মন্ত্র দান করিয়া বলিলেন, তুমি এই মন্ত্র প্রভাবে ইন্দ্র ও মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া দিব্যাস্ত্র লাভ কর।

অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে ঐ মন্ত্র শিক্ষা করিয়া দিব্যাস্ত্র লাভ করিবার জন্য হিমালয় পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। অর্জ্জুন গন্ধমাদন পর্ব্বত পার হইয়া কৈলাস পর্ব্বতের নিকট পৌঁছিতেই শুনিলেন কে যেন বলিল, "দাঁড়াও"! অর্জ্জুন দেখিলেন, এক বৃক্ষের নীচে পিঙ্গল জটাধারী এক উজ্জ্বল দেহ তপস্বী দাঁড়াইয়া আছেন। তপস্বী বলিলেন, তুমি ব্রতধারী হইয়া সশস্ত্র কেন? ইহা তপস্বীদের আশ্রম। তুমি অস্ত্র ত্যাগ করিয়া পুণ্য পথে বিচরণ কর। অর্জ্জুন বলিলেন, মহাত্মন্! আমি ব্রতধারী হইলেও দেব-কৃপার প্রার্থী। হে দেব! আপনি প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার মনোবাসনা অবগত হউন। তপস্বী সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বৎস! আমি দেবরাজ ইন্দ্র, তোমার সদাচারে আমি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। অর্জ্জুন বলিলেন, ভগবান্! আমি আপনার নিকট সমস্ত দিব্যাস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিয়াছি, আপনি আমাকে ঐ বর দিন্।

ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হইয়া বর দান করিলেন। অর্জ্জুন সেই স্থানেই দেব-দেব মহাদেবের আরাধনা করিতে বসিয়া গেলেন। চার মাস কাটিয়া গেল। পঞ্চম মাসের প্রারম্ভে একদিন অর্জ্জুন দেখিলেন, একটা শূকর অতি বেগে তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া তাহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শূকরের পশ্চাতে এক ব্যাধও দৌড়াইয়া আসিতেছিল। সেও ঐ শূকরের

প্রতি এক বাণ নিক্ষেপ করিল। দুইটি বাণ লাগিতেই ঐ শূকর এক দানবের রূপ ধরিয়া মরিয়া গেল। অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যাধকে বলিলেন, তুমি যুদ্ধ-রীতি জান না, তুমি আমার লক্ষ্যের উপর কেন বাণ প্রয়োগ করিয়াছ? ইহা শুনিয়া ঐ ব্যাধ বলিয়া উঠিল, মর্খ! আমি এই বনের অধিকারী, আমিই এই শূকরের উপরে প্রথমে বাণ নিক্ষেপ করিয়াছি। নিজের দোষ তুমি অপরের উপর দিতে চাহ? অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ ব্যাধের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্যাধের গায়ে একটি বাণও লাগিল না। অর্জ্জুন দেখিলেন, অগ্নিপ্রদত্ত দুইটি তূণই শেষ হইয়া গেল। তথাপি একটি বাণও ব্যাধের গায়ে লাগিল না, অধিকন্তু ব্যাধ হাসিতেছে দেখিয়া অর্জ্জুন বিশেষ বিরক্ত হইয়া ধনুকের গুণ দিয়া আঘাত করিলেন। ব্যাধরূপী অর্জ্জুনের ধনুক কাড়িয়া লইল। অর্জ্জুন তলবার আঘাত করিলেন—তলবার চূর্ণ হইয়া গেল। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু ব্যাধ অটল! অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, সহসা দেখিলেন, ব্যাধের গলায় তাঁহারই শিব পূজার মালা। দেখিয়া অর্জ্জুন বুঝিলেন, ইনি আর কেহ নহেন। ইনি তাঁহার অভীষ্ট দেব দেব মহাদেব। অর্জ্জুনের তদ্গত ভাব দেখিয়া মহাদেব প্রসন্ন হইয়া পাশুপত অস্ত্র দান করিলেন। এই সময়ে অন্য অন্য দেবতাগণ আসিয়া অর্জ্জুনকে দিব্যাস্ত্র সকল দান করিলেন।

এই সময়ে ইন্দ্র বলিলেন, অর্জ্জুন। তোমার ত কাজ হইয়াছে, এখন দেবতাদের একটি কাজ করিবার জন্য তোমাকে একবার স্বর্গে যাইতে হইবে। তোমার অভাবে পাণ্ডবগণ বিশেষ কাতর হইয়া আছেন। তোমার সংবাদ তাঁহাদিগকে দিবার জন্য আমরা লোমশ মুনিকে পাঠাইয়া দিতেছি। আমি আমার সারথি মাতলিকে রথসহ তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব। তুমি তাহার সহিত স্বর্গে যাইবে।

যথাসময়ে লোমশ মুনি পাণ্ডবদের নিকট পৌঁছিয়া অর্জ্জুনের দৈব অস্ত্রপ্রাপ্তির কথা জানাইলেন। পরে বলিলেন, অর্জ্জুন এখন দৈবকার্য্য সাধনের জন্য স্বর্গে গিয়াছেন এবং তথায় গান্ধর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। ইন্দ্রদেব ইহাও বলিয়াছেন, কর্ণের যে সহজাত কবচ ও কুণ্ডলের জন্য তোমরা ভীত হইয়া আছ,সেই কবচ ও কুণ্ডল ইন্দ্রদেব লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। ইহা শুনিয়া পাণ্ডবগণ বিশেষ প্রীত হইয়া নারদের কথানুসারে লোমশ মুনির সহিত তীর্থ যাত্রা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

তিন দিন পরে তাঁহারা কাম্যক বন হইতে নৈমিষারণ্যের অন্তর্গত গোমতীতে স্নান করিয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে আসিলেন। কিছুদিন প্রয়াগে বাস করিয়া তাহারা বেদিতীর্থ, গয়া, মহীধর তীর্থ, কৌশিক তীর্থ হইয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাসাগর হইতে যাত্রা করিয়া বৈতরণী নদী বাহিত কলিঙ্গ দেশ পার হইয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া সমস্ত তীর্থ দর্শন শেষ করিবার পরে প্রভাস তীর্থে পৌঁছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা সিন্ধুতীর্থ হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত—নিভৃত পুণ্যপীঠ বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

একদিন ভীম ও দ্রৌপদী বদরিকাশ্রমের ঝরণার ধারে বসিয়া আছেন এমন সময়ে সূর্য্যের কিরণের মত উজ্জ্বল পাপড়িযুক্ত এক সহস্রদল কমল বাতাসের বেগে উড়িয়া আসিয়া দ্রৌপদীর নিকটে পড়িল। দ্রৌপদী তাহা উঠাইয়া লইয়া ভীমকে দিলেন, কিন্তু ঐরূপ আর একটি ফুল যুধিষ্ঠিরকে দিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। এই জন্য তিনি ঐরূপ আর একটি ফুল আনিয়া দিবার জন্য ভীমকে বলিলেন। ইহা শুনিয়া ভীম বাতাসের গতি লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, একটা বুড়ো বানর পথের ধারে শুইয়া আছে। বানরটাকে রাস্তা ছাড়িয়া দিতে বলিলে, সেই বানর বলিল, আমি বুড়া হইয়াছি, উঠিবার শক্তি নাই; আমার লেজটা তোমার যাইবার রাস্তায় পড়িয়া আছে, তুমি তাহা উঠাইয়া পাশে রাখিয়া দাও। ভীম বানরের লেজটা তুলিয়া পাশে রাখিয়া দিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু উঠাইতেও পারিলেন না। ভীম বানরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, তিনি হনুমান।

হনুমানের কথামত ভীম কুবেরের সরোবরের দিকে চলিয়া গেলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, হাজার হাজার যক্ষ ঐ সরোবরে পাহারা দিতেছে। ভীম কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঐ সরোবরে নামিয়া পড়িলেন এই সময়ে ঐ যক্ষদের সহিত ভীমের যুদ্ধ হইল। অনেক যক্ষ মরিয়া গেল। এমন সময়ে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে সেখানে পৌঁছিলেন। পাঁচ বৎসরের পর অর্জ্জুনও এই সময়ে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। কুশল প্রশ্নের পর ইন্দ্র স্বর্গে গিয়া নিবাতকবচদের সহিত যুদ্ধের কথা জানাইলেন। নিবাতকবচদের

সহিত যুদ্ধের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই পরম সুখী হইলেন। পরম আনন্দে এখানেও পাণ্ডবগণের চারি বৎসর কাটিয়া গেল। এইবার তাঁহারা তথা হইতে দ্বৈতবনের দিকে চলিলেন। বনবাসের আর দুই বৎসর মাত্র বাকি আছে।

পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে বাস করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন দুর্যোধন প্রভৃতির খেয়াল হইল, দ্বৈতবনে আভীর পল্লী দেখিবার ছলে বনবাসী পাণ্ডবগণকে আপনাদের ঐশ্বর্য্য দেখাইতে হইবে। এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা আভীর পল্লী দেখিবার জন্য



বানরের লেজটা উঠাইতে পারিলেন না

ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অনুমতি চাহিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অনুমতি দিলে কৌরবেরা দ্বৈতবনের দিকে চলিয়া গেলেন। সেই সময়ে চিত্রসেন গন্ধর্ব আসিয়া তথায় এক সরোবরে স্নান করিতেছিলেন। দুর্যোধন পক্ষের লোকেরা চিত্রসেনকে তথা হইতে চলিয়া যাইতে বলিল। কিন্তু চিত্রসেন তাঁহাদের কথা না শুনিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই যুদ্ধে কৌরব পক্ষের সকলে বন্দী হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে যে সকল মহিলা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও বন্দিনী হইলেন। চিত্ররথ সকলকে লইয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির এই সংবাদ পাইয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে বলিলেন, তোমরা গিয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে ও কুল মহিলাগণকে মুক্ত করিয়া আন। ভীম আর অর্জ্জুন ত অবাক্। তাঁহারা বলিলেন মহারাজ! যে কাজ আমরা করিতাম, সে কাজ গন্ধর্ব্বরাজ করিলেন। তিনি ত আমাদের বন্ধুর কাজ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, বিপদের সময় ভাই—ভাই। তারপর আমাদের পুরস্ত্রীগণ অপরের হাতে লাঞ্ছিত হন, ইহা আমাদের দেখা উচিত নহে। যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া অর্জ্জুন গিয়া চিত্রসেনের হাত হইতে পুরস্ত্রীগণকে ও দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়া দুর্য্যোধনাদিকে যুধিষ্ঠিরের নিকট লইয়া আসিলেন। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সপরিবারে তাঁহাকে হস্তিনায় পাঠাইয়া দিলেন।

পাণ্ডবেরা আবার কাম্যক বনে ফিরিয়া আসিলেন। একদিন তাঁহারা মৃগয়ায় গমন করিয়াছেন। কুটিরে

দ্রৌপদী আর দাসীরা রহিল। পুরুষের মধ্যে রহিলেন কেবল পুরোহিত ধৌম্য। সে পথে যাইতেছিলেন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ। সঙ্গে তাঁহার হাজার হাজার সেনা। কুটীরের নিকট দ্রৌপদীকে দেখিয়া তিনি রথ লইয়া একেবারে কুটীরের কাছে আসিলেন এবং দ্রৌপদীকে রথে করিয়া লইয়া চলিলেন। দ্রৌপদী কত কাঁদিলেন, কত মিনতি করিলেন, কিন্তু কোন ফলই হইল না। এমন সময়ে পাণ্ডবেরা মৃগয়া হইতে ফিরিলেন। কুটীরে দ্রৌপদী নাই। দাসীরা কাঁদিতেছে। পাণ্ডবেরা তাহাদের মুখে সব শুনিলেন। এই অপমানে তাঁহারা ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইলেন, সকলে ধনুর্বাণ হাতে লইয়া জয়দ্রথের অনুসরণ করিলেন। পাণ্ডবেরা বাতাসের মত বেগে ছুটিয়া যাইয়া জয়দ্রথের রথ ধরিলেন। যুদ্ধ হইল— জয়দ্রথ পরাজিত ও বন্দী হইলেন। যুধিষ্ঠির কিন্তু জয়দ্রথকে ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। জয়দ্রথ ছিলেন দুর্যোধনের ভগিনীপতি। আবার পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে গেলেন। এই সময়ে বনবাসের বারো বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এবার অজ্ঞাত বাসের সময়। পাণ্ডবেরা নানা স্থান ঘুরিয়া অবশেষে মৎস্য রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিরাট সেখানকার রাজা। পাণ্ডবেরা মৎস্য রাজ্যের রাজধানীর নিকট আসিয়া সেখানে আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র কাপড়ে বাঁধিয়া এক শ্মশানে উঁচু শমী গাছের আগায় ঝুলাইয়া রাখিলেন।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাঁচ ভাই বিরাট রাজার ভবনে ছদ্মবেশে থাকিবার পরামর্শ করিলেন। যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় দক্ষ কঙ্ক নাম গ্রহণ করিলেন। ভীম বল্লভ নামক পাচক, অর্জুন বৃহন্নলা নাম ধারণ করিয়া রমণীগণের নৃত্যগীতশিক্ষক হইলেন। নকুল অশ্বচিকিৎসক গ্রন্থিক ও সহদেব তন্তিপাল নামে গো-পালক ও দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নামে দাসীরূপে একে একে বিরাট রাজার বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

অজ্ঞাতবাসের চতুর্থ মাসে বিরাটরাজের পাচক বল্লভ নামক ভীমের সহিত জীমূত নামক এক মল্লের মল্লযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জীমূত হারিয়া যায় এবং বল্লভের বিশেষ সুখ্যাতি হয়। দ্রৌপদীরও এই সময়ে একটু বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। বিরাটের সেনাপতি ও শ্যালক কীচকের স্বভাব ভাল ছিল না। সে একদিন অন্তঃপুরে দ্রৌপদীকে সামান্য এক দাসী মনে করিয়া অপমানকর কথা বলিয়াছিল। ভীম ইহা শুনিতে পাইয়া একদিন রাত্রিকালে নৃত্যশালায় তাহাকে কীল চড় মারিয়া তার হাত-পা সব শরীরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া মারিয়া ফেলিলেন। সকালবেলায় সকলে তাল-পাকান একটা মৃতদেহ দেখিতে পায়, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে কে, তাহা অতি কষ্টে চেনা যায়। কীচককে কে মারিয়া ফেলিল, কিছু জানা গেল না। শেষে দ্রৌপদীই বলিয়া ফেলিলেন, কীচক আমার অপমান করায় আমার গন্ধর্বস্বামী ইহার এই অবস্থা করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া কীচকের আত্মীয় স্বজনেরা খুব রাগিয়া গেল এবং যে সৈরিন্ধ্রীর জন্য এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই সৈরিন্ধ্রীকেও তাহারা কীচকের মৃত দেহের সহিত এক চিতায় জ্বালাইবার জন্য বাঁধিয়া লইয়া গেল। ভীম এই সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি রাজভবন হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং শ্মশানের দিকে যাইতে যাইতে একটা গাছ তুলিয়া লইয়া সকলকে তাড়া করিলেন। কীচকের আত্মীয়েরা সকলেই মরিয়া গেল। এইবার ভীম দ্রৌপদীর বাঁধন খুলিয়া দিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। নিজেও চুপি চুপি বিরাটরাজার বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সকলেই জানিল, এ কাজ আর কাহারও নহে, ইহা দ্রৌপদীর গন্ধর্বস্বামীর কাজ। ইহার পর হইতে আর কেহ দ্রৌপদীর অপমান করিতে সাহস করে নাই।

অজ্ঞাত বাসের আর সামান্য কয়েক দিন বাকি আছে। দুর্যোধনের চিন্তার অন্ত নাই। তাঁহারা পাণ্ডবগণকে খুঁজিবার জন্য কত জায়গায় লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাদের খবর পাওয়া গেল না। এই সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া খবর দিল, বিরাটরাজের সেনাপতি কীচক গন্ধর্বের হাতে মারা গিয়াছে। এই কথা শুনিয়াই ত্রিগর্তরাজ বিশেষ খুসী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার খুসীর কারণ এই যে, কীচকের সাহায্যেই বিরাটরাজ তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এই সময়ে কৌরব পক্ষের সকলেই বুঝিয়াছিলেন, অজ্ঞাতবাসের সময় শেষ হইলেই পাণ্ডবগণ আসিয়া উপস্থিত হইবেন এবং রাজ্য চাহিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে ত সহজে রাজ্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না; কাজেই যুদ্ধ বাধিবে। যুদ্ধ বাধিলে অনেক অর্থের দরকার। অতএব এই সময়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা প্রথমেই বিরাটরাজের সহিত যুদ্ধ করা স্থির করিলেন। সুশর্মা বিরাট সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধের জন্য চলিলেন। বিরাট

রাজও গুপ্তবেশী যুধিষ্ঠির, ভীম ও নকুল, সহদেবকে লইয়া যুদ্ধ করিতে চলিলেন। এই যুদ্ধে ত্রিগর্ত্তের রাজা সুশর্ম্মা বিরাটরাজকে বন্দী করিয়া লইয়াছেন দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম গিয়া সুশর্ম্মাকে যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া বিরাটরাজকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। এদিকে রাত্রি হইয়া গিয়াছে। দুর্য্যোধন অসংখ্য সৈন্য লইয়া গোপালকদিগকে হারাইয়া দিয়া বিরাটরাজার ষাট হাজার গাভী লইয়া যাইতেছেন, একজন আসিয়া সংবাদ দিল। রাজধানীতে কেহ ত তখন ছিলেন না। সংবাদ পাইয়া রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া যুদ্ধে চলিলেন। এই সময়ে উত্তরা বৃহন্নলাকে বলিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে হারাইয়া তাঁহাদের সুন্দর সুন্দর কাপড়গুলি যেন কাড়িয়া আনা হয়; আমি সেই কাপড় দিয়া পুতুল তৈয়ারী করিব। বৃহন্নলা স্নেহের সহিত তাহাই স্বীকার করিয়া চলিয়া গেলেন। বৃহন্নলা সারথি বেশে রথ চালাইতেছেন। উত্তর ধনুর্ব্বাণ লইয়া রথের উপরে আছেন। উত্তর সহসা কৌরবদের সৈন্যবল দেখিয়া ভয় পাইয়া ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া রথ হইতে নামিয়া পলাইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া জোর করিয়া রথে বসাইয়া রাখিলেন। কিন্তু বৃহন্নলার অস্ত্র যে সেই শ্মশানে শমীবৃক্ষের উপরে তোলা আছে। বৃহন্নলাবেশী অর্জ্জুন উত্তরকে লইয়া সেই শ্মশানের শমীবৃক্ষের নিকট পৌঁছিলেন। একে শ্মশান, তার উপর তার ধারেই দুর্য্যোধনের সাগরের মত সৈন্যদল দেখিয়া উত্তর ভয় পাইয়া গেলেন। বৃহন্নলা উত্তরকে আশ্বাস দিয়া শমীবৃক্ষ হইতে তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিতে বলিলেন। কিন্তু উত্তরের ভয়ের পরিসীমা ছিল না। এই সময়ে অর্জ্জুন হিসাব করিয়া দেখিলেন অজ্ঞাতবাসের এক বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উত্তরকে বলিলেন, রাজকুমার উত্তর। ভয় পাইও না, আমিই অর্জ্জুন। এই কথা শুনিয়া উত্তরের আর কোন ভয় রহিল না।

এখন উত্তর সারথি, অর্জ্জুন যোদ্ধা। ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। এই যুদ্ধে কৌরবগণ পরাজিত হইলেন। অর্জ্জুন সম্মোহন অস্ত্রে কৌরবগণকে অচেতন করিয়া তাহাদের চাদরগুলি উত্তরার পুতুল তৈয়ারী করিবার জন্য লইয়া চলিলেন। রথের পশ্চাতে পশ্চাতে ষাট হাজার গাভীও লইয়া আসিলেন। যাইবার সময় তিনি উত্তরকে বলিলেন, তুমি বিরাট নগরে গিয়া যেন প্রকাশ করিয়ো না, পাণ্ডবগণ তোমার পিতার আশ্রয়েই আছেন; আর আমি এই যুদ্ধ জয় করিয়াছি। বলিবে, বৃহন্নলার সারথ্যে আমি এই যুদ্ধে জয় করিয়াছি। কেননা, এখন আরও কিছুদিন এই কথা গোপন রাখিতে হইবে। উত্তর ইহা স্বীকার করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজকুমারের বিজয়-উৎসব আরম্ভ হইল।

বিরাটরাজ কুমারের বিজয় সংবাদ পাইয়া পাশা খেলিতে ইচ্ছা করিলেন। ইচ্ছা না থাকিলেও যুধিষ্ঠির পাশা খেলা আরম্ভ করিলেন। খেলিতে খেলিতে বিরাটরাজ রাজকুমারের বাহাদুরীর প্রশংসা করিতেছেন. ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, বৃহন্নলা যাহার সারথি, তাহার জয় অবশ্যই হইবে। রাজা এই কথায় ভয়ানক চটিয়া গিয়া খুব জোরে পাশা ফেলিয়া যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করিলেন। ইহাতে যুধিষ্ঠিরের নাক দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। দ্রৌপদী সোনার ঘটিতে জল আনিয়া যুধিষ্ঠিরের মুখে চোখে দিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে যুধিষ্ঠিরের নাক হইতে রক্ত পড়া বন্ধ হইল।

এই সময়ে রাজকুমার উত্তর আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে বৃহন্নলাকে এখন রাজসভায় আনা হইল। বৃহন্নলা আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন।

পরদিন রাজকুমারের বিজয়োৎসব আরম্ভ হইল ইতিপূর্ব্বেই যুধিষ্ঠির প্রভৃতি স্ব স্ব রূপ ধারণ করিয়া সভায় আসিয়া বসিয়াছেন। রাজকুমার উত্তর পাণ্ডবগণের রহস্য ভেদ করিলেন। উৎসবের আনন্দের মধ্য দিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত বিরাটরাজের সখ্য স্থাপিত হইল। কৌরবদের সকলেই এখন জানিল, পাণ্ডবগণ মরে নাই। তাঁহারা সকলেই এখন চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

অভিমানী দুর্য্যোধন কিন্তু বিনা যুদ্ধে তীক্ষ্ণ সূচির অগ্রভাগে যতটা মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া থাকে, ততটা স্থানও পাণ্ডবদিগকে দিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ সন্ধি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহার কথা রক্ষা করেন নাই। অবশেষে পঞ্চপাণ্ডবের জন্য পাঁচখানি গ্রাম পর্য্যন্ত চাওয়া হইয়াছিল। দুর্য্যোধন তাহা দিতেও প্রস্তুত হন নাই। কেবল ঐ কথাই বলিয়াছিলেন "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী" অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন। উভয় পক্ষই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে

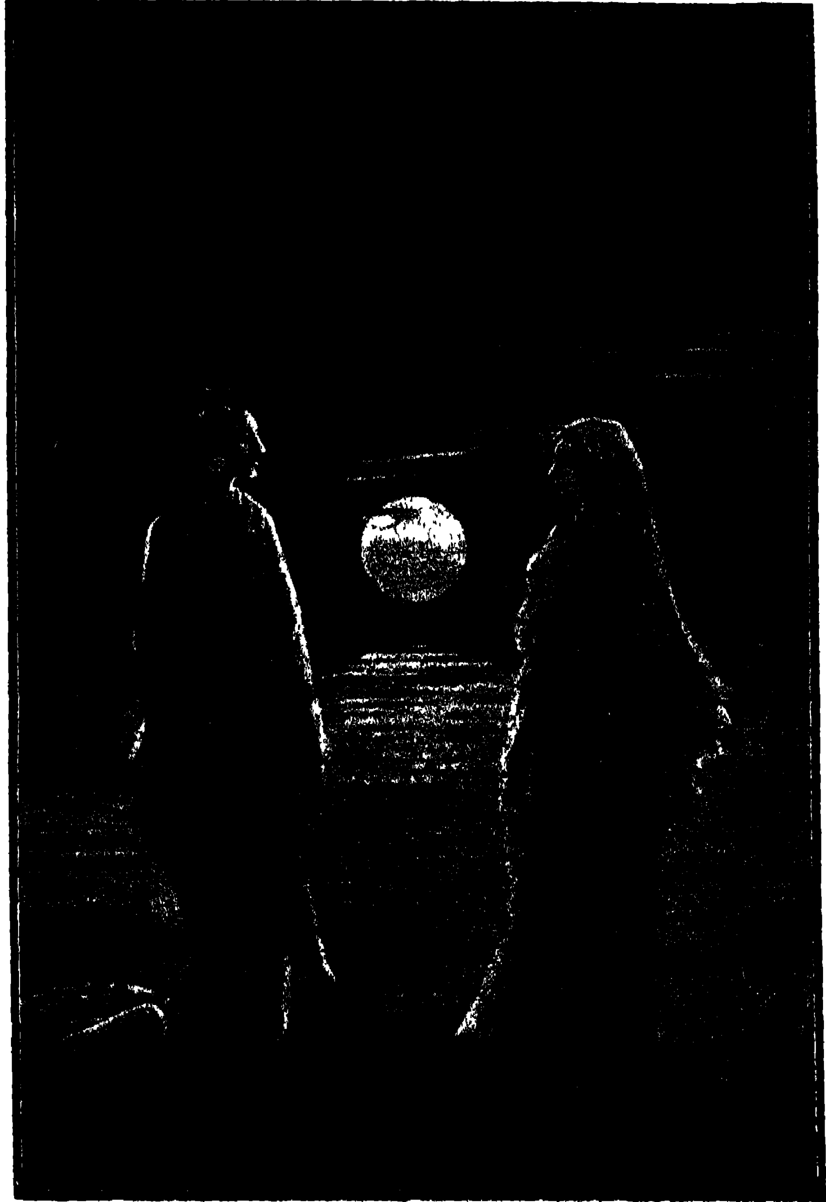


সমান, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ কোন পক্ষেই অস্ত্র ধারণ করিবেন না, স্থির হইল।

কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ দিতে গেলেন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কপট নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন; জাগ্রত হইয়া তিনি উভয়ের মনোভাব জানিয়া দুর্য্যোধনকে তাঁহার নারায়ণী সেনা দিলেন। আর তিনি নিজে অর্জ্জুনের পক্ষে থাকিবেন বটে কিন্তু অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিলেন। যুদ্ধের আয়োজন পূর্ণমাত্রায় চলিল। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আর একবার সন্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু দ্রৌপদী তাঁর খোলা চুল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, তাহা হইলে আমার চুল কি এমনি খোলাই থাকিবে? ভীমার্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা কি রক্ষিত হইবে না? কৃষ্ণ এবিষয়ে আর কিছু বলিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ৭ অক্ষৌহিণী ও দুর্য্যোধনের পক্ষে ১১ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধ করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরে সমবেত হইল। কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম, শল্য, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি দুর্য্যোধনের সেনাপতি হইলেন।

এই সময়ে একদিন কুন্তী দেবী কর্ণের কাছে গিয়া কর্ণকে তাঁহার সব পরিচয় জানাইলেন। কিন্তু ইতি-পূর্ব্বে কর্ণ দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন না। এইজন্য তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন অর্জ্জুন ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বিবদমান আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে ভাবিয়া অর্জ্জুনের মোহ হইল। কিন্তু পার্থ সারথি শ্রীকৃষ্ণ নানা উপদেশ দিয়া অর্জ্জুনের মোহ ভঙ্গ করেন। এই উপদেশই গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া শেষে গীতা নামে অভিহিত হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আঠারো দিনে শেষ হয়। প্রত্যেক দিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেক সৈন্য হতাহত হইতে লাগিল। এইরূপ নয় দিন কাটিয়া গেল। দশম দিবসে



কুন্তী-কর্ণ সংবাদ

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। মহারাজ শান্তনু তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছিলেন। এজন্য ভীষ্মের মৃত্যু পাণ্ডবগণ অসম্ভব মনে করিতে

লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার বধোপায় জানিবার জন্য পাণ্ডবগণ ভীষ্মের নিকটে গেলেন। ভীষ্ম পাণ্ডবগণকে তাঁহার বধের উপায় বলিয়া দিলেন। পরদিন অর্জ্জুন, মহারাজ দ্রুপদের পুত্র শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় ভীষ্মকে শরবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিলেন। ভীষ্মের গায়ে এত শর লাগিয়াছিল যে, তিনি যুদ্ধে পতিত হইবার সময়ে মাটিতে ঠেকেন নাই; শরের উপরেই ছিলেন। এইজন্য ভীষ্মের শরশয্যার কথা বলা হয়। যথাসময়ে এইরূপ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করিলে দ্রোণ দুর্য্যোধনের সেনাপতি হইলেন। গুরু শিষ্যের যুদ্ধ। অর্জ্জুন এই সময়ে নারায়ণী সেনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গিয়াছেন। দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করিলেন। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা করিলেন, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই জয়দ্রথকে বধ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই জয়দ্রথ নিহত হইল। মহাবীর দ্রোণও যুদ্ধে নিহত হইলেন। ক্রমে কৌরব পক্ষের কর্ণ প্রভৃতি সেনাপতিগণ একে একে অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইলেন। এই সময়ে ভীমের সহিত দুঃশাসনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীম ভীমবিক্রমে দুঃশাসনকে গদাঘাতে নিপাতিত করিয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে দুঃশাসনের বক্ষ-রক্ত পান করিলেন এবং অঞ্জলি ভরিয়া দুঃশাসনের রক্ত লইয়া গিয়া দ্রৌপদীর কেশসংস্কার করিয়াদিলেন।

যুদ্ধের সংবাদ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে সবই পাইতেন যুদ্ধ শেষ হইলেই প্রতিদিন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যুদ্ধ সংবাদ জানাইতেন। ধৃতরাষ্ট্র এক এক পুত্রের



ভীম কর্ত্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান

পুত্র অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করিলেন। এই সময়ে দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন এই সপ্তরথী মিলিয়া অভিমন্যুকে বধ করিলেন। জয়দ্রথ ব্যূহ-দ্বার রক্ষা করিয়াছিল।

নারায়ণী সেনার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অর্জ্জুন ফিরিয়া আসিয়া অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া মৃত্যুসংবাদ পাইতেন আর বিলাপ করিতেন। এ বিলাপ যে কি ভীষণ, তাহা লিখিয়া জানান যায় না। তোমরা বড় হইয়া মহাভারতের এই 'ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ' অংশ পড়িও।

এবার দুর্য্যোধন মাত্র বাকি। তিনি দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়া লুকাইলেন। পাণ্ডবগণ দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে



গিয়া দুর্য্যোধনের অনেক নিন্দা করিতে লাগিলেন। নিন্দা অসহ্য হওয়ায় অভিমানী দুর্য্যোধন হ্রদ হইতে উঠিয়া ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভীমের হাতে দুর্য্যোধনও উরুভঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

দুর্য্যোধন উরুভঙ্গ হইয়া পড়িয়া আছেন। ভীম তাঁহার মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন, ইহা দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামার অসহ্য হইল। তিনি পাণ্ডবগণকে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। শিবির-দ্বারে মহাদেবের সহিত তাঁহার দেখা হইল। অশ্বত্থামা মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া শিবিরে প্রবেশ করিয়া পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে বিনাশ করিয়া তাহাদের মুণ্ড লইয়া শিবিরের বাহিরে আসিলেন ও দুর্য্যোধনকে দিলেন। দুর্য্যোধন বুঝিলেন, এ ত পঞ্চপাণ্ডবের মুণ্ড নয়। হর্ষ-বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু হইল। অষ্টাদশ দিবসে এই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল।

শোকাতুরা গান্ধারীকে শান্তি দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ বচনে গান্ধারী দেবীর শত পুত্রশোক বাড়িয়া উঠিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিলেন। পরে যথারীতি মৃত বীরগণের সৎকার করা হইল।

যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসিয়াছেন। কিন্তু সিংহাসনে বসিয়া তাঁহার শান্তি নাই। যুদ্ধের বিভীষিকা, আত্মীয় স্বজনগণের মৃত্যু তাঁহার হৃদয়কে পীড়া দিতেছিল। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অশ্বমেধ যজ্ঞ করা স্থির হইল। অশ্বমেধের ঘোড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই ঘোড়া মণিপুরে পৌঁছিলে, বভ্রুবাহনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে অর্জ্জুন মোহাচ্ছন্ন হইলেন। নাগকন্যা উলূপী আসিয়া অর্জ্জুনের জীবন রক্ষা করিলেন। অর্জ্জুন যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। যজ্ঞ পূর্ণ হইল।

ইহার পর ধৃতরাষ্ট্রের জীবন বড় দুঃসহ হইল। তিনি গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতির সহিত মহাপ্রস্থান করিলেন। এই সময়ে বিদুরও দেহত্যাগ করিলেন।

এইবার যাদবগণের মধ্যে আত্মকলহ আরম্ভ হইল। এই আত্মকলহে সকলেই মারা গেল। কৃষ্ণ-বলরামও এই সময়ে দেহত্যাগ করিলেন।

অর্জ্জুন কৃষ্ণের শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন। ব্যাসদেব আসিয়া অর্জ্জুন প্রভৃতিকে উপদেশ দিয়া সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিলেন।

কিছুদিন পর কৃষ্ণ বিরহে পাণ্ডবগণের আর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। তাঁহারা অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের উপর রাজ্যভার দিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। একে একে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। যুধিষ্ঠির মাত্র বাকি। রাজধানী হইতে বাহির হইবার সময় একটি কুকুর পাণ্ডবগণের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। ঐ কুকুরটি কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সঙ্গে এখনও চলিতেছিল। ক্রমে স্বর্গ নিকট হইয়া আসিল। ইন্দ্রদেব রথ লইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া রথে চড়িতে বলিলেন।



ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির—মহাপ্রস্থানের পথে

কিন্তু যুধিষ্ঠির ঐ কুকুরকে না লইয়া কিছুতেই স্বর্গে প্রবেশ করিতে চাহিলেন না। যুধিষ্ঠিরের এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া ঐ কুকুর ধর্ম্মের রূপ ধারণ করিয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমার কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরীক্ষা করিতেছিলাম। ধর্ম্মের এই কথা শেষ হইতে না হইতেই দেবতাগণ যুধিষ্ঠিরকে লইয়া ইন্দ্রের সহিত দেবরথে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।



ঈশপের গল্প

(১৫৯৮ পৃষ্ঠার পর)

ঈশপ ছিলেন গল্পের রাজা। ঈশপের গল্পের বইয়ের নাম (Aesop's Fables) তোমরা নিশ্চয়ই জান। বিদ্যাসাগর মহাশয় 'কথামালা' নাম দিয়া ঈশপের কতকগুলি গল্পের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কাজেই, ঈশপের গল্পের সহিত তোমাদের পরিচয় আছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে। এখানে তোমাদের কাছে ঈশপের জীবনী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি।

খৃষ্টজন্মের প্রায় পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসের অন্তর্ভূত লিডিয়া দেশের রাজা ক্রীসাসের রাজত্বকালে ঈশপ বর্ত্তমান ছিলেন। অনেকের মতে তাঁহার ৬২০ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্ম হইয়াছিল।

ঈশপ প্রথমে ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় ও রহস্যপটুতার পরিচয় পাইয়া তাহার মানব তাঁহাকে মুক্তি দান করেন। মুক্তিলাভ করিয়া তিনি কি রাজা, কি প্রজা, কি সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সকলের কাছেই গল্প বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষের 'পঞ্চতন্ত্রের' গল্পগুলি যেমন পশু-পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীকে উপলক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে, ঈশপও তেমনি মানুষের নিত্যকার ব্যবহার, সমস্ত জীবনে যত রকম ঘটনা ঘটিতে পারে তাহাই কল্পনায় অনুভব করিয়া পশু-পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীকে উপলক্ষ করিয়াই তাঁহার গল্পগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে প্রচুর হাস্যরস ও রহস্যের লঘুতা দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈশপ তাঁহার উপদেশপূর্ণ কাল্পনিক গল্পগুলির দ্বারা রাজা প্রজা সকলকেই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার গল্পের তিরস্কার, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও কটাক্ষে গ্রীসের প্রজারা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠে। তিনি তখন একটি রূপক গল্প বলিয়া অতিথির প্রতি সদয় ব্যবহার প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার গল্পের জন্যই বিরক্ত হইয়াছিল, সুতরাং আবার গল্প শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইল এবং তাঁহাকে এক পর্ব্বতের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করিল।

কিন্তু তথাপি গ্রীসে ঈশপের সমাদর অল্প ছিল না। কোন ব্যক্তি কোন মজলিসে ঠিক উপযুক্ত সময়ে ঈশপের একটি গল্প ভাল করিয়া বলিতে পারিলে তাহাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিবেচনা করা হইত।

ঈশপের মৃত্যুর দুইশত বৎসর পরে, তাঁহার প্রস্তর-মূর্ত্তি গ্রীসের প্রসিদ্ধ সাতজন জ্ঞানীর প্রতি মূর্ত্তির নিকট প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঈশপ যে এই সকল গল্পের প্রথম স্রষ্টিকর্ত্তা, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। অনেকের মতে আমাদের ভারতবর্ষেই এইরূপ গল্পের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল। মানবসৃষ্টির প্রথম অবস্থায় পশুর সহিত একত্র অবস্থান করাতে তাহাদের প্রকৃতি আদিম মানব বিশেষভাবে অবগত হইতে পারিত। শৃগালের ধূর্ত্ততা, হরিণের



ঈশপ গল্প বলিতেছেন

ভীরুতা, সিংহের বিক্রম, ঘোড়ার অহঙ্কার, গাধার সহিষ্ণুতা ও নির্বুদ্ধিতা, ষাঁড়ের বল প্রভৃতি দেখিয়া তাহাদের প্রতি মনুষ্যভাবের আরোপ করিয়া গল্প রচিত হইত।

এই সকল গল্প লোকের এতদূর প্রিয় যে, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস্ বন্দিদশায় এই সকল গল্প পদ্য করিয়া চিত্ত বিনোদন করিতেন। পৃথিবীর সকল ভাষাতেই ইহার বহুতর অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এখানে কয়েকটি গল্প দেওয়া হইল। এই সকল গল্পের উপদেশগুলি যেমন মনোরম, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। কোন কোন গল্প হইতে দুই তিনটি উপদেশ পাওয়া যায়।

শৃগাল ও আঙুর ফল

এক শৃগাল কোন আঙুরের বাগানে গিয়া দেখিল, মাচার উপরে গুচ্ছ গুচ্ছ পাকা আঙুর মুক্তার ঝালরের মত ঝুলিতেছে। সেই সুন্দর রসালো ফল দেখিয়া শৃগালের খাইতে অত্যন্ত লোভ জন্মিল। কিন্তু সে অনেক লম্ফ ঝম্ফ দিয়াও সেই লোভনীয় ফল পাড়িতে পারিল না। তখন সে সেখান হইতে আপনার মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়া চলিয়া গেল যে, "যাক, ও আঙুরগুলো টক্!



যাহার যে বিষয়ে অক্ষমতা আছে, সে সেই বিষয়ের আপনার অক্ষমতা ভুলিয়া উক্ত বিষয়ের নিন্দা করিয়া মনে আপক্ষাকৃত সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করে।

বাঘ ও বক

এক সময়ে এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়া গিয়াছিল। সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বনের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিল এবং যে জন্তুকে দেখে, তাহাকেই বলে, "ভাই রে, আমার গলা হইতে হাড় বাহির করিয়া দাও, আমি তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব।" কেহই বাঘের প্রস্তাবে সম্মত হইল না। অবশেষে একটা বক বাঘের কাকুতি মিনতিতে দয়ার্দ্র হইয়া এবং পুরস্কারের লোভে পড়িয়া বাঘের গলা হইতে হাড় বাহির করিয়া দিতে স্বীকার করিল। বাঘ তাহার মুখ হাঁ করিল এবং বক তাহার লম্বা গলা বাঘের মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া ঠোঁটে ধরিয়া বাঘের গলার হাড় বাহির

করিয়া আনিল। তখন বক বিনীত বচনে বাঘের স্বীকৃত পুরস্কার প্রার্থনা করিলে, বাঘ দাঁত কড়মড় করিয়া বিরক্তির স্বরে বলিল, 'অকৃতজ্ঞ জীব, বাঘের মুখের ভিতর হইতে আপনার আস্ত মাথাটা যে বাহির করিয়া লইতে পারিয়াছিস্, তাহাই যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া না মানিয়া, আবার অন্য পুরস্কারের প্রত্যাশা করিতেছিস্। যদি আপনার ভালো চাহিস্ তবে শীঘ্র আমার সম্মুখ হইতে দূর হ, নতুবা এখনই তোর ঘাড় ভাঙিয়া



স্বীকৃত পুরস্কার প্রার্থনা করা বন্ধ করিয়া দিব।" বক হতবুদ্ধি হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

কৃষক ও সর্প

কোনো এক বৎসরে অত্যন্ত শীত পড়িয়াছিল।

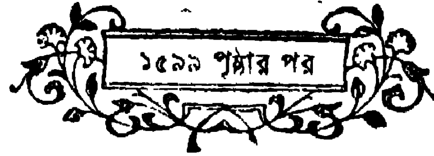


এক কৃষক ক্ষেত্র হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় দেখিল, একটা সাপ শীতে আড়ষ্ট ও মৃতপ্রায় হইয়া আলের ধারে পড়িয়া আছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া কৃষকের দয়া হইল; সে সাপটাকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া বাড়ী আসিল এবং উননের কাছে গরমে রাখিয়া দিল। আগুনের তাপে সজীব হইয়াই সাপ ফণা ধরিয়া কৃষকের সন্তানদিগকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। তখন সেই কৃষক একটা কুঠার দ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া বধ করিয়া বলিল, "আমি যেমন নির্বোধের মত খলকে দয়া করিয়াছিলাম, তাহার উপযুক্ত শিক্ষা পাইলাম!"



কি ও কেন ?

কাঠ জলে ভাসে কেন ?



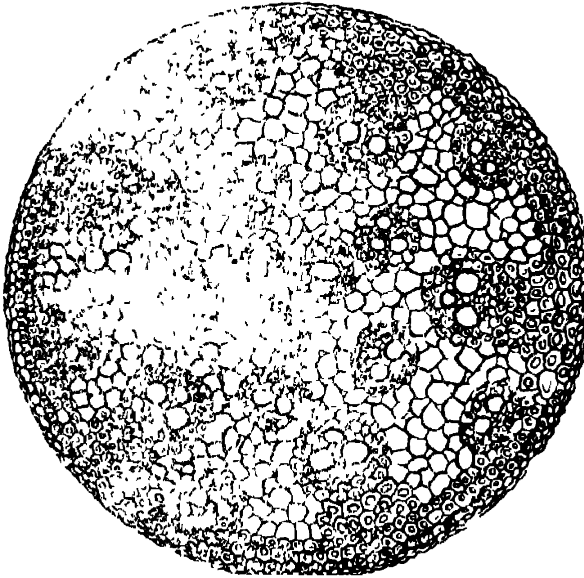
তোমাদের মধ্যে যারা বিদ্যালয়ে সামান্য কিছু বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে তারা এ কথা শুনে একটুও ভড়্‌কে যাবে না। পর মুহূর্ত্তেই বেশ নিঃসংশয়ে বলে উঠবে যে, কাঠের "আপেক্ষিক গুরুত্ব" জলের "আপেক্ষিক গুরুত্বের" চেয়ে বেশী, তাই কাঠ জলে ভাসে। খানিকটা জল নাও, আর ঠিক সেই আয়তনের যে কোনও একটা জিনিষ নাও। জল আর জিনিষটাকে ওজন কর। জিনিষটার ওজন আর জলটার ওজনের যে অনুপাত তাই হ'ল জিনিষটার "আপেক্ষিক গুরুত্ব।" এই কথাটাকে আরও সোজা করে বললে এই দাঁড়ায় যে সম আয়তনের দুটো জিনিষের মধ্যে যেটা বেশী ভারী, তার "আপেক্ষিক গুরুত্ব"ও বেশী। যে জিনিষের ভার যত বেশী, তার ওপর পৃথিবীর আকর্ষণও তত প্রবল। তাই সে যতদূর সম্ভব নীচে নেমে পৃথিবীর নিকটস্থ হ'তে চায়। জলের চেয়ে লোহার গুরুত্ব বেশী, তাই লোহা জলের নীচে চলে যায়; অপর পক্ষে কাঠের গুরুত্ব কম, তাই তাকে ওপরেই ভেসে থাকতে হয়।

উত্তর যে ঠিক, তাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখলে ব্যাপারটা তেমন সোজা মনে হয় না। জল আর কাঠ কি দিয়ে তৈরী, তা ভেবে দেখা যাক। জলের কণা তৈরী হয়েছে হাইড্রোজনের দুটো অণু (atom) আর অক্সিজেনের একটা অণুর (atom) পরস্পরের সংযোগের ফলে। হাইড্রোজনের অণুর ওজন ধরা যাক 'এক', তা হ'লে অক্সিজেনের অণুর ওজন হবে ১৬। অতএব দুটো হাইড্রোজেন ও একটা অক্সিজেন মিলে যে জলকণা (water molecule) তৈরী হয়েছে, তার ওজন হবে ১৮। এই জলকণাটা তিনটে জিনিষ দিয়ে তৈরী, তাই গড়পড়তা (average জলের ওজন বলা যেতে পারে ১৮ ÷ ৩ = ৬। এইবার কাঠের কথা ভেবে দেখা যাক। কাঠের প্রধান উপাদান হল অঙ্গার (Carbon)। আর যা যা জিনিষ তাতে আছে, তাকে আমাদের না ধরলেও খুব ক্ষতি হবে না। এই অঙ্গারের average বা আগের মত গড়পড়তা অঙ্গার-কণার (Carbon atom) ওজন হয় ১২। অতএব হিসাব করে দেখতে পাওয়া গেল যে, কাঠের ওজন জলের ওজনের প্রায় দুই গুণ হওয়া উচিত। উচিত হলেও বাস্তবিক তা হয় না। অতএব কেন হয় না, এই হল আমাদের সত্যিকারের সমস্যা।

এর উত্তর দিতে হ'লে গাছ কেমন ভাবে কাঠকে নিজের মধ্যে তৈরী করে, তা ভেবে দেখতে হয়। কিন্তু তা বলবার আগে আর একটা খুব সাধারণ জিনিষ তোমাদের বলে নিই। কাঠ জলের চেয়ে যে বেশ ভারী, তা তোমরা জান। না জানলেও এক টুকরো কাঠ জলের মধ্যে ফেলে দেখতে পার— টপ করে ডুবে যাবে। কিন্তু একটা ছিপি-আঁটা কাচের শিশি নাও।

শিশিটা যদি খালি থাকে তবে দেখবে যে জলে ফেললে তা ভাসতে থাকবে। এইবার বুঝলে যে, কোনও জিনিষের গুরুত্ব বেশী হলেও কৌশল করে তাকে জলে ভাসান যেতে পারে। লোহা ত জলের চেয়ে অনেক ভারী। তবুও, লোহার বড় বড় পিপে তৈরী করে মানুষ তাকে জলে ভাসিয়েছে আর তার উপর রাস্তা তৈরী করে বড় বড় নদী এপার ওপার করছে। অতএব জিনিষ যদি ভিতরে ফাঁপা হয়, তবে সে জলে ভাসবে তার গুরুত্ব যাই হোক না কেন।

গাছ যখন নিজের মধ্যে কাঠ তৈরী করে, তখন সে অঙ্গার-কণাকে পাশাপাশি সাজিয়ে সাজিয়ে তৈরী করে না। সে প্রথমে অঙ্গার-কণা দিয়ে ছোট ছোট কোষ তৈরী করে। এই কোষে বা Cell-গুলি পরস্পর পাশাপাশি থেকে কাঠ তৈরী হয়। এই কোষগুলির ভিতরটা ফাঁপা, সেই জন্যে ছিপে-আঁটা শিশির মত জলে পড়লে তা আর ডুবতে চায় না। উদ্ভিত্তত্ত্ব যারা আলোচনা করেন, তাঁরা কাঠের খুব পাতলা পাতলা ফালি চিরে অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করেছেন। অণুবীক্ষণের নীচে এই কোষগুলি খুব



কাঠের ভিতরের কোষ

স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। আমরা তার একটা ছবি দিলাম। এই কোষগুলো যদি কোন রকমে জলে ভর্ত্তি হয়ে যায়, তবে কাঠ আর জলে ভাসে না।

এই কোষগুলোর দেওয়াল এত শক্ত যে, সাধারণতঃ তার মধ্যে জল ঢুকতে পারে না। খুব বেশী চাপ দিয়ে জল যদি জোর করে ঢোকান যায়, তবে দেখতে পাওয়া গেছে যে, কাঠ ভারী হয়ে যায়। প্রকৃতির ক্ষেত্রে তা প্রায়ই হয়। পাথুরে কয়লা ত কাঠ থেকেই তৈরী। কিন্তু যুগযুগান্তরে অসম্ভব চাপ পেয়ে তার কোষগুলি সব চুরমার হয়ে যায়। তখন সে আর জলের উপর ভাসতে পারে না।

সাটিনের কাপড় চক্‌চক্‌ করে কেন ?

চক্‌চক্‌ করতে হ'লে সে জিনিষ থেকে খানিকটা আলো আমাদের চোখে এসে পড়া উচিত। অতএব যে জিনিষটা চক্‌চক্‌ করবে, তার আরশির মত আলোকে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকা চাই। কিন্তু আলোকে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতার ওপর যে সাটিনের কাপড়ের চক্‌চক্‌ করার মূল কারণ নির্ভর করে, তা নয়। তা যদি হ'ত তবে আরশিই সব চেয়ে বেশী চক্‌চক্‌ করত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আরশি সাটিনের মত একটুও চক্‌চক্‌ করে না।

সাটিনের কাপড়কে ম্যাগনিফাইং গ্লাস (Magnifying glass) বা আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায়। তার বুনান সাধারণ কাপড়ের বুনানের মত নয়। তার বুনন এক সমতলেই আবদ্ধ নয়, বরং লাঙল দিয়ে চষা ক্ষেতের মত ঢেউ-খেলান। এই ঢেউ খেলান তলের প্রধান গুণ হল



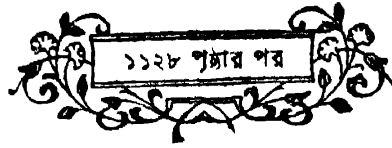
সাটিনের কাপড়

এই যে, সে যতই নড়ুক না কেন, তা থেকে খানিকটা আলো আমাদের চোখে এসে লাগবেই। আর যে সব সমতল থেকে আলো এক সঙ্গে আসে, সেগুলো পরিষ্কার সোজা সোজা ভাবে টানা থাকে বলে তা থেকে যে আলো আসে তা ঝলমল করতে থাকে।





পৃথিবী পরিক্রমণে স্পেনের প্রচেষ্টা—ম্যাগেলানের প্রথম পৃথিবী পরিক্রমণ


১১২৮ পৃষ্ঠার পর

পূর্ব্ব দুই প্রবন্ধে আমরা পৃথিবী পরিক্রমণে পর্ত্তুগালের প্রচেষ্টার কথাই বলিয়াছি। এইবার পর্ত্তুগালের প্রতিবেশী স্পেনের প্রচেষ্টার কথা বলিব। স্পেন ও পর্ত্তুগাল পাশাপাশি দেশ এবং উভয়ের ধর্ম্ম ও ভাষা প্রায় এক। তথাপি দুই দেশের মধ্যে প্রত্যেক বিষয়েই খুব রেষারেষি চলিত। সামুদ্রিক অভিযানে স্পেন বহুকাল পর্য্যন্ত বিশেষ কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার কারণ, বর্ত্তমান স্পেনের অধিকাংশ প্রদেশই তখন মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী মুরদের অধীন ছিল। কেবলমাত্র স্পেনের উত্তর-পশ্চিম কোণে পার্ব্বত্য অঞ্চলের কয়েকটি প্রদেশের খৃষ্টানগণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মুরগণ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং খৃষ্টান রাজগণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দক্ষিণে হটাইয়া দেন। অবশেষে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ক্যাষ্টিল নামক এক প্রদেশের রাজকন্যা ইসাবেলা (Isabella) এবং আরাগন নামক আর এক প্রদেশের রাজপুত্র ফার্ডিনাণ্ড পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সমগ্র স্পেনদেশকে এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে মুরদের শেষ রাজা রোয়াব্দিল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্পেনদেশ পরিত্যাগ করেন এবং সমস্ত স্পেনে ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধবিগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্পেনও পর্ত্তুগালের মত বিদেশে রাজ্য-বিস্তার করিতে আগ্রহান্বিত হইল। কিন্তু স্পেনদেশে পর্ত্তুগালের মত সুদক্ষ নাবিক ছিল না। তাহারা পর্ত্তুগালের নাবিকদিগকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া নিজেদের কার্য্যে নিযুক্ত করিত।

এই সময় ক্রিষ্টোফর্ কলম্বস্ নামক জনৈক জেনোয়াদেশী নাবিক রাণী ইসাবেলার নিকট প্রস্তাব করেন যে, উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য পাইলে তিনি ক্রমাগত পশ্চিমদিকে যাইয়াও ভারতবর্ষে যাইবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করিতে পারিবেন। কলম্বস্ কিরূপে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিতে যাইয়া আমেরিকা আবিষ্কার করেন, সে বৃত্তান্ত (শিশুভারতী ৯৩৬-৯৪৪ পৃষ্ঠা) পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, স্পেন কেন পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারে বাহির হয় নাই। স্পেন যখন ভারতবর্ষে আসিবার সমুদ্র-পথ আবিষ্কারের জন্য যত্নবান হয়, তখন তাহার সহিত পর্ত্তুগালের এক সংঘর্ষ বাধিবার উপক্রম ঘটে। কারণ, তখন পূর্ব্বদিকের কয়েকটি দেশে—বিশেষতঃ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ভাগে—পর্ত্তুগীজদের আধিপত্য বেশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই, স্পেনদেশীয় নাবিকগণ পূর্ব্বদিকে যাতায়াত করিলে তাহাদের একচেটিয়া স্বার্থে আঘাত লাগিবে, এই আশঙ্কায় তাহারা স্পেনের এই নূতন অভিযানে যথাসম্ভব বাধা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহাতে এই দুই খৃষ্টান শক্তির মধ্যে আত্মকলহ না ঘটে, তজ্জন্য খৃষ্টান জগতের ধর্ম্মগুরু পোপ ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে এক আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলস্থ ফেরোদ্বীপের পূর্ব্বাংশে শুধু পর্ত্তুগালের জাহাজ যাইতে পারিবে এবং পশ্চিমদিকে শুধু স্পেনের জাহাজ যাইতে পারিবে। পূর্ব্বদিকে যে সমস্ত দেশ আবিষ্কৃত হইবে, তাহা থাকিবে পর্ত্তুগালের দখলে এবং পশ্চিমদিকের দেশগুলি থাকিবে স্পেনের অধিকারে। এইভাবে ধর্ম্মগুরু পোপ দুই দেশের বিবাদের সুমীমাংসা করিয়া দেন।

কাজেই, স্পেনের পক্ষে পশ্চিম দিকে সমুদ্র-যাত্রা করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। কলম্বস যখন আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আমেরিকায় উপনীত হন, তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকস্থ জাপান দেশ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, উহা এক সম্পূর্ণ নূতন দেশ। কলম্বসের এই আবিষ্কারে পর্ত্তুগীজরা ভাবিল যে, বাস্তবিকই যদি স্পেনিয়ার্ডগণ পশ্চিমদিকে যাইয়া, ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইবে। সেইজন্য দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত পূর্ব্বদিক দিয়া ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার করিতে যত্নবান হয়। অবশেষে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কোডিগামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। ভাস্কোডিগামার আবিষ্কারের কথা পরে বলা যাইবে।

ভাস্কোডিগামার আবিষ্কারের সংবাদ শুনিয়া স্পেনের রাজা খুব ক্ষুব্ধ হইলেন। কারণ, তাঁহার ভাগ্যে ভারতবর্ষের বাণিজ্য মিলিল না। কিন্তু তবু তিনি দমিলেন না। তিনি পর পর কলম্বসের অধীনে আরও তিনবার পশ্চিমদিকে জাহাজের বহর পাঠান এবং এই সমস্ত জাহাজের কাপ্তেনগণ ক্রমে ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ভাগের বহু স্থান আবিষ্কার করেন। এই সময়ে আমেরিকায় দুই সুসভ্য সাম্রাজ্য ছিল। উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো দেশে আজটেক (Aztec) নামক এক পরাক্রান্ত জাতি শাসন করিত। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশে 'ইঙ্কা' উপাধিধারী রাজবংশ এক সুবৃহৎ সাম্রাজ্য শাসন করিত। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে কর্টেস (Cortes) নামক একজন স্পেনদেশীয় ভাগ্যান্বেষী মেক্সিকো দেশ অধিকার করিয়া তথায় স্পেনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপে সমস্ত আমেরিকা মহাদেশ স্পেনের হস্তগত হইল। (শুধু বর্ত্তমান ব্রেজিল দেশ ব্যতীত)। আমেরিকা নামের একটু ইতিহাস আছে। কলম্বস যখন তৃতীয়বার সমুদ্র-যাত্রা করেন, তখন তাঁহার সহিত আমেরিগো ভেসপুসি (Amerigo Vesspussi) নামক একজন ফ্লোরেন্সদেশীয় ঠিকাদার (Contractor) ছিল। এই লোকটি দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্র উপকূল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখেন, এবং সেই পুস্তকে

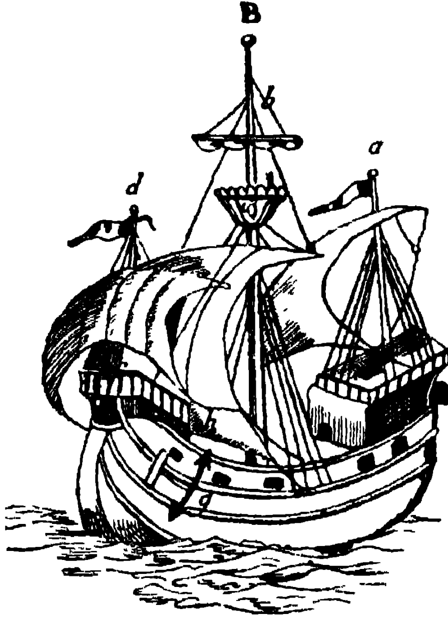
পৃথিবী পরিক্রমণে স্পেনের প্রচেষ্টা

তিনি সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন যে, কলম্বস্ ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেন নাই—সম্পূর্ণ এক নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার নামানুসারে এই মহাদেশের নাম রাখা হয়—আমেরিকা। কলম্বস্ ইহার অধিবাসিগণকে ভুলক্রমে 'ইণ্ডিয়ান' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্তও আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে রেড্ ইণ্ডিয়ান (Red Indian) বলা হয়। কারণ, তাহাদের গায়ের বর্ণ তাম্রের মত লাল আভাযুক্ত। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমেরিকা দেশ দক্ষিণে কতদূর প্রসারিত, তৎসম্বন্ধে স্পেনিয়ার্ডদের কোন ধারণা ছিল না। এই সময় বালবোয়া (Balboa) নামক একজন স্পেনদেশীয় ভাগ্যান্বেষী পানামা যোজক আবিষ্কার করেন। সে স্থানের আদিম অধিবাসিগণ বালবোয়াকে বলে যে, যোজকের পশ্চিমদিকে অন্য এক মহাসাগর বর্ত্তমান আছে। বালবোয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া সেই মহাসাগর দেখিতে পান। তারপর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সেই মহাসাগরের তীরে পৌঁছেন। বালবোয়ার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি এক বৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া এই নূতন মহাসাগর পরিক্রমণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। কারণ, তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা তাঁহার বিবিধ সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। তাঁহার মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লস্, ফার্নাণ্ডেজ ম্যাগেলান্ (Fernandez Magellan) নামক এক পর্ত্তুগীজ্ নাবিককে পুনরায় পশ্চিমদিক্ দিয়া ভারতবর্ষে যাইবার পথ আবিষ্কারের জন্য প্রেরণ করেন। ম্যাগেলানের দলই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবী পরিক্রমণে সমর্থ হন।

ফার্নাণ্ডেজ ম্যাগেলান্ পর্ত্তুগাল দেশীয় লোক। পর্ত্তুগালের এক খুব সম্ভ্রান্ত বংশে আনুমানিক ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালে লিস্‌বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যা ও নৌবিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং যৌবনে পর্ত্তুগীজ নাবিকদের সহিত বহুবার সমুদ্রে যাতায়াত করেন। এই উপলক্ষে তিনি ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পর্ত্তুগালের রাজা ম্যানুয়েল তাঁহার সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করায় তিনি ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়া স্পেনের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত রাজার এই মর্ম্মে চুক্তি হয় যে, রাজা তাঁহাকে খাদ্য ও বিবিধ সরঞ্জাম সহ পাঁচখানা জাহাজ দিবেন এবং ম্যাগেলান্ যে সমস্ত দেশ আবিষ্কার করিবেন, তাহা স্পেনের রাজার সম্পত্তি হইবে। তবে তিনি ইচ্ছা করিলে দুইখানা দ্বীপ নিজের জন্য রাখিতে পারিবেন। এই সমুদ্রযাত্রার যাহা লাভ হইবে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ ম্যাগেলান্ পাইবেন।

১৫১৯ খৃঃ অব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর সেভিল (Seville) বন্দর হইতে পাঁচখানি জাহাজ ম্যাগেলানের অধ্যক্ষতায় পৃথিবী পরিক্রমনে বাহির হইল। ইহাদের মালবহনের ক্ষমতা ৭৫ হইতে ১২০ টনের মধ্যে। তাহার সঙ্গে ৮২টা বন্দুক, ১৮টি Hour-glass (সময় নিরূপণের জন্য) ২৫টি য়্যাষ্ট্রোলেব (Astrolabe—সূর্য্য অথবা নক্ষত্রের উচ্চতামাপক পূর্ব্বকালীন যন্ত্র-বিশেষ) এবং সূর্য্য ও তারকা নিরূপণ করায় জন্য একপ্রকার যন্ত্র ছিল। ইহা ব্যতীত তাঁহারা লইলেন, ৬০টি ধনুক, ৩৬০টি তীর, ১ টন বারুদ এবং নানা রকম লোহা ও কাচের জিনিষ। আণ্টনিও পিগাফেটা Antonio Pgafetta) নামক একজন ইটালীদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক এই সমুদ্র-অভিযানে যোগদান করেন এবং তিনি তাঁহাদের সমুদ্র-যাত্রার সম্পূর্ণ দৈনন্দিন বিবরণ (Diary) রাখিয়া গিয়াছেন। এই ডায়েরী হইতে প্রথম পৃথিবী পরিক্রমণের সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায়। পিগাফেটা

লিখিয়াছেন, 'কাপ্তেন জেনারেল নিজে পর্ত্তুগীজ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ অন্য চারি জাহাজের কাপ্তেনরা ছিল স্পেনদেশীয় কাজেই, তাঁহারা ম্যাগেলান্‌কে মোটেই মানিতে চাহিতেন না। ম্যাগেলান প্রথমে



ম্যাগেলানের ভিক্টোরিয়া জাহাজ

অন্য কাপ্তেনদিগকে তাঁহার প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছুই খুলিয়া বলেন নাই।

আমরা সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৪ জন লোক পাঁচখানা জাহাজে রওনা হইলাম। ২৬শে ডিসেম্বর আমরা ক্যানারী দ্বীপে পৌঁছিয়া কয়েকদিন শুধু জল ও কাষ্ঠ আহরণ করিলাম।

৩রা অক্টোবর আমরা ক্রমাগত দক্ষিণে চলিতে লাগিলাম। আমরা ভার্ড (Verd) অন্তরীপ বামে রাখিয়া সমুদ্রের উপকূল দিয়া ক্রমে ৮° ডিগ্রি অক্ষাংশ অতিক্রম করিলাম। এই স্থান হইতে সিয়ারা লিয়োন (Sierra leon)-এর পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হইল। এই স্থান হইতে বাতাস প্রতিকূল বহিতে লাগিল এবং সময় সময় বৃষ্টি ও ভীষণ গুমটের ভিতর দিয়া আমরা দক্ষিণে বিষুবন রেখা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলাম।

বিষুবন্ রেখা অতিক্রম করার পর ধ্রুবতারা আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইল। আমরা তখন ব্রেজিলের দিকে লক্ষ্য করিয়া আটল্যান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া অগ্রসর হইলাম। ১৩ই ডিসেম্বর আমরা ব্রেজিলের রাজধানী রাইও-জেনিরো (Rio-de-Janerio) বন্দরে পৌঁছিলাম। এই বন্দরে ১৩ দিন কাটাইয়া আমরা উপকূল ভাগ দিয়া অগ্রসর হইলাম। ৩৪° দক্ষিণ অক্ষাংশে পৌঁছিলে আমরা একটি বড় নদীর (La Plata) মোহানায় পৌঁছিলাম। আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, ইহা পশ্চিম সমুদ্রে যাওয়ার প্রণালী কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা আমাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া দক্ষিণে চলিতে লাগিলাম। ক্রমে মে মাসে ৪৯° ডিগ্রী অক্ষাংশে উপস্থিত হইলে আমরা একটি ভাল পোতাশ্রয় দেখিতে পাইলাম। এই সময়ে শীতকাল উপস্থিত হওয়াতে আমরা এইখানেই সমস্ত শীত ঋতু প্রবাস করিতে মনঃস্থ করিলাম। এই বন্দরে আমরা পাঁচমাস কাটাইলাম, কিন্তু জাহাজের নাবিকদের মধ্যে মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। অন্য চারিজন কাপ্তেন স্পেনদেশীয়। ম্যাগেলানের কর্ত্তৃত্ব তাহাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বিদ্রোহ করিয়া ম্যাগেলানকে নিহত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কাপ্তেন জেনারেল পূর্ব্বেই খবর পাইয়া খুব ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। বন্দীদের দুইজনকে বন্দুকের গুলিতে মারিয়া ফেলা হইল এবং আর দুইজনকে সমুদ্রোপকূলে রাখিয়া যাওয়া হইল। এই দেশের Patagonia লোকেরা মহাকায় (৬। ফিট উঁচু) এবং নরমাংসভোজী এই সময়ে সান্তিয়াগো (Santiago) জাহাজ চড়ায় আটকাইয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

সেন্ট জুলিয়ান হইতে বহির্গত হইয়া ১১ই অক্টোবর আমরা নূতন এক জলপ্রণালীতে

পৌঁছিলাম। পরে জানিতে পারিলাম যে, এই স্থানেই নূতন মহাদেশের শেষ, এই প্রণালী দিয়া পশ্চিম মহাসাগরে যাওয়া যায়।

এই জলপ্রণালীর বর্ত্তমান নাম ম্যাগেলান্ প্রণালী (Straits of Magellan)। কিন্তু ম্যাগেলান ইহার নাম দেন Strait of Eleven Thousand Virgins") এইপ্রণালী আবিষ্কারের পর ম্যাগেলানের মনে আশার সঞ্চার হইল যে, হয়ত পশ্চিম সমুদ্রে যাওয়ার পথ মিলিল। কিন্তু এই প্রাণালীর উভয় পার্শ্বে বরফে-ঢাকা উঁচু উঁচু পর্ব্বত ছিল এবং কোথায়ও নঙ্গর করিবার স্থান ছিল না। এই স্থানে রাত্রে প্রবল ঝড়ে নাবিকদের ভীষণ কষ্ট হয়। দুইখানা জাহাজ ঝড়ের বেগে এই প্রণালীর ভিতর বহুদূর পর্য্যন্ত চালিত হয় এবং কিছুদূরে তাঁহারা আর একটি সঙ্কীর্ণ প্রণালী দেখিতে পান। এই সঙ্কীর্ণ প্রণালীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের মনে হইল যে, আর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই পশ্চিম মহাসাগরে প্রবেশ করা যাইবে। কিন্তু তাঁহারা অধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত আর অগ্রসর হওয়া ঠিক নয় মনে করিয়া ফিরিয়া আসেন। অধ্যক্ষ তাঁহাদের প্রদত্ত সংবাদে উৎসাহিত হইয়া Santo Antonio এবং Concepcion এই দুই খানা জাহাজকে অগ্রসর হইয়া পর্য্য-বেক্ষণ করিতে আদেশ করেন। Santo Antonio জাহাজের অধ্যক্ষ অন্ধকারে পলায়ন করিয়া স্পেনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন ম্যাগেলান্ নিজেই অবশিষ্ট তিনখানা জাহাজসহ অগ্রসর হইতে থাকেন। অর্দ্ধপথে অগ্রসর হইয়া তিনি সম্মুখে পর্য্যবেক্ষণের জন্য একখানা বোট্ (Boat) পাঠাইলেন, এবং অতঃপর কি করা উচিত, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য তিনি জাহাজের লোকদের এক বৈঠক ডাকাইলেন। অধিকাংশ লোকেই মত দিল যে, দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করাই উচিত। কিন্তু ম্যাগেলান বলিলেন যে, "যদি আমাদিগকে চামড়া খাইয়াও থাকিতে হয়, তথাপি আমরা সম্মুখবর্ত্তী সমুদ্র অতিক্রম করিতে পশ্চাৎপদ্ হইব না। কারণ আমি সম্রাট্‌কে কথা দিয়াছি যে, ভারতবর্ষে যাইবার নূতন পথ আবিষ্কার করিব।"

এই সময় বোটের লোকেরা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সংবাদ দিল যে, সম্মুখস্থ অন্তরীপ ঘুরিয়া অপর পার্শ্বে গেলেই পশ্চিম দিকে মহাসমুদ্র দৃষ্টিগোচর হইবে। তখন ম্যাগেলান উৎসাহিত হইয়া তিনখানা জাহাজেই অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা এই অন্তরীপের নাম দিলেন বাঞ্ছিত অন্তরীপ (Cape Descado ThewishedforCape) ২৮শে নবেম্বর তাঁহারা ম্যাগেলান্ প্রণালী ছাড়িয়া প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করিলেন। এই প্রণালী ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহার উড্ডীয়মান মৎস্য প্রথম দেখিতে পান।



ম্যাগেলান প্রণালী

প্রশান্ত মহাসাগর

(পিগাফেটার বর্ণনানুযায়ী)

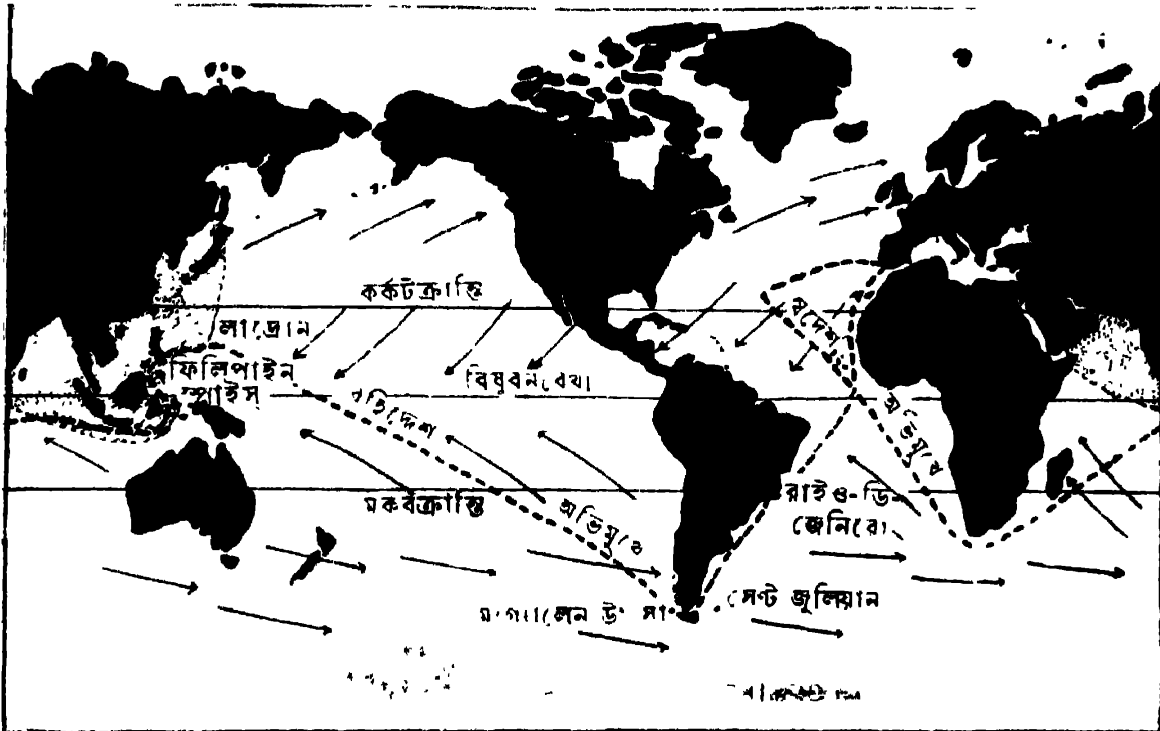
২৮শে নবেম্বর বুধবার আমরা মহাসাগরে প্রবেশ করিয়া উত্তর-পশ্চিম কোণ লক্ষ্য করিয়া জাহাজ চালাইতে লাগিলাম। এই মহাসাগরে আমরা কোনরূপ ঝড়-বাদ্‌লায় পড়ি নাই বলিয়া আমরা ইহার নাম দিই—প্রশান্ত মহাসাগর। এই মহাসাগর অতিক্রম করিতে আমাদের তিন মাস বিশ দিন সময় অতিবাহিত হয়। এই সুদীর্ঘ পথে আমরা টাটকা খাবার কিছুই আস্বাদ করিতে পারি নাই। সমস্ত বিস্কুট ও রুটি চূর্ণ হইয়া ধূলায় ও পোকাতে পরিণত হয়,—জল পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। ম্যাগেলানের বাণী সত্য হইল, কারণ আমাদিগকে ক্ষুধা নিবারণের জন্য মাস্তুলের আবরণ যে চামড়া ছিল তাহা কাটিয়া জলে ভিজাইয়া খাইতে হয়। ১৯ জন লোক দাঁতের গোঁড়া ফুলিয়া মারা যায়। এই তিন মাস শুধু আমরা চারিদিকে নীল জলরাশি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। অবশেষে ৬ই মার্চ্চ আমরা শ্যামল তৃণাবৃত দুইটি দ্বীপ (অক্ষাংশ ১২° ডিগ্রি উত্তর, গ্রীন-উইচ্ হইতে ১৪৬° পূর্ব্ব) দেখিতে পাইলাম। অধ্যক্ষ মনে করিলেন যে, এই দ্বীপে টাটকা খাবার ও জল পাওয়া যাইবে। কিন্তু, এই দ্বীপে অবতরণ করিতেই অসভ্য দ্বীপবাসীরা তাহাদের Canoeতে চড়িয়া জাহাজে আসিয়া আমাদের জিনিষ-পত্র চুরি করিতে আরম্ভ করিল। আমাদের এমন অবস্থা নয় যে, আমরা তাহাদিগকে মারিয়া তাড়াইতে পারি। সুতরাং আমরা তাড়াতাড়ি কিছু খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিয়া এই চোরের দ্বীপ (Ladrone Island) হইতে সরিয়া পড়ি।

লাদ্রোণ দ্বীপের পর ম্যাগেলান্ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়া বর্ত্তমান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হন। এখানকার অধিবাসীরা অনেকেই কতকটা সভ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ম্যাগেলান্‌কে খাদ্যদ্রব্যাদি দিয়া আতিথেয়তা দেখায়। কিন্তু এই আতিথেয়তাই ম্যাগেলানের মৃত্যুর কারণ হইল। কুবু নামক দ্বীপের রাজা শপথ করিয়া বলেন যে, ম্যাগে-লান যদি তাহাকে অন্য এক দ্বীপের রাজার সহিত যুদ্ধে সাহায্য করেন, তাহা হইলে সে নিজে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে এবং স্পেনের রাজার অধীনতা স্বীকার করিবে। রাজার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ম্যাগেলান্ উক্ত দ্বীপ আক্রমণ করিতে যাইয়া ১৫২১ খৃঃ অব্দের ২৬শে এপ্রিল দ্বীপবাসীদের হস্তে নিহত হন।

হতাবশিষ্ট স্পেনিয়ার্ডগণ কোনমতে জাহাজে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করে। জুবু দ্বীপের খৃষ্টান রাজাও তাহার কাছে ম্যাগেলান্ যে কয়জন স্পেনিয়ার্ডকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা-দিগকে বধ করেন। অন্য সকলে Johan Carvajo নামক নাবিকের নেতৃত্বে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া Molucca বা মসলা দ্বীপের সন্ধানে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত ঘুরিতে থাকে। ক্রমে তাহারা বোর্ণিও দ্বীপে উপস্থিত হইয়া সাগু, লবঙ্গ, তরমুজ প্রভৃতি অনেক ফল—যাহা পূর্ব্বে তাহারা কখনও দেখে নাই—তাহার সন্ধান পায়। এইস্থানে তাহারা ম্যাগেলানের স্থলে Sebastian* del Cano নামক এক ব্যক্তিকে কাপ্তেন-জেনারেল নির্ব্বাচিত করে। বোর্ণিও হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ৬ই নবেম্বর মসলা দ্বীপে উপস্থিত হয় এবং সেইখানে তাহারা প্রথমে জানিতে পারে যে, তাহারা পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছে। তখন তাহারা সকলে সমবেত হইয়া ঈশ্বরের নিকট ধন্যবাদ জানাইল এবং জয়োল্লাসে

* এই ব্যক্তি প্রথমতঃ সামান্য Pilot-এর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু নিজের চরিত্র ও অধ্যাবসায় গুণে দলের নেতৃত্ব স্থান লাভ করেন।

সমস্ত কামান হইতে একসঙ্গে তোপ দাগিল। পরদিবস Alphonso de Lorosa নামক একজন পর্ত্তুগীজ ব্যবসায়ী স্পেনিয়ার্ডদের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলেন। লোরোসার নিকট হইতে তাহারা অনেক খবর জানিতে পারিল। লোরোসা প্রায় প্রথম পর্ত্তুগীজদলের সহিত পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া প্রায় ষোল বৎসর যাবৎ সেখানে মসলার ব্যবসায় করিতেছেন। কিন্তু পর্ত্তুগীজেরা ইউরোপের অন্যদেশের লোকদিগকে তাহাদের পূর্ব্ব ভারতীয় উপনিবেশ স্পেনের রাজার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পাঁচখানা জাহাজ লইয়া ভারতে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছেন। ইহাতে পর্ত্তুগালরাজ ভীষণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কারণ, স্পেনের রাজা যদি নূতন পথ আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে পূর্ব্বদেশের বাণিজ্যে পর্ত্তুগালের যে একাধিপত্য আছে, তাহা আর থাকিবে না। সুতরাং তিনি পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধিকে আদেশ দিয়াছেন যে, তিনি যেন সর্ব্বদা ছয়খানা যুদ্ধ-জাহাজ প্রস্তুত



ম্যাগেলানের যাত্রাপথ ও প্রত্যাগমন-পথ

সম্বন্ধে কিছুই জানিতে দেয় নাই। লোরোসা আরও খবর দিলেন যে, প্রায় এগার মাস পূর্ব্বে পর্ত্তুগাল হইতে একখানা বড় জাহাজ মসলা ভরিতে মলাক্কা দ্বীপে আসে। সেই জাহাজের কাপ্তেন তাঁহাকে বলেন যে, পর্ত্তুগালের রাজা ম্যানুয়েল জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহারই একজন প্রজা ম্যাগেলান্ রাখেন; ম্যাগেলানের সন্ধান পাইলেই তিনি যেন ম্যাগেলান্‌কে ধৃত করিয়া পর্ত্তুগালে প্রেরণ করেন। কিন্তু ঠিক এই সময়ে এডেনের মুসলমানদের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় রাজপ্রতিনিধি ম্যাগেলানের সন্ধানে কোন জাহাজ নিযুক্ত রাখিতে পারেন নাই।

পিগাফেটা লিখিতেছেন :—লোরোসার কাছে এই সংবাদ শুনিয়া আমাদের মহা ভয় উপস্থিত হইল। আমরা লোরোসাকে বুঝাইলাম যে, স্পেনের রাজা মহাপ্রতাপশালী যদি লোরোসা আমাদিগকে স্পেনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে স্পেনের সম্রাটের নিকট তাঁহার খুব পুরস্কার ও সম্মান মিলিবে। লোরোসা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

ইহার পরে আমরা এক মাস কাল মসলা দ্বীপে থাকিয়া নানা নূতন নূতন জিনিষ দেখিয়া কাটাইলাম। অবশেষে ২১শে ডিসেম্বর আমরা মসলাদ্বীপ পরিত্যাগ করিলাম। এই সময়ে আমাদের প্রায় সমস্ত জাহাজই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, শুধু 'ভিক্টোরিয়া' কার্য্যক্ষম ছিল। আমরা পর্ত্তুগীজদের ভয়ে, পথিমধ্যে আর কোনও দ্বীপে থামিলাম না; জাভা ও বোর্ণিওর মধ্যবর্ত্তী সুণ্ডাপ্রণালী হইতে সোজা আফ্রিকার দক্ষিণস্থ উত্তমাশা অন্তরীপের দিকে নৌচালনা করিলাম। ৬ই মে তারিখে আমরা উত্তমাশা অন্তরীপ দেখিতে পাইলাম, কিন্তু পর্ত্তুগীজদের ভয়ে সেইখানে আর থামিলাম না—সোজা উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ৯ই জুলাই আমরা Cape Verd-এ উপস্থিত হইয়া নঙ্গর করিলাম। এই সময়ে খাওয়ার কষ্টে ও স্কার্ভি রোগে ২১ জন লোক মারা যায়।

কেপ ভার্ডে আসিয়া দেখা গেল যে, টাটকা খাবার না পাইলে আমরা সকলেই দেশে ফিরিবার পূর্ব্বেই মারা যাইব। কিন্তু এই সমস্ত স্থান পর্ত্তুগালের দখলে ছিল এবং পর্ত্তুগালের রাজার কড়া হুকুম ছিল যে, যে কেহ আমাদিগকে ধরিতে পারিবে সে বহু পুরস্কার পাইবে। সুতরাং আমরা মন্ত্রণা করিয়া পর্ত্তুগীজ ব্যবসায়ীদের নিকট খবর পাঠাইলাম যে, আমরা আমেরিকা হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর উত্তরণ করিয়া আসিতে বহু বিপদে পড়িয়াছি, তাঁহারা যেন অর্থের বদলে খাদ্যদ্রব্যাদি দিয়া আমাদিগকে প্রাণে বাঁচান। পর্ত্তুগীজেরা আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাদিগকে অনেক টাটকা খাদ্যদ্রব্য দিল। এইরূপ দুইবার আমাদের নৌকা ঠিক ঠিক ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তৃতীয়বারে নৌকা ঠিক সময়ে না ফেরায় আমাদের সন্দেহ হইল যে, হয়ত আমাদের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক তাহাই



ম্যাগেলানের স্মৃতিস্তম্ভ

হইয়াছিল। কারণ, একজন নাবিক কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া ফেলে যে, আমরা ম্যাগেলানের বহরের শেষ জাহাজ। সন্দেহ হওয়া মাত্রই আমরা তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়া স্পেনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পরে শুনিলাম যে, পর্ত্তুগীজরা আমাদিগকে বন্দী করিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

৬ই সেপ্টেম্বর আমরা আবার San-Lucar এর উপসাগরে প্রবেশ করিলাম এবং ৮ই সেপ্টেম্বর আমরা সেভিল বন্দরে পৌঁছিয়া সমস্ত তোপ দাগিলাম। সমস্ত পৃথিবী জানিল যে, আমরাই সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি।

আমরা স্পেন হইতে রওনা হইয়াছিলাম পাঁচখানা জাহাজে—২৩৪ জন লোক, ফিরিয়া আসিলাম একখানা জাহাজে—১৮ জন লোক।

পৃথিবী পরিক্রমণের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলা হইল। তোমরা জানিতে পারিলে যে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া জানেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং স্পেন ও পর্ত্তুগালের লোকেরা প্রায় একশতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া এই অনুমান প্রমাণ করিতে সমর্থ হয়। এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর ইতিহাসের ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। ম্যাগেলানের দৃঢ় সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়ের ফলে পৃথিবীর সম্পূর্ণ পরিক্রমণ সিদ্ধ হয়। যদিও তিনি এই আবিষ্কারের ফল ভোগ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার দৃঢ় অধ্যবসায় ও নৈপুণ্যের কাহিনী ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ম্যাগেলানের এই আবিষ্কারে স্পেনের বাণিজ্যের কোন সুবিধা হয় নাই এবং তাহার প্রায় ৬০ বৎসর পরে ইংরেজ নাবিক ফ্রান্সিস্ ড্রেক্ দ্বিতীয়বার পৃথিবী পরিক্রমণ করেন।

ম্যাগেলানের পৃথিবী পরিক্রমণের কাহিনী ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মানুষ চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা কতদূর কাজ করিতে পারে, ম্যাগেলানের দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বুঝিতে পারি। যে সকল নির্ভীক পুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন নূতন দেশের সংবাদ বলিয়াছেন, নূতন নূতন জাতির কথা বলিয়াছেন, নূতন নূতন জীবজন্তু, পশু-পক্ষী, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, মানুষের রীতি-নীতি সম্বন্ধে আমাদিগকে নূতন জ্ঞানের পথে লইয়া গিয়াছেন, ম্যাগেলান ছিলেন তাঁহাদেরই একজন।

যাঁহারা কৃতী পুরুষ, তাঁহারা অনেক সময়ে আপনাদের জীবিতকালে জনসাধারণের নিকট হইতে তাঁহাদের কৃতিত্বের উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিতে পারেন না। তোমরা অনেক বড় লোকের জীবনী পাঠ করিলেই, জানিতে পারিবে যে, তাঁহারা কত নির্য্যাতন সহিয়াছেন, কত লোকনিন্দা ও অপমান সহ্য করিয়াছেন ; এমন কি, কারাগারে পর্য্যন্ত নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তবু তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য-পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পরে দেশের লোকেরা বুঝিতে পারিয়াছে, তাঁহাদের দান কত বড় এবং তাঁহাদের শোণিত-ধারার মধ্য দিয়া অনাগত দেশবাসিগণের জন্য কি অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন।

ম্যাগেলানের জীবনেও তাহার কোনও ব্যত্যয় হয় নাই। অজানা পথে, অজানা দেশের সন্ধানে, ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া সমুদ্রের বুকে, কি অসীম সাহসিকতার সহিত তিনি তরী ভাসাইয়াছিলেন—তাহা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, কত বড় সাহসী বীর তিনি ছিলেন আজ 'ম্যাগেলান প্রণালী' তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে এবং আজ তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়া এই সাহসী বীরের কাহিনী আমাদিগকে ভুলিতে দিতেছে না



তুষারকণা ও সাত বামন

[তুষারকণা ও সাত বামন—গ্রীমের "Snow-Drop and Seven Dwarfs" গল্পের অনুবাদ, ঘুটেকুড়ুনী Cinderella গল্পের এবং ভাই-ভগিনীটি হইতেছে Hansel and Grethel-এর অনুবাদ।]



এক দেশের এক রাণী দুপুরবেলা জানালার ধারে বসে' বসে' সেলাই করছিলেন। রাণীর কোনও সন্তান ছিলো না। সেলাই করতে করতে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন যে, অনেক সব শাদা শাদা তুলোর মত ফুলো ফুলো মেঘ উড়ে যাচ্ছে। মেঘের দিকে দেখতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর হাতে ছুচটা বিঁধে গেলো গেলো আর ডু'ফোটা রক্ত আঙ্গুলের ডগা থেকে গড়িয়ে পড়লো। তিনি চমকে উঠে সেই রক্তের রঙের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন,—আমার যদি ঐ মেঘের মত ফর্সা, ও ঐ রকম রক্তের আভার মত একটি মেয়ে হয় তো বেশ হয়।

অল্পদিন পরেই রাণীর একটি মেয়ে হলো। তার রং শরৎকালের শাদা মেঘের মত ফর্সা, তার গালদুটি হলো লাল টুকটুকে আর চুলগুলি ছিলো কালো কুচকুচে। রাণী তাঁর মেয়ের নাম রাখলেন তুষারকণা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মেয়ে জন্মগ্রহণ করার বছরখানেক পরেই রাণী মারা গেলেন। রাজামশাই এক বছর পরে আবার বিয়ে করে' আর একটি রাণী নিয়ে এলেন।

এই যে নূতন রাণী, ইনি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু আর কেউ যে তাঁর চেয়ে সুন্দরী হবে, এ তিনি সহ্য করিতে পারতেন না। তাঁর ভারী মজার একট যাদু-করা আয়না ছিলো। সেই আয়নাটাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সেটা উত্তর দিতো। রাণী সেই আয়নাটাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন—হ্যাঁ আয়না, আমি কি সব চেয়ে সুন্দরী? এই কথার উত্তরে সেই আয়নাটি বলতো,—হ্যাঁ রাণীমা, আপনি এই পৃথিবীতে সকলের চেয়ে সুন্দরী।

বহুদিন কেটে গেছে। এখন তুষারকণা সাত বছরে পা দিয়েছে। সে ক্রমেই অপরূপ সুন্দরী হ'য়ে উঠছে। সেই সময় রাণী একদিন তাঁর আয়নাকে জিজ্ঞাসা করে' জানলেন যে, তাঁর চেয়েও সুন্দরী হচ্ছে তুষারকণা। এই কথা শুনে রাণীর ভয়ানক রাগ হলো। যতই দিন যেতে লাগলো ততই তার রাগ বাড়তে লাগলো। শেষে তিনি ঠিক করলেন যে, তুষারকণাকে মেরে ফেলতে হবে। রাজবাড়ীর এক চাকরকে ডেকে তাকে বহু টাকার লোভ দেখিয়ে তিনি বললেন যে, সে যেন গভীর বনের মধ্যে তুষারকণাকে নিয়ে যায়, আর সেখানে নিয়ে গিয়ে তার প্রাণবধ করে। সেই চাকরটা কাপড়ের মধ্যে একখানা ছোরা লুকিয়ে নিয়ে তুষারকণাকে সঙ্গে করে' বনের দিকে রওনা হলো। সেই লোকটা তুষারকণাকে এমনি গভীর বনের মধ্যে নিয়ে গেলো যে, সেখানে মানুষের কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। যখন সেই লোকটা তার কাপড়ের মধ্য থেকে লুকানো ছোরা বার করে' তুষারকণাকে মারতে উদ্যত হলো, তখন

তুষারকণা ভয় পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাকে অনুরোধ করলে, "তুমি আমাকে মেরো না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আর কখনো বাড়ী ফিরে যাবো না। আমাকে না মেরে, এখানে একা ছেড়ে দিয়ে যাও।" এই কথা শুনে সেই লোকটার একটু দয়া হলো, তাই সে তুষারকণাকে বনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেলো।

সারাদিন ধরে' তুষারকণা বনের ভিতর বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। কখনো বা কাঁটা বনের ধার দিয়ে, কখনো বা ঝর্ণার পাশ দিয়ে দিয়ে সে চল্‌তে



তুমি আমাকে মেরো না

লাগলো। চল্‌তে চল্‌তে সে সন্ধ্যাবেলা অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো, আর মাঝে মাঝে বুনো জন্তুর ভীষণ গর্জ্জন শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এদিকে ওদিকে ছুটছিলো। এমন সময়ে সে খানিকদূরে একটি কুটীর দেখতে পেলে। সে তখন দৌড়ে গিয়ে সেই কুটীরে প্রবেশ করলে।

কুটীরের মধ্যে সব জিনিস বেশ সাজানো গোছানো আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটি টেবিলের উপর একটি শাদা পরিষ্কার কাপড় পাতা আর সেই টেবিলের উপর সাত থালা খাবার সাজানো। ঘরের একপাশে পাশাপাশি সাতটা বিছানাও পাতা ছিলো।

তুষারকণা বনে বনে ঘুরে' ঘুরে' বেজায় ক্লান্ত হ'য়ে এসেছিলো, আর তার ক্ষিদেও পেয়েছিলো খুব। তাই সে প্রত্যেক থালা থেকে একটু একটু করে' খাবার খেলো, প্রত্যেক গেলাস জল থেকে এক চুমুক এক চুমুক করে' জল খেয়ে তার তেষ্টা দূর করলে। তারপর সে ঘুমোবার জন্য প্রত্যেক বিছানায় উঠে উঠে দেখ্‌তে লাগলো যে, কোন্ বিছানাটা সকলের চেয়ে নরম। সব বিছানা পরখ্ করে, সে সপ্তম বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। ঘুমোবার আগে সে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ জানালে, কারণ, তিনি সেদিন তাকে কি রকম বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

যখন বেশ অন্ধকার রাত্রি, তখন সেই বাড়ীর মালিকেরা ফিরে এলো। তারা হচ্ছে বামন, আর গুণ্‌তিতে তারা ছিলো সাতজন। পাহাড়ের গায়ে গায়ে খুঁড়ে খুড়ে সোনার খনির খোঁজ করাই ছিলো তাদের প্রধান কাজ।

ঘরে ঢুকে তারা তাদের হাতের সাতটি বাতি দেশলাই দিয়ে জ্বালালে এবং তাদের ঘরে লোক আসার লক্ষণ তারা তক্ষুনি বুঝ্‌তে পারলে। তারা প্রত্যেকেই খাবার টেবিলের কাছে গিয়ে বলাবলি কর্‌তে লাগলো—কে আমার চেয়ারে ব'সে এটাকে এমন ক'রে ঘুরিয়ে দিয়েছে, কে আমার খাবার খেয়েছে, ইত্যাদি। তারপর তাদের মধ্যেকার এক বামন লক্ষ্য করলে যে, তার বিছানায় কে যেনো শুয়েছিলো। এই দেখে সে বলে, উঠলো,—এঁ্যা, আমার বিছানায় কে যেনো শুয়েছিলো! এই শুনে দ্বিতীয় বামনও তার নিজের বিছানার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে,— আর আমার বিছানাতেও কে যেনো শুয়েছিলো! এই ভাবে প্রত্যেকে বল্‌তে লাগলো,— আর আমার বিছানাতেও…। শেষকালে সপ্তম বামনটি বলে, উঠলো— দেখো, দেখো, এদিকে এসো! তখন সেই সাতজন বামনই বাতি হাতে করে' ঘুমন্ত তুষারকণার বিছানার চারিদিকে ভীর করে' দাঁড়ালো এবং সেই রকম সুন্দরী ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে' তারা অবাক্ হ'য়ে গেলো। তারা সবাই ব'লে উঠলো,— বাঃ, কি সুন্দরী! পাছে সেই মেয়েটির ঘুম ভেঙে যায়, তাই

তারা আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে' গেলো। সে রাত্রে তারা সাতজন ছয় বিছানায় ঘেঁসাঘেঁসি করে, শুয়ে কোনরকমে রাত কাটিয়ে দিলে।

সকালবেলা তুষারকণার যখন ঘুম ভাঙলো, তখন সেই ছোট ছোট বেঁটে মানুষগুলোকে দেখে তার ভয়ানক ভয় হ'ল কিন্তু তারা যখন খুব আদরের সঙ্গে কথা আরম্ভ করে' তার নাম জিজ্ঞাসা করলে তখন তার ভয় কেটে গেলো। সে বললে,— আমার নাম তুষারকণা। বামনরা জিজ্ঞাসা করলে, – কি করে' তুমি এখানে এলে? তখন তুষারকণা তার হিংসুটে বিমাতার কথা সব বললে এবং কি করে' সে সেই চাকরের কাছ থেকে তার প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সেই কুটীরে এসেছিলো, তাও সব বলে গেলো।



সবাই বলে উঠলো, কি সুন্দরী!

সেই বামনগুলি তখন তাকে অভয় দিয়ে বললে —তুমি আমাদের এখানে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকো; আমাদের জন্য তুমি রান্না করবে, কাপড় কাচবে, ছেঁড়া খোঁড়া কাপড় সেলাই করবে আর আমাদের এই ছোট্ট ঘরটিকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে' গুছিয়ে রাখবে, কেমন? তুষারকণা খুব আনন্দের সঙ্গে বামনদের প্রস্তাবে রাজী হলো।

বেলা হ'লে বামনরা বেরুলো সোনার খনির খোঁজে। যাবার আগে তারা তুষারকণাকে সাবধান করে' দিয়ে গেলো যে, সে যেনো বাড়ীর ভিতর কাউকে ঢুকতে না দেয় কারণ তাহার বিমাতা নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে বার করে' তার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবেন।

* * * *

ওদিকে চাকরটা যখন রাণীকে গিয়ে খবর দিলে যে, সে তুষারকণাকে মেরে ফেলেছে, তখন রাণী খুব খুসী হ'য়ে ভাবলেন যে, তিনি সকলের চেয়ে সুন্দরী। কিছুদিন পরে একদিন তাঁর হঠাৎ খেয়াল হলো, তিনি তাঁর আয়নাটিকে বের করে' জিজ্ঞাসা করলেন,—বলতো আয়না, আমি কি সব চেয়ে সুন্দরী? আয়না উত্তর দিলে,—আপনি এখানে সকলের চেয়ে সুন্দরী, কিন্তু তুষারকণা এখনও বেঁচে আছে, আর সে থাকে পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট কুটীরে। সে আপনার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী।

আয়নার এই উত্তর শুনে রাণী রাগে পাগলের মতো হ'য়ে উঠলেন আর প্রতিজ্ঞা করলেন যে' যেমন করে'ইহোক তিনি তুষারকণাকে বধ করবেন। কিন্তু কি করে' মেরে ফেলবেন, তার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। অনেক ভাববার পর রাণী ঠিক করলেন যে, ফেরিওয়ালা সেজে তিনি তুষারকণার কাছে যাবেন।

একদিন রাণী পুরুষের বেশ পরে' মাথায় পাগড়ী বেঁধে, অনেক চেষ্টা করে' রং টং মেখে তাঁর চেহারা একেবারে বদলে ফেললেন। তিনি একটি ঝুড়ির ভিতর নানারকমের খেলনা ও ফিতে নিয়ে তুষার-কণার কুটীরের দরজায় গিয়ে হাঁক দিলেন—খেলনা চা—ই—ই। ফিতা চা—ই—ই। ফেরিওয়ালার ডাকে তুষারকণা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে যে, ফেরিওয়ালার ঝুড়িতে রং-বেরঙের নানান রকমের সুন্দর ফিতা রয়েছে। তাই দেখে তার ভারী লোভ হলো। সে ভাবলে—ও আর আমার কি ক্ষতি করবে, ডাকিই না ওকে। এই ভেবে সে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বললে,—আমাকে কিছু নীল রঙের ফিতে দাও না!

সেই পুরুষবেশী ফেরিওয়ালা বললে—দেখি মা এই ফিতে দিয়ে তোমার জামা তৈরী করলে তোমাকে কেমন মানাবে? এই কথা শুনে তুষারকণা যেই তার সৎমার কাছে এগিয়ে এলো, অমনি তিনি তাঁর হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে' তাঁর হাতের ফিতে দিয়ে তার গলা এমনি কষে বেঁধে ফেললেন যে, দম বন্ধ হ'য়ে তুষারকণা মাটিতে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে' গেলো। তুষারকণাকে মড়ার মতো পড়ে' থাকতে দেখে' তার সৎমা মনে করলেন যে, সে নিশ্চয়ই মারা গিয়েছে।

আসলে কিন্তু তুষারকণার দম একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায় নি। তার একটু একটু নিঃশ্বাস পড়ছিলো। রাত্রে বামনরা বাড়ী ফিরে এসে বেচারী তুষারকণাকে মড়ার মতো পড়ে' থাকতে দেখে ভয়ানক ভয় পেল। তারা সবাই ব্যস্ত হ'য়ে এগিয়ে গিয়ে তাকে তুলে বিছনায় শোওয়ালে, আর তাড়াতাড়ি তার গলার ফাঁসটা খুলে দিলে। তখন তুষারকণার নিঃশ্বাস ক্রমশঃ বেশ ভালভাবে পড়তে লাগলো এবং তার জ্ঞান ফিরে এলো। যখন তার কাছ থেকে বামনরা সব কথা শুনলে তখন তারা বেশ বুঝতে পারলে যে, সেই ফেরিওয়ালা নিশ্চয়ই তুষারকণার সৎমা। সেই জন্য তারা আবার তাকে বার বার করে' বারণ করে' দিলে যে, সে যেনো ফের কাউকে কখনো বাড়ীতে ঢুকতে না দেয়।

বাড়ী এসে সেই দুষ্টু সৎমা যখন আবার তাঁর আয়নাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সেই আয়নাটা আবার সেই একই উত্তর দিলে,—তুষারকণা এখনও জীবিত, এবং সে-ই সকলের চেয়ে সুন্দরী। এবারেও ঐ কথা শুনে রাণীর ভীষণ রাগ হলো ও তিনি মনে মনে বলিলেন,—এবার আমি নিশ্চয়ই তাকে শেষ করবো। এবার তিনি সম্পূর্ণ অন্য বেশ ধরে' তাঁর ঝুড়ির নানা জিনিসের সঙ্গে করে' একটি বিষ-মাখানো চিরুনি নিয়ে বনের ভিতরকার সেই কুটীরে পৌছলেন। ফেরিওয়ালার ডাক শুনে তুষারকণা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে—আমি আর তোমায় আসতে দিতে পারি না। ফেরিওয়ালা তাকে সুন্দর সুন্দর সব চিরুনি দেখিয়ে লোভ দেখালে, আর বললে,—দেখো, দেখো, কি সুন্দর সব চিরুনি। তুষারকণা তো ছেলেমানুষ, তাই ফেরিওয়ালার সব জিনিসপত্র দেখে তার ভারী লোভ হলো। তার উপর সে দেখলে যে, এই ফেরিওয়ালা আর একজন। সেই জন্য সে দরজা খুলে ফেরিওয়ালাকে ডাকলে। ফেরিওয়ালা ভিতরে এসে বললে,—দেখি মা, কোন্ চিরুনি দিয়ে তোমার মাথার চুল বেশ ভালো করে' আঁচড়ানো যাবে। এই বলে' তার সৎমা যেই সেই বিষাক্ত চিরুনিটা তুষারকণার চুলে গলিয়ে বসিয়ে দিলেন, অমনি তুষারকণা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে আছড়ে শুয়ে পড়লো। রাণী ভাবলেন যে, এবারে তিনি নিশ্চয়ই সফল হয়েছেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সেদিন বামনরা বাড়ী ফিরে এলো এবং যখন তারা আবার তুষারকণার সেই অবস্থা দেখলে, তখন তারা জানলে যে, সেই দুষ্টু হিংসুটে রাণীটা নিশ্চয়ই আবার এসেছিলো। মাথার চুলে গোঁজা চিরুনিটা শীঘ্রই তাদের নজরে পড়লো। যেই তারা সেই চিরুনিটা তুষারকণার মাথা থেকে বার করে' নিলে অমনি তুষারকণার জ্ঞান হলো। সে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে' সব বৃত্তান্ত সেই বামনদের বললে। আবার সেই বামনরা তাকে বারবার সাবধান করে' দিলে যে, সে যেনো কখখনো কোনোদিন অচেনা কাউকে দরজা না খুলে দেয়। তুষারকণাকে এই ভাবে সাবধান করে' দিয়ে পরের দিন তারা তাদের কাজে বেরিয়ে গেলো।

ওদিকে রাণী আবার যখন আয়নার কাছ থেকে আগের মত জানলেন যে, তুষারকণা তাঁর চেয়ে সুন্দরী এবং সে এখনও বেঁচে আছে, তখন রাগের চোটে তাঁর মন হু হু করে' জ্বলতে লাগলো। "তুষারকণাকে আমি মারবোই, এতে আমি মরি সেও ভালো," এই প্রতিজ্ঞা করে' তিনি এবারে এক কৃষকের বেশ ধরে' বেরুলেন। একটি ঝুড়ি ভরে' তিনি কয়েকটি কমলালেবু সঙ্গে নিলেন। সেই সব কমলালেবুর মধ্যে একটা কমলালেবুতে একেবারে ভয়ানক বিষ মাখানো ছিলো।

দরজায় ধাক্কা শুনে তুষারকণা ভিতর থেকে উত্তর দিলে—আমি কখখনো কাউকে দোর খুলবো না, সাত বামন আমাকে বার বার বারণ করেছে। সেই চাষাবেশধারী রাণী খুব মিষ্টি-মধুর স্বরে বললেন,—আমি কিছু বিক্রি করতে আসি নি মা, আমি এইখানের এক বাগানের মালী—আমার বাগানের কয়েকটা কমলালেবু তোমাকে উপহার দিতে এসেছি।

তুষারকণা ভিতর থেকেই উত্তর দিলে, আমার মোটেই ভরসা হয় না।

সেই চাষাটি এই শুনে আবার বললে, তুমি কি ভয় করছো যে, এতে বিষ মাখানো আছে? এই দেখো আমি এর আধখানা খাচ্ছি তুমি কি অপর অর্দ্ধেকও খেতে পারো না? এই বলে, সেই চাষাবেশী রাণী একটা কমলার আধখানা খেয়ে ফেললেন। কিন্তু ঐ কমলার অর্দ্ধেকে এমনি বিষ মাখানো ছিলো যে, তা খেলেই মানুষের মৃত্যু নিশ্চয়।

তুষারকণা দরজাটা একটু ফাঁক করে' ঝুড়ি-ভরা লাল লাল বড় বড় কমলালেবু দেখ্‌লে। তাই দেখে তার ভয়ানক লোভ হলো। সেইজন্য সে হাত বাড়িয়ে সেই চাষার কাছ থেকে আধখানা কমলা নিলে। কমলালেবু মুখে দিতে না দিতে তুষারকণা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। সেই রাণী তখন কঠোর অট্টহাস্য হেসে বললেন, তুমি খুব সুন্দরী হ'তে পারো কিন্তু এবার আর বামনরা তোমাকে বাঁচাতে পারছে না। বাড়ী পৌঁছে আয়নাকে জিজ্ঞাসা করে' রাণী এবার উত্তর পেলেন যে' পৃথিবীতে সব চেয়ে সুন্দরী তিনি।

বামনরা সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে এসে দেখ্‌লে যে, তুষারকণা নিস্তব্ধ হ'য়ে মাটিতে পড়ে' আছে। তারা খুব খুঁজে দেখলে যে, কোথাও কোনও বিষের চিহ্ন আছে কি না, তার গলায় কিছু বাঁধা আছে কি না এবং তার চুল নেড়ে নেড়ে দেখ্‌লে যে, সেখানে কিছু আছে কি না। তারা তার মুখের কাছে জল ও খাবার নিয়ে এসে দেখ্‌লে যে, সে খায় কি না। কিন্তু তুষারকণার হাত-পা সব একেবারে ঠাণ্ডা, সে নড়লো না। তখন তারা আস্তে আস্তে বললে, আমাদের তুষারকণা মারা গেছে। বামনরা তুষারকণাকে এমনি ভালোবাসতো যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই তারা আশা করছিলো যে, এই বুঝি সে জাগলো। পর পর তিন দিন, তিন রাত্রি কেটে গেলো, তারা তুষারকণার দেহের চারিপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলো। তাদের চোখে সে কদিন মোটেও ঘুম ছিলো না, তারা কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে' প্রতিক্ষণেই আশা করছিলো যে, এই বুঝি তুষারকণা জেগে উঠে বসে।

তিন দিন পরে তাদের মনে হলো তুষারকণার সৎকারের কথা। কিন্তু তারা কিছুতে ভাবতে পারলে না যে কি করে' ঐ ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটিকে তারা মাটির নীচে পুঁতবে। তারা তুষারকণাকে এমনি ভালোবাসতো যে, তারা বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে, সে সত্যি সত্যি মারা গিয়েছে। সেই জন্য তারা কাঁচের একটি সুন্দর বড় বাক্স তৈরী করে' তাতে তুষারকণাকে শোওয়ালে, যাতে সব সময় বাইরে থেকেও তাকে দেখা যায়। তারপর তারা বাক্সর উপরে খুব সুন্দর করে' সোনালী অক্ষরে লিখলে "রাজকন্যা তুষারকণা।"

পাহাড়ের ধারে সেই বাক্সটা নিয়ে গিয়ে সেই সাত বামন পালা করে' সেটিকে পাহারা দিতে লাগলো। বনের পশু-পাখী ও প্রজাপতিরা ঐ রকম অপরূপ সুন্দরীকে মৃত দেখে অনুতাপ করতো, আর কাছাকাছি যতো সব ফুলও ফুলগাছ ছিলো, তারাও দুঃখে মলিন ভাব ধরেছিলো, এমন কি, মেঘেরাও আকাশ দিয়ে উড়ে যাবার সময় ফোঁটা ফোঁটা জল ফেলে যেতো, সে যেন তাদের অশ্রুজল—কারণ তুষারকণার মৃত্যু দেখে কেউ দুঃখ চেপে রাখতে পারছিল না।

* * * *

অনেক—অনেক বছর কেটে গেছে। তুষারকণা সেই কাঁচের বাক্সের মধ্যে শুয়ে আছে কিন্তু কিছুমাত্র বদলায়নি। একদিন এক রাজপুত্র শিকার করতে করতে সেই জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সুন্দরী তুষারকণাকে দেখ্‌তে পেলেন। রাজপুত্র সেই বামনদের বললেন্—তোমরা আমায় এই বাক্স সমেত ঐ মেয়েটিকে দাও, আমি ওকে বাঁচার চেষ্টা করবো—ভালো ভালো অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাবো। তোমরা যতো টাকা চাও আমি দিচ্ছি। বামনরা প্রথমে তুষারকণার মৃতদেহ টাকার লোভেও দিতে চাইলে না। কিন্তু যখন তারা ভাবলে যে, তাদের প্রিয় তুষারকণা আবার বেঁচে উঠ্‌তে পারে তখন তারা রাজী হলো।

রাজকুমার তখন সেই বাক্সটিকে বয়ে' রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর চাকরদের হুকুম দিলেন। পাহাড়ের ধারের রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে তারা সেই বাক্সটিকে বয়ে' নিয়ে নামছে, হঠাৎ একটা গর্ত্তের ভিতর পা পড়ে' গিয়ে সামনের দুজন লোক এমনি হোঁচট খেলো যে, তার ফলে তুষারকণা ভয়ানক একটা ঝাঁকুনি খেয়ে দুলে উঠলো। এই ঝাঁকুনির চোটে তুষারকণার গলা থেকে সেই বিষাক্ত কমলার

রোয়াটা ফস্ করে' বেরিয়ে গেলো। সে তখুনি চোখ চেয়ে জেগে উঠে বস্‌লো। ভাগ্যিস্, সেই ফমলার রোয়াটা তুষারকণার পেট পর্য্যন্ত যায় নি।

তুষারকণা খুব ভয়ের সঙ্গে বলে' উঠলো, আমি কোথায়? রাজপুত্র তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আমি এক দেশের রাজপুত্র, আমি তোমায় আমার রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছি।

বাড়ী পৌঁছে রাজপুত্র তাঁর বাবার কাছে তুষারকণাকে কি করে' পেলেন, তা সব বল্‌লেন। রাজা তুষারকণার মত সুন্দরী মেয়ে কখনো দেখেন নি, তাই তাঁর খুব পছন্দ হলো। তিনি রাজপুত্রের সঙ্গে তুষারকণার বিয়ের সব ঠিক করে' ফেল্‌লেন।

বিয়ের ভোজে সেই সাত বামন এলো। তারা তাদের প্রিয় তুষারকণাকে বেঁচে উঠতে দেখে' খুব আনন্দিত হলো। কিন্তু নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরে যাবার সময় তারা দুঃখিত মনে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলো, কারণ, তাদের বাড়ীতে তো তুষারকণা আর যাবে না! কিন্তু তাদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, তুষারকণা রাজপ্রাসাদে থাকলে সেই দুষ্টু সৎমার রাগ তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।

সেই দুষ্টু রাণীও বিয়ের নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিত হ'য়ে খুব সুসজ্জিত হ'য়ে যাবার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আয়না বল তো আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? আমি নিশ্চয়ই সব চেয়ে সুন্দরী? আয়না উত্তর দিলে,—রাণীমা, এখানে আপনি অতি উজ্জ্বল তারার চেয়েও সুন্দরী। কিন্তু আপনার চেয়েও সুন্দরী হচ্ছে যে রাজপুত্রের বিয়ের নিমন্ত্রণে আপনি যাচ্ছেন, তাঁর স্ত্রী। আশাহত হ'য়ে তিনি রেগে একেবারে বসে' পড়্‌লেন। কিন্তু রাগ দমন করে' তিনি দেখ্‌তে গেলেন যে, কে সে অপরূপ সুন্দরী রাণী। বিয়ে বাড়ীতে গিয়ে যখন তিনি দেখ্‌লেন যে, সে আর কেউ নয়,



রাজপুত্র বল্‌লেন, তোমরা আমায় মেয়েটিকে দাও

সে হচ্ছে তুষারকণা, তখন রাগে গদ্‌গদ্‌ করতে করতে তিনি বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু এবার তো আর হাজার রাগলেও তিনি তুষারকণার কোনো অনিষ্ট করতে পারবেন না। তাই মনের মধ্যে রাগে গুম্‌রে গুম্‌রে তাঁর কঠিন অসুখ হলো, আর সেই অসুখেই তাঁর মৃত্যু হলো।

রাজপুত্র ও তুষারকণা অনেক বছর ধরে' তাঁদের রাজ্যে আনন্দে ও শান্তিতে রাজত্ব করেছিলেন। অশেষ আনন্দের মধ্যে রাজকন্যা তুষারকণার শুধু সেইদিন বেশ একটু দুঃখ হতো যেদিন সেই বামনরা দেখা করতে এসে বিষণ্ণ হ'য়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাজবাড়ী থেকে বিদায় নিতো।

ঘুঁটে কুড়ুনী

সে মেয়েটির ভালো নামটা কেউ জানত না। সকলেই তাকে ঘুঁটেকুড়ুনী ব'লেই ডাকত, কারণ, বাড়ী-ঘরের সব কাজ করে' কর্ম্মে তাকে সর্ব্বদা খুব অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন হ'য়ে থাকতে হ'ত। সে বেচারীর মা নেই। তার বিমাতা ও দুটি বৈমাত্র বোন তার প্রতি কোন দিনও সদ্ব্যবহার অথবা দয়া মমতা করেন নি।

ঘুঁটেকুড়ুনীর বৈমাত্র বোনেরা সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত সে বেচারীকে দিয়ে কেবলই কাজ করায় আর নিজেরা সারাদিনই খুব আনন্দে মেতে থাকে। ঘুঁটেকুড়ুনী কয়লা ভেঙ্গে উনুন ধরায়, বাসন মাজে, ঘর-দোর ঝাট দেয়, সব জিনিসপত্রের ধুলো ঝেড়ে বাড়ীর সব জিনিস গোছগাছ করে' সাজিয়ে রাখে। সে তার বৈমাত্র বোনের হাতে হাতে সব জিনিস এগিয়ে দিয়ে তাদের সেবা করে। আর রাত্রি হ'লে ঘুঁটেকুড়ুনী একটি নির্জ্জন কন্‌কনে ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে পুরানো জীর্ণ ঘরে একটা খড় জড়ো-করা বিছানার উপর শুয়ে ঘুমোয়। অথচ তার বৈমাত্র বোনেরা দিব্যি আরামে নরম ধব্‌ধবে পরিষ্কার বিছানায় ঘুমুতো।

একদিন শোনা গেল যে, যুবরাজের জন্মদিন উপলক্ষে রাজার বাড়ীতে দুদিন ধ'রে খুব উৎসব হবে। সেই উৎসবে রাজ্যের বহু লোক নিমন্ত্রিত হ'ল। ঘুঁটেকুড়ুনীর বৈমাত্র বোনেরাও রাজার বাড়ীর নিমন্ত্রণ পেয়েছিলো। নিমন্ত্রণ পেয়ে তারা এতো খুশী হ'ল যে, সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত তারা কেবল সেই উৎসবের কল্পনাই করতে লাগল। কে কোন্ রঙের শাড়ী আর জামা পরে' যাবে, সেই আলোচনাতেই তারা বিভোর হ'য়ে উঠল। বেচারী ঘুঁটেকুড়ুনী রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয় নি, কারণ রাজার বাড়ীর যে-সব লোক নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল, তারা তাকে কাজ করতে দেখে ও তার বোনদের ফরমাস খাটতে দেখে তাকে বাড়ীর ঝি বলে' ঠিক করে' নিয়েছিলো।

উৎসবের প্রথম দিনের সন্ধ্যায় ঘুঁটেকুড়ুনী তার বোনদের সুন্দর সুন্দর সব দামী কাপড় জামা ও গহনা পরিয়ে দিয়ে তাদের চুল বেঁধে দিলে। উৎসবে যাবার জন্য তারও খুব ইচ্ছা হচ্ছিলো। সে তার বোনেদের নানান্ বেশভূষায় সজ্জিতা দেখে ভাবলে যে, "আমি যদি ঐ রকম ভালো ভালো পোষাক পরে' গাড়ী করে' উৎসবে যেতে পারতাম আর রাজপ্রাসাদের ভিতরটি একবার দেখতে পেতাম তাহ'লে কি আনন্দই না হ'ত আমার। আমি ফিরে এলে রাজপুত্র হয়তো এক আধবার আমার কথা ভাবতেও পারত।" এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ঘুঁটেকুড়ুনীর চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তার আকুল ক্রন্দনে তার সকল দুঃখ যেন অন্তর ভেদ করে' বেরিয়ে এলো।

ঘুঁটেকুড়ুনীর বোনেরা তার চোখের জল দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলে যে, সে কাঁদছে কেন।

ঘুঁটেকুড়ুনী উত্তর দিলে, "আমি তোমাদের সঙ্গে রাজবাড়ীর উৎসবে যাবো।"

তার এই কথা শুনে তার বোনেরা একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বিদ্রূপ করে' বললে, "তুমি যাবে উৎসবে! কেউ তোমার দিকে ফিরেও দেখবে

না।" এই ব'লেই তারা গাড়ীতে উঠে গাড়ী হাঁকিয়ে চ'লে গেল। বেচারী ঘুঁটেকুড়ুনী তার সেই ভাঙাচোরা অন্ধকার ঘরে গিয়ে তার দু হাতের মধ্যে তার মুখখানিকে চেপে ধ'রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এমন সময় সে হঠাৎ শুনতে পেলে যে, কে যেন তার পিছন থেকে খুব স্নেহ ও সহানুভূতি-ভরা কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, সে কাঁদছে কেন। সে তখন তাড়াতাড়ি পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলে যে, একটি পরী তাকে ঐ কথা



ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল

করছে। সে কোনো রকমে তার কান্না চেপে সজল চক্ষে তার দুঃখের কারণটি একবার বলতে চেষ্টা করলে কিন্তু দুঃখের আতিশয্যে তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোলো না। সেই পরীটি কিন্তু তার মনের কথা বুঝতে পেরে বললে, "তুমি রাজবাড়ীতে উৎসবে যাবে? বেশ, তুমি আর কেঁদ না। আমি তোমার সেখানে যাবার ব্যবস্থা করছি। এখন, আমি তোমাকে যা যা বলি, তাই কর দেখি। প্রথমে তুমি শীঘ্র করে' একটা লাউ নিয়ে এস তো।"

ঘুঁটেকুড়ুনী তখনই একটা লাউ নিয়ে এলো। সেই পরীটি যেই তার হাতের সোনার কাঠি দিয়ে লাউটিকে ছোঁয়ালে, অমনি সেটা একটি সুন্দর ঝকঝকে নূতন গাড়ী হ'য়ে গেল।

তখন সেই পরীটি বললে "এবার আমাকে গোটা কয়েক নেংটি ইঁদুর এনে দাও।" ঘুঁটেকুড়ুনী ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে দেখলে যে ইঁদুরমারা কলের ভিতরে ছ'টা নেংটি ইঁদুর প'ড়ে রয়েছে। সে সেই কলশুদ্ধ ইঁদুরগুলি নিয়ে এসে হাজির করলে। সেই কলটা খুলে দিতেই এক একটা করে' ইঁদুর বেরিয়ে আসতে লাগল। পরীটিও এক এক করে' সব ইঁদুরগুলির পিঠে তার কাঠিগাছি কেবল ছুঁইয়ে দিলে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ছ'টা ইঁদুর মস্ত মস্ত তেজী ছ'টা ঘোড়া হ'য়ে গেল।

এইবার সেই পরীটি বললে, "এখন আমাকে একটা ধেড়ে ইঁদুর ধরে' এনে দাও।" ঘুঁটেকুড়ুনী তখনই খুঁজে পেতে একটা ধেড়ে ইঁদুর ধরে' নিয়ে এলো। পরীটি যেই সেটাকে তার সোনার কাঠি দিয়ে ছুঁলে, অমনি সেটা খুব জমকালো পোষাক-পরা একটি কোচম্যান্ হ'য়ে গেল।

তারপর পরীটি বললে, "আর একবার দৌড়ে গিয়ে আমাকে দুটো টিকটিকি এনে দাও। তোমাদের বাড়ীর শশা গাছের নীচে দুটো টিকটিকি আছে।" ঘুঁটেকুড়ুনী টিকটিকি দুটোকে ধ'রে নিয়ে এলো। সোনার কাঠি ছোঁয়াতেই সে দুটো হ'য়ে গেল দিব্যি সুন্দর সুন্দর দুই সহিস।

ঘুঁটেকুঁড়ুনী অবাক্ হ'য়ে পরীর এই সব কাণ্ড দেখছিলো। কিন্তু তবু সে বিমর্ষ হয়ে ম্লানমুখে একপাশে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। সেই পরী তার বিষণ্ণতার কারণ বুঝতে পেরে তাকে বললে, "এইবার আমি আমার সোনার কাঠিটি তোমাকে ছোঁয়াব।" এই ব'লে সে যেমনি তার সোনার কাঠি ঘুঁটেকুড়ুনীর গায়ে ছুঁইয়েছে, অমনি ঘুঁটেকুড়ুনীর ময়লা, শতছিন্ন কাপড় ও জামা ভারী সুন্দর সুন্দর সব নূতন জামা-কাপড়ে পরিণত হ'ল— তার গায়ে দামী দামী সব সৌখীন গহনা হ'ল অনেক, আর দেখা গেল যে, তার পায়ে পরীদের মতো এক জোড়া সোনার চকচকে মল হয়েছে। এইবার ঘুঁটেকুড়ুনীকে খুবই সুন্দর দেখাতে লাগল। মনে হ'ল তার রূপ যেন আর ধরে না।

তখন সেই পরীটি বললে, "এখন আমি চললাম। তুমি কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। রাত বারোটার আগে তোমাকে কিন্তু রাজপ্রাসাদ থেকে চলে আসতে হবে। নইলে তোমার গাড়ীটি আবার লাউ হ'য়ে যাবে—ঘোড়াগুলো

হয়ে যাবে নেংটি ইঁদুর, কোচ্ম্যান হবে ধেড়ে ইঁদুর আর সহিস দুটি হ'য়ে যাবে একজোড়া টিক্‌টিকি এবং তুমিও আগের মতো আবার ছিন্ন কাপড় চোপড়-পরা মলিন হ'য়ে যাবে।" এই ব'লে সেই পরীটি ঘুঁটেকুড়ুনীকে চুম্বন করে' গাড়ীতে তুলে দিলে। গাড়ীখানা রাজার বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।



সোনার কাঠির সোনার পরশ

ঘুঁটেকুড়ুনীকে ছয়' ঘোড়ার সেই রকম জমকালো গাড়ী করে' আস্‌তে দেখে, আর তাকে অপরূপ সুন্দরী দেখে রাজবাড়ীর সকলে মনে কর্‌লে যে, সে নিশ্চয় কোনো রাজকুমারী হবে। সেইজন্য রাজপুত্র নিজে এসে তাকে অভ্যর্থনা করে' গাড়ী থেকে নামিয়ে যে ঘরে উৎসব হচ্ছিল এবং যেখানে সব অতিথি ও অভ্যাগতেরা ছিলেন, সেখানে তাকে নিয়ে গেলেন। রাজপুত্র মনে মনে ভাব্‌লেন যে, এত সুন্দরী মেয়ে তিনি পূর্ব্বে কখনো দেখেন নি। রাজপুত্র আরও ভাব্‌তে লাগলেন যে, "কে এই রাজকুমারী।" ঘুঁটেকুড়ুনীর হিংসুটে বিমাতা ও বৈমাত্র বোনেরা অবশ্য তাকে চিন্‌তে পারেনি, কিন্তু তার অভ্যর্থনা ও সমাদর দেখে তারা একেবারে রেগে আগুন হ'য়ে উঠেছিল। সেইদিনকার উৎসব রাত্রিতে রাজপুত্র তার সঙ্গে সবচেয়ে বেশীক্ষণ কথাবার্ত্তা বল্‌লেন।

রাত্রি বারোটা বাজ্‌তে যখন পনেরো মিনিট বাকী, তখন ঘুঁটেকুড়ুনীর মনে প'ড়ে গেল সেই পরীর কথা। সে তখনই রাজপুত্র প্রভৃতি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরীর-দেওয়া সেই সুদৃশ্য ছ'ঘোড়ার গাড়ী করে' রাজবাড়ী থেকে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। ঠিক বারোটার সময় সে বাড়ী পৌঁছে গেল। সে বাড়ী ফিরে দেখলে যে, সেই পরীটি তার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে। পরীটি তার হাতের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে আবার ছিন্নভিন্ন পোষাক-পরিহিতা ম্লান ঘুঁটেকুড়ুনী করে' দিয়ে চ'লে গেলেন। ঘুঁটেকুড়ুনী ঘরে গিয়ে তার খড়ের বিছানায় চুপ করে' শুয়ে রইল।

ঘুঁটেকুড়ুনীর বোনেরা বাড়ীতে ফিরে এসে দেখ্‌লে যে, ঘুঁটেকুড়ুনী তার বিছানা থেকে চোখ মুছতে মুছতে উঠে এলো, যেন সে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল। তার বোনেরা ঘুঁটেকুড়ুনীর কাছে রাজবাড়ীর ঐশ্বর্য্য আর জাঁক-জমকের কথা অনর্গল বল্‌তে লাগ্‌ল আর সেই চমৎকার পরিচ্ছদে ভূষিতা অপরূপ সুন্দরীর কথাও তারা বল্‌তে লাগ্‌ল। তাদের কথা শুনে ঘুঁটেকুড়ুনী মনে মনে বুঝতে পারলে যে, সেই সুন্দরীটি কে।

পরের দিন রাত্রে রাজবাড়ীতে আবার উৎসব। ঘুঁটেকুড়ুনী সেদিনও তার বোনদের সাজিয়ে দিলে। তারা যখন রাজবাড়ীতে চ'লে গেল, তখন সে বেচারী বিমর্ষ হ'য়ে তার বিছানায় গিয়ে চুপ করে' ব'সে রইলো। অল্প কিছুক্ষণ পরেই সেই পরীটি আবার তার কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। সেদিন সেই পরী তাকে আরও সুন্দর সুন্দর সব কাপড়-জামা ও অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে আরও বেশী সুন্দরী করে' তুল্‌ল এবং সে আবার ছ'ঘোড়ার গাড়ীতে করে' রাজবাড়ীতে গেল। রাজপুত্র সেদিন একমাত্র তার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা বল্‌তে লাগ্‌লেন। নানান্ কথাবার্ত্তায় ঘুঁটেকুড়ুনী এত বিভোর হ'য়ে উঠেছিল যে, সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছিল, তা টেরও পায়নি। হঠাৎ একবার যখন ঘড়ির উপর তার চোখ প'ড়ে গেল তখন সে দেখলে যে, বারোটা বাজতে মাত্র আর এক মিনিট বাকী। ঘুঁটেকুড়ুনী অত্যন্ত ব্যস্ত ও চঞ্চলভাবে তখনই সেখান থেকে রওনা হ'ল। তাড়াতাড়িতে সে রাজপুত্রের কাছ

থেকে বিদায় পর্য্যন্ত নিতে পারেনি। রাজবাড়ীর দরজার কাছে যেতে না যেতেই ঢং ঢং ক'রে ঘড়িতে বারোটা বেজে গেল। বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সে পূর্ব্বের মতো ছেঁড়া কাপড়-জামা-পরিহিতা ঘুঁটে-কুড়ুনী হ'য়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তার পায়ের সোনার মল জোড়া কিন্তু অদৃশ্য হ'ল না। তাড়াতাড়ি ছুটে পালাতে গিয়ে তার পায়ের একগাছা মল রাজবাড়ীর চৌকাঠের পিছনে প'ড়ে গেল। সে এত ব্যস্ত ও চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল যে, সেই মলটির দিকে আর ফিরেও দেখলে না। একেবারে সোজা দৌড়ে গিয়ে বাড়ী পৌঁছে তবে সে নিশ্চিন্ত হ'ল।



ছুটে পালাতে গিয়ে এক গাছা মল প'ড়ে গেল

ওদিকে রাজপুত্র কিছুতেই বুঝতে পারলেন না যে, সে কেন অত তাড়াতাড়ি অমন ক'রে ছুটে পালাল। তিনি উৎসবের সেই ঘর থেকে তাকে খোঁজবার জন্য তাড়াতাড়ি বের হ'লেন, কিন্তু তাকে কোথাও পেলেন না। বিমর্ষ হ'য়ে তিনি যখন ফিরে আসছেন তখন দরজার চৌকাঠের কাছে সেই চকচকে সোনার মলগাছি দেখতে পেয়ে সেটিকে কুড়িয়ে নিলেন।

রাজপুত্রের ইচ্ছা অনুসারে ও অনুরোধে পরের দিন রাজা তাঁর রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দিলেন যে, রাজপুত্রের কুড়িয়ে-পাওয়া সেই মল যে মেয়ের পায়ে ঠিক হবে তিনি তার সঙ্গে তাঁর ছেলের বিবাহ দিবেন। রাজবাড়ীর দাসীরা সেই মলটি নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরতে লাগ্‌ল। কত মেয়ে সেই মলটি পরবার কত চেষ্টাই করলে কিন্তু কেউই পারলে না। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে রাজবাড়ীর দাসীরা ঘুটেকুড়ুনীদের বাড়ীতে উপস্থিত হ'ল।

ঘুঁটেকুড়ুনীর বৈমাত্র বোনেরা সেই মলখানি পরবার অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু পার্‌লে না। শেষকালে তাদের মা ব'লে উঠলেন, "আরে, কোনো রকমে কষ্টেসৃষ্টে পায়ে পর্‌ না—তাহ'লে যে রাজরাণী হ'বি।" এই ব'লে তিনি নিজে মলটি তাদের পায়ে পরিয়ে দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করলেন। রাজবাড়ীর দাসীরা তাঁর রকম দেখে মুখে কাপড় দিয়ে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌তে লাগ্‌ল। তাদের পা মলের চাপে ফুলে লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, তবু পায়ের গাঁঠ পেরিয়ে মলটি পায়ে উঠল না।

দাসীরা মলটি নিয়ে যখন ফিরে যাবার উপক্রম করছে তখন তারা দেখলে যে, দরজার একপাশে ম্লানমুখে ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় প'রে ঘুঁটেকুড়ুনী দাঁড়িয়ে আছে। একজন দাসী তাকে দেখে ব'লে উঠল, "কই মা! তুমি তো মলটি একবার পরলে না। আমাদের উপরে রাজার আদেশ আছে যে, প্রত্যেককে এই মল পরিয়ে দেখ্‌তে হবে।" সেই দাসীর ঐ কথা শুনে ঘুঁটেকুড়ুনীর বিমাতা ও তার বোনেরা খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে একেবারে যেন গড়িয়ে পড়্‌ল। তারা বিদ্রূপ ক'রে বল্‌লে, "ওমা! ওকে আবার নাকি মল পরতে হবে! বাঁদরের গলায় কি মুক্তার মালা মানায়!" তার বোনেদের ঐ রকম শ্লেষপূর্ণ কটু উক্তিতে ঘুটে-কুড়ুনীর মুখখানি লজ্জা ও সঙ্কোচে একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেল। সে আস্তে আস্তে দরজার পাশে স'রে গেল।

তখন দাসীরা সবাই ব'লে উঠ্‌ল, "আপনারা ও বেচারীর প্রতি অমন ব্যবহার করবেন না।" এই ব'লে একজন দাসী এগিয়ে গিয়ে ঘুঁটেকুড়ুনীকে তার হাতখানি ধ'রে দরজার পাশ থেকে বার ক'রে নিয়ে এসে বল্‌লে, "এসো মা, তুমি একবার মলটি প'রে দেখো।" এইবার সেই দাসীটি যেই সেই মলটি

তার পায়ে পরিয়েছে, অমনি সেটা ফস্ করে' তার পায়ে ঠিক লেগে গেল।

তাই না দেখে ঘুঁটেকুড়ুনীর হিংসুটে বিমাতা ও বোনেরা খুব অবাক্ হ'য়ে গেল। তারপর অদৃশ্য থেকে সেই পরীটি তার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে যখন তাকে রাজকুমারীর মতো সুন্দর সুন্দর সব বেশ-ভূষায় সাজিয়ে অপরূপ সুন্দরী করে' তুলল, আর তার অপর পায়ে ঠিক সেই কুড়িয়ে-পাওয়া মলের মত আর এক গাছা মল হ'ল, তখন তারা আরও বেশী আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। তারা সবাই অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌লে যে বাস্তবিক তাদের ঘুঁটেকুড়ুনীই তো সেই সুন্দরী রাজকুমারী--যাকে তারা দুদিনই উৎসবে রাজবাড়ীতে উপস্থিত থাকতে দেখেছে। এইবার তারা তাদের বহুদিনের নির্দ্দয় ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত বোধ করলে এবং ঘুঁটেকুড়ুনীর কাছে ক্ষমা চাইলে। ঘুঁটেকুড়ুনীও খুব উদারতার সঙ্গে হাসিমুখেই তাদের ক্ষমা করলে। পূর্ব্বে তারা তার প্রতি যে সব অন্যায় ব্যবহার করেছিল, ঘুটেকুড়ুনী সে সবই একমুহূর্ত্তে ভুলে গেল।

এইবার সে সেই দাসীদের সঙ্গে অতি সুন্দর একখানি গাড়ী করে' রাজবাড়ীতে চ'লে গেল। রাজা রাণী ও রাজপুত্র এবং রাজবাড়ীর সব বড় বড় কর্ম্মচারীরা তাকে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে নিলে। অল্প কয়েক দিন পরে খুব ধুমধাম ক'রে রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ হ'ল। সেই বিবাহে তার বিমাতা ও বোনেরাও এসে খুব ভোজ খেয়ে গেল। রাজপুত্র ও ঘুঁটেকুড়ুনী পরম সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করতে লাগ্‌লেন।

ভাই-ভগিনী

[১]

এক প্রকাণ্ড বনের কাছে এক কাঠুরের ছোট একখানি বাড়ী। কাঠুরে, তার দুটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে হান্‌সেল ও গ্রেথেল, আর তাদের সৎমা এই নিয়ে তাদের সংসার। কাঠুরে বড় গরীব; কাঠ কেটে গ্রামে নিয়ে বেচে যা কিছু পায় তাই দিয়ে কোন মতে দিন গুজরাণ করে।

একবার দেশে বড় দুর্ভিক্ষ হল। কাঠুরের ত যা সামান্য আয় তা আরও কমে গেল। কি করে এতগুলি লোকের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করবে, ভেবে ভেবে সে আর কূল পায় না। একদিন সন্ধ্যায় এমনি নানা চিন্তায় অস্থির হয়ে সে তার স্ত্রীকে বলল, "আমাদের কি গতি হবে বল ত? এই ত অবস্থা। সামান্য যা পুঁজি আছে তাতে নিজেদের ত দূরের কথা, ছেলেমেয়ে দুটিকেই বা ক'দিন খাওয়াতে পারব! এতগুলি লোকের কি যে উপায় হবে, ভেবেই পাই না।"

কাঠুরের স্ত্রী সৎ ছেলেমেয়ের উপর মোটেই সদয় ছিল না। সে চট ক'রে এদের দায় থেকে মুক্তি পাবার একটা ফন্দি এঁটে ফেলল। বলল, "তাই ত যে দিন কাল পড়েছে, কি যে করবে বুঝতেই পারি না। আচ্ছা দেখ, এক কাজ করলে হয় না? চল খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে আমরা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কাঠ কাটবার ছুতো করে গভীর বনে চলে যাই। সেখানে আগুন জেলে খাবার দিয়ে ওদের বসিয়ে রেখে আমরা কাঠ কাটতে অনেক দূরে চলে যাব। ওরা কোন সন্দেহই করতে পারবে না, আর ও বনের রাস্তা খুঁজে বাড়ীতে ফিরতেও পারবে না। তা হ'লেই ওদের ভাবনার হাত থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাব।"

কাঠুরে অবাক হয়ে বলল, "এ তুমি কি বলছ? কোন্ প্রাণে এই কচি ছেলেমেয়ে দুটোকে এমন করে বনে ফেলে আসবার কথা তুমি ভাবলে? কত ভয়ানক হিংস্রজন্তু সব বনে রয়েছে, তারা যে ওদের টুকরো টুকরো করে ফেলবে! না, না, এমন কাজ আমি করতে পারব না।"

কাঠুরের স্ত্রী ভারী রেগে গেল। বলল, "তুমি যেমন বোকা তেমনি কষ্ট পাবে ত! যখন সোজা ব্যবস্থায় রাজি হচ্ছ না তখন এস, একে একে চারজনেই না খেয়ে মরি।" কিন্তু এইটুকু বলেই সে থামল না। বার বার অনেক রকম করে কাঠুরেকে ঐ কুপরামর্শ দিয়ে দিয়ে এমন নিষ্ঠুর কাজ করাতেও রাজি করিয়ে ফেলল।

এদিকে ছেলেমেয়ে দুটি ক্ষিদেয় অস্থির হয়ে ঘুমাতে পারছিল না। সৎমায়ের সব কথাই তারা শুনতে পেল। গ্রেথেল্ ভয়ে কেঁদে অস্থির হয়ে বলতে লাগল, "দাদা আমাদের কি হবে?" হান্‌সেল

বলল, "চুপ কর লক্ষ্মী বোনটি, কেঁদো না, আমি যা হয় ব্যবস্থা করব।" তার পর যেই তাদের মা, বাবা ঘুমিয়েছে অমনি ছেলেটি উঠে পিছনের দরজা খুলে বাইরে গেল। চারিদিকে ফুটফুটে জোৎস্না—সামনেই মাটীর উপর পাথরের শাদা নুড়িগুলি আলোয় ঝক্‌মক্ করছে। হান্‌সেল একে একে অনেক নুড়ি কুড়িয়ে দুপকেট বোঝাই করে নিল।



শাদা পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে পকেট বোঝাই করলে

তার পর দরজাটি ধীরে ধীরে বন্ধ করে গিয়ে গ্রেথেল্‌কে বলল, "শান্ত হও বোন, ভাল করে ঘুমিয়ে নাও। ভগবান্ আমাদের নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন।" এই বলে সেও ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর না হ'তেই তাদের সৎমা এসে দুজনকে খুব নাড়া দিয়ে উঠিয়ে বলল, "ওঠ্, ওঠ্, শীগগির তৈরি হয়ে নে, এখনি আমরা কাঠ কাটতে যাব। এই তোদের দুজনের দুটুকরো রুটী রইল, সময়মত খাবি—আর খাবার কিছু নেই।" হান্‌সেলের পকেট ত পাথরে ভরা—গ্রেথেল্ কোঁচড়ে করে রুটী দুটুকরো নিয়ে নিল। তার পর সবাই মিলে বনের দিকে রওনা হ'ল। হান্‌সেল কিছু দূর এগিয়েই বাড়ীর দিকে ফিরে ফিরে তাকায় আর দাঁড়িয়ে পড়ে। বার বার এমনি করাতে দল থেকে সে পেছনে পড়ে যেতে লাগল। তা দেখে কাঠুরে বলল, "হান্‌সেল, তুমি ফিরে ফিরে ও কি দেখছ বল ত?" হান্‌সেল বলল, "বাবা, দেখ ছাদের উপর আমার শাদা বেড়ালটা বসে আমাদের দেখছে।" তার সৎমা রেগে বলল, "ওরে বোকা, কোথায় তোর বেড়াল? চিমনিতে রোদ পড়ে অমনি শাদা দেখা যাচ্ছে।" আসলে হান্‌সেল কিন্তু বেড়াল দেখছিল না, সে থেমে পড়ে একটা একটা করে পাথরের নুড়ি পথে রেখে যাচ্ছিল। এমনি করে তারা গভীর বনের মধ্যে উপস্থিত হ'ল। কাঠুরে বলল, "তোরা, কিছু কাঠ জোগাড় করে আন্—আগুন জ্বেলে দি, তা হ'লে আর তোদের শীত করবে না।" দুই ভাই বোনে মিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই অনেক কাঠকুটো এনে ফেলল। আগুন ধরিয়ে কাঠুরের স্ত্রী বলল "এবার আমরা কাঠ কাটতে যাচ্ছি। তোরা খেয়ে দেয়ে ঘুমো। সন্ধ্যাবেলা এসে তোদের ডেকে নিয়ে যাব।" এই বলে তারা চলে গেল।

[২]

দু'ভাই বোনে বসে আছে। মাঝে মাঝে কুড়ালের শব্দ শোনা যায়। ওরা বুঝতে পারে কাঠুরে কাছেই কাট কাটছে। কিন্তু কাঠুরে যে ওদের ফাঁকি দেবার জন্যে একটা শুকনো গাছে একটা ডাল বেঁধে রেখে গেছে আর হাওয়ায় সেটা নড়ে নড়ে অমনি শব্দ করছে, তা ত আর ওরা জানে না। অনেকক্ষণ ধরে বাপ মা ফিরে আসতে পারে এ আশায় বসে বসে বিকালের দিকে ছেলে মেয়ে দুটি ঘুমিয়ে পড়ল। যখন তাদের ঘুম ভাঙ্গল তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। গ্রেথেল্ ভয় পেয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। হান্‌সেল তাকে বোঝাতে লাগল "একটু চুপ করে থাক লক্ষ্মীটি, যেই চাঁদ উঠবে, অমনি পাথরগুলো চকমক্ করবে, আর তাই দেখে দেখে আমরা বাড়ী যেতে পারব।"

ক্রমে চাঁদের আলো এসে সমস্ত বন ছেয়ে ফেল্‌ল। চারিদিক জোৎস্নায় উজ্জল, তার মধ্যে পাথরের নুড়িগুলো রূপোর টুকরোর মত ঝক্ ঝক্ করছে দেখে ভাই বোনে হাত ধরাধরি করে' চলল। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে একেবারে ভোর হয়-হয় এমনি সময়ে তারা বাড়ীর দরজায় পৌছল। দরজাতে ধাক্কা দিতেই তাদের সৎমা এসে হাজির—ছেলে মেয়েকে দেখে রেগে বলল, "তোরা এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলি ওখানে? আমরা ভাবছিলাম আর বুঝি তোরা ফিরবিই না।" কাঠুরে কিন্তু তাদের ফিরে পেয়ে খুব খুসী হ'ল।

কিছুদিন এমনি ভাবে যায়। আবার দেশে ভারী অজন্মা হ'ল। কোথাও কিছু খাবার মেলা দায়। কাঠুরেও একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়ল। একদিন কাঠুরের স্ত্রী তাকে ডেকে বলল, "দেখ আর এই আধখানা রুটী মাত্র আমাদের পুঁজি আছে। এই টুকুন সঙ্গেই সব শেষ। চল, আগের বারের মত ছেলে মেয়ে দুটোকে বনে রেখে আসি। এবার আরও গভীর জঙ্গলে ছেড়ে আসব যেন আর ফিরতে না পারে।" কাঠুরে বলল, "যদি না খেতে পেয়ে মরতেই হয়, সবাই একসঙ্গেই মরব, তার জন্য আর এত ফন্দি ফিকিরের দরকার কি?" কিন্তু কাঠুরের স্ত্রী এসব কথা গ্রাহ্য না করে আবার ঘুরে ফিরে ঐ কথাই বলতে থাকল।

একবার অন্যায় কাজ করতে রাজি হ'লে আবার তাতে সম্মত হতেই হয়, কাঠুরের স্ত্রীর পরামর্শ মানতেই হ'ল। ছেলে মেয়ে দুটি এবারেও আগের মত সব শুনতে পেল। কিন্তু এবার কাঠুরের স্ত্রী সাবধান হয়ে দরজায় চাবি দিয়ে রেখেছিল তাই হান্‌সেল আর পাথর যোগাড় করতে পারল না। তবু সে গ্রেথেল্‌কে বলল, "ব্যস্ত হোয়োনা দেখো, ভগবান্ আমাদের একটি কিছু ব্যবস্থা করেই দেবেন।"

আবার আগের মতই কাঠুরের স্ত্রী ভোরে এসে ছেলে মেয়েদের টেনে তুলল। ছোট্ট দুটুকরো রুটী দিয়ে বলল "চল, এখন আমরা কাঠ কাটতে যাই।" হান্‌সেল আর উপায় না দেখে একটা রুটী ছোট ছোট টুকরো করে নিয়ে তাই পথে রেখে রেখে চলল। তাকে বার বার ফিরে তাকাতে দেখে এবারেও কাঠুরে জিজ্ঞাসা করল, "হান্‌সেল, তুমি এতবার ফিরে ফিরে কি দেখছ?" হান্‌সেল বলল, "কিছু না বাবা, আমার পায়রাটা বসে আছে ছাদে, তাই দেখেছিলাম।"

এমনি ভাবে চলতে চলতে তারা এসে ভয়ানক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কাঠ এনে আগুন করে দিয়ে কাঠুরের স্ত্রী বলল, "আমরা চললাম। কাঠ কেটে সন্ধ্যার সময় এসে তোদের নিয়ে যাব।"

একটু বেলা হলে গ্রেথেল্ ও হান্‌সেল মিলে সেই একটুকরো রুটী ভাগ করে খেয়ে নিল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল। অন্ধকার হবার পর তাদের ঘুম ভাঙ্গল। একে গভীর বন, তাতে নানারকম জানোয়ারের হাঁক-ডাক—তাদের যে কি রকম ভয় করতে লাগল, সহজেই বুঝতে পার। হান্‌সেল তবু গ্রেথেল্‌কে বোঝাতে লাগল, "একটু চুপ করো লক্ষ্মী বোনটি, জ্যোৎস্না হলেই রুটীর টুকরো দেখে দেখে আমারা বাড়ী যেতে পারব।" চাঁদ উঠল, বড় বড় গাছের ডালের আড়াল থেকে জ্যোৎস্না যেন লুকোচুরি খেলতে লাগল কিন্তু রুটীর টুকরো আর খুঁজে পাওয়া গেল না। বনের পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে যেখানে খাবার পেয়েছে খেয়ে গেছে। হান্‌সেল তবু বলে, "দাঁড়াও, এই এখনি আমরা পথ খুজে পাব।" এমনি করে চলে চলে রাত শেষ হয়ে গেল। দিনের আলোয় চারদিক খুজে খুজেও তারা কোন পরিচিত পথ দেখতে পেল না। আবার দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল। ক্ষিদেয় পরিশ্রমে কাতর হয়ে পা আর চলে না—অবশেষে এক গাছতলায় শুয়ে দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

তৃতীয় দিন সকালে উঠে আবার তারা চলতে আরম্ভ করল; কিন্তু পথ কোথায়? যে দিকেই চায়, বনের যেন আর শেষ নেই। হান্‌সেল বুঝল, শীগগির কোন সাহায্য না পেলে তাদের এমনি করে ক্ষিদেয় শুকিয়ে মরতে হবে। দুপুর বেলা তারা দেখতে পেল একটা ভারী সুন্দর শাদা পাখী গাছের উপর বসে চমৎকার গান করছে। একটু পরেই সেটা উড়ে গেল। দু ভাই-বোনে ক্ষিদে তেষ্টা ভুলে পাখীটার পিছনে পিছনে দৌড়ে চলল। কতকদূর গিয়েই দেখে দূরে একটা সুন্দর বাড়ী।

তার উপর বসে পাখীটা কি যেন ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। এতক্ষণে একটা আশ্রয় পাওয়া যাবে ভেবে দুই ভাই বোনে সেই বাড়ীর দিকে ছুটল। গিয়ে দেখে ভারী মজার বাড়ী, বাইরেটা, রুটী, কেক্ দিয়ে তৈরী আর জানালাগুলি চিনির। হান্‌সেল বলল, "এবার তবে আমরা পেট ভরে খেতে পারব। ছাতের এক টুকরো খেয়ে দেখি ত জিনিসটা কেমন।" গ্রেথেল্ জানালার কাছে এগিয়ে একটু কামড়ে নিয়ে খেতে লাগল। এমন সময় ভিতর হ'তে ভারী মিষ্টি গলায় কে বলল—'বাইরে কে গো তোমরা দরজায় ধাক্কা দিচ্ছ?" ওরা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, বাতাস—বাতাস! স্বর্গের থেকে এসে দরজায় লাগছে। দু ভাই-বোনে মহা আনন্দে ছাদের কেকের টুকরো জানালার চিনি ভেঙ্গে ভেঙ্গে খাচ্ছে, এমন সময়ে হঠাৎ দরজা খুলে এক থুড়থুড়ে বুড়ী বেরিয়ে এল। ওরা ভয়ে ভয়ে হাতের খাবার ফেলে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল। কিন্তু বুড়ী এসে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর

করে বলল, "ওমা, এমন সুন্দর ছেলেমেয়ে তোমরা এখানে এলে কেমন করে? এস, এস আমার কাছে



দরজা খুলে এক থুড়থুড়ে বুড়ী বেরিয়ে এল

থাকবে, তোমাদের কোন কষ্টই হবে না।" এই বলে তাদের হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল। তারপর ভাল ভাল খাবার খাইয়ে তাদের যত্ন করে ভাল বিছানায় শুইয়ে দিল। এই ক'দিনের দুঃখকষ্ট সব ভুলে গিয়ে ছেলে মেয়ে দুটি আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

[৩]

এই বুড়ী কিন্তু আসলে এক ডাইনী। নানারকম সুন্দর খাবারের লোভনীয় বাড়ী তৈরি করে ছেলে-ধরা ফাঁদ পেতে বসে থাকে। তার পর কোন ছেলেমেয়ে এলে তাকে আদর করে বাড়ীতে নিয়ে যায় বটে কিন্তু অবশেষে তাকেই মেরে রান্না করে খায়। ডাইনীদের চোখ লাল রংএর হয়, আর তারা বেশী দূর অবধি দেখতে পায় না। এদিকে তাদের ঘ্রাণশক্তি আবার তেমনি জোরাল, অনেক দূরের ছেলেমেয়ের গন্ধ সহজেই বুঝতে পারে। যখন হান্‌সেল আর গ্রেথেল আসছিল ডাইনী বুড়ী আগে থেকেই সব টের পেয়ে খুব খুসী হয়ে মনে মনে বলছিল, "ঐ যে আসছে দুটি কচি কচি বাচ্চা, আমার হাত থেকে ওদের আর নিস্তার নেই।"

ভোরের দিকে ডাইনী হান্‌সেল আর গ্রেথেলের বিছানার কাছে গেল। এমন সুন্দর নরম হাত-পা, ফোলা ফোলা গাল দেখে যে তার খুব মায়া হ'ল তা নয়, বরং জিভ থেকে জল ঝরতে লাগল। কিছুক্ষণ ধরে ওদের দেখে বুড়ী চট করে হান্‌সেলকে তুলে নিল আর একটা বড় লোহার খাঁচার মধ্যে তাকে বন্ধ করে দিল। হান্‌সেল কত কান্নাকাটি করল কিন্তু কিছুই লাভ হ'ল না। তার পর এল গ্রেথেলের পালা। বুড়ী তাকে এক ঝাকুনী দিয়ে উঠিয়ে বলল, "যা যা শীগগির জল নিয়ে আয়, তার পর ভাল করে রান্না করে তোর ভাইকে খেতে দে। ওটা অমনি বন্ধ থাক —যখন খেয়ে দেয়ে বেশ মোটা হবে তখন ওকে খাব।" গ্রেথেলের তখনকার অবস্থা ত বুঝতেই পার। সে যে কত কাঁদল, কত মিনতি করল, হান্‌সেলকে ছেড়ে দিতে কিন্তু কিছুতেই রাজি হ'ল না—বুড়ী তাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিতে লাগল। আর হান্‌সেলকে মোটা হবার জন্য ভাল ভাল খাবার দিয়ে গ্রেথেলকে কেবলমাত্র কাঁকড়ার দাঁড়া খেতে দিত।

[৪]

রোজ সকালে ডাইনী একবার করে খাঁচার কাছে আসত, হান্‌সেল কতটা মোটা হ'ল দেখতে। বুড়ী চোখে ভাল দেখতে পায় না, বলত, "হান্‌সেল তোমার আঙুল বা'র করত দেখি কেমন মোটা হচ্ছ।" হান্‌সেল খুব চালাক ছেলে, সে একখানা হাড় রেখে দিয়েছিল রোজই সেখানা একটু এগিয়ে ধরত আর ডাইনী তাতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কেবলই বলত, "এত খাওয়াই, তবু কিছুই এর হচ্ছে না কেন?" এমনি করে যখন চার সপ্তাহ কেটে গেল, তখন ডাইনীর আর আর সবুর সইল না। একদিন সে চটেমটে গ্রেথেলকে বলল, "যা জল নিয়ে আয়, আর মিছামিছি দেরী করব না, এখনই আমি ওকে রেঁধে খাব। গ্রেথেলের ত ভয়ে প্রাণ গেল গেল। সে জল আনতে গিয়ে কেঁদে কেঁদে ভগবানের কাছে প্রর্থনা জানাতে লাগল, "হে ভগবান্, এবার আমাদের রক্ষা পাবার একটি উপায় করে দাও এর চেয়ে ত বনের জানোয়ারের হাতে মরাও ছিল ভাল, দুজনে এক সঙ্গে মরতাম!" এ রকম করে বেশীক্ষণ কাঁদবার সুযোগ তার হ'ল না, ডাইনীর ধমকের চোটে তাড়াতাড়ি জল নিয়ে রান্না

ঘরে এসে সে দেখে বুড়ী উনুন ধরিয়ে, ময়দা মেখে বসে আছে। তাকে দেখেই ডাইনী বলল, "আগে আমি



এত খাওয়াই তবু এর কিছু হচ্ছে না

রুটী সেঁকে নেব। দেখ্‌ত তন্দুরটা (Oven) তৈরী হয়েছে কি না।" ডাইনীর মতলব ছিল, এই সঙ্গে গ্রেথেলকেও শেষ করে দেওয়া। গ্রেথেল তা বুঝতে পারল। কিন্তু কেমন করে ভাইয়ের প্রাণ বাঁচায়, সে তখন নানারকমে ভাবছে। হঠাৎ তার এক বুদ্ধি যোগাল। সে বলল, তন্দুর কোথা দিয়ে দেখতে হয়, আমি ত জানি না, আমায় দেখিয়ে দাও।" ডাইনী ভারী রেগে বলল, "এই এত বড় দরজা রয়েছে —আমি শুদ্ধ যেতে পারি, আর তুই দেখতে পারিস না।" এই বলে যেই না সে দরজার ভিতরের দিকে একটু এগিয়েছে গ্রেথেল অমনি তাকে এক ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ফেলে দরজা এটে দিলে। ডাইনী সেই গরম তন্দুরে বন্ধ হয়ে চীৎকার করে জলে পুড়ে মরে গেল।

গ্রেথেলের তখন কি মজা! সে ছুটে গিয়ে খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে হান্‌সেলকে এই সুসংবাদ জানাল। দু ভাই-বোনের তখন কি রকম আনন্দ হ'ল বুঝতেই পারছ। তারপর দুজনে মিলে সব ঘর-গুলিতে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ডাইনীর বাড়ীতে অনেক দামী দামী জিনিষ ছিল; আর শোবার ঘরটিতে অনেক মণি-মুক্তা ছিল। হান্‌সেল তার কতকগুলি নিয়ে দু পকেট বোঝাই করে ফেলল। গ্রেথেলও তার দেখাদেখি কোচড় ভরে মুক্তা নিয়ে নিল। তারপর সেই প্রকাণ্ড মায়াবনের মধ্য দিয়ে বাড়ীর পথ খুঁজে খুঁজে দুজনে এক নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল। পার হবার কোন উপায়ই নেই দেখে হান্‌সেল একেবারে নিরাশ হয়ে বসে পড়ল। গ্রেথেল বলল, "দাঁড়াও, আমি একটা চেষ্টা করে দেখি।" নদীতে একটা বড় রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছিল। গ্রেথেল গান গেয়ে বলতে লাগল—"সুন্দর রাজহাঁস, তোমার কোন্‌ দেশে বাড়ী? আমরা দুটি ভাই-বোন এখানে পড়ে আছি। আমাদের দয়া করে পার করে দাও না।" অমনি রাজহাঁসটি এসে পাখা মেলে বসে একে একে তাদের পিঠে করে নদী পার করে দিল।



আমি শুদ্ধ যেতে পারি—তুই পারিস্‌নে

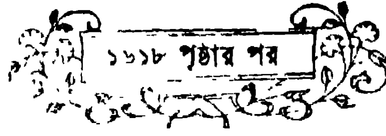
এ পারে এসেই তারা দেখে একেবারে চেনা-রাস্তা! হান্‌সেল ও গ্রেথেল তখন মনের আনন্দে ছুটতে আরম্ভ করল। একটু পরেই গাছ-পালার মধ্যে দিয়ে যখন বাড়ী দেখা যেতে লাগল, তখন তাদের মুখে হাসি আর ধরে না। বাড়ী পৌঁছে তারা দেখে কাঠুরে তাদের হারিয়ে কেঁদে কেঁদে দিন কাটাচ্ছে। হঠাৎ ছেলেমেয়েকে এ রকম ভাবে ফিরে পেয়ে সে যেন হাতে স্বর্গ পেল। তারা যে মণি মুক্তা এনেছিল, তাই বেচে অভাব দূর হ'ল। তারপর সকলে মিলে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল।







অঙ্গার যুগ ও পাথুরে কয়লা



তোমরা পাথুরে কয়লা চেন ত? ভূগর্ভ হতে খুঁড়ে যে কয়লা তোলা হয়, তাকেই বলে খনিজ বা পাথুরে কয়লা। এই কয়লা আমাদের বর্তমান যুগের সভ্যতার একটা প্রধান উপাদান। এর থেকে গ্যাস্ বের করে বড় বড় সহরে আলো দেওয়া হয়। এরই জোরে রেলগাড়ী, জাহাজ, মস্ত মস্ত পাটের কল কাপড়ের কল চলে। এরই সাহায্যে রাঙ্গা মাটি পুড়িয়ে লোহা বের করা হয়, আবার সেই লোহা থেকে ইস্পাত তৈরী হয়। রাণীগঞ্জে যদি পাথুরে কয়লার খনি না বেরোত, তাহলে জামশেদপুরে, বরাকরে লোহার কারখানাও হত না। নিউকাস্‌লে, ওয়েল্‌সে, যদি মাটির ভেতর কয়লা না থাকত, তাহলে ম্যাঞ্চেষ্টারে কাপড়ের কলও হত না, শেফিল্ডে লোহার কারখানাও হত না। ইংলণ্ডের এ জগৎ জোড়া সাম্রাজ্যও হত না।

ভূতত্ত্ববিৎ হল্যাণ্ড সাহেব তাই বলতেন যে, আমাদের বাঙ্গলা দেশের আশে-পাশে মাটিতে লোহা আর কয়লা এত আছে যে, একদিন এই দেশ ইংলণ্ডের মত কল-কারখানায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। নিশ্চয়ই উঠবে, যদি তোমরা ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েরা দিবারাত্র ঘুম না দাও। তোমাদের মাথায় ভগবান্ বুদ্ধি দিতে ত কসুর করেন নাই, কোমর বেঁধে দাঁড়ালে সবই করতে পারবে তোমরা।

আচ্ছা, তোমরা কি এ কথা ভাবছ যে, আমি মিছেমিছি কয়লার এত গুণগান করছি—কয়লার কোন দরকার নেই, বিদ্যুতের শক্তিতে তোমরা কল চালাবে, রেল ছোটাবে, সহরে রোশনাই করবে! তা করতে পার, কিন্তু অত বিদ্যুৎ তোমার আসবে কোথা থেকে? যে ডাইনেমো কল চালিয়ে বিজলী তৈরী করতে হবে, সে ডাইনেমো চলবে কিসের জোরে? দু'চার জায়গায় নায়েগ্রা কি কাবেরীর মতন জলপ্রপাতের জলের তোড়ে চাকা বসিয়ে কল চালাতে পার। কিন্তু বেশীর ভাগ সহরে কয়লা পুড়িয়ে ডাইনেমো চালাতে হবে।

তোমাদের মত বুদ্ধিমান্ ছেলেমেয়ে হয়ত আবার একটা খুঁত ধরবে! হয়ত বলবে যে, মোটরগাড়ী, উড়ো জাহাজ, এগুলো চালাতে ত আর কয়লা দরকার হয় না। হয় না, আমি মানি। কিন্তু পেট্রোল, কেরোসিন এরা যে কয়লারই ছোট ভাই। একই জননীর গর্ভে এদের জন্ম। তা ছাড়া, কি জান, পেট্রোল, কেরোসিন পৃথিবীতে খুব বেশী নেই, এত নেই যে, তাই দিয়ে দুনিয়ার সব কল-কারখানা একটি মাসও চলতে পারে। উপরন্তু, আজকাল সকল দেশেই যে রকম উড়ো জাহাজের বহর হয়েছে, আর কিছু দিন পরে তাদেরই খোরাক জোগান কঠিন হয়ে উঠবে। কল চালাবার জন্য পেট্রোল পাবে কোথায়!

কাজেই আমাদের নির্ভর করতে হবে কয়লার উপরই।

আচ্ছা, এখন দেখা যাক, এই কয়লা জিনিসটা কি, মাটির ভেতর এল কোথা থেকে। আগে তোমাদিকে বলেছি, মনে আছে যে, প্রকৃতিতে যত কিছু পদার্থ আছে তাকে দুই ভাগ করা যায়—মৌলিক ও যৌগিক। মৌলিক পদার্থের মধ্যে আমাদের একটা সব চেয়ে অন্তরঙ্গ জিনিস হচ্ছে—অঙ্গার। এই অঙ্গার প্রত্যেক জীব ও প্রত্যেক উদ্ভিদের শরীরের প্রধান অংশ। উদ্ভিদ তার দেহের অঙ্গার সংগ্রহ করে বায়ুমণ্ডল বা আকাশ থেকে, এ কথা তোমরা জান। আর, প্রাণীরা তাদের দেহের অঙ্গার পায় উদ্ভিদ্ থেকে, অর্থাৎ যে সব ঘাস-পালা, তরী-তরকারী খায়, তার থেকে। এই যে প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীরের অঙ্গার, এর থেকেই উৎপত্তি কেরোসিন পেট্রোলের, এর থেকেই জন্ম পাথুরে কয়লার। কেরোসিন, পেট্রোলের বিষয় আজ কিছু বলব না, তবে এইটুকু মাত্র জেনে রেখো যে, ওরা অঙ্গারের যৌগিক পদার্থ।

কয়লা হচ্ছে ভূগর্ভের এক প্রকারের শিলা। তিন রকম শিলার কথা বলেছিলাম, মনে আছে ত —জলজ, আগ্নেয় ও পুনর্গঠিত। কয়লাকে জলজ শিলা বলা হয়ে থাকে, কেননা, বেলে পাথর, চূণ পাথর ইত্যাদির যেমন জলের মধ্যে জন্ম হয়, কয়লারও তাই। পাথুরে কয়লার প্রধান উপাদান মৌলিক অঙ্গার। তবে অন্যান্য শিলার মধ্যে যেমন আর পাঁচটা দ্রব্য মিশে রয়েছে, এতেও তাই নানা রকমের ভাল-মন্দ পাথুরে কয়লা আছে। পরে তাদের নামগুলো তোমাদিগকে বলব। কিন্তু যে কয়লাতে মৌলিক অঙ্গার যত বেশী আছে, সেই কয়লা তত উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য। এই মৌলিক অঙ্গার কয়লার মধ্যে এসেছে পুরাকালের উদ্ভিদের দেহ হতে। ভেবে দেখ, কি রকম মজার কথা হল। পুরাকালের উদ্ভিদগুলো আকাশ থেকে যে অঙ্গার সংগ্রহ করেছিল, তাই সঞ্চিত হয়ে রয়েছে মাটির ভেতর তোমাদের জন্য, তোমরা তার সাহায্যে জগতে সভ্যতা বিস্তার করবে বলে।

ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগকে ক্ষিতিমণ্ডলের স্তরগুলোর একটা ছক এঁকে দিয়েছিলাম মনে আছে ত। সেই ছকের মাঝখানটায় একটা যুগ দেখতে পাবে, যার ইংরেজী নাম Carboniferous অর্থাৎ অঙ্গার যুগ। কয়লার খনিগুলোর গোড়াপত্তন হয়েছিল এই যুগে। পৃথিবীর বেশীর ভাগ কয়লার খনি ঐ সময়েই যদিও অনেক পরে পর্য্যন্ত (চা খড়ির যুগ পর্য্যন্ত) কয়লার স্তর গড়ে উঠেছিল। ভূবিদ্যা সম্বন্ধে একটা কথা তোমাদিগকে এইখানেই বলি। লাটিনে এক কথা আছে, প্রকৃতিদেবী কখনও লাফ মারেন না। এর মানে এই যে, অমুক বছরের অমুক তারিখে অঙ্গার যুগ আরম্ভ হল, আর অমনি সব গাছগুলো কয়লা হয়ে যেতে লাগল—কিংবা অমুক বছরের অমুক দিনে সব শামুক-গুগলি জলে পড়তে আরম্ভ করলে আর চা-খড়ির সৃষ্টি আরম্ভ হল—এ রকম সংসারে কখন হয় নাই। যুগগুলোর সীমা রেখা অস্পষ্ট। প্রকৃতি ধীরে ধীরে এক যুগ হতে আর এক যুগে প্রবেশ করেছেন। তোমাদিগকে আগেই বুঝিয়েছি যে, পণ্ডিতেরা শিলাস্তরগুলো খুঁড়ে পরীক্ষা করে ধীরে ধীরে কি রকমে বসুন্ধরার অতীত জীবনের ইতিহাস জানতে পেরেছেন। জানতে পেরেছেন, বলছি—কিন্তু সত্যি কথা এই যে, আন্দাজ করেছেন। নিশ্চিত ত কিছু বলা যায় না। একটা স্তর দেখে যেটা আন্দাজ করেছেন সেটা বার বার নানা রকমে যাচাই করে তবে নিজের সিদ্ধান্ত বলে লোকসমাজে প্রচার করেছেন। আজ আমরা মোটামুটি বুঝতে পারি, ভূমণ্ডলের জ্বলন্ত গোলক কেমন করে আস্তে আস্তে জুড়োতে লাগল, কেমন করে বাইরের খোলটা জমে কঠিন হল কিন্তু ভেতরটা তরল অগ্নিময় রইল, কেমন ক'রে নানা প্রকারের ধোঁয়া বেরিয়ে চারিদিকে বায়ুমণ্ডল বা আকাশ সৃষ্টি করলে। এই যে গ্যাসগুলো বেরিয়েছিল, এর মধ্যে মুক্ত অক্সিজেন খুব কমই ছিল। খানিকটা অক্সিজেন অঙ্গার খেয়ে কয়লা পোড়া ধোঁয়া হয়ে গেল। খানিকটা হাইড্রজেনের সঙ্গে মিশে জলের বাষ্প হয়ে গেল। একবার যখন জলের সৃষ্টি হল, তখন সেই জল কখন ঝড়-বৃষ্টির রূপ ধরে,' কখন নদনদীর রূপ ধরে' ডাঙ্গার সঙ্গে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ জুড়ে দিলে। ভূগর্ভের যে আগুন, সেও কিছু চুপ করে, বসে রইল না। ভেতর থেকে ক্রমাগত ধাক্কাধাক্কি মারে, সুবিধা পেলেই ঠেলে ফুঁড়ে বাহিরে এসে খানিকটা জায়গা লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। এই রকম করে যুগ-যুগান্ত ধরে জলে স্থলে আগুনে ধস্তাধস্তি চলল। আজ যেখানে জল দুদিন বাদে সেখানে হয় ডাঙ্গা, আজ যেখানে

অঙ্গার যুগ ও পাথুরে কয়লা

ডাঙ্গা দুদিন বাদে সেখানে আসে সমুদ্র। বহুকাল পর্যন্ত এর মাঝে কোন চেতন পদার্থ ছিল না—না ছিল জীব, না ছিল উদ্ভিদ্। কিন্তু ক্রমশঃ তাপ কমে কমে যখন কতকটা সহনীয় হল, তখন ঈশৎ উষ্ণ জলমণ্ডলের মাঝে প্রথম সূত্রপাত হল প্রাণীশক্তির। উদ্ভিদ প্রথম দেখা দিলে অতি নগণ্য জলের শেওলা-রূপে, আর প্রাণীর আবির্ভাব হল অতি ক্ষুদ্র জেলীকণা-রূপে। আরও বহুকাল কেটে গেল। সৃষ্টি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ক্রমোন্নতির পথে। উদ্ভিদ ও জীব দুয়েরই রূপ বদলে বদলে যেতে লাগল।

পৃথিবীর এই ক্রমবিকাশের ইতিহাসে অঙ্গার যুগ একটা খুব বড় ব্যাপার। তখনও হিমালয়, ইউরাল, এণ্ডিজ প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী ভূগর্ভ হতে ওঠে নাই। পৃথিবীর সর্বত্র হ্রদ, বিল, জলাভূমি। আর তার মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর উঁচু পাড়—ইচ্ছা হলে তাকে পাহাড়ও বলতে পার। চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ পালা। তবে সে গাছ আজকালকার বট, অশ্বত্থ, ওক, আম কাঁটালের জাতেরও নয়, ঝাউ-দেবদারুর জাতেরও নয়। অর্থাৎ সে গাছে ফুলও ধরত না, দেবদারুর মত cone-ও ধরত না। সে গাছের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বর্তমান কালের ফার্ণজাতীয় কয়েক রকম আগাছার সঙ্গে। ফার্ণ তোমরা নিশ্চয়ই চেন। দার্জিলিং পাহাড়ের গায়ে অজস্র জন্মায়। আমাদের বাঙ্গলা দেশে বর্ষার সময়ে ঝোপ জঙ্গলে নদী নালার ধারেও অনেক হয়। উত্তরবঙ্গে আমরা ওকে বলতাম ঢেঁকীশাক। বর্তমান কালের Club moss Horsetail ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আগাছা অঙ্গার যুগের বনে ছিল বড় বড় গাছ। সেই স্যাঁৎসেঁতে গরম হাওয়াতে এই সব গাছ একশো ফুট পর্যন্ত উঁচু হত। গাছগুলো জন্মাত, পাহাড়ের উপরে নয়, নীচে জলার ধারে, পাঁক কাদার মাঝে। এত গাছ-গাছড়া, কিন্তু একদম ফল-ফুল ছিল না। পাতার উপরে গুটি বেরোত, যেমন আজও ফার্ণের পাতায় দেখা যায়। সেই গুটিই ছিল তাদের বীজ—তার থেকে নূতন গাছ জন্মাত। আকাশে একটাও পাখী উড়ত না। তখনও পাখীর জন্ম হয় নাই। ডাঙ্গার জানোয়ার মোটে ছিল না, তখনও আকাশে অক্সিজেনের অভাব। শ্বাস-প্রশ্বাস নেবে কি করে। জন্তু যা ছিল, সব উভচর, ব্যাঙের মতন, কুমীরের মতন। তারা জল থেকে বেরিয়ে কাদার উপর একটু লাফালাফি করে আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু উভচর বলে তারা আজকালকার ব্যাঙ কি Newt-এর মতন ছোট্ট প্রাণী ছিল না। এক একটা আকারে ছিল মহিষের প্রমাণ। আগে তোমাদিগকে Labyrinthodont-এর কথা বলেছি, মনে আছে ত! মাকড়সা, বিছে, আরসোলা, তেলাপোকা যথেষ্ট ছিল—আর বেশ বড় বড়। জলে মাছের অভাব ছিল না। তবে তারা সব চিংড়ী মাছ কাঁকড়ার মত বর্মচর্মপরিহিত ছিল। এই যুগের শেষের দিকে ধীরে মাছ থেকে সরীসৃপের উদ্ভব হতে আরম্ভ হল। কয়লার স্তরে, কি তার উপর-নীচের কাদা কি বেলে পাথরে স্তরে, এই সমস্ত প্রাণীর অস্থির নানা চিহ্ন পাওয়া গেছে।

ফার্ণজাতীয় যে গাছগুলোর কথা উপরে বলেছি, পণ্ডিতদের মতে তারা কয়লা গঠনের জন্য অন্যান্য গাছের চেয়ে ঢের বেশী উপযোগী। কেন, তা বলতে চেষ্টা করে আর কথা বাড়াব না। এটা তোমরা বিশ্বাস করে নাও। আম, কাঁঠাল, ওক দেবদারুর কয়লা আজও ত কোথাও দেখতে পাওয়া যায় নাই। আচ্ছা ধর, কোন জলার মাঝে এক সুন্দর ফার্ণ-বন রয়েছে। হঠাৎ হল কি! ভূগর্ভের আগুনের ঠেলাঠেলিতে সমস্ত জলাটা বসে নেমে পড়ল। তোমার বনশুদ্ধ জলের ভিতর চলে গেল। তারপর যথানিয়মে বছরের পর বছর পাহাড় থেকে মাটি, বালি, নুড়ি, কাঁকর সব বৃষ্টির জলে ধুয়ে ধুয়ে এসে সেই জলে পড়তে লাগল। ফার্ণ-বন চাপা পড়ে গেল গাদা গাদা মাটি বালির নীচে। এই ব্যাপার বহু যুগ ধরে চলল। আগে তোমাদিগকে বলছি ত যে, চাপা পড়লে বালি হয়ে যায় বেলে পাথর, শামুক-গুলী হয়ে যায় চূণ পাথর, কাদা হয়ে যায় shale (সেল)। উদ্ভিদের দেহের উপর চাপ পড়লে সে হয়ে যায় কয়লা। কয়লা হয়ে যায়, মানে তার শরীরের অন্য অনেক পদার্থ উবে যায়, কি রূপান্তরিত হয়ে যায়, পড়ে থাকে প্রধানতঃ অঙ্গার। আর সেই অঙ্গার উপরের মাটি-পাথরের ওজনে জমাট বেঁধে দানাদার শক্ত পাথর হয়ে উঠে। কাঠ পোড়ালে কয়লা হয়, তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। খানিকটা চাল নিয়ে তাওয়ার উপর ভাজলে সেটা প্রথমে লালচে রঙ্গের চাল-ভাজা হয়ে যায়। আরও খানিকক্ষণ ভাজলে

পুড়ে কালো হয়ে যায়। আমরা ছেলেবেলায় ঐ পোড়া চাল গুঁড়িয়ে বিস্তর কালী তৈরী করতাম। কাঠ কি চাল পুড়ে কালো হয়ে গেল, মানে, তার দেহের জল ইত্যাদি অনেকগুলো পদার্থ বেরিয়ে দেখো, কত রকম সুন্দর রঙ বেরোবে ওর কালো দেহের ভিতর থেকে। একটা মজবুত ছুরী নিয়ে যদি একখণ্ড কয়লাকে ভেঙ্গে পাৎলা পাৎলা প্লেটের মতন টুকরো কর ত দেখবে তার ভেতরে কত কি



এই সব গাছ একশো ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'ত

গেল, বা রূপান্তরিত হয়ে গেল, পড়ে রইল অঙ্গার। শস্যের মরাইয়ে ধান চাল অনেক দিন পড়ে থাকলে কালো হয়ে যায়, নিশ্চয় শুনেছ। সেকালের পুরানো কেল্লার গোলাঘরে সঞ্চিত গম, চাল একেবারে কয়লা হয়ে গেছে, এ আমি অনেকবার দেখেছি। তবে কি জান, পুরানো গোলাঘরের কালো চাল, কিংবা পোড়া কাঠ, এ সবের উপরে ত আর হাজার হাজার ফুট পাথরের চাপ পড়ে নাই! তাই তারা জমাট বাঁধে না, দেখতে চাল কি কাঠের মতনই থাকে, শুধু রঙটা কালো হয়ে যায়। কিন্তু খনিজ কয়লা, শুধু কালো বর্ণ তা নয়, একেবারে পাথর হয়ে গেছে। এই পাথুরে কয়লা যে কি সুন্দর পদার্থ, তা তোমরা হয় ত ঠিক বুঝতে পার না, কেননা ছোট বেলা থেকে রোজই দেখছ ঐ পদার্থ। কিন্তু ভাল করে নজর করে দেখো ওর কি চমৎকার দানাদার গড়ন। রোদে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দাগ! গাছের বোঁটার দাগ, পাতার দাগ ত দেখতে পাবেই। উপরন্তু সময়ে সময়ে তার ভিতর দেখবে সেই মান্ধাতার আমলের গাছের গায়ের গুটির লালচে লালচে দাগ। আরও দেখতে পাবে সেই আমলের নানা পোকা মাকড়ের অঙ্গের টুকরো। কয়লা খুব পাতলা করে কেটে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে তার মধ্যে নানা আশ্চর্য্য রকমের রঙের খেলা দেখতে পাওয়া যায়। এ সব অবশ্য তোমরা বড় হয়ে দেখবে। এখন তোমাদের হাতে আর অনুবীক্ষণ যন্ত্র কে দেবে। আমার একটু বেশী বয়সে পাথুরে কয়লার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। কয়লার উনুনের গনগনে আঁচ তার নীলাভ আগুনের শিখা, দেখে মহা আনন্দ হত। পড়বার টেবিলের উপর বছর খানেক পর্য্যন্ত এক গাদা কয়লার নুড়ী জমিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। সেগুলো ভেঙ্গে চুরে কত রকম খেলা খেলতাম। কয়লা যে এত

সুন্দর জিনিষ তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই,কেন না পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে মণি, হীরা, সেও ভূগর্ভের জমাট অঙ্গার বই আর কিছু নয়।

আচ্ছা, অঙ্গার যুগে যে পৃথিবীতে এত গাছ-পালা জঙ্গল, এর জন্য বায়ুমণ্ডলের কি তফাৎ হল, আন্দাজ করতে পার? তোমাদিগকে আগেই বলেছি যে, গাছ-পালা আকাশ থেকে অঙ্গার সংগ্রহ করে আপন শরীর বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ আকাশে যে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস (বা কয়লা পোড়া ধোয়া) আছে, তার অঙ্গার ভাগটা নিজের দেহে টেনে নেয়, আর অক্সিজেন ভাগটা ছেড়ে দেয়। ঠিক আমাদের উল্টো—আমরা অক্সিজেন টেনে নিই আর কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস ছাড়ি। অঙ্গার যুগে যখন লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ্ এক সঙ্গে এই অঙ্গার ভক্ষণ আরম্ভ করলে, তখন তার ফলে আকাশে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের ভাগ হু হু করে বেড়ে চলল। বাতাস প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাসের উপযোগী হয়ে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নূতন নূতন ধরণের অক্সিজেন পায়ী জীবের আবির্ভাব হতে আরম্ভ হল।

উভচর, সরীসৃপ, ব্যোমচারী, স্তন্যপায়ী, এই সমস্ত প্রাণীর ইতিবৃত্ত এখানে বলার কথা নয়। এইটুকু-মাত্র মনে রেখো যে, প্রাণিজগতের এই ক্রমবিকাশ সম্ভব হত না, যদি সেকালের গাছ ফার্ণের জঙ্গল-গুলো বায়ুমণ্ডল পরিষ্কার করে না দিত। পৃথিবী তাহলে আজও সেই পুরাকালের পোকা মাকড়ের রাজত্ব থাকত।

আগে তোমাদিগকে বলেছি যে, অঙ্গার যুগে একেবারে জঙ্গলকে জঙ্গল জলে ডুবে গিয়ে কয়লার খনির গোড়াপত্তন করত। কিন্তু সব সময়েই যে এই রকম হত, তা নয়। অনেক সময় গাছের ডাল পালা দূর দূর থেকে স্রোতে কি জোয়ার ভাটার টানে ভেসে এসে এক জায়গায় গাদাবন্দী হত। তারপর সেগুলো জলের তলায় চলে গেলে তার উপর মাটি বালি চাপা পড়ত এবং কালের গতিতে সেখানটায় একটা কয়লার স্তর গড়ে উঠত। কয়লার স্তরের নীচে সব সময়ে সেল্ বা জমাট কাদার পাথর পাওয়া যায়। আর, উপরে পাওয়া যায়, হয় সেল, নয় বেলে পাথর। অবশ্য এই সমস্ত স্তরগুলো ভূগর্ভে আগুনের ঠেলায় দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে থাকতে পারে। কিংবা ভেতর থেকে গলা আগ্নেয় পাথর বেরিয়ে কয়লার স্তরের উপরে বা নীচে ঢুকে গিয়ে থাকতে পারে। কি করে এসব ব্যাপার ঘটে, তা তোমাদিগকে আগের পরিচ্ছেদে ছবি একে বুঝিয়ে দিয়েছি। যারা খনি থেকে কয়লা তুলতে যায়, তাদের এই স্তরগুলোর অবস্থা বেশ করে পরীক্ষা করে নিতে হয়। নইলে ভুল জায়গায় গর্ত্ত খুড়ে অনর্থক অনেক পয়সা নষ্ট হয়। ভূগর্ভের কয়লার স্তর কত গভীর হবে, তার কোন স্থিরতা নেই। দু-তিন ইঞ্চিও হতে পারে, ত্রিশ চল্লিশ ফুটও হতে পারে, বেশীও হতে পারে। তবে অন্ততঃ ফুট তিনেক পুরু স্তর না পেলে খুড়ে মজুরী পোষায় না। কখন কখন কয়লার স্তরের মাঝে স্পষ্ট ফার্ণ গাছের গুঁড়ি দেখতে পাওয়া যায়, আর তার নীচের সেল্-এর স্তরে শেকড় গুলো দেখা যায়। হয়ত বা উপরের বেলে পাথরের স্তরে ডাল পালার ছিহ্নও পাওয়া যায়। শিশু ভারতীর ১৪৭৪ পৃষ্ঠায় ছবি দেখ এ রকম হলে পণ্ডিতরা ধরে নেন যে, গাছটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেই খানেই কয়লা বনে গেছে অর্থাৎ ঐ স্থানের সারা জঙ্গলটা জলে ডুবে বালি চাপা পড়েছিল।

কোন কোন জায়গায় এখনও দেখা যায় যে, সেল-এর উপর পাত্‌লা কয়লার স্তর, তার উপর আবার সেল, আবার কয়লা, আবার সেল, আবার কয়লা এই রকম পরদার উপর পরদা পড়ে গেছে। এই অবস্থা কেমন করে হয়েছে তোমরা সহজেই আন্দাজ করতে পারবে। প্রথমে খানিকটা ডালপালা জমে জলে তলিয়ে গেছে, তার উপর কাদা বালি পড়েছে, আবার ডালপালা জমেছে, আবার তলিয়ে গেছে, এই রকম বার বার হয়েছে। কোন কোন জায়গায় এই রকম আশী, একশো পরদা কয়লা পর্য্যন্ত দেখা যায়। কয়লার স্তর ও তার মাঝের সেল্ বেলে পাথরের স্তর সবশুদ্ধ বারো হাজার চোদ্দহাজার ফুট পর্য্যন্ত গভীর হয়। এক ফুট কয়লা তৈরী করতে পঞ্চাশ দফা ফার্ণের ডালপালা লেগেছে পণ্ডিতেরা এই রকম আন্দাজ করেন। এক এক দফা ফার্ণের ডালপালা পাকা কয়লা হতে অন্ততঃ দশ বছর লাগে। এই রকম হিসেব করে পণ্ডিতবর্গ হক্সলী স্থির করেছেন যে, বারো হাজার ফুট গভীর স্তরগুলো জলের মধ্যে পড়ে পাকতে ষাট লক্ষ বছর সময় লেগেছে। এর থেকে তোমাদের কতকটা কল্পনা হবে যে ভূবিদ্যার যুগ মানে কি!

তোমাদিগকে আগেই বলেছি যে, কয়লার খনির পত্তন জুরাসিক্, কি চা-খড়ির যুগ অবধি চলেছে।

কিন্তু অঙ্গার যুগের খনির কয়লা যে রকম সুন্দর জমাট বাঁধা, পরের যুগের কয়লা সে রকম নয়। যে কয়লা যত জমাট হবে, যাতে অঙ্গারের ভাগ বেশী থাকবে, সেই কয়লা তত মূল্যবান্। মূল্যবান্ এই জন্য যে, সেই কয়লা পুড়িয়ে তত তাপ পাওয়া যাবে। আমাদের রাণীগঞ্জের কয়লার চেয়ে বিলেতী কয়লা থেকে ঢের বেশী তাপ পাওয়া যায়। তাই, কারখানাতে তার কদর অনেক বেশী। অবশ্য তোমরা এ কথা ভেবো না যে, কয়লা যত নীচে থেকে খুঁড়ে বের করা হবে, তত পুরানো, বা তত জমাট হবে। ভূগর্ভের আগুনের খেলার ফলে জলজ অঙ্গার। লোহা ইস্পাতের কারখানাতে anthracite খুব ব্যবহার হয়।

সব চেয়ে কাঁচা কয়লা হচ্ছে, Peat। জলা বিলের ধারে ঘাস, শৈবাল, পানা, আগাছা স্তূপাকার হয়ে জমে ধীরে ধীরে পচতে আরম্ভ করে। পচতে পচতে তার মধ্যের খানিকটা অঙ্গার আলাদা হয়ে যায়। এটা হতে খুব বেশী বছর লাগে না। পানা ও শৈবালের দেহে যে আয়োডিন আছে, সেইটে বেরিয়ে এই পচা ঘাস-পালার রাশির মধ্যের অঙ্গারকে ঠেলে বের করে দেয়। পীট্-এর গাদা কখন কখন প্রায় পঞ্চাশ ফুট গভীর হয়। তার উপরটা লালচে রঙ কিন্তু তলার দিকটা বেশ কালো। পীট্-এর প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ জল। বেশ করে শুকিয়ে নিতে হয়। নইলে কোন কাজে লাগে না। শুকনো পীট্ এ অঙ্গারের ভাগ শতকরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। বিলেতে গরীব লোকে রাঁধবার জন্য, আগুন পোহাবার জন্য, খুব পীট ব্যবহার করে।



শিলা ও কয়লার স্তরে সেকালের ফর্ণ গাছ

পীট্-এর চেয়ে আর একটা পাকা কয়লা হচ্ছে lignite বা Brown coal। এ কয়লা জ্বালিয়ে বিশেষ আঁচ হয় না। ভেতরকার গড়নও পাথুরে নয়, কাঠের মতন। তবে Lignite পীট্-এর মত আধুনিক জিনিস নয় সত্যিকার খনিজ কয়লা। অঙ্গারের ভাগ শতকরা ষাট।

পাথরের স্তরগুলো ত ক্রমাগত নীচে উপরে হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে অনেক সময় কয়লা খুব উপরেই পাওয়া যায়। তাই জমীটা পুকুর কাটার মতন করে কেটে নিয়ে পাশ থেকে কয়লার স্তর খুঁড়তে আরম্ভ করা হয়। অন্য অনেক জায়গার বিনা Shaft বা সুড়ঙ্গ না কেটে কয়লার স্তরে পৌঁছান যায় না।

এইবার তোমাদিগকে কয়েক রকম কয়লার নাম শিখিয়ে দেব, আর কোনটায় কত অঙ্গার আছে তার একটা আন্দাজ করে দেব। সব চেয়ে পাকা জমাট পুরানো কয়লা হচ্ছে, anthracite, এর সাধারণ নাম Stone coal যথার্থ পাথুরে কয়লা। এর শতকরা নব্বই ভাগের চেয়েও বেশী বিশুদ্ধ

Cannel coal বা গ্যাস কয়লার ভেতরের গড়নও পাথুরে, রঙও পাকা, কালো। তবে এর ভেতর থেকে এত গ্যাস বেরোয় যে, এর প্রধান ব্যবহারই হচ্ছে জ্বালানি গ্যাস তৈরী করা। অঙ্গারের ভাগ এতে শতকরা আশি।

আর এক রকম কয়লা আছে তাকে Dry Bituminous বলে। তার অঙ্গারের ভাগ শতকরা প্রায় নব্বই। তার প্রধান কাজ হচ্ছে Steam Engine চালান।

Lignite-কে কয়লা বলা হয় বটে, কিন্তু Jet (জেট্) বলে এক রকম খুব শক্ত কুচকুচে কালো lignite পাওয়া যায়, যাকে পালিশ করে চকচকে সুন্দর নানা রকম গহনা, হার, ব্রোচ, কাণের দুল ইত্যাদি তৈরী হয়।

Bitumen নামে আর এক রকম খনিজ কয়লা আছে। তার অঙ্গারের ভাগ গ্যাস্ কয়লার চেয়েও বেশী। কিন্তু তাকে জ্বালানি কাজে বড একটা ব্যবহার করা হয় না। আগুনে দিলেই গলে ফেঁপে ওঠে, আর তার ভেতর থেকে ফোঁস ফোঁস করে নানা রকম গ্যাস বেরোতে থাকে। তোমরা আলকাতরা চেন, যা দিয়ে শহরের রাস্তা তৈরী হয়? সেই আলকাতরা বেরোয় এই বিটুমেন কয়লা হতে। আলকাতরা যে শুধু রাস্তার কাজের জন্য উপযোগী, তা নয়। ওর থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় কত জিনিস পাওয়া যায়। সবগুলোর নাম এখানে করবার দরকার নেই। তবে একটা কথা তোমরা মনে রেখ, aniline dyes বলে যে সমস্ত জলজলে চমৎকার রঙ বাজারে পাওয়া যায়, সবই বেরোয় এই আলকাতরা থেকে।

এই যে নানাজাতীয় খনিজ কয়লার নাম করলাম, এর মধ্যে অঙ্গার ছাড়া আরও কত কি পদার্থ আছে। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ত আছেই! তা ছাড়া, ফসফরাস, গন্ধক, লোহা, ইত্যাদি অনেক পদার্থ আছে। এ সব বাজে জিনিস যত কম থাকে, কয়লা তত উৎকৃষ্ট হয়। গন্ধক, ফস্‌ফরাস্ থাকলে সে কয়লা ইস্পাত তৈরী করার কাজে লাগে না। অক্সিজেন বেশী থাকলে জ্বালিয়ে আঁচ হয় না। তবে কয়লাতে নাইট্রজেন আছে বলে আমরা গ্যাসের কারখানা থেকে একটা খুব উপকারী দ্রব্য পাই। নাইট্রজেন ও হাইড্রজেন মিলে এমোনিয়া তৈরী হয়। গ্যাসের সঙ্গে সেই এমোনিয়া বেরিয়ে আসে। গ্যাসটাকে জলের ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিলে, এমোনিয়ার ভাগটা জলে গলে যায়। এই এমোনিয়া সভ্যজগতে নানা কাজে লাগে।

তোমরা যদি কখনও পশ্চিমে বেড়াতে যাও, তাহ'লে দেখতে পাবে, সারি সারি সব কয়লার খনির চিমনি দেখা যাচ্ছে। এই সব খনি থেকে কয়লা তোলা হয়। কয়লা খনির ভিতর থাকে। খনির ভিতর নেমে গিয়ে মজুরেরা সব কয়লা তোলে। যদি কখনও কয়লার খনির নেমে দেখবার সুযোগ হয়, তাহ'লে দেখবার সেই সুযোগ ছেড় না। তাহ'লে বুঝতে পারবে, কেমন করে খনির ভিতর মজুরেরা স্তরের পর স্তর কাটছে, কেমন করে সে সব কয়লা উপরে তোলা হয়, কেমন করে লোকজন চলাফেরা করে—কি করে কয়লার শ্রেণীবিভাগ করে, চালান দেওয়া হয়—এই সব।

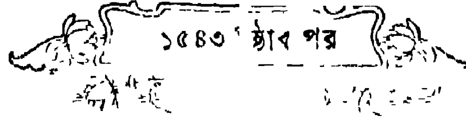
অনেক সময় কয়লার খনিতে দুর্ঘটনা ঘটে। নানারূপ সতর্কতা সত্ত্বেও অনেক সময় আগুন লেগে যায়,—ধ্বসিয়া পড়ে, তাতে বহু লোক জন মারা পড়ে। বিজ্ঞানের সাহায্যে আজকাল কয়লার খাদ হ'তে কয়লা তুলবার নানা সুব্যবস্থা হয়েছে। এ সব বিষয়ে তোমরা যত দেখবে, ততই শিখতে পারবে।

আমার কয়লার গল্প শেষ হল। কত উপকারে লাগে এই পদার্থ, তা বুঝলে ত? প্রকৃতি দেবী তোমাদের জন্য যুগ যুগান্তর ধ'রে এই উপকারী জিনিস সঞ্চয় করে রেখেছেন। তবে মানুষ যদি বিজ্ঞানের চর্চ্চা না করত, যেখানকার কয়লা, সেইখানেই পড়ে থাকত—তাকে খুঁড়ে বের করে কাজে লাগান আর হত না।

আর অঙ্গার যুগের ফার্ণ-জঙ্গলের প্রতিও তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কেন না, তারা বাতাস পরিষ্কার না করে দিলে জগতে মানুষের জন্মই হত না।



স্পেক্ ও গ্রাণ্ট



বহু শতাব্দী ধরিয়াই নীলনদের উৎস সন্ধানের সম্বন্ধে ইউরোপবাসীদের মনে ঔৎসুক্য জাগিয়াছিল কিন্তু সঠিক কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। প্রাচীন মিশরের স্ফীঙ্কস (sphinks) এর প্রশ্নের মত এ যেন জটিল, দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালীই রহিয়া গেল। সম্রাট্ নিরোর মনেও নীলনদের উৎসমুখ জানিবার জন্য কৌতূহল জাগিয়াছিল এবং তিনি সেই জন্য লোক-জনও আফ্রিকা মহাদেশে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়; কারণ, নীলনদের অভিমুখে কিছুদূর চলিয়াই তাঁহাদের গতি এক দুর্গম, জলাভূমির দেশে অবরুদ্ধ হইয়া যাইতে বাধ্য হয়। কাজেই, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নীলনদের উৎসমুখ লোকের নিকট অজ্ঞাত রহস্যই ছিল।

নীলনদের উৎসমুখ আবিষ্কারের ইতিহাসে জন্ হ্যানিং স্পেক-এর (John Henning Speke) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেমন করিয়া বীর স্পেক, জেম্‌স গ্রাণ্টকে সঙ্গে লইয়া ভিক্টোরিয়া ন্যায়েন্‌জাই (Victoria Nyanza) নীলনদের উৎসস্থান কি না, তাহা আবিষ্কারের জন্য আফ্রিকা মহাদেশে যাত্রা করেন। সে কাহিনী আবিষ্কারের ইতিবৃত্তে আজও অমর হইয়া রহিয়াছে।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে জন্ হ্যানিং স্পেক সমারসেটের (Somerset) জর্ডনস্ Jordons নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। স্পেক এর পিতা ছিলেন সৈনিক, কাজেই বীরের রক্ত স্পেক-এর ধমনীতে প্রবাহিত ছিল। বড় হইয়া সৈন্য হওয়াকেই তিনি আনন্দের সহিত জীবনেরব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সৈনিক জীবনের শিক্ষা শেষ করিয়া মাত্র সতের বৎসর বয়সে তিনি পদাতিক সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হন। ঐ বয়সেই যুদ্ধসম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ যথেষ্ট হইয়াছিল। স্যর কলিন ক্যাম্পবেলের অধীনে ভারতের শিখ যুদ্ধে তাঁহাকে বহুবার যোগ দিতে হইয়াছিল। বহুবিধ সাহসিকতা এবং শক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হওয়ায় শীঘ্রই স্পেক্-এর পদোন্নতি ঘটিল; তিনি প্রথমে লেফ্‌টেনাণ্ট এবং তার দুই বৎসর পরে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হইলেন।

সৈনিক জীবনের নানাবিধ অসুবিধা এবং কঠোরতা সত্ত্বেও স্পেক এর তাহাই ভাল লাগিত। খেলাধূলা, শিকারই স্পেক্-এর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। প্রায়ই অবকাশ সময়ে তিনি হয় শিকার উপলক্ষে, নতুবা এমনি আবিষ্কারের নেশায় হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে, রহস্যময় তিব্বত প্রদেশে যাত্রা করিতেন। পথ স্থির করিবার বিষয়ে স্পেক-এর অদ্ভুত শক্তি ছিল। মানচিত্রের অভাবেও অনেক সময় স্পেক-এর কোন অসুবিধাই হইত না।

শিখ যুদ্ধ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মধ্য আফ্রিকা অঞ্চলে আবিষ্কারের চেষ্টায় যাত্রা করিবার আকাঙ্ক্ষা স্পেক-এর

মনে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই তখনও যাইবার সময় আসে নাই। ভারতবর্ষে তাঁহার সৈনিক জীবনের দশ বৎসর তখনও পূর্ণ হয় নাই। স্পেক-ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলেন এবং গভীর মনোযোগের সহিত ভূতত্ত্ব এবং উদ্ভিদ্-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, আবিষ্কারক হইতে হইলে এই দুইটি বিদ্যা তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিতে পারিবে।



J. H. Speke

দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিয়া গেল। চাকুরীর মেয়াদ হইতে মুক্ত হইয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্পেক কলিকাতা হইতে এডেন যাত্রা করিলেন। কিন্তু তখনও যাত্রার উদ্দেশ্য তাঁহার নিজের নিকটও অজানা ছিল। শীঘ্রই কিন্তু একটা সুযোগ ঘটিয়া গেল। স্পেক শুনিতে পাইলেন যে, বম্বের গভর্ণমেণ্ট সোমালী দেশ (Somali Country) আবিষ্কারের জন্য একটি অভিযান প্রেরণ করিতেছেন। উৎসাহিত চিত্তে স্পেক এই দলের সঙ্গী হইবার জন্য অনুমতি লইয়া প্রবেশ করিলেন। লেফটেনাণ্ট বার্টন হইলেন এই দলের নেতা।

১৮ই অক্টোবর তারিখে স্পেককে আলাদা একটি অভিযানে বাণ্ডার গোরি (Bunder Gori) নামক স্থানে প্রেরণ করা হইল। ইহার উদ্দেশ্য, স্পেক যতদূর সম্ভব, দক্ষিণ প্রদেশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবেন, সেখানকার জমি ও দেশীয় লোকদের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আবার আসিয়া মূল অভিযানের সহিত বার্ব্বারায় (Berbera) যোগ দিবেন। উৎসাহী যুবক স্পেকের নিকট এ প্রস্তাবটি খুবই মনোরম বোধ হইতেছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ এ চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। একে ত পথের দুর্গমতা, তার উপর স্পেক-এর দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতা; কাজেই, এ যাত্রা কিছুই হইল না। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এডেনে (Aden) পুনরায় ফিরিয়া যাইতে হইল। কিন্তু বেশীদিন নিশ্চেষ্ট থাকিবার লোক স্পেক নহেন। কাজেই, ২১শে মার্চ্চ তারিখে তিনি পুনরায় সোজা বার্ব্বারা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বেই মিলনের যে কেন্দ্র স্থির হইয়াছিল, সেখানে পৌঁছিয়া স্পেক দেখিলেন, সম্মুখে আরও অগ্রসর হইবার জন্য বিপুল আয়োজন চলিতেছে; উট, দেশীয় লোক, জিনিসপত্র সবই প্রস্তুত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ যাত্রায় অধিকদূর অগ্রসর হওয়া ঘটিয়া উঠিল না। একদল সোমালী শত্রু অতর্কিতে শিবির আক্রমণ করিল। নিশীথের গভীর অন্ধকারে দুইপক্ষে যে মারামারি চলিল, তাহার ফলে স্পেক ও বার্টন উভয়েই গুরুতর ভাবে আহত হইলেন। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অভিযানের আশা ত্যাগ করিয়া স্পেক ইংল্যাণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সমুদ্র-ভ্রমণে স্পেকের ভগ্নস্বাস্থ্য আশ্চর্য্যভাবে সারিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের দুঃসাহসিক কার্য্যের প্রবৃত্তিও ফিরিয়া আসিল। দেশে ফিরিয়াই স্পেক ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (Crimean war) যোগদান করিলেন এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত একটি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনরূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে স্পেক বার্টনের নিকট হইতে পুনরায় আফ্রিকার হ্রদ এবং সম্ভবপর হইলে নীলনদের উৎসমুখ আবিষ্কারের জন্য এক অভিযানে যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইলেন। এই যাত্রায় বার্টন ও স্পেক যত প্রকার বিপদ-আপদ এবং দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া যাপন করিয়াছেন, তাহা বলিবার

নয়। বার্টন তখন অসুস্থ, রোগ শয্যায় শায়িত; এমন সময় একদিন স্পেক বিখ্যাত হ্রদ ভিক্টোরিয়া নায়ন্জা হ্রদ আবিষ্কার ও নামকরণ করেন। স্পেকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এই হ্রদই নীলনদের উৎপত্তি-স্থল। পরে ফিরিয়া আসিয়া দলপতি বার্টনকে একথা বলিতে তিনি তাহা বিশ্বাস না করিয়া ভুল মত বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

দুঃখের বিষয়, এই মতামত লইয়া বার্টন ও স্পেক উভয়ের মধ্যে বিষম মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। জানজিবারে (Zanzibar) পৌঁছিয়া স্পেক বার্টনকে জ্বরে অসুস্থ অবস্থায় রাখিয়া ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করিলেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছিয়া তিনি বিখ্যাত রাজকীয় ভৌগলিক সমিতিকে (Royal Geographical Society) টাঙ্গানিকা হ্রদ এবং ভিক্টোরিয়া নায়নজা হ্রদ আবিষ্কারের কথা জানাইলেন। বলা বাহুল্য, এজন্য তিনি যথেষ্ট সম্মান ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। অথচ এসব আবিষ্কারের জন্য প্রকৃত সম্মান বার্টনেরই প্রাপ্য। অবশেষে বার্টন ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত কথা শুনিতে পাইলেন। উভয়ের মধ্যে চিরদিনের বন্ধুত্বের অবসান হইল।

বার্টন স্পেকের উৎসমুখ আবিষ্কারের মতকে রূপকথার কাহিনী বলিয়া প্রকাশ্যেই হাস্যবিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে স্পেকের নিজের আবিষ্কারের মত দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য পুনরায় অভিযান করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল।

তিনি প্রকাশ্যে বক্তৃতা এবং কাগজে বহু প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। অবশেষে জনসাধারণেরও এ বিষয়ে ঔৎসুক্য জাগ্রত হইল এবং ভৌগোলিক সমিতিও তাঁহাকে এইরূপ অভিযানে যাত্রার অনুমতি প্রদান করিলেন।

যখন মনোমত সঙ্গীর প্রশ্ন উঠিল, তখন স্পেক গ্রাণ্টকে মনোনীত করিলেন। গ্রাণ্টের পুরা নাম জেমস্ অগষ্টাস্ গ্রাণ্ট (James Augustus Grant)। ভারতীয় সৈন্যদলে থাকিতে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। গ্রাণ্ট ও স্পেক উভয়ে ঠিক সমবয়সী। গ্রাণ্ট জন্মিয়াছিলেন ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল, স্পেকের জন্মের প্রায় একমাস পূর্ব্বে। শিক্ষা শেষ করিয়া উনিশ বৎসর বয়সে গ্রাণ্ট সৈন্যদলে যোগ দেন এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বহুবিধ যুদ্ধ-ব্যাপারেই ব্যাপৃত ছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি লক্ষ্ণৌয়ে ছিলেন এবং বিদ্রোহীদলের সহিত বিশেষ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে স্পেকের সহিত গ্রাণ্টের প্রথম আলাপ হয়। এই আলাপ ক্রমে দৃঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কারণ, উভয়ের মধ্যে মতের মিল যথেষ্ট ছিল — খেলা-ধূলায় উভয়েরই প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। কাজেই, স্পেকের অভিযান যাত্রার আমন্ত্রণ পাইয়া গ্রাণ্ট এক মুহূর্ত্তও দ্বিধা করিলেন না - যাইতে সম্মত হইলেন।



অভিযানের আয়োজন চলিতে লাগিল। ভৌগোলিক সমিতি ২,৫০০ পাউণ্ড মঞ্জুর করিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় সর্দ্দারদের বহুবিধ উপহার সামগ্রী যথা— বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্রাদি অনুমোদন করিলেন। কেপ (Cape Colony) পার্লামেণ্টও কতক টাকা মঞ্জুর করিল।

সমস্ত ঠিকঠাক হইয়া গেলে স্পেক ও গ্রাণ্ট উভয়ে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল তারিখে ইংল্যাণ্ড

হইতে জানজিবারের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এখান হইতে দলের লোকজন অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রায় ২১৭ জন লোক মধ্য-আফ্রিকা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

প্রথম যাত্রার গন্তব্যস্থান হইল কাজে (Kaze)—উন্যামেজি (Unymwezi) রাজ্যের রাজধানী। ইহারই অপর নাম চন্দ্রের রাজ্য। পূর্ব্বে স্পেক্ এদেশে প্রচুর পরিমানে কাপড় ও পুঁতি পাঠাইয়াছিলেন—যাহাতে দেশীয় অধিবাসীরা অভিযানের পথে তাঁহাদের সাহায্য করে। যাত্রা-পথ অবিরাম নানা উপায়ে তাঁহাকে জ্বালাতন করিত; জিনিস-পত্রের অসম্ভব দাম হাঁকিত। তাহাতে স্পেক্ রাজী হইলেও হয় ত যাত্রাপথে সর্দ্দারের লোক আসিয়া আরও কাপড় এবং আরও পুঁতি দাবি করিত। এই সব ব্যাপার লইয়া নানা অশান্তিকর ব্যাপারের উৎপত্তি হইত। তাঁহারা অসাধারণ কৌশলী এবং বুদ্ধিমান্ ছিলেন বলিয়াই নানান্ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে স্পেক্ কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। জুলাই মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত



মিয়নঙ্গা সর্দ্দারের দেশে

বৃষ্টিপাতে এবং অভিযানের ভারবাহীদের মধ্যে নিয়ত কলহে অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যাহা হউক, চারিমাসের চেষ্টায় অবশেষে 'কাজে' পৌঁছান হইল। কিন্তু বোঝাবহনকারীদের মধ্যে কলহের ফলে প্রায় ৯৮ জন লোক পথিমধ্যে স্পেক্-এর জিনিস-পত্রের প্রায় অর্দ্ধেকাংশ লইয়া সরিয়া পড়িল। তা ছাড়া আরও যে কত রকম অসুবিধা ছিল, তাহা বলিবার নয়। দেশীয় সর্দ্দারেরা তাহাদের রাজ্যের মধ্য দিয়া স্পেক্কে যাত্রার অনুমতি দিবার আগে দারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিলেন। এসময়ে এমন হইয়াছিল যে, পা অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। দেহে কোন শক্তি ছিল না, চক্ষে নিদ্রা আসিত না।

স্পেক্কে এরূপ অশক্ত হইয়া পড়িতে দেখিয়া গ্রাণ্ট আলাদা পথ ধরিয়া যাত্রা করা মনস্থ করিলেন এবং আরও লোকজন এবং খাদ্যসংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র দলটিকে রাখিয়া যাইবার কিছু দিনের মধ্যে দেশীয় লোকেরা গ্রাণ্টের শিবির আক্রমণ করিয়া নানা দ্রব্য চুরি করিয়া চাকরদিগকে ভয়

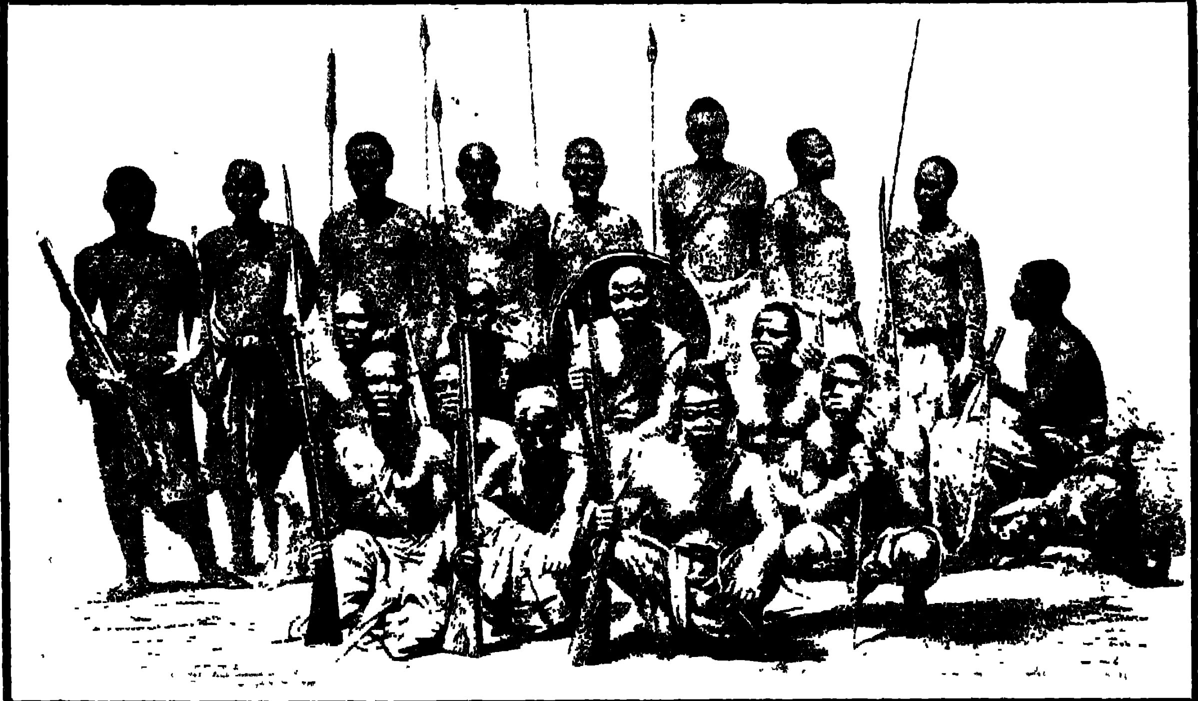
দেখাইয়া চলিয়া যায়। গ্রাণ্ট এ অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য দেশীয় সর্দ্দারের নিকট অভিযোগ করেন। সর্দ্দার মিয়নঙ্গা (Miyonga) যে বিচার করিলেন, তাহা বেশ কৌতুকজনক। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার প্রজারা ভুল করিয়া এই ঘটনা ঘটাইবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। একজন হতভাগ্য দোষীর হাত কাটিয়া ফেলিবার হুকুম হইল এবং শাদা লোকটি তাঁহার সমস্ত হৃত দ্রব্যাদি ফিরিয়া পাইবেন বলিয়া সর্দ্দার আশ্বাস দিলেন। দুঃখের বিষয়, জিনিস-পত্র প্রায় কিছুই ফিরিয়া পাওয়া গেল না।

যাহা হউক, স্পেক্ পুনরায় ভ্রমণের উপযুক্ত সুস্থ হইয়া উঠিলে পর তাঁহারা উভয়ে টাঙ্গানিকা হ্রদ ও ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদের পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ক্যারাগু (Karague) আসিয়া পৌঁছিলেন।

বাস্তবিকই অত্যন্ত দয়ালু লোক ছিলেন। এ সময় গ্রাণ্ট আবার জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। পায়ের মধ্যে অনেকগুলি ফোড়া হইয়াছিল। দেশীয় ঔষধ-পত্র ব্যবহারে কোন উপকার হইল না। কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম ব্যতীত এই রোগ নিরাময়ের আর কোন উপায় রহিল না।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া স্পেক্ ঠিক করিলেন, রাজা রুমানিকার নির্দ্দেশমত একজন পথ-প্রদর্শক সঙ্গে লইয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী উগাণ্ডা (Uganda) রাজ্যে যাইবেন কাজেই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রাণ্টকে রুমানিকার গৃহে রাখিয়া স্পেক্ উত্তরে উগাণ্ডা যাত্রা করিলেন।

এদেশে আসিয়া স্পেক্ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দুর্গম অরণ্যের পরিবর্ত্তে এখানে পর্ব্বতের উপত্যকায় প্রচুর শ্যামল শস্যসম্ভার। চাষ-আবাদের চিহ্ন সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। স্পেক্ ভাবিয়াছিলেন, এমন সুন্দর



স্পেক্ এর বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ

এদেশের রাজার নাম ছিল রুমানিকা Rumanika)। রাজা রুমানিকা এই দুই আবিষ্কারককে এত পরম আদরে গ্রহণ করিলেন যে, তাঁহার কোনও অভিসন্ধি থাকিতে পারে মনে করিয়া তাঁহারা ঈষৎ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাহা নহে এই রাজা

শস্যশ্যামল কর্ষিত ক্ষেত্র যেখানে, সেখানকার রাজাও নিশ্চয়ই বিচক্ষণ ও দয়ার্দ্রহৃদয় হইবেন, কিন্তু দেখা গেল, কার্য্যতঃ তিনি তাহার বিপরীত।

রাজা টেসা (Mtsa) ক্ষমতাশালী হইলেও অতিশয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। ছয়মাস কাল উগাণ্ডায়

বাস করিয়া স্পেক রাজার নিষ্ঠুরতার বহু পরিচয়ই পাইয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ এই নিষ্ঠুর রাজা স্পেককে কেন জানি না, সুনজরে দেখিয়াছিলেন। কাজেই, রাজসভায় স্পেক-এর সমাদর বাড়িয়াছিল। অনেকবার স্পেক-এর চেষ্টায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বহু হতভাগ্যের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।

মানুষের প্রাণ লইয়া রাজা যেন ছিনিমিনি খেলিতেন। অতি সামান্য দোষেও প্রাণদণ্ডই একমাত্র শাস্তি ছিল। যদি কোন ভৃত্য ভুল করিয়া রাজার সম্মুখে হাসিয়া ফেলিত, তবে তাহার কান দুইটি কাটিয়া ফেলা হইত। দোষ অধিক হইলে শাস্তির মাত্রাও বাড়িয়া যাইত।

একবার রাজা, রাণীদের সঙ্গে লইয়া বনভোজনে গিয়াছেন। একজন রাণী রাজাকে খুসী করিবার জন্য একটি সুপক্ক ফল আনিয়া দিলেন। হঠাৎ রাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন—"কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! স্ত্রীলোক হইয়া আমাকে ফল উপহার দেওয়া।" তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগিনী রাণীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়া গেল। লোকজন আসিয়া ধরিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবে, এমন সময়ে খাম খেয়ালী রাজা ঠিক করিলেন, নিজ হাতে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিবেন। একটা মোটা লাঠি লইয়া ভীষণ মারিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় স্পেক ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ায় এবং স্পেক-এর কাতর অনুনয়ে হতভাগিনী রাণী সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন।

রাজ্যের চারি পাশে শিকারের অপর্য্যাপ্ত জায়গা ছিল। কাজেই, স্পেক মনের আনন্দে অধিকাংশ সময়ই শিকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি রাজাকে একটি বন্দুক উপহার দিয়া শিকার করিতে শিখাইয়া দিলেন। রাজা চমৎকার বন্দুক ছুঁড়িতে শিখিয়াছিলেন। এরকম অলসভাবে এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে স্পেকের কিন্তু মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু কি করিবেন, রাজা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে মোটেই রাজী নন। এমন সময় দুজন দেশীয় অনুচর গ্রাণ্টকে স্কন্ধে বহিয়া উগাণ্ডা রাজ্যে লইয়া আসিল।

ধীরে ধীরে গ্রাণ্ট সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এখন প্রধান কাজ হইল, রাজাকে রাজী করান। রাজা প্রথমটায় মোটেই রাজী হইলেন না, কারণ, তাহা হইলে উপহার লাভ বন্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই, তিনি পথের দুর্গমতা সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা নানান খবর দিয়া আবিষ্কারকদ্বয়কে নিবৃত্ত করিতে চাহিলেন কিন্তু কিছুতেই যখন রাজী করান গেল না, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজা সম্মতি দিলেন। তারপর রাজকীয় বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া দলবলসহ







একদিনে তিন মহিষ শিকার

শাদা লোক দুটিকে বিদায় দিতে সঙ্গে চলিলেন। স্পেকের ভৃত্যেরা রাজার আদেশ অনুসারে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এইরূপে স্পেক ও গ্রাণ্টকে সমারোহের সহিত বিদায় দিয়া রাজা ঘোড়ায় চড়িয়া নিজের প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

স্পেকের ছোট্ট দলটি এবার পূর্ব্বদিক ধরিয়া নীলনদ অভিমুখে যাত্রা করিল। কারণ, স্পেক স্থির করিলেন, নদীটি ধরিয়া তাঁহারা তাহার উৎপত্তিস্থল (স্পেকের মতে) ভিক্টোরিয়া নায়নজায় পৌঁছিবেন।

কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর না হইতেই দলে একটা গোলমাল উপস্থিত হইল। দেখা গেল, দেশীয় ভৃত্যেরা অপরের জিনিস জোর করিয়া কাড়িয়া লইবার জন্য বড়ই আগ্রহান্বিত। স্পেক-এর ইহাদের বলিবার কিছুই ছিল না; কারণ রাজা আসিবার সময় ভৃত্যদের এই লুঠপাটের অনুমতি দিয়াছিলেন। কাজেই, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

এরকম কিছুদিন চলিবার পর স্পেক ঠিক করিলেন, রাজা উনিওরোর সহিত বন্ধুত্ব করা প্রয়োজন। কারণ, তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। সেই অনুসারে স্পেক ও গ্রান্ট দুজনে দুইদিকে যাওয়া স্থির করিলেন। গ্রান্ট উত্তরে রাজা উনিওরোর (Unyoro) রাজ্যের অভিমুখে চলিলেন আর স্পেক পূর্ব্বদিকে নীলদের অভিমুখে রওনা হইলেন।

উগাণ্ডার রাজধানী ত্যাগ করিবার চৌদ্দ দিন পরে স্পেক উরণ্ডগানি (Urondogani) পৌঁছিলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া এক মুস্কিল বাধিল। নদী পার হইবার কোন নৌকাই নাই, কি করিয়া ভিক্টোরিয়া নায়নজা (Victoria Nyanza) পৌঁছান যায়? তিনি দেশীয় লোকদের প্রথমে অনুনয়, পরে ভয় দেখাইতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন নিরুপায় হইয়া হাঁটিয়াই যাইবেন স্থির করিলেন।

এক সপ্তাহ কাল চলিবার পর স্পেক তাঁহার বাঞ্ছিত স্থানের দর্শন লাভ করিলেন। সম্মুখেই বিশাল ভিক্টোরিয়া নায়নজা হ্রদ। তিনি দেখিলেন, নীলনদ ভিক্টোরিয়া হ্রদ হইতে প্রপাতরূপে পাহাড়ের উপর দিয়া বাহির হইয়া আফ্রিকা মহাদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বহু শতাব্দীর দুর্ব্বোধ্য রহস্যের এত দিন পরে মীমাংসা মিলিল।

উগাণ্ডার রাজা স্পেক-এর সঙ্গে যে সব অনুচর দিয়াছিলেন, তাহারা স্পেককে কিছুতেই প্রপাত সম্বন্ধে কোন ভৌগোলিক অনুসন্ধান করিতে দিতে রাজী হইল না। কারণ রাজা তো তাহাদের এ বিষয়ে কোন উপদেশই দেন নাই। অগত্যা স্পেক প্রপাতের নামকরণ করা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিলেন না। হ্রদের নাম হইল "রিপন প্রপাত।". লর্ড রিপনের নাম অনুসারে এই নাম হইল। কারণ, লর্ড রিপনের চেষ্টায়ই রাজকীয় ভৌগলিক সমিতি এই অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ইহার পরে স্পেক উনিওরো (Unyoro) রাজ্যে পৌঁছিয়া গ্রান্টের সহিত পুনরায় মিলিত হইবার জন্য



রিপন প্রপাত

ব্যাগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি অতি সত্বর উরণ্ডগানি (Urondogani) আসিয়া পৌঁছিলেন; কিন্তু এখানে আসিয়া সেই পূর্ব্বের বিপদ- নদী পার হইবার উপায় নাই। কিন্তু এবার স্পেক-এর আর হাঁটিবার সামর্থ ছিল না। অতি কষ্টে কয়েকটা জীর্ণ 'ক্যানো' নামক নৌকা সংগৃহীত হইল। এই ক্যানোতে নদী পার হইতে গিয়াই পথে বিষম বিপদ ঘটিল।

ক্যানোগুলি যখন মাত্র অল্পদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় একদল ওয়ানজর (Wanjoro) রাজ্যের অধিবাসী প্রায় পনেরটি ক্যানোয় চড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেশের সহিত ব্যবসায় উপলক্ষে আসিতেছিল। ক্যাসোরো (Kasoro) নামক স্পেক-এর একজন অনুচর, একদিন যখন সেই নৌকাগুলির অধিবাসীরা তীরে নামিয়া আহার করিতে গিয়াছে তখন একটু ছেলেমানুষী দুষ্টুমি করিবে ঠিক করিল।

যখন নৌকাবাসীরা আবার ফিরিয়া আসিল, তখন ক্যাসোরো তাহাদের বিষম চীৎকার করিয়া

ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিল। বেচারারা প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে ক্যাসোরা তাহাদের পরিত্যক্ত খাদ্যসামগ্রী মহা-তৃপ্তির সহিত আহার করিতে লাগিল। স্পেক্ ব্যাপার দেখিয়া প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন; পরে ক্যাসোরোকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কারণ, ইহাদের রাজ্যেই তো কিছুক্ষণ পরে আতিথ্য চাহিতে হইবে।

সেই রাত্রির মত স্পেক্ তাঁবুতে রাত্রি যাপন করা স্থির করিলেন। তিনি সেই রাত্রিতেও আরও কিছু দূর অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ক্যাসোরো কিছুতেই রাজী হইল না। সে বলিল যে, এখন আমরা উনিওরো (Unyoro) রাজ্যের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি, ইহার পর আরও অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইলে কামরাসি (Kamrasi) রাজ্যের অনুমতি লইতে হইবে।



উরণ্ডগানির এক বামন

স্পেক্ দেখিলেন, ইহাদের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করা নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র। কাজেই, তিনি সেই চেষ্টায় নিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু স্পেক্-এর মনে ভয় হইল, রাত্রিতে যদি কোন আক্রমণ হয়, তাই তিনি অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত রাখিতে বলিলেন। কিন্তু অনুচরেরা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তবু স্পেক্-এর মনে ভয় জাগিয়া রহিল যে, বিপদের সময় হয় ত ইহারা সকলেই পলায়ন করিবে।

যাহা হউক, সারারাত্রি ভালই কাটিল। বিপদ কিছুই ঘটিল না। ভোরের বেলা স্পেক্ এখন কি করা কর্তব্য, সে বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ বলিল, দিনটা এখানে কাটাইয়া পরে ধীরে সুস্থে অগ্রসর হওয়াই কর্তব্য। কিন্তু স্পেক্-এর এ প্রস্তাব মনঃপূত হইল না।

বোম্বে নামক স্পেক্-এর একজন খুব বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান্ অনুচর ছিল। স্পেক্ আর দেরী না করিয়া যেখানে সীমান্তপতি (Boundry officer) থাকে সেখানে গিয়া তিনি যে কামরসির রাজ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত, তাহা জানান উচিত মনে করিয়া বোম্বেকে সেখানে পাঠাইবেন স্থির করিলেন। কারণ, তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল, গ্রাণ্ট নিশ্চয়ই এতদিনে উনিজর রাজ্যের রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং ছাড়পত্র (Passport) জোগাড় করিয়াছেন।

বোম্বেকে পাঠাইয়া দিবার সাত ঘণ্টা পরে পাঁচটি অতিজীর্ণ ক্যানোতে চড়িয়া স্পেক্ অগ্রসর হইলেন। এইবার স্পেক্ একটি আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন—"যাক ভাবনা গেল, আর পায়ে হাঁটিতে হবে না।" এমন সময় সশস্ত্র ওয়ানজর (Wanjor) যাত্রীসহ একটি বড় ক্যানো সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, দেখা গেল। স্পেক্-এর অনুচরদের মধ্যে একটা ভীতির ভাব দেখা গেল। এবার যুদ্ধ অবশ্য স্থাবী। চীৎকার, চেঁচামেচি, অস্ত্রশস্ত্রের আয়োজন চলিতে লাগিল। অথচ অস্ত্রশস্ত্র খুবই কম আছে দেখা গেল। এদিকে সশস্ত্র ক্যানোর লোকেরা যখন দেখিল স্পেকের লোকেরা তাহাদের দিকেই আসিতেছে, তখন তাহারা হঠাৎ যেন ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। স্পেক্-এর অনুচরদের ক্যানোগুলি উহার দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু ধরিতে পারিল না।

এই সময় তাঁহারা উগাণ্ডার রাজ্যের সীমান্ত পার হইয়া আসিয়াছিলেন। প্রতিমুহূর্তেই স্পেক্ সীমান্ত-পতির গ্রামে পৌঁছানোর আশা করিতেছিলেন। সেই গ্রামে পৌঁছিয়া তিনি দেখেন, নদীতীরে অসংখ্য দেশীয় লোক নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্পেক্ প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, ইহারা তাঁহাদের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছে কিন্তু পূর্ব্বের সেই সশস্ত্র ক্যানোটি দেখিয়া তিনি সমস্ত বুঝিয়া ফেলিলেন। নৌকায় দাঁড়াইয়া স্পেক্ টুপীটি খুলিয়া ফেলিলেন। ভাবিলেন, তাঁহাকে দেখিলে হয় ত ইহারা শান্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন যে, কামরাসির (Kamrasi) প্রাসাদে

যাইবেন বলিয়া আসিয়াছেন। ইহাতেও কোন ফল হইল না, বরং লোকগুলি রাগিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

তখন নৌকা করিয়া নীলনদ পার হইবার আশা স্পেক্ ত্যাগ করিলেন। দুইদিন হাঁটিয়া স্পেক্ কামরাসির প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। এখানে পুনরায় গ্রাণ্টের সহিত স্পেক্-এর সাক্ষাৎ হইল।

এক মাসের চেষ্টায় বহুকষ্টে এই আবিষ্কারকদ্বয় কামরাসির রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছিলেন। কামরাসি বলিলেন, তিনি শুনিয়াছেন যে, তাঁহারা নাকি নরখাদক। যাহা হউক এবারে কিন্তু রাজা বেকার মধ্য আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। স্পেক্ তাঁহার নিজের অঙ্কিত মানচিত্র দেখাইয়া যাইবার সহজ পথ দেখাইয়া দিলেন। বিদায় লইয়া বেকারের নৌকায় স্পেক্ ও গ্রাণ্ট নীলনদ বাহিয়া খার্টুম (Khartum) পর্য্যন্ত গেলেন। তারপর মরুভূমি পার হইয়া কাইরো (Cairo) অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে এই দুই আবিষ্কারকের ভাগ্যে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছিল। স্পেক্ তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ আবিষ্কার সম্বন্ধে



বন্য হস্তীর দলের সম্মুখে

কামরাসি এই দুইজন শাদালোককে মহাসমাদরে একমাস কাল নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন।

ওয়ানজরদের (Wanjor) শত্রুতার ফলে স্পেক্ ও গ্রাণ্টকে বাধ্য হইয়া পুনরায় হাঁটিতে হইল। তিনমাস কাল হাটিয়া পরে স্পেক্ ও গ্রাণ্ট গণ্ডকোরোতে পৌছিলেন। এই যাত্রাপথে তাঁহাদিগকে যে কত বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহার অবধি নাই। একবার এক দল বন্য হাতীর সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, অসীম সাহসিকতার সহিত সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। এখানে তাঁহাদের সঙ্গে বেকার (Baker) এর সাক্ষাৎ হইল। বই লিখিয়া, বক্তৃতা দিয়াই কাটাইয়াছেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর বন্দুক ছুড়িতে গিয়া অকস্মাৎ দুর্ঘটনা ঘটে। তাহাতেই স্পেক্-এর মৃত্যু হয়। ইহার এক বৎসর পরে তাঁহার পুস্তক প্রকাশিত হয়।

জেম্স্ গ্রাণ্ট আবিসীনিয় সামরিক অভিযানের সময় গুপ্তচর বিভাগে যথেষ্ট কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গ্রাণ্ট দেশে ফিরিয়া নিজের জন্মভূমি নাইরিন (Nairin)-এ বাস করিতে থাকেন। সেই খানেই ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।



শ্বেতকেতু

১৫৫২ পৃষ্ঠার পর

শ্বেতকেতু নামক একজন দার্শনিক উপনিষদের যুগে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। উপনিষদ ছাড়া মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা যায়। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং কৌষীতকি এই তিন উপনিষদে তাঁহার সম্বন্ধে একটি কাহিনী রহিয়াছে। তাহা হইতে তখনকার দিনের দর্শন চর্চ্চার একটা স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়।

প্রবাহণ জৈবলি তখন পাঞ্চাল দেশের রাজা। তিনি একটি বড় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাতে বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হন, শ্বেতকেতুর বাবাও নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু তাঁর বোধ হয় তখন অন্য জায়গায়ও নিমন্ত্রণ ছিল; অথবা অন্য কোন কারণে তিনি নিজে যাইতে অসমর্থ হইয়া পুত্র শ্বেতুকেতুকে প্রতিনিধি পাঠান।

পাঞ্চাল-রাজ প্রবাহণ জৈবলি অতি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা একাধিক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার যজ্ঞে শ্বেতকেতুর পিতা নিজে না আসিয়া পুত্রকে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন দেখিয়া হয়ত তিনি কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন। যেজন্যই হউক, তিনি শ্বেতকেতুকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর, আপনি যে আমার যজ্ঞ করিতে আসিয়াছেন, আপনাকে আপনার বাবা সব শিখাইয়া দিয়াছেন ত?"

শ্বেতকেতু কহিলেন, "হাঁ"।

তখন রাজা কহিলেন, "আচ্ছা, ঠাকুর, বলুন ত, মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, কোন পথে যায় এবং কোন পথে আবার ফিরে?"

শ্বেতকেতু কহিলেন, "এ সব ত বাবা আমায় শিখান নাই।"

রাজা কহিলেন, "কিছুই না শিখিয়া আপনি কোন সাহসে বলিলেন, 'শিখিয়াছি', আর কোন সাহসেই বা আপনি এ যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন?"

লজ্জিত হইয়া শ্বেতকেতু বাড়ী ফিরিয়া গেলেন এবং পিতাকে কহিলেন, "রাজা আমাকে যা করিলেন, আমি ত তার কোন উত্তরই দিতে পারিলাম না, আপনি এসব আমায় শিখাইয়া দেন নাই কেন?"

রাজা কি কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা ছেলের নিকট শুনিয়া শ্বেতকেতুর পিতা কহিলেন, "এর উত্তর ত আমিও জানি না, জানিলে কি আর তোমাকে শিখাই নাই! চল, দুজনেই গিয়া রাজার নিকট উপদেশ নিয়া আসি।"

অতঃপর পিতাপুত্র উভয়েই পাঞ্চাল রাজের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট বিদ্যা যাচ্‌ঞা করিলেন। রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, এই বিদ্যা ত ক্ষত্রিয়দেরই বিশেষ সম্পত্তি, ইতঃপূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণকে ইহা দেওয়া হয় নাই। তার চেয়ে আপনি বরং কিছু হিরণ্য, কিংবা গরু-ঘোড়া কিংবা দাস-দাসী বর গ্রহণ করুন না!"

ব্রাহ্মণ তাহাতে রাজী হইলেন না; পক্ষান্তরে তিনি রাজার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত হইলেন। অতঃপর বাধ্য হইয়া রাজা এই গোপনীয় তত্ত্ব-কথা ব্রাহ্মণের নিকট বলিলেন।

"মৃত্যুর পর আত্মার গমনের দুইটি পন্থা আছে, একটির নাম দেবযান, আর একটির নাম পিতৃযান।

যাঁহারা অরণ্যে বাস করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা করেন এবং তপস্যা করেন, তাঁহারা দেহান্তে দেবযান-পথে গমন করেন। মৃত্যুর পর ইঁহাদের আত্মা আলোকে গমন করে, সেখান হইতে দিন, তার পর শুক্লপক্ষ, তার পর উত্তরায়ণ, তার পর সংবৎসর, তার পর আদিত্য, তার পর চন্দ্র এবং বিদ্যুৎ এবং সর্ব্বশেষে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। ইঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

"আর যাঁহারা গ্রামে বাস করিয়া যজ্ঞাদি নানা প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পিতৃযানে গমন করেন। তাঁদের আত্মা প্রথমতঃ ধূমে গমন করে, তার পর রাত্রি, তার পর কৃষ্ণপক্ষ, তার পর দক্ষিণায়ন, তার পর পিতৃলোক, এবং সেখান হইতে আকাশ হইয়া ইঁহারা চন্দ্রলোকে বাস করেন। ইঁহাদের মুক্তি হয় না। সুকৃত ভোগ শেষ হইলেই ইঁহারা আবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং কর্ম্মানুসারে মানুষ কিংবা আর কিছু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীতে ফিরিবার সময় তাঁরা আকাশ হইতে বায়ুতে, তার পর ধূমে এবং তার পর মেঘে গমন করেন এবং সেখান হইতে বৃষ্টির সঙ্গে পৃথিবীতে নামিয়া পড়েন। ইঁহারই নাম পিতৃযান।"

দেবযান ও পিতৃযানের কথা ছাড়া আরও কয়েকটি তত্ত্বকথা শ্বেতকেতু এবং তাঁহার পিতা প্রবাহণ জৈবলির নিকট শিখিয়াছিলেন।

খুব সম্ভবতঃ পাঞ্চাল দেশ হইতে ফিরিবার কিছুকাল পরে এক দিন শ্বেতকেতুর পিতা তাঁহাকে কহিলেন, "শ্বেতকেতো, আমাদের বংশে ত কেহ লেখা পড়া না শিখিয়া থাকে নাই, তুমিও গুরুর গৃহে গিয়া বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া আইস।" শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন, বার বৎসর গুরু-গৃহে বাস করিয়া যখন তাঁহার চব্বিশ বৎসর বয়স হইল, তখন তিনি বাড়ী ফিরিলেন। কিন্তু এত দিন লেখাপড়া করিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত গর্ব্ব হইয়াছে। বাড়ীতে তিনি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিতেন, কাহারও সঙ্গে বেশী কথাবার্ত্তা কহিতেন না।

তাঁহার পিতা একদিন তাঁহাকে কহিলেন, "তোমাকে দেখিয়া মনে হয়, তুমি বেশ প্রাজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, কিন্তু একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতে চাই—সে বিদ্যা কি তুমি অবগত হইয়াছ, যাহা জানিলে সব জানা হয়?" শ্বেতকেতু কহিলেন, "না বাবা, সে বিদ্যা কি?" পিতা কহিলেন, "শোন, যেমন একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিলেই সমস্ত মাটীর স্বরূপ জানা হয়—ভিন্ন ভিন্ন মাটীর জিনিস শুধু নামে পৃথক মাত্র, মাটী হিসাবে সবই এক,—সেইরূপ সেই যে চরম সত্য, তাহাকে জানিলেই সব জিনিস জানা হয়, কেননা, সমস্তই তাহার বিকার মাত্র।

"আদিতে এক এবং অদ্বিতীয় সৎ মাত্র ছিলেন। তিনিই এই চরাচর বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন। এই সৎ ই জগতের মূল; সমস্ত বিশ্ব এই সৎকে আশ্রয় করিয়াই আছে এবং তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

"মৌমাছিরা নানা বৃক্ষের ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া চাকে সব মধু সংগৃহীত করে। কিন্তু পরে বলিতে পারে না কোন ফুল হইতে কোনটুকু মধু আনিয়াছে। তেমনি এই যে সকলের মূল সৎ, তাহাতে সব বস্তু বিলীন হইয়া গেলে তখন আর বলা চলে না কোনটি সিংহ, আর কোনটি মানুষ। ইহারা জগতে সকলেরই মূল এক—তবে মূলের কথা ইহারা জানে না, এই যা দুঃখ। এই যে সকলের মূল সৎ, ইহারই নাম আত্মা। শ্বেতকেতো, তুমিও তাহাই।

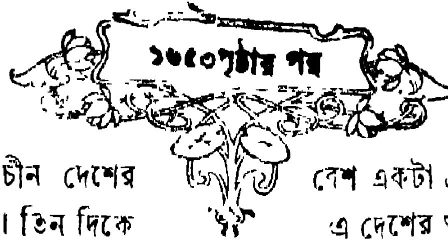
"একটি ন্যগ্রোধ ফলকে কাটিলে তাহার ভিতরে সূক্ষ্ম বীজ দেখা যায়; সেই বীজকে বিভক্ত করিলে আর কিছু দেখা যায় না। কিন্তু এই বীজের ভিতর যে সূক্ষ্ম, অদৃশ্য বস্তু আছে, তাহা হইতেই প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। তেমনই সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম আত্মা হইতে এই বিরাট্ বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্বেতকেতো, তুমিই সেই আত্মা।

"কতকটা লবণ জলে ফেলিয়া দিলে উহা গলিয়া যায়। তার পর সেই জল ভাণ্ডের যেখান হইতেই জল সংগ্রহ করা যাউক না কেন, সর্ব্বত্রই লবণের স্বাদ পাওয়া যাইবে। লবণ যেমন জলের সর্ব্বত্র অদৃশ্য-ভাবে বর্ত্তমান থাকে, সূক্ষ্ম আত্মাও জগতের সর্ব্বত্র তেমনিই বর্ত্তমান রহিয়াছে, আর সেই আত্মাই তুমি।

"অতি দূর গান্ধার দেশ হইতে কাহাকেও চোখ বাঁধিয়া নানা দিক ঘুরাইয়া কোনও এক দুর্গম স্থানে আনিয়া যদি ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাহার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিয়া যদি তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয়, এই দিকে গান্ধার দেশ, যাও, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যেমন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অবশেষে স্বদেশ গান্ধারে যাইতে পারিবে, তেমনই বুদ্ধিমান ব্যক্তি আচার্য্যের উপদেশ পাইলে ক্রমশঃ এই আত্মাকে জানিতে পারে এবং তাহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। শ্বেত-কেতো, ইহা সত্য জানিও যে, এই আত্মাই তুমি।"



তুর্কীস্তান



সাধারণ বর্ণনা ও সীমা

এসিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকে তুর্কীস্থান মধ্য এসিয়ার একটি বিস্তৃত প্রদেশ। কাস্পিয়ান হ্রদের তীর হইতে আরম্ভ করিয়া চীন দেশের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত তুর্কীস্তানের সীমা। তিন দিকে উচ্চ পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত—থিয়ান শান (Thian-Shan), কারকোরাম (Karakoram) এবং কুয়েন্-লুন (Kuen-Lun)—আর পূর্ব্ব দিকে গোবি মরুভূমির বিশাল প্রান্তর। মধ্যভাগের কাছাকাছি লবনোরের নিম্ন ভূমি, তারিম (Tarim) নদী ও তাহার শাখা-প্রশাখা এদিক ওদিক দিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই অঞ্চলের সীমান্ত দেশের বা তাহার কাছাকাছি বেশীর ভাগই অনুর্ব্বর "ষ্টেপ্ ভূমি।" সামান্য কিছু কিছু উর্ব্বর জমি-জমাও যে নাই, তাহা নহে।

নদী

কাশগর (Kashgar), ইয়ারকন্দ (Yarkand) এবং করকাস্ নামে তিনটি নদী যে অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানই বেশ উর্ব্বর ও শস্য-শামল হইয়াছে এবং তুর্কীস্তানের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে।

তুর্কীস্তান দুইটি ভাগে বিভক্ত—পূর্ব্ব ও পশ্চিম। পূর্ব্ব বা চীন তুর্কীস্তান আর পশ্চিম তুর্কীস্তান রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত। এই দুই সাম্রাজ্যের অধীনে থাকিলেও তুর্কীস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বেশ একটা ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

জল-বায়ু

এ দেশের আবহাওয়া—শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। শীত—সে দারুণ শীত, জানুয়ারী মাসে মাঠ, ঘাট, জল-স্থল সব তুষারে ঢাকিয়া ফেলে। পাহাড় প্রভৃতির দূরের কথা, সমতল ভূমিরও ঐরূপ অবস্থা দাঁড়ায়। কিন্তু আবার যাদুকরের মায়াদণ্ডের স্পর্শের মত, কাহার যেন অজ্ঞাত স্পর্শে সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে বসন্ত আসিয়া দেখা দেয়। তখন বরফ কোথায় মিলাইয়া যায়, প্রকৃতি যেন হাসিতে থাকে। ফুল গাছে ফুল ফোটে, ফল গাছ মঞ্জরিত হয়, এক স্বপ্নরাজ্যের রূপ ধারণ করে।

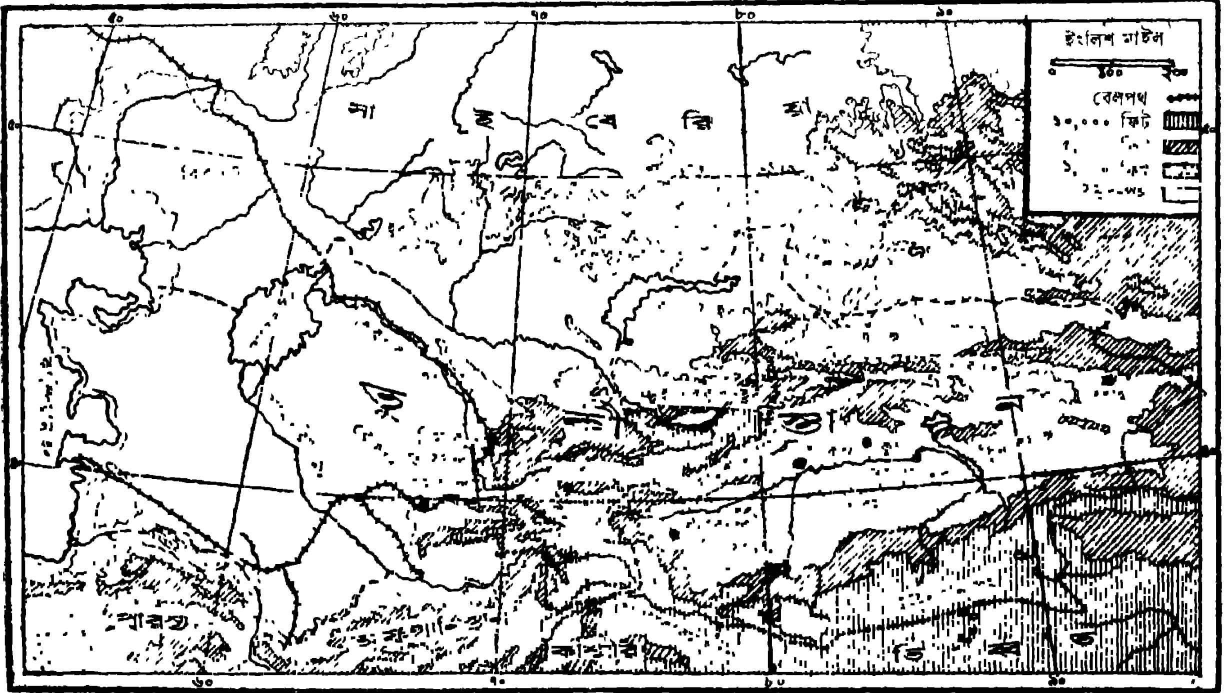
গ্রীষ্মকাল, শীতকালেরই মত ক্লেশপ্রদ এবং অনেক দিন থাকে। শরৎ ও হেমন্ত ঋতুর আভাসও এদেশে পাওয়া যায়।

শীত, গ্রীষ্ম, প্রভৃতি ঋতুর এইরূপ তারতম্য হইলেও মোটের উপর তুর্কীস্তানের জলবায়ু বেশ আরামপ্রদ, শুধু ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসটা তেমন ভাল নয়। এ দেশের আকাশে মেঘ বড় একটা দেখা যায় না। সূর্য্য প্রায় সকল ঋতুতেই ধূলির মেঘে ঢাকা থাকে। পাহাড়ের আলগা মাটি, সমতল ভূমির

মাটী এই সব জোর হাওয়ায় বাতাসে ভাসিয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তবে নিম্ন ভূমিতে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। কাস্পিয়ান হ্রদের ও ভারত মহাসাগরের জলো হাওয়া উচ্চ পাহাড়ের দেওয়াল ভেদ করিয়া এখানে পৌছিতে পারে না বলিয়াই বৃষ্টি বড় কম হইয়া থাকে। এদেশের নদীগুলির জন্ম পাহাড়ের গায়ের বিস্তৃত তুষার ক্ষেত্রে। গ্রীষ্ম কালে তুষার গলিয়া নদীর বুকে স্রোতোধারা বহিয়া আনে, তারপর নদীর মধ্য হইতে নানা দিকে খাল কাটিয়া জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা করায় চাষীর বেশ সুবিধা হয়। এজন্য এদেশে ফসল ফলে এবং সবুজ শোভায় চক্ষু জুড়ায়।

চীনের অধীনে আসে। পূর্ব্ব তুর্কীস্তানের প্রধান সহরের নাম কাশগড়, ইয়ারকন্দ প্রভৃতি। লোক-সংখ্যা হইবে প্রায় ৫,৮০,০০০।

এদেশের লোকেরা বেশীর ভাগই বাণিজ্য করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। উটের পিঠে পণ্য দ্রব্য বোঝাই দিয়া সহযাত্রী বণিক্‌দল বানিজ্য যাত্রা মরুভূমির পথেই হউক, পার্ব্বত্য পথেই হউক, এক সহর হইতে অন্য সহরে যাইয়া কেনা-বেচা করিয়া থাকে। এই সব যাযাবর বণিক্‌দল রাত্রিকালে পথের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়া বিশ্রাম করে। দলের যিনি দলপতি, তিনি দল হইতে একটু দূরে স্বতন্ত্রভাবে তাঁবু ফেলিয়া



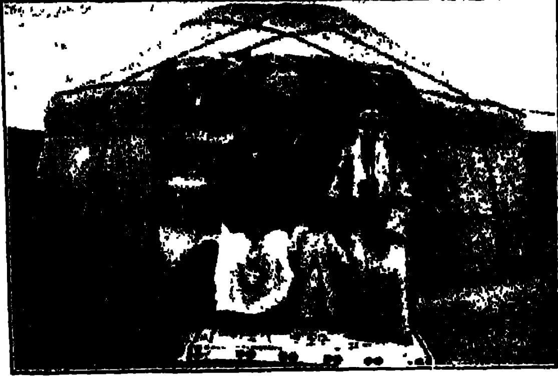
তুর্কীস্তানের মানচিত্র

প্রথমেই বলিয়াছি যে, তুর্কীস্তান পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে বিভক্ত। এ অঞ্চলের লোকদের মধ্যে বেশীর ভাগই মুসলমান। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এদেশের লোকেরা একটা বিদ্রোহ করে। সেই বিদ্রোহের আগুন জলিয়াছিল অনেক দিন। ইয়াকুব বেগ নামক একজন সাহসী বীরপুরুষ এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। ফলে দেশ স্বাধীন হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইয়াকুব বেগ নিহত হইলে উহা আবার

পূর্ব্ব
তুর্কীস্তান

বাস করেন। এইসব তাঁবুতে যতটা সম্ভব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা থাকে। এই সব যাত্রিদলের কাছে, চা অতিশয় প্রিয় খাদ্য। এই সব চা ইট-চা নামে পরিচিত, ইট-চার কথা তোমাদের কাছে পূর্ব্বেও দুই একবার বলা হইয়াছে। মোঙ্গল এবং তুর্কীরা মরুভূমির মধ্যে চলাফেরার সময়, এই চা পান না করিলে কি বরফের মধ্যে, কি রাত্রিকালে, মরুভূমির ভীষণ শীতের উৎপাত সহ্য করিতে পারে না। এ চাকে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা

নাম দিয়াছেন 'Coin of the Desert' বা মরুভূমির ধন। কোয়েহটিঙ্গ সহরে একটি তোরণ আছে। এই তোরণ বা সদর দরজার বয়স হইবে প্রায় ৩০০ তিন শত বৎসরের উপর। এই পথে চীন তুর্কীস্তানের দিক হইতে নানাদেশের বণিগ্‌দল পণ্য দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।



বণিক দলের দলপতি

এই মোঙ্গল সীমান্তের তোরণ দ্বারটির মজবুত গড়ন, এবং বিশালতা, দর্শকগণের চক্ষে সম্ভ্রম উদ্রেক করে।

অনেক সময় সহযাত্রী বণিগদল রাত্রিবেলা চলেন এবং দিনের বেলা বিশ্রাম করেন। সাধারণতঃ বিকেল বেলা যাত্রা করিয়া দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত গড়ে আটঘণ্টা হিসাবে চলিয়া ২০ কুড়ি মাইল পথ চলিয়া থাকে। এই ভাবে পথ চলাটা একেবারেই আরামদায়ক নহে। এক একটা উট প্রায় চার পাঁচমণ বোঝা বহন করে। ঘণ্টায় দুই মাইল আড়াই মাইলের বেশী উট চলিতে পারে না। রাত্রিতে উটগুলি তাঁবুর পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া থাকে আর সকালবেলা চলিতে থাকে।

বণিকেরা সকল বেলা ইট-চা হইতে চা তৈয়ারী করিয়া পান করে। কি তিব্বত, কি মঙ্গোলিয়া, কি সাইবেরিয়ার কতক অংশ এবং তুর্কীস্তান—সর্ব্বত্র এই ইট-চায়ের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

ইট-চা-কে মরুভূমির ধন বলা হইয়াছে কেন জান? মোঙ্গোলিয়া ও তুর্কীস্তানে এই ইট-চার বিনিময়ে গরু, বাছুর, পাখী এবং আরও প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। ইট-চার প্রয়োজনীয়তা এত বেশী হইবার কারণ এই যে, এদেশে অনেক স্থানেই ভাল পানীয় জল মিলে না, কাজেই, মরুযাত্রীরা এবং বণিকেরা ইট-চা পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। সেদেশে জলের কিরূপ অভাব, বলিতেছি। হয়ত তুমি একশত মাইল চলিয়া গেলে দুইটি কূপের সাক্ষাৎ পাইলে আর সেই কূপের জলও প্রায়ই লোণা হইয়া থাকে। মরুভূমির বুকে তামারিস্ক (Tamarisk) নামে এক প্রকার গুল্ম জন্মে এই গুল্মের শিকড়গুলি মাটির নীচে বহুদূর পর্য্যন্ত সিক্ত ভূমির সন্ধানে ছড়াইয়া পড়ে, সাধারণতঃ যেখানে কূপ থাকে, সেইখানেই ইহারা বেশী জন্মে। এজন্য অধিকাংশ কূপের জলই ঐ গুল্মের শিকড়ের জন্য পীতবর্ণ হয় এমন দুর্গন্ধযুক্ত হয় যে, কোনরূপেই পানের যোগ্য হয় না। এজন্য যাত্রীরা চওড়া কাঠের জলাধারে জল সংগ্রহ করিয়া লয়।

ইট-চায়ের মূল্য

মরুভূমির পথে কিংবা সমতল উর্ব্বর ভূমির পথে—



যাযাবর মোঙ্গল—রাত্রির বিশ্রাম

যেদিক দিয়াই যাত্রীরা ভ্রমণ করে না কেন, তাহাদের প্রায় সকলেই খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লয়। যাত্রীদল সাধারণতঃ গম, হইতে খাদ্য প্রস্তুত করে। পাহাড়ের পথ দিয়া যাইবার সময়, কিংবা কোন গ্রামের ধারে তাঁবু গাড়িলে পর অনেক সময় গ্রামবাসীরা বণিগদলের নিকট ভেড়া বিক্রয় করিতে

আসে, এইরূপ বিক্রয় করিয়া তাহারা ইট-চা বা টাকা কড়ি সংগ্রহ করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। এই সকল তুর্কীস্থান যাত্রী বণিকেরা বেশীর ভাগই



দূরের পথে—সহযাত্রী বণিগদল

পণ্যদ্রব্যাদি

পশম, তুলা, কিসমিস, চামড়া এই পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য চীন তুর্কীস্থানে লইয়া যায়। সময় সময় মৃতদেহও বহন করিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, চীনা বণিকদের যদি



মরুভূমিতে—ইট চা

পথে, বা সীমান্ত প্রদেশে মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহাদের শব সাময়িকভাবে সমাহিত করিয়া রাখা হয়, পরে সঙ্গীয় যাত্রীদল দেশে ফিরিবার সময় সাময়িক কবর হইতে মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া 'কফিনে' (শবাধার) পুরিয়া দেশে আনিয়া সমাহিত করে। বলা বাহুল্য যে, ঐরূপে শবের কয়েকখানা হাড় মাত্র থাকে। এইরূপ শববাহী দলকে অন্যান্য সহযাত্রী বণিগদল ভীতির চক্ষে দেখে।



মোঙ্গল সীমান্তের তোরণ দ্বার

বণিকগদলের আর একটি অতি কুসংস্কার আছে। অনেক সময় বরফাচ্ছন্ন পথে চলিতে দুই একটি

উটকে মৃতপ্রায় অবস্থায় বরফের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়, বরফাচ্ছন্ন নিরীহ জীব কোনো-রূপেই আপনাকে বরফের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারে না, এই সময়ে যদি কোন বণিগদল সেই পথে যায়, তবে তাহারা ঐ উটকে উদ্ধার করা দূরে থাকুক বরং ফেলিয়া রাখিয়া যায়, তাহাদের বিশ্বাস, এইরূপ উটকে বাঁচাইতে গেলে তাহাদের



বিক্রয়ের জন্য ভেড়া লইয়া যাইতেছে

দলের উটেরও এইরূপ অবস্থা হইবে, কাজেই সেই তুষার প্রান্তরে হতভাগ্য জীব তিলে তিলে মরণের দুয়ারে গিয়া পৌঁছে।

তুর্কীস্তানের পথ বড় ভীষণ।

এমন সব গিরিপথ উত্তীর্ণ হইতে হয় যে, সেগুলিকে 'মরণের দ্বার' (Dead pass) বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বরফে ঢাকা বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশ, নিকটে ও দূরে বরফাচ্ছন্ন পর্ব্বত-শ্রেণী,—উন্মত্ত তুষার ঝটিকা বহিয়া যাইতেছে। সেই দারুণ শীতে পথ চলা, একবার কল্পনা কর! এই সব পার্ব্বত্য গিরিসঙ্কট ৭,০০০।৮,০০০ ফিট উচ্চ হইয়া থাকে। ঝড়ের বেগে বরফ গলিয়া পড়িতে থাকে। এইরূপ পথে সময় সময় বণিগদল রাত্রির অন্ধকারে পথহারা হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। একবার একহাজার উষ্ট্রবাহিত একটি বিরাট সহযাত্রী বণিগদল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

বসন্তকাল যেমন দেখা দেয়, তখন মোঙ্গল, তাতার ও চীন তুর্কীস্তানের পল্লীগ্রামের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। এইরূপ যাত্রার সময় তাহাদের সঙ্গে তাঁবু থাকে, বাণিজ্য দ্রব্যাদি থাকে, গৃহপালিত পশু পক্ষী থাকে। মোট কথা, গৃহস্থালির বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়াই তাহারা অভিযান করে। এইরূপ অভিযান দ্বারা তাহারা সারাবৎসরের খাদ্য, বস্ত্র এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে।

বসন্ত অভিযান

প্রত্যেক গ্রামের বা দলের এক একজন সর্দ্দার থাকে। তুর্কীস্তানের পথে এবং চীন ও তুর্কীস্তানে মোঙ্গল, কিরঘিজ, রুশ তাতার প্রভৃতি জাতীয় লোক দেখা যায়। রুশ তাতারীয়েরা রুশিয়া ও তুর্কীস্তানের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উত্তর দেশেই বাস করে। সর্দ্দারেরা কাজাক, তাতার, কিরঘিজ এই সব সম্প্রদায়ের হয়। সাধারণতঃ এই সব দলপতিদিগকে যাযাবর বলিলে কোনরূপ অত্যুক্তি হয় না। ইহারা নিজেদের দল লইয়া আজ এখানে, কাল ওখানে এইরূপ ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। পর পৃষ্ঠায় সিন্‌কিয়াঙ্গ (Sinkiang) প্রদেশের একজন সর্দ্দারের চিত্র দেওয়া হইল।

যাযাবর সর্দ্দার



বরফের পথে মৃতপ্রায় উট ও যাত্রীদল

চীন তুর্কীস্তানের কাজাকদিগকে প্রায়ই বাজপাখী, বা ঈগলপাখী হাতে করিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।

কাজাকেরা ঈগল পাখী খুব ভালবাসে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই পাখী পুষিতে ভালবাস, কিন্তু সে সব পাখীরা অধিকাংশই পোষ মানে। কাজাকদের কাছে, একটি ঈগল পাখীর দাম, দুইটি ঘোড়ার চেয়েও বেশী। ইহারা তাহাদের পোষা ঈগল কখনও বিক্রয় করে না, বরং সময় সময় কোনও দলপতিকে উপহার দিতে দেখা যায়। এই সব ঈগলদিগকে কাঁচা মাংস খাওয়ান হয়। শরৎকালে এইসব পোষা ঈগলপাখীকে শিকার করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথমটায় ততটা দক্ষ না হইলেও ক্রমে ইহারা শিকারে এমন অভ্যস্ত হয় যে, হরিণ, শিয়াল, এমন কি নেকড়ে বাঘ শিকার করিতেও দক্ষ হইয়া থাকে।


মরণের পথ—বরফে ঢাকা গিরিসঙ্কট

লোকেরা যাইয়া শিকার তুলিয়া আনে এবং ঈগলপাখীটিকে পুরস্কারস্বরূপ প্রচুর পরিমাণে মাংস খাইতে দেয়। সোনার ঈগল বা


একজন সর্দ্দার—সিন কিয়াঙ্গ


একজন কাজাক ও তাহার সোনার ঈগল পাখী

ঈগলেরা থাবা দিয়া আঘাত করিয়া এই সব জন্তুদিগকে মারিয়া ফেলে। মারিয়া পর Golden Eagle পাখী কাজাকদের অত্যন্ত প্রিয়। এই পাখী সংগ্রহ করা বড় কঠিন।

জীবনকে বিপন্ন করিয়া তবে এই পাখী সংগ্রহ করিতে হয়।

চীন তুর্কীস্থানে যাইবার পথে অনেক সময় এমন দুই একটি প্রাচীন সহরের সাক্ষাৎ মিলে, যে সব



রেলপথ হইতে ১৬০০ মাইল দূরে অবস্থিত কুচেঙ্গৎজি সহর

সহর রেলপথ হইতে প্রায় ১৬০০ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রসঙ্গক্রমে কুচেঙ্গৎজি সহরের নাম করা যাইতে পারে। এখানে আসিলে মনে হয় না যে, আমরা বিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগের লোক। এখানে হাজার হাজার বছর পূর্ব্বের নিয়মকানুন, সামাজিক রীতিনীতি সব বাঁচিয়া আছে। এই সহরের পথঘাট, গলিগুঁজি লোকজনের পোষাক-পরিচ্ছদ—সবই সেকেলে ধরণের, হয়ত বা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু অদল বদল হইবে, কিন্তু তাহাও অনেক সময়-সাপেক্ষ বলিয়াই ভ্রমণকারীরা মনে করেন এইরূপ আরও দুই একটি প্রাচীন সহর আছে। ইউরামচি (Uramchi) সহরের কাছে তোকসান (Toksun) নামক একটি সহরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। পঞ্চাশ বৎসর আগে মুসলমানদের বিদ্রোহের পর, এই সহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এক সময়ে এই সহরটি প্রাচীর বেষ্টিত ও দেখিতে অতি শ্রীসম্পন্ন ছিল। এখন তাহার কিছুই নাই, না আছে প্রাচীর, না আছে বাড়ীঘর, আছে শুধু একটি মসজিদ ও একটা দুর্গের ভগ্ন প্রবেশ পথ মাত্র। এখানে আসিলে, এক সময়ে এখানকার প্রাচীন সভ্যতা কিরূপ ছিল, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

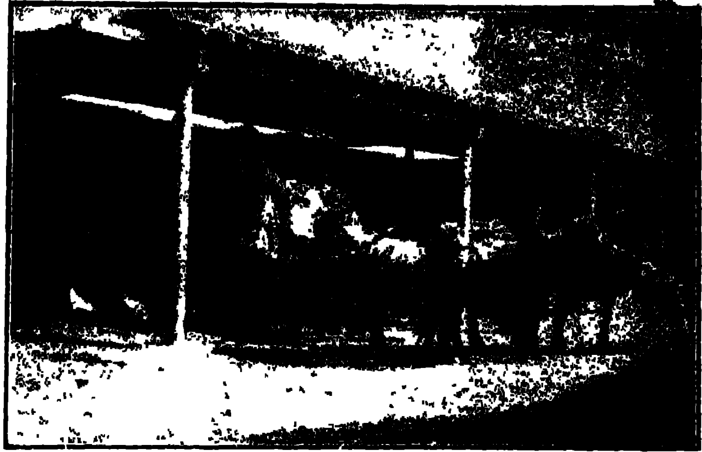


তোকসান সহরের ধ্বংসাবশেষ

এদেশের লোকেরা এক প্রকার যানের ব্যবহার করে, তাহাদের নাম আরাবা (Araba)। এই গাড়ী, উট, গরু, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতিতে টানে।

গ্রামের পথে, সহরের পথে, মরুভূমির সর্বত্রই এই সকল গাড়ীর আড্ডা দেখা যায়। ভারী বোঝা টানিতে হইলে এই গাড়ীর সহিত গাধা জুড়িয়া দেয়, কেননা ভারী বোঝা টানিতে এদেশে গাধার তুল্য অন্য প্রাণী আর নাই। এই সব গাড়ীর দুইটি করিয়া চাকা থাকে। আর সেই চাকাও অতি সহজেই তৈয়ারী হয়। ছোট ছোট শক্ত গাছ দিয়া কিংবা গাছের ডাল বাঁকাইয়া এই গাড়ীর চাকা প্রস্তুত করে।

তোমরা মরুভূমিতে "মরুদ্যান" (Oasis) আছে, একথা জান।



আরাবা গাড়ীর আড্ডা



আরাবার চাকা তৈয়ারী করিতেছে

তুর্কীস্থানের মরুভূমির মধ্যে মধ্যে যে সকল মরুদ্যান আছে, সেখানে এক একটি বাণিজ্যকেন্দ্র আছে। এই সকল স্থানে রীতিমত বাজার মিলে। এই সব বাজারে দূর-দূরান্তর হইতে গ্রামবাসীরা আসিয়া কেনাবেচা ও অদল বদল করে। গ্রাম্য লোকেরা পশম এবং চামড়ার বিনিময়ে খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করিয়া লয়। এইরূপ বাণিজ্য কেন্দ্রে সকল জাতীয়—তুর্কীস্থান, চীন, মোঙ্গল প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদিগকে দেখা যায়। মরুভূমির দেশের তরমুজ অতি উৎকৃষ্ট। আজ কাল অনেক স্থানে মরুভূমিতেও জল সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ায় মরুভূমির উষর বুকেও সবুজ শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং যে সকল ফুল, ফল ও খাদ্য-শস্য কোন কালেই মরুভূমিতে জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহাও জন্মিতেছে। মরুভূমির বাজারের তরমুজের বাজার বড় বিখ্যাত। এখানে লোক জড় হইয়া সব বড় বড় তরমুজ কেনাবেচা করে। এইখানে দেখিতে পাইবে, পথের দুই পাশে সার দিয়া বসিয়াছে শাক সব্জীর দোকানীরা, ফল-বিক্রেতারা এবং পশম, চামড়া প্রভৃতি বিনিময়ের জন্য গ্রামবাসীর দল। মরুদ্যানে নানারকম ফল, ডিম, মাংস ও শাক-সব্জী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এদেশের



গ্রামের লোকেরা দ্রব্য বিনিময় করিতেছে

কৃষকেরা গাধার সাহায্যে শস্য 'মাড়াই' করে

তুর্কীস্থান

তরমুজের কথা বলিয়াছি। হামি নামক স্থানের তরমুজ, তুর্ফানের আঙ্গুর, আর কুচার বালিকাদের সৌন্দর্য্যের তুলনা মিলে না। চীনেরা এই সম্বন্ধে একটি ছড়া বলে:—

"তুর্ফানের আঙ্গুর রে ভাই—তরমুজ হামিরের,"
কুচা দেশের ছোট্ট মেয়ে হার মানিয়েছে ফুলের।

চীন-তুর্কীস্থানের পশমের কারবার খুবই বিখ্যাত। এদেশের লোকেরা পশমকে নানা রঙে রঞ্জিত



তরমুজের বাজার

করিয়া বিবিধ গাত্রবস্ত্র ও নানা প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এ সব কাজে তাহাদের একটা স্বাভাবিক ভাবে বংশপরম্পরানুগত শিক্ষা আছে। গ্রামের পথে বা সহরের পথে চলিতে চলিতে দেখিতে পাইবে, কোথাও কোনও শিল্পী গাছের ছায়ায়, বা বাড়ীর পাশের একটু নির্জ্জন স্থানে বসিয়া রাগ্ বা গালিচা (কার্পেট) বুনিতেছে। এতটুকু বিশ্রাম নাই—অতি দ্রুত হাত চালাইতেছে।

তুর্কীস্থানের বাড়ীঘরগুলি, তোমরা আমাদের দেশে যেমন ঘরবাড়ী দেখিতেছ, সেইরূপ নহে। ঘরগুলি, ছোট ছোট, জানালা নাই, এমন ভাবে তৈয়ারী যেন সামান্য একটু রন্ধ্রপথেও আলো প্রবেশ করিতে না পারে। সে দেশের আলো অর্থে গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপ। পথের মধ্যে যে সব সরাইখানা আছে, সেগুলিও ঐরূপ ভাবেই প্রস্তুত।

স্থানে স্থানে বৌদ্ধ বিহার বা মঠ দেখা যায়। এই সব বিহারগুলি অধিকাংশই উচ্চ পাহাড়ের



গাধা দিয়া শস্য মাড়াইতেছে

উপর নির্ম্মিত। এখানে লামারা বাস করে। তীর্থযাত্রীরা আসে। এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কি ভাবে



পশম রঞ্জিত করা

কেমন করিয়া ভারতের বাহিরে পৃথিবীর নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, সেকথা তোমরা জান।

কাজেই, এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলিলাম না।



কার্পেট বুনিতেছে

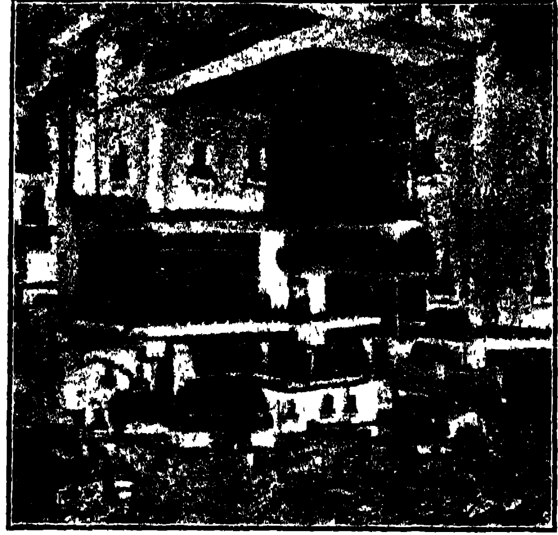
ভ্রমণ-পথে ব্যবসায়ীকে অনেক সময় নদী পার হইতে হয়। উটেরা স্বচ্ছন্দ গতিতে নদী উত্তীর্ণ হয়। এই সব নদীতে প্রায়ই গভীর জল থাকে না, তবে জল যে বরফ-শীতল, সে কথা না বলিলেও চলে। এই জলের মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে উটেরা নদী পার হয়।

যে সব ব্যাপারী দলের সঙ্গে যে সকল উট-চালক



ব্যাপারীর দল নদী পার হইতেছে

বা পথপ্রদর্শক থাকে, তাহাদের মত কষ্টসহিষ্ণু লোক বড় কম দেখা যায়। শীত বল, গ্রীষ্ম বল, সকল ঋতুতেই ইহারা অটুট ভাবে কাজ করিতে পারে। ইহারা হাসিখুসি, বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান, বলিষ্ঠ এবং মিষ্ট স্বভাবের হইয়া থাকে। লাদাখি ভৃত্যেরাই



একটি বৌদ্ধ-মঠ



লাদাখি ভৃত্য

সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং কর্মনিপুণ হয়। এই সব ভৃত্য একদিকে যেমন পরিশ্রমী, তেমনি কৌশলীও

বটে। পথে তোমার ঘোড়ার নাল খারাপ হইলে অমনি তাহারা মেরামত করিতে লাগিয়া গেল এবং দক্ষ শিল্পীর মত অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সব ঠিক ঠাক্ করিয়া আবার যাত্রাপথে অগ্রসর হইল। তুর্কীস্তানের স্থানে স্থানের বিচিত্র সৌন্দর্য্য ভ্রমণকারীদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। তিয়েনশানের (Tien Shan) উপত্যকার শ্যামল শ্রী শুধু মনোরম নয়, উপভোগ্যও বটে। এই পথে আসিলে জন্তু জানোয়ারেরাও যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। এই উপত্যকায় খুব লম্বা লম্বা বুক পর্য্যন্ত উঁচু ঘাস হয়। জন্তু-জানোয়ারেরা সেই ঘাস পরম তৃপ্তির সহিত খাইয়া থাকে। বরফ গলিয়া গেলে অধিত্যকা প্রদেশের এই শ্যামলশ্রী বিকশিত হয়।

তিব্বত দেশের সহিত তুর্কীস্তানের সম্বন্ধ নিকট। অনেক সময় তিব্বতের দিক হইতে পাহাড়ের পথে ব্যাপারীর দল ইয়াকের পিঠে বোঝা চাপাইয়া নীচে নামিয়া আসে। অতি বড় দুর্গম গিরিপথে চলিতেও এই জন্তুদের সামান্যও পদস্খলন হয় না।



দুর্গম গিরিপথে ইয়াক সহ ব্যাপারীর দল

কাশগড়—চীন তুর্কীস্তানের প্রধান সহর ও বাণিজ্য-কেন্দ্র। গ্রামের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা এখানে বেসাতি করিতে আসে। পুরুষদের মত মেয়েরাও ঘোড়ায় ও গাধায় চড়িয়া দ্রুতবেগে পথ চলে। গাধাগুলি কিন্তু চলিবার পথে বেশ তামাসা করে। পথের পাশে যদি কোন খাবার দোকান থাকে, তাহা হইলে সেই দোকান হইতে নির্ব্বিরোধী বালকের মত অনায়াসে মুখে খাবার তুলিয়া দেয়। আরোহীর বা দোকানীর প্রহারেও বিচলিত হয় না। কাশগড় কিজিলদরিয়া নদীর তীরে অবস্থিত। রুশ তুর্কীস্তানের সীমান্ত হইতে কাশগড়ের দূরত্ব বড় বেশী নয়। এখানে ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল বাস করেন। কাশগড় অঞ্চলের শাসনকর্ত্তাও এখানে থাকেন। পুরাকালের দুই একটি বাড়ী-ঘর এখনও এখানে ধ্বংসের মধ্য দিয়াও বাঁচিয়া আছে। কাশগড়ের বাজার বিশেষ প্রসিদ্ধ। কাশগড় নদী এ অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় এখানকার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর। সহরের পথে গাধার পিঠে জলের পিপা চাপাইয়া জল বিক্রয় করিবার রীতি আছে। এখানে সূর্য্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর। তুর্কীস্তানের মুসলমান মহিলারা গ্রামে বা ছোট ছোট সহরে চলাফেরার সময় বোরখা ব্যবহার করেন না বটে, কিন্তু বড় বড় সহরে চলিবার সময় বোরখার ব্যবহার করেন।



ঘোড়ার নাল তৈয়ারী করিতেছে

চীন তুর্কীস্তানের লোকেরা যেমন অতিথিবৎসল, তেমনি অমায়িক। চীন তুর্কীস্তানের অধিবাসী তুর্কীরা কাশগড়িয়া নামে পরিচিত। তুর্কীরা বেশ



কাশগড়ের যাত্রী—গ্রাম্য মেয়ে



কাশগড়ের গলিপথে বোরখা পরা মুসলমান স্ত্রীলোক

হাসিখুসি, রসিক, সঙ্গীতানুরাগী এবং মেলা ও বাজারে চলাফেরা করিতে ভালবাসে। ইহারা পরিশ্রমী হইলেও চীনাদের ন্যায় নহে। এ দেশের অনেক জায়গায় বৃষ্টি কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না, কিন্তু এজন্য তাহাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই,



পানামিকের মেয়ে

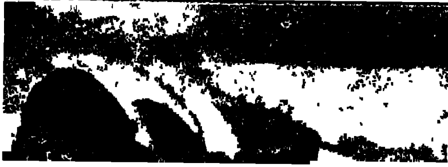
কেননা, গ্রীষ্ম যত প্রবল হয়, পাহাড়ের মাথায় বরফ তত বেশী গলিয়া নদীর বুকে জল বাড়াইয়া দেয়। ঐ জল খালে খালে নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া চাষ বাসের সুবিধা করে।

সিন্‌কিয়াঙ্গ মরুদ্যানের পথে মুখভরা হাসি লইয়া পানামিক অঞ্চলের মেয়েদের দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশের মেয়েরা খুব হাসিখুসী। বণিকদের কাছে আসিয়া পণ্যদ্রব্যাদির বিনিময় করিয়া আবার হাসিমুখে বাড়ী ফিরে। এদেশের মাতা পিঠে একটা ঝুড়ির ভিতরে করিয়া শিশু-সন্তান বহন করে।

পশ্চিম তুর্কীস্তান—এই অংশ এখন রুশগণতন্ত্র দ্বারা শাসিত। Autonomous Republic of Turkistan। ইহার উত্তর সীমা কিরগিজ ষ্টেপ ভূমি, পূর্ব্ব সীমা চীন তুর্কীস্তান। চীন তুর্কীস্তানের সহিত রুশ তুর্কীস্তান তিয়ানশান পর্ব্বতশ্রেণী পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগরের তটভূমি, আর দক্ষিণ দিকে

পারস্য ও আফগানিস্থান। কুশিক নামক স্থানটি ভারতীয় রেলপথের চমন নামক স্থান হইতে মাত্র ৪৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পথটুকু যদি ঐ রেলপথের সহিত সংযুক্ত হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সহিত তুর্কীস্থানের চলাচলের সুযোগ হইত এবং ইউরোপের ক্যালে হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত রেল-পথের যোগ হইত। রুশ তুর্কীস্থানের পরিমাণফল ৭,৬০০,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা

সেমিভেটকিন্‌সক্, সমরকন্দ, ফরগণা, সিরদরিয়া এবং আমুদরিয়া এই কয়টি বিভাগে রুশ তুর্কীস্থান বিভক্ত।





মা ও ছেলে

তাশকেণ্ট (Tashakent) নগরীতে শাসন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। এই কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রদেশের শাসন সমিতি, এক একজন সভ্য তাশকেণ্টে প্রেরণ করেন। কেন্দ্রীয় সভায় ৭২ জন সভ্য থাকেন। ইঁহারাই শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন।

এখানকার সহরগুলির মধ্যে আশখাবাদ (Ashkha-Bad), বোখারা Bokhara), সমরকন্দ হামি, এ সব প্রধান।

আশখাবাদ—কাস্পিয়ান হ্রদের অন্তর্বর্ত্তী দেশের রাজধানী। এখান হইতে রেলপথ—সমরকন্দ এবং কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরবর্ত্তী ক্রাস্‌নোভোদস্ক সহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশটি রুশদের হাতে আসিবার পর হইতে আশখাবাদ এ অঞ্চলের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এখানে ছোট বড় নানা প্রকার শিল্প ও বাণিজ্য চলিতেছে। এই সহরের লোক-সংখ্যা প্রায় ৫৩,০০০ জন। আশখাবাদের কারিগরি বিদ্যালয় এবং সরকারী বাড়ীগুলি দেখিতে অতি সুন্দর।

বোখারা বোখারা অঞ্চলের প্রধান নগর। মধ্য এসিয়ার মধ্যে বোখারা প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। এক সময়ে ইহা কি ধর্ম্ম বিষয়ে, কি শিক্ষা বিষয়ে সকল দিক দিয়াই মোস্‌লেম জগতের দ্বিতীয় নগরী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখনও এখানকার দুই একটি প্রাচীন কীর্ত্তি স্তম্ভ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখানে নানা পল্লীতে প্রায় ৩৬৮টি মস্‌জিদ আছে। বোখারা সহরের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ সরোবর আছে। ইহার জল পানের অযোগ্য হইলেও সহরের লোকেরা এই সরোবরের তীরে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এখানে সহরের লোকেরা কাপড় কাচে, স্নান করে এবং আবর্জ্জনা ধৌত করে, এজন্যই এখানকার জল ভাল নহে। **সমরকন্দ** ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। ১২২০ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিজখাঁ এই সহরটি একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে তৈমুরলঙ্গ যখন এখানে রাজধানী করেন, তখন এই নগরীর পূর্ব্ব গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সহরের শিরদার মসজিদটি প্রসিদ্ধ।

খিবা সহরটিতে মাটির দেওয়াল দেওয়া বাড়ী ঘরের সংখ্যাই বেশী। এখানে দুইটি প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, ও কয়েকটি মস্‌জিদ ছাড়া, পাকা বাড়ী নাই বলিলেই চলে। খিবা হইতেছে প্রাচীন খারাজিম প্রদেশের রাজধানী। রুশ অধিকারের পূর্ব্বে পশ্চিম তুর্কীস্থানের প্রায় সমগ্র দেশেই এখানকার রাজার অধীন ছিল। এখন ইহার পূর্ব্ব গৌরব কিছুই নাই। ক্ষুদ্র উজবেগ প্রদেশ মাত্র এবং ইহার অধীনে দুই চারিটি মরুস্থান আছে।

পশ্চিম তুর্কীস্থানের প্রধান বাণিজ্য-সম্পদ হইতেছে তুলা। এদেশের তুলা ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। ফরগণা অঞ্চলের লোকদের মুখে তুলার কথা ছাড়া, অন্য কোন কথা শুনা যায়

না। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এদেশের লোকেরা খাদ্য-শস্য গমের চাষেও মনোযোগী নহে। তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য আসে দক্ষিণ রুশিয়া হইতে। বাস্তবিক পক্ষে তুলার কারবারই হইতেছে এখানকার প্রধান ব্যবসায়।

চীন তুর্কীস্তান সম্বন্ধে এখানে আবার দুই একটি কথা বলিব। চীন তুর্কীস্তানকে সাধারণতঃ তাবতারি, কাশগরিয়া, সিন্‌কিয়াঙ্গ বা সাত সহরের দেশ (Land of the seven cities) বলে। এই দেশের পশ্চিমাংশ সমুদ্রতটরেখা হইতে প্রায় ৪৫০০ ফিট উচ্চ। ক্রমশঃ এই উচ্চতা ঢালু হইয়া ২,০০০ ফিট পর্য্যন্ত নামিয়াছে। লোপনোর (Lop-nor) অঞ্চলটি ১০০০ ফিট মাত্র উঁচু। পণ্ডিতেরা বলেন, এক সময়ে এই অঞ্চলটা সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত ছিল। এখন সেই নিম্নাংশটাই তাকলামাকান্ (Taklamakan) নামক ভীষণ ও বন্ধুর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই মরুভূমি দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে প্রায় ৬০০ মাইল হইবে আর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে হইবে প্রায় ৩৫০ মাইল। এই মরুভূমির উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে তিয়ান্‌শান্ পর্ব্বত-শ্রেণী বিরাজিত। খান্‌তেঙ্গি নামক ইহার একটি শৃঙ্গের উচ্চতা প্রায় ২৪,০০০ ফিট হইবে। এই পর্ব্বতশ্রেণী প্রথমতঃ তুর্কীস্তানের জুনগরিয়া প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরে রুশ তুর্কীস্তানের সহিত চীন তুর্কীস্তানের সীমা-রেখারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

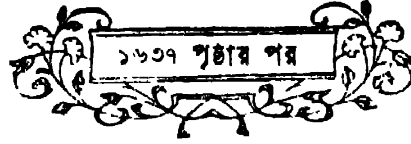
তুর্কীস্তান কি পূর্ব্ব, কি পশ্চিম, কোন প্রদেশেরই খনিজ দ্রব্যাদির সম্বন্ধে তেমনভাবে কোনরূপ অনুসন্ধান চলে নাই। এদেশের খনিজ দ্রব্যাদি পার্ব্বত্য প্রদেশে পাথুরে কয়লা, লোহা, রূপা, সীসা প্রভৃতি নানা জাতীয় খনিজ দ্রব্যাদি রহিয়াছে, কিন্তু এদিকে কোনরূপ উদ্যোগ না হওয়ায় এদেশের খনিজ দ্রব্যের কোনও ব্যবস্থা নাই। রবিরের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এদেশে যে কত জাতির বাস ও তাহাদের মিশ্রণে কত জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বলা বড় সহজ নয়। রুশ, তাতার, কাল্মুক, কিরঘিজ, ইহুদী, পার্শী আফগান, তুঙ্গান (চীনদেশীয় মুসলমান) প্রভৃতি জাতি তুর্কীস্তানের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের সহিত ও তুর্কীস্তানের বাণিজ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। দিন দিন তুর্কীস্তানের নিভৃততম প্রদেশেও সভ্যতার আলোক প্রবেশ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে; তবে এখনও তাহার অনেক বিলম্ব আছে।



পারসিক জাতি


১৬৩৭ পৃষ্ঠার পর

নবীন ব্যাবিলন সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন সাইরাস অথবা কুরুস (Cyrus বা সাইরাস)। তিনি জাতিতে ছিলেন পারসিক। পারসিকেরা আর্যজাতির এক শাখা। ইহারা অন্য স্থান হইতে আসিয়া ইরাণদেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। তাহারা নিজেদের আর্য বলিত ও দেশের নাম দিয়াছিল আর্যান আর্য হইতেই ইরাণ নামের উৎপত্তি। এই আর্যজাতি নানা দলে বিভক্ত হইয়া ইরাণের নানা স্থান দখল করিয়া বসে। মীদেরা (মদ) পশ্চিম প্রান্তে আড্ডা গাড়িল। পারসিকেরা (পার্শ) দখল করিল দক্ষিণাংশ। বর্কান অথবা হাইরকানিয়ানরা (Hyrcanians) কাস্পিয়হ্রদের দক্ষিণ কূলই পছন্দ করিল। হরৌবতী (Arachosians), জ্রাণক (Drangians) ও হরৈব (Arians) গোষ্ঠীরা বর্তমান আফগানিস্থানে প্রবেশ করিল। বাখত্রি (Baktrians), সুগুদ (Sogdians) উবার্জমিয়া (Chorasmians) প্রভৃতি দলেরা হিন্দুকুশের উত্তর প্রান্তেই রহিয়া গেল। পার্থবেরা (Parthians) বর্তমান পারস্যে বসবাস করিতে লাগিল। পার্শ গোষ্ঠীর নাম হইতেই সমগ্র জাতির নাম হইয়াছে পারসিক। তবে প্রথমে মীদেরাই শক্তিশালী হইয়াছিল।

অনেক দিন পর্যন্ত এই জাতির খোঁজ-খবর বড় কেহ রাখিত না। ইতিহাসের পটভূমিতে তাহারা প্রথম দেখা দেয় অ্যাসিরিয়রাজ তৃতীয় সালমানেসারের সময়। তিনি ও তাঁহার পৌত্র চতুর্থ আদাদ নিরারি জাগ্রস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া "মাদাই" (মীদ) জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। এই সময় হইতে মীদদের সঙ্গে অ্যাসিরিয়ার রাজাদের পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অবশেষে সার্গন মীদরাজ দয়াকুকে (Deioces) বন্দী করিয়া পদানত করেন (খৃঃ পূঃ ৭১৫)। সেনাকেরিবও মীদদের নিকট হইতে কর আদায় করেন। অনেক দিন পর্যন্ত মীদেরা অ্যাসেরিয়ার আধিপত্য স্বীকার করে। অসুরবানিপালের রাজত্বের শেষ ভাগে ফ্রবর্তিস (Phraortes) মীদজাতিকে অ্যাসিরিয়ার অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করেন। ইহার অল্পদিন পরে মীদরাজ উভক্ষত্র (Cyaxares) নবপোলাসারের (Nabopolassar) সঙ্গে যোগ দিয়া অ্যাসিরিয়ার রাজধানী নিনেভে অবরোধ করেন। দুই বৎসর অবরোধের পর নিনেভের পতন হয়। অ্যাসিরিয়ার শেষ রাজা সিন্সারিস্কুন্ প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিয়া আত্মহত্যা করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য উভক্ষত্র ও নবপোলাসার ভাগাভাগি করিয়া লন। এইভাবে সমগ্র ইরাণদেশ ও পূর্ব্ব অ্যাসিরিয়ার উপর উভক্ষত্রের আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

মীদসাম্রাজ্য কিন্তু বেশী দিন টিকিল না। উভক্ষত্রের পুত্র ইস্তুভেগুর (Astyges) রাজত্বকালে অনশানের হকামনিশ্য-বংশীয় (Achæmenid) পারসিক সামন্তরাজ কুরুস (Cyrus) বিদ্রোহ করিয়া

তাঁহাকে পরাজিত করেন ও মীদসাম্রাজ্য অধিকার করেন। (৫৫০ খৃঃ পূঃ)।

এই সময়ে এসিয়ামাইনরে ক্রীসাস্ (Croesus) নামে একজন বিখ্যাত রাজা লিডিয়ায় (Lydia) রাজত্ব করিতেছিলেন। ক্রীসাস্ ছিলেন ইস্তভেগুর



রাজা কুরুসের পর্ব্বত গাত্রে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি

। কুরুসের অভ্যুত্থানে তাঁহার প্রাণে সন্ত্রাস উপস্থিত হইল। কাজেই তিনি মিশররাজ আমাসিস্ (Amasis) ও ব্যাবিলন রাজ নবনী দাসের সঙ্গে যোগ দিয়া কুরুসকে দমন করিতে মনস্থ করিলেন। এমন কি গ্রীস্ দেশের স্পার্টানরাও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল। তিনি গ্রীক্ সভ্যতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কথিত আছে তিনি নাকি গ্রীসদেশের অ্যাপোলো (Apollo) দেবের ডেল্‌ফি (Delphi) মন্দিরে অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া দেবতার প্রত্যাদেশ জানিতে চাহিলেন। ডেলফির পুরোহিত ভবিষ্যৎবাণী (Oracle) করিলেন যে ক্রীসাস্ যদি হ্যালিস নদী পার হইয়া কুরুসকে আক্রমণ করেন তবে তিনি একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবেন। তবে আর ভাবনা কি? কুরুসের সাম্রাজ্য ত তাঁহার মুঠার মধ্যে! সুতরাং কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি হ্যালিস্ (Halys) নদী পার হইলেন। টেরিয়ার যুদ্ধে সুবিধা না করিতে পারিয়া তিনি নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুরুস তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া রাজধানী সার্ডিসের (Sardis) দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। এখানে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে ক্রীসাস হারিয়া গেলেন। অল্প কয়েক দিন অবরোধের পর রাজধানী কুরুসের হস্তগত হইল। ক্রীসাস আত্মসমর্পণ করিলেন।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (Herodotus) ক্রীসাসের পরিণামের বিষয়ে সুন্দর একটি গল্প বলিয়াছেন। কুরুসের আদেশে ক্রীসাসকে হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া একটি চিতার উপর বসান হইল। মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া ক্রীসাসের মনে পড়িল যে একদিন এথেন্সের বিজ্ঞ রাষ্ট্রবিদ সোলোন (Solon) তাঁহার ধনদৌলত দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, যাহারা জীবিত আছে তাহাদিগকে সুখী বলা যায় না। এ কথা মনে পড়াতে তিনি 'সোলোন' সোলোন, সোলন, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। কুরুস একজন দোভাষীকে বলিলেন, "যাও বন্দীকে জিজ্ঞাসা কর সে কাহার নাম স্মরণ করিতেছে।" অনেক পীড়াপীড়ি করাতে ক্রীসাস সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। তখন কুরুসের মনে অনুশোচনা উপস্থিত হইল। তাই ত তিনিও ত মানুষ তাঁহারও ত এইরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় হইতে পারে। এই কথা মনে হওয়াতে তিনি অনুচরদের আদেশ দিলেন যে ক্রীসাসকে মুক্তি দেওয়া হউক। ইতিমধ্যে চিতা প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা আর নিবান গেল না। তখন ক্রীসাস্ আপোলো দেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "দেব, কোনদিন যদি আমার কোন উপহার তুমি

গ্রহণ করিয়া থাক তবে আমায় রক্ষা কর।" অমনি হঠাৎ কোথা হইতে মেঘ আসিয়া খুব ঝড়-বৃষ্টি হইল, ও চিতা নিবিয়া গেল।

লিডিয়া হস্তগত করিবার পর কুরুস ব্যাবিলন বিজয়ে মন দিলেন। তবে তাঁহার সেনাপতি হরপগাস (Harpagus) এসিয়া মাইনরের ভূমধ্যসাগর উপকূলস্থিত গ্রীকরাজ্যগুলি একে একে জয় করিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে আনয়ন করেন। এই সব গ্রীক্ রাজ্যের সঙ্গে বন্দোবস্ত হইল যে তাহারা নিয়মিত ভাবে কর দিবে এবং প্রয়োজন মত পারস্য-রাজকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবে। এদিকে আসিরিয়ার শাসনকর্তা গোব্রিয়াসকে সসৈন্যে ব্যাবিলনিয়াতে পাঠান হইল। নবনীদাসের পুত্র বেল্শাজার তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ওপিসের যুদ্ধে তিনি ভীষণভাবে পরাজিত হন এবং গোব্রিয়াস বিনা আয়াসে ব্যাবিলন অধিকার করিলেন। পর বৎসর কুরুস স্বয়ং ব্যাবিলনে আগমন করেন এবং এখানকার পুরোহিতেরা তাঁহাকে ত্রাণ-কর্তারূপে অভিনন্দন করে। ব্যাবিলনিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। এখানে তাঁহার প্রথম কাজ হইল ব্যাবিলনিয়ার পুরোহিতদিগকে সন্তুষ্ট করা,



কুরুসের সমাধি

নবনীদাস দেশের ভিন্ন ভিন্ন মন্দির হইতে দেবমূর্তি-লইয়া আসিয়া ব্যাবিলনে জড় করিয়াছিলেন। কুরুস তাহা নিজের মন্দিরে ফেরত পাঠান। নেবুক্যাড্রেজার জেরুসালেম অধিকার করিয়া সেখান-কার অধিবাসীদিগকে ব্যাবিলনিয়াতে বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। কুরুস তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুমতি দিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেকালে তাঁহার মত উদার অন্তঃকরণের রাজা খুবই বিরল ছিল। আসিরিয়ার রাজাদের মত তিনি কখন অনর্থক রক্তপাত করেন নাই। পরাজিত শত্রুর সহিত তিনি খুবই সদয় ব্যবহার করিতেন। প্রজার ধর্মমতেও তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না। এইসব কারণে সবাই তাঁহার শাসন সন্তুষ্ট চিত্তে মানিয়া লইয়াছিল। ব্যাবিলন বিজয়ের পর যে দশ বৎসর তিনি বাঁচিয়াছিলেন তাঁহার বিরুদ্ধে কেহই বিদ্রোহ করিতে চেষ্টা করে নাই। আর সেই যুগে তাঁহার মত এত বড় সাম্রাজ্যের অধিপতি আর কেহই ছিলেন না। ৫২৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কুরুসের দুই পুত্র ছিল—কম্ব্যুজিয় (Cambyses) ও বার্দ্য (Smerdis)। কম্ব্যুজিয় রাজা হইয়া গোপনে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করেন। তাঁহার রাজত্বের



কুরুসের পুত্র কম্ব্যুজিয়ের সমাধি

প্রথম চারি বৎসর দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতেই কাটিয়া গেল। তারপর তিনি সসৈন্যে মিশর অভিমুখে রওনা হন। এই সময়ে তৃতীয় স্যামেটিক ছিলেন মিশরের ফারাও। পেলুসিয়ামের নিকট দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কম্ব্যুজিয় জয় লাভ করেন। অল্প কয়েকদিন পরে তিনি মেম্ফিস ও হিলিওপলিস অধিকার করেন। সমগ্র মিশর পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তভূত হইল। প্রথম প্রথম পিতার

পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কম্বুজিয়া মিশরবাসীদের প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করেন। তাহাদের প্রথামত তিনি ফারাওপদে অভিষিক্ত হন। তাহাদের ধর্ম্মের প্রতিও তিনি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু শোনা যায়, কিছুদিন পরে নাকি তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। ফলে, মিশরবাসীদের ধর্ম্মের তিনি ঘোরতর অবমাননা করেন। ইহাতে প্রজারা খুবই বিক্ষুব্ধ হইল। এদিকে পারস্য হইতে সংবাদ আসিল যে, কে একজন নিজেকে কুরুসের পুত্র বার্ঘ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। দেশের প্রাচীনপন্থী লোকেরা নাকি তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া কম্বুজিয়া সসৈন্যে স্বদেশ অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে সিরিয়ায় তাঁহার মৃত্যু হইল।

কম্বুজিয়ের সঙ্গে দরায়বৌস বা দরায়ুস (Darius) নামে তাঁহার এক জ্ঞাতি ভ্রাতাও আসিতেছিলেন। তিনি ছিলেন বিস্তস্পের (Hystaspes) পুত্র। দারয়বৌস ভ্রাতার মৃতদেহ সঙ্গে করিয়া সসৈন্যে পারস্যের রাজধানী সুসায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে বার্ঘ্যনামধারী বিদ্রোহী নেতা মিডিয়াতে পলাইয়া যায়। সেখানেও সে নিস্তার পাইল না। দরায়বৌস পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে নিহত করেন। এইবার তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের একছত্র রাজা হন। তবে প্রথম দুই বৎসর তাঁহাকে অনেক বিদ্রোহ দমন করিতে হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে অনেকে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু দারয়বৌস একে একে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া রাজ্যমধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

এইবার তিনি রাজ্যবিস্তারে মন দেন। ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্য তিনি এক অভিযান প্রেরণ করেন। খুব সম্ভবতঃ সিন্ধুনদের পশ্চিম পারস্থিত হিন্দুরাজারা পারস্যরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি ইউরোপ অভিমুখে রওনা হন। বস্ফরাস (Bosphorus) প্রণালীর উপর একটি নৌকার সেতু তৈয়ারী করা হয়। পারস্য সৈন্য তাহার উপর দিয়া ইউরোপে পদার্পণ করে। এসিয়া মাইনরের গ্রীকরাজাগুলি অনেক যুদ্ধ জাহাজ দিয়া দারয়বৌসকে সাহায্য করে। তিনি উত্তর দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া ডানিউব নদীর তীরে উপস্থিত হন। সেখানে গ্রীকপোতের সাহায্যে একটি পুল তৈয়ারী করা হয়। তাহার উপর দিয়া নদী পার হইয়া তিনি সিথিয়া (Scythia) আক্রমণ করেন। হেরোডোটাস অবশ্য বলেন যে, দারয়বৌস ভীষণভাবে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং অল্পের জন্য নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পান। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নয়। তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইলে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। তবে মেগাবাজাজ নামে একজন সেনাপতিকে থ্রেসজয় করিবার জন্য রাখিয়া আসেন। মেগাবাজাজ



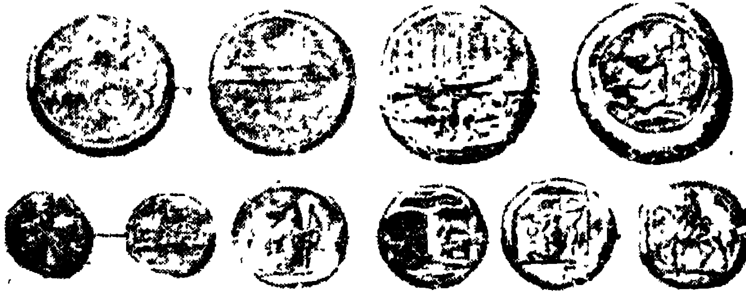
দারয়বৌসের রাজধানী - পার্সিপলিসের ধ্বংসাবশেষ

থ্রেসদেশে পারস্য-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। ম্যাকিদনিয়া পর্য্যন্ত পারস্যরাজের অধীনতা স্বীকার করে।

এই ঘটনার বার বৎসর পরে এসিয়ামাইনরের গ্রীকরাজ্যগুলি পারস্যের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন মিলেটাসের (Miletus) শাসনকর্ত্তা আরিষ্টগোরাস (Aristagoras)। তিনি প্রথমে স্পার্টার সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেখানে বিফলকাম হইয়া তিনি এথেন্সের দ্বারস্থ হন। এথেন্স সাহায্য

করিতে স্বীকৃত হয়। ইউবিয়া দ্বীপের ইরিট্রিয়া (Eretria) রাজ্য হইতেও তিনি সাহায্য পান। কিন্তু ইতিমধ্যে পারস্য সৈন্য মিলেটাস অবরোধ করিয়াছিল। কাজেই আরিষ্টগোরাস্ তাঁহার মিত্রসৈন্য লইয়া এসিয়া মাইনের রাজধানী সার্ডিস (Sardis) অভিমুখে অগ্রসর হন। বিনা আয়াসে গ্রীকরা সার্ডিস অধিকার করে। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ আগুন লাগিয়া নগরটি ভস্মীভূত হয়। সুতরাং গ্রীকসৈন্যেরা সেই স্থান পরিত্যাগ করে। এফেসাস নগরের সম্মুখে পারস্য সৈন্যদের সঙ্গে তাহাদের


পারস্যের দেবতা অরমুজ


দারয়বৌসের মুদ্রা

সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে গ্রীক সৈন্য পরাজিত হয় ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। কথিত আছে যে, দারয়বৌস যখন সার্ডিসের ধ্বংসের কথা শুনিলেন, তখন তিনি এথেন্সবাসীদের উপর ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

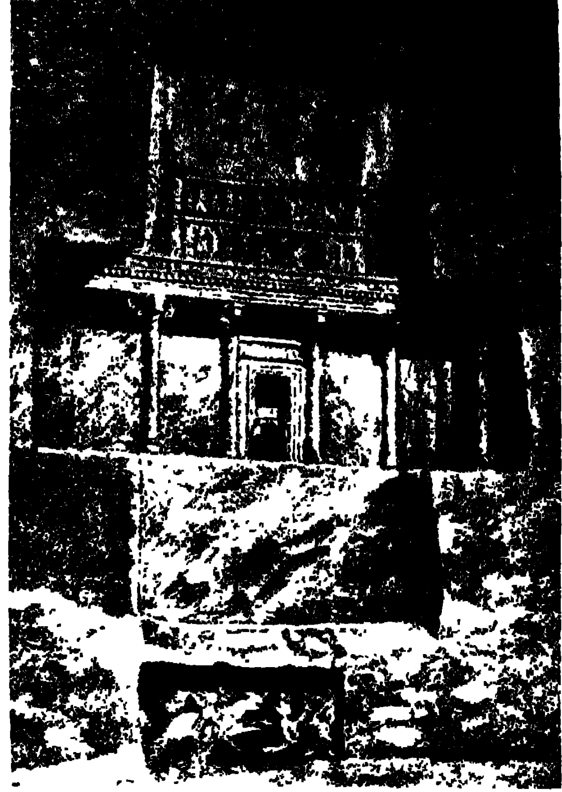
এসিয়া মাইনরে গ্রীকদের বিদ্রোহ অতি সহজেই দমন হইল। এইবার দারয়বৌস জামাতা মার্দনিয়াসকে (Mardonius) ইউরোপীয় গ্রীকদিগকে পদানত করিতে পাঠান। থ্রেস ও ম্যাকিদোনিয়া পারস্যরাজের অধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু এথস অন্তরীপের নিকট পারস্যরাজের যুদ্ধপোতগুলি ঝড়ে ধ্বংস হওয়াতে মার্দনিয়াসকে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। ইহাতেও দারয়বৌস দমিলেন না। দুই বৎসর পর তিনি পুনরায় একদল পারস্য-সৈন্য, দতিস ও আর্তাফার্নিস নামে দুই জন সেনাপতির অধিনায়কত্বে প্রেরণ করেন। ইহারা সোজা সাগরপাড়ি দিয়া ইউবিয়া ও এথেন্সের দিকে অগ্রসর হইল। পথে গ্রীকদ্বীপগুলি তাহারা জয় করিল। এই ভাবে তাহারা ইউবিয়া দ্বীপে উপনিত হইয়া ইরেট্রিয়া রাজ্য অধিকার করিল। এইবার আসিল এথেন্সের পালা। পারস্য, সৈন্য ইউবিয়া ও গ্রীসের মধ্যবর্তী প্রণালী পার হইয়া মারাথনে পদার্পণ করিল। এইখানে এথেন্স ও প্লেটিয়া (Plataea) রাজ্যের সৈন্যেরা তাহাদিগকে বাধা দিতে আসিল। গ্রীকসৈন্যেরা মিলতাইরিয়ার রণনৈপুণ্যে পারস্যবাহিনীকে পরাজিত করিল (৪৯০ খৃঃ পূঃ)। তখন পারস্য-সৈন্য জাহাজে চড়িয়া এথেন্সের বন্দরের দিকে অগ্রসর হইল। সেখানে গিয়া তাহারা দেখিল যে, গ্রীকসৈন্য সেখানেও তাহাদিগকে বাধা দিতে উপনিত। কাজেই, আর গোলমাল না করিয়া তাহারা দেশে ফিরিয়া গেল। ইহাতেও দারয়বৌস


বেহিস্তন পর্ব্বতলিপি ও খোদিত চিত্র

দমিলেন না। গ্রীস জয় করিবার জন্য পুনরায় তিনি অভিযান পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

দারয়বৌস তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনের জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রাজধানী ছিল পার্সিপলিস (পার্স) সুসা, ব্যাবিলন ও একবাটানায়। সমগ্র রাজ্য তিনি ২০টি প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রদেশ শাসনের ভার একজন ক্ষত্রপবনের (Satrap) হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের সঙ্গে প্রাদেশিক শাসনের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সুন্দর সুন্দর রাস্তা নির্মিত হইয়াছিল। এই সব রাস্তা দিয়া অশ্বারোহী ডাকবাহী নিয়তরূপে ডাক লইয়া চলাচল করিত। দারয়বৌসের রাজত্বের প্রধান প্রধান ঘটনা তাঁহার জ্যাগ্রস পর্ব্বতস্থিত বেহিস্তন পর্ব্বতলিপি হইতে জানা যায়।

দারয়বৌসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ক্ষয়ার্শ (Xerxes) পারস্য সাম্রাজ্যের রাজা হন। মার্দনিয়াসের পরামর্শে তিনি গ্রীসদেশ জয় করিতে মনস্থ করেন। এইজন্য তিনি একটি বিশাল সৈন্য বাহিনী ও নৌবাহিনী সংগ্রহ করেন। হেলেসপন্ট (Hellespont) প্রণালীর উপর একটি সেতু নির্ম্মাণ করা হয়। এই পথে তিনি সসৈন্যে থ্রেসে পদার্পণ করেন। তারপর তিনি ম্যাকিদন ও থেসালির মধ্য দিয়া অগ্রসর হন। পথে কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না। একে একে উত্তর গ্রীসের রাজাগুলি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু থার্ম্মাপলির (Thermopylae) গিরিবর্ত্মের প্রবেশ পথে স্পার্টার রাজা লিওনিদাসের অধীনে গ্রীকসৈন্যেরা তাঁহাকে বাধা দিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি গ্রীকদের হঠাইতে পারিলেন না। তখন একদল পারস্যসৈন্য একজন বিশ্বাসঘাতক গ্রীকের সাহায্যে গুপ্ত পথে পাহাড় অতিক্রম করিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে গ্রীক-সৈন্যদের আক্রমণ করিল। দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া গ্রীকসৈন্যবাহিনী একেবারে বিধ্বস্ত হইল। লিওনিদাস ও ৩০০ বীর স্পার্টান সৈন্য অতুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল, ৪৮০ খৃঃ পূঃ।



দারয়বৌসের সমাধি



দারয়বৌসের সমাধি পর্ব্বতের সাধারণ দৃশ্য

এইবার ক্ষয়ার্শ এথেন্স অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দেখেন, নগর প্রায় জনশূন্য। কারণ, কূটবুদ্ধি থেমিষ্টক্লিসের (Themistocles) পরামর্শে নগরবাসীরা তাহাদের বাড়ীঘর ছাড়িয়া সালামিস ও অন্যান্য দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিল। অল্প অয়াসেই এথেন্স পারস্যরাজের অধিকারে আসিল। তাঁহার আদেশ অনুসারে সমগ্র নগর ভস্মীভূত হইল।





সিংহ



বিড়ালজাতীয় জন্তুর মধ্যে সিংহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সিংহ পশুর রাজা। এমন শক্তিশালী, এমন তেজস্বী এবং পরাক্রমশালী জন্তু আর দ্বিতীয় নাই। বাঘ বল, ভালুক বল, গণ্ডার বল, সকল পশুই বল-বিক্রমে সিংহের কাছে হার মানে। এত পরাক্রম বলিয়াই সিংহকে পশুরাজ বলা হয়।

বাঘের চোখের মাঝখান কিছু বসা ও কিছু বাঁকা, কিন্তু সিংহের চোখের মাঝখান চেপ্টা।

সিংহের কেশর আছে, অপর কোন জন্তুর কেশর নাই, তাই কেশরী বলিলে কেবল সিংহকেই বুঝায়। কেশর কেবল পুরুষ জাতিরই হয়, স্ত্রী জাতির হয় না। কেশর সিংহের অলঙ্কার, কেশর না থাকিলে



আফ্রিকার সিংহ



এসিয়ার সিংহ

আমাদের এই পশুরাজ মাংসাশী, বেজায় মাংস-লোভী; মাংস না হইলে চলে না। মাংস না পাইলে বাঁচে না। সিংহের শরীরের ধরণটা বাঘ ও বিড়ালের ন্যায়, তবে যৎসামান্য প্রভেদ আছে। বিড়ালের দাত আটাশটি কিন্তু সিংহের ত্রিশটি।

ইহাদিগকে তেমন সুশ্রী, তেমন গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দেখাইত না। সিংহ যখন রাগে, তখন এই কেশর ফুলিয়া উঠে, ভয়ঙ্কর দেখায়।

সিংহের আর একটি আপনার জিনিস আছে তাহা লেজের গোড়ায় একগাছা হাড়। এই হাড় লাঠির

কাজ করে। সিংহের থাবাও বড় সোজা নয়। একবার ইহার খপ্পরে পড়িলে আর নিস্তার নাই। সেই থাবা আবার বিড়ালের থাবার ন্যায় অতি নরম, তুলার মত, এই জন্য চলিবার সময় কোন শব্দ হয় না।

এই থাবার কোমল স্থানে নখগুলি থাকে। শিকার করিবার সময় বাহির হয়। তখন এই নখগুলি সাঁড়াশীর ন্যায় কাজ করে। সিংহের কটি অতি ক্ষীণ, এমন আর কোন জন্তুর নাই।

সিংহী এককালে তিনটি শাবক প্রসব করে। প্রথমে শাবকের চোখ ফোটে না। ১০।১৫ দিন পরে দৃষ্টি শক্তি লাভ করে। প্রথমে তাহারা বিড়ালের ন্যায় মিউ মিউ করে, আপন পিতামাতার ন্যায় গর্জ্জন করিতে পারে না। বয়সের সঙ্গে শক্তিসামর্থ্যও বৃদ্ধি হইতে থাকে। কেশর উঠিতে থাকিলে, বুঝিতে



বর্ব্বরী সিংহ

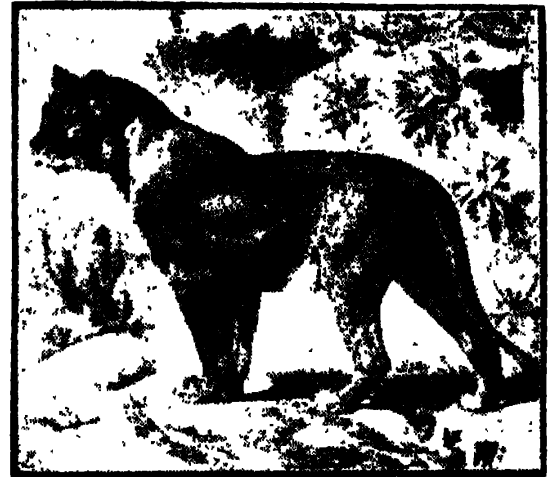
হইবে এইবার তাহার যৌবনকাল আসিতেছে। শক্তি, সামর্থ্য, গাম্ভীর্য্য, তেজ এবং উল্লাসভাব তাহাদের ধরণধারণে, কার্য্যকলাপে বুঝিতে পারা যায়। এই সময় তাহারা কিছু বেশী মাংসলোভী হইয়া উঠে।

সিংহের ক্ষমতা বড় কম নয়। বিড়াল যেমন ইঁদুর মারিয়া মুখে করিয়া লইয়া যায়, তেমনি সিংহ বড় বড় বলদ মহিষাদি শিকার করিয়া আপনার পৃষ্ঠে ফেলিয়া অতি দ্রুতপদে পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ যাইতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করে না।

সিংহ একজাতি বটে, কিন্তু দেশভেদে, অবস্থা-ভেদে এবং আকার-ভেদে সিংহ প্রধানতঃ চারি প্রকার—বর্ব্বরী সিংহ, সেনিগাল সিংহ, অন্তরীপের সিংহ এবং এসিয়ার সিংহ।

বর্ব্বরী সিংহ—উত্তর আফ্রিকার ও আফ্রিকার বর্ব্বরী দেশের সিংহকে বর্ব্বরী সিংহ বলা যায়। ইহাদের ঘন ঘন লোম, বর্ণ হলদে অথচ কটা এবং কেশর বেশ পরিপুষ্ট হয়। চক্ষু অতি তীব্র, রাত্রিকালে চক্ষু হইতে অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ বাহির হয়। রাগিলে শরীর ফুলিয়া উঠে, শান্তভাবে শরীর যেমন ছিল, তাহার দ্বিগুণ বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের লেজের গোছাটিও অতি কঠিন; তাহার দ্বারা এক ঘা লাগাইলে রীতিমত চাবুক বা লগুড়ের কার্য্য হয়।

সেনিগাল সিংহ—পশ্চিম আফ্রিকা এবং সেনিগাল দেশে এই সিংহের বাস। ইহাদের



সেনিগাল সিংহ

লোম ঘন পীতবর্ণ, কেশর বড়, গাঢ় এবং সংলগ্ন। তেজ ও বীর্য্যে বর্ব্বরী সিংহের সমান।

অন্তরীপের সিংহ—দক্ষিণ-আফ্রিকা ও উত্তমাশা অন্তরীপে এই সিংহের বাস। ইহারা দুই প্রকার। এক, দেখিতে পীতাভ, অপর দেখিতে কটা। এই কটা সিংহ বড় ভয়ানক, অতিশয় মাংসলোলুপ আর বেজায় হিংস্র। ওলন্দাজেরা যখন প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকাকূলে আসিয়া উপনিবেশ করেন, তখন তাঁহারা এক প্রকার কাল সিংহ দেখিতে পান। ওলন্দাজেরা যে কাল সিংহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা কাল সিংহ নয়, তাহারা

কয়াল কালরূপী কটাসিংহ। কোন কোন কটা সিংহের কেশর কাল হয়। বোধ হয় তাহারাই কাল সিংহ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

উপরি উক্ত তিন প্রকার সিংহকেই এক কথায় আফ্রিকার সিংহ বলা যায়। আফ্রিকার সিংহের মত ক্ষমতাশালী ও কষ্টসহিষ্ণু জীব আর আছে কিনা সন্দেহ। হাতী, গণ্ডার ও বাঘ ক্ষমতাশালী বটে কিন্তু তাহারা এই সিংহের ন্যায় কষ্ট স্বীকার করিতে পারে না।

এসিয়ার সিংহ

আফ্রিকার সিংহ যেমন ভয়ানক, এসিয়ার সিংহও তদপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। উভয়ের স্বভাবই সমান। তবে প্রভেদ এই, আফ্রিকার সিংহ মরুভূমির রাজা, এসিয়ার সিংহ বনজঙ্গলের রাজা।

এসিয়ার এক প্রকার সিংহ আছে - তাহারা তেজস্বী এবং অত্যন্ত মাংসলোভী হইলেও মানুষ দেখিলে ছুটিয়া পালায়। কিন্তু আর একজাতীয় সিংহ আছে—তাহারা মানুষকে ভ্রূক্ষেপও করে না।

এসিয়ার সিংহী এক সময়ে তিন চারিটি সন্তান প্রসব করে এবং পাঁচ মাস পর্যন্ত সন্তানগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে রাখে। এসিয়ার সিংহজাতিকে দেশভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—আরবী, পারস্য ও ভারতীয়।

আরবী সিংহ দুই প্রকার- এক জাতির কেশর আছে, আর এক জাতির কেশর নাই। যাহাদের কেশর নাই, তাহারাই আরব জাতির প্রিয়। আরবেরা এই সিংহকে ধর্মনিষ্ঠ বলে। তাহারা এই জাতীয় সিংহকে হিংসা করে না। কিন্তু কেশরী সিংহের উপর তাহাদের বেজায় রাগ, দেখিলেই মারিয়া ফেলে।

ভারত ও পারস্য উভয় দেশের সিংহই দেখিতে এক প্রকার এবং একজাতীয়। কিন্তু আরব দেশের সিংহ বলে ও বিক্রমে তেমন সাহসী হয় না। তাহারা মেষ, মহিষ প্রভৃতিকে শিকার করে বটে, কিন্তু কি জানি কেন ভালুক দেখিলে ইহারা অত্যন্ত ভয় পায়, ভালুকের কাছেও অগ্রসর হয় না।



সিংহীর শান্ত মূর্তি

শিকারীর কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোক, এমন কি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখিলেও ইহারা ছুটিয়া পালায়। এই জাতীয় সিংহ তুরস্কেও আছে।

পারস্যের সিংহ চতুর এবং সাহসী, কিন্তু তেমন শক্তিশালী নয়। ইহারা দূরে শিকার দেখিলে, প্রথমে জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে, শিকার কাছে আসিলে, বাঘের মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে, এই সময়ে ভয়ানক গর্জন করিতে থাকে। তৃণভোজী জন্তুর মাংস ইহাদের প্রিয় খাদ্য।

ভারতবর্ষীয় সিংহ—ভারতের সিংহ প্রধানতঃ দুই প্রকার—সৌরাষ্ট্র ও গুজরাটি সিংহ এবং বঙ্গদেশের সিংহ। কেহ কেহ বলেন—সৌরাষ্ট্র বা গুজরাটের সিংহের ঘাড়ে কেশর হয় না। এইজন্য ইহাদিগকে কেশরহীন সিংহ বলা যায়। আবার কেহ কেহ বলেন, গুজরাটি সিংহের কেশর হয় না, এমন কথা বলা যায় না। এই জাতীয় সিংহ পূর্ব্বে পুষ্কর তীর্থের নিকট পর্য্যন্ত দেখা যাইত। গুজরাটের কোথাও কোথাও ইহাদিগকে "উটিয়া বাঘ" বলে।

বাঙ্গলার সিংহ—এই সিংহের বর্ণ মৃগের ন্যায়। ইহাদের কেশর ফিকা হলুদ রঙের, মধ্যে মধ্যে কটা রঙের বুটি কাটা। আফ্রিকার সিংহের মত ইহাদের গাম্ভীর্য্য নাই তবে বলে, বিক্রমে বড় কম নয়। ইহাদিগকে সিন্ধু প্রদেশে রাজপুতনায়, গোয়ালিয়র রাজ্যে ও কচ্ছ প্রদেশে গ্রীষ্মের সময় মাঝে মাঝে দেখা যায়। পূর্ব্বে এই জাতীয় সিংহ ভারতের নানা স্থানে এবং বাঙ্গলা দেশেও বাস করিত।

প্রাচীন কালে আমাদের দেশে যাঁহারা অতিশয় শক্তিশালী হইতেন, লোকে সিংহের সহিত তাঁহাদের শক্তির তুলনা করিত। এইরূপ শক্তিশালী ব্যক্তিরা নিজ নামের সহিত সিংহের নাম যোগ করিতেন। সেকালের রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সিংহচন্দ্র, এবং সিংহবিক্রম এই দুইটি নামও ছিল।

পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল, আমেরিকায় সিংহ পাওয়া যায় না। কিন্তু সে ভুল এখন ভাঙ্গিয়াছে, তথায় 'পুমা' নামে একজাতীয় সিংহ দেখা গিয়াছে। যেখানে ইহাদের বেশী উৎপাত, সেখানকার লোকেরা উচ্চ গাছের উপর মাচা বাঁধিয়া ঘর তৈয়ারী করিয়া বাস করে। রাত্রিকালে বড় একটা কেহ মাটিতে নামে না।

পূর্ব্বে ইউরোপেও বিস্তর সিংহের বাস ছিল, কিন্তু এখন সেখানে সিংহ দেখিতে পাওয়া যায় না, বোধ হয় একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে। সে সময়ে রোমকেরা এই সিংহ লইয়া এক মহোৎসব করিত। রোমসম্রাট, মান্যগণ্য লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। সকলে আসিয়া উচ্চ মঞ্চের উপর বসিতেন। আর নীচে একেবারে চারি পাঁচ শত সিংহ ছাড়িয়া দেওয়া হইত। সিংহে সিংহে তুমুল যুদ্ধ হইত; এমন যুদ্ধ কেহ কখনও দেখে নাই।

সিংহের আকার লাঙ্গুলের অগ্রভাগ হইতে নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত মাপিলে বার ফুট হইবে। সিংহী আকারে তত বড় হয় না। সিংহের গায়ের লোম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। উহাদের পেটের লোম শাদা। পায়ে বাঁকা বাঁকা বড় বড় নখর আছে।

সিংহী পাঁচ মাস কাল গর্ভধারণ করিয়া একেবারে তিন চারিটি শাবক প্রসব করে এবং অতি দুর্গম গিরিগুহায় বা বনের মধ্যে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া শাবকদিগকে লুকাইয়া রাখে। এ সময়ে এমন সতর্কতা অবলম্বন করে যে, পাছে কেহ টের পায় আশঙ্কায় যাইবার সময় লাঙ্গুল দিয়া পায়ের চিহ্ন মুছিয়া যায়। বিড়াল যেমন বিড়ালীর সন্তানগুলির প্রাণসংহার করিতে সকল সময়ই চেষ্টা করে, সিংহও তেমনি সিংহীর শাবকগুলির প্রাণনাশ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

সিংহ পোষ মানে, সিংহের উপকার করিলে তাহা কখনও ভুলিয়া যায় না, এমন অনেক গল্প আছে। তোমরা বোধ হয় এ গল্পটি জান যে, রোম নগরের একজন ক্রীতদাস সিংহের পায়ের কাঁটা তুলিয়া দিয়া কি প্রকারে সিংহের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া প্রভুর দণ্ড হইতে মুক্তি পাইয়াছিল। মানুষ বুদ্ধিবলে সিংহের ন্যায় দুরন্ত ও শক্তিশালী জন্তুকেও পোষ মানাইয়া সার্কাশ প্রভৃতিতে খেলা দেখাইয়া থাকে। আফ্রিকার কাফ্রিরা ও নানা দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শিকারীরা আফ্রিকার বনে ও জঙ্গলে সিংহ শিকার করে। সিংহ প্রায় চল্লিশ বৎসর বাঁচে।

মানুষের তাড়নায় সব দেশেই সিংহের বংশ নির্ম্মূল হইতে চলিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে শত শত সিংহ বাস করিত, এখন সেখানে মোটেই সিংহ নাই। ভারতবর্ষে সুন্দরবনের ধারে পূর্ব্বে অনেক সিংহ বাস করিত, তাহাদের বংশ এখন লোপ পাইয়াছে।



সিংহ ও বাঘের মধ্যে কে বেশী বলবান্ সে বিষয়ে অনেক সময়ে অনেক কথা হয়। সিংহের মধ্যে আফ্রিকার সিংহের ন্যায় তেজস্বী ও বলবান্ সিংহ পৃথিবীর কোথাও নাই। যেমন আফ্রিকার সিংহ, তেমনি আমাদের সুন্দরবনের রাজকীয় বাঘ (Royal Bengal Tigar)। ইহারা আফ্রিকার সিংহের মত তেজস্বী, সাহসী, শক্তিশালী ও হিংস্র স্বভাবের। আমরা আফ্রিকার সিংহ ও সুন্দরবনের বাঘের চিত্র দিলাম,—তোমরা বল দেখি, আফ্রিকার সিংহ ও ভারতের—বাঙ্গলার বাঘ, এ দু'য়ের মধ্যে বড় কে?

অনেকের বিশ্বাস যে, 'মানুষ খেকো' সিংহ বেশীর ভাগই বৃদ্ধ সিংহ, এ কথা কিন্তু সত্য নহে। সাধারণতঃ যে সকল সিংহ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পায় তাহারাই পরাবর মানুষ মারিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। এখানে এ বিষয়ের একটি গল্প বলিতেছি। আফ্রিকার ইউগাণ্ডা অঞ্চলে যখন রেলপথ প্রস্তুত হইতেছিল তখন সাভো (Tsavo) নামক স্থানের কাছে দুইটি মানুষ খেকো সিংহের উৎপাতে কয়েকদিন রেলওয়ে একেবারে কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল। রাত্রির পর রাত্রি দুই নরমাংসলোভী সিংহ শ্রমিকদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের উৎপাত এতদূর বাড়িয়া গিয়াছিল যে সেখানকার শ্রমিকেরা একেবারে কাজ ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঐ সিংহ দুইটি নিহত হইলে পর শ্রমিক সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এই সিংহের উৎপাতের বিষয় বিলাতের পার্লামেণ্ট সভায় পর্যন্ত প্রশ্ন উঠিয়াছিল। একজন ইংরাজ লেখক এ বিষয় উল্লেখ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"Such fame did the man-eaters of Tsavo earn that they were actually mentioned in Parliament probably the only lions ever to receive such honour."

সিংহেরা অনেক সময় দল বাঁধিয়া শিকার করে। এই সময়ে তাহারা পূর্ব্ব হইতেই একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়া চলে। মহিষের পাল, হরিণের পাল, জেব্রা, কৃষ্ণসার মৃগ এবং হস্তীযূথ আক্রমণ করিতেও এসময়ে ইহারা ভয় পায় না। এইরূপ দলবদ্ধ সিংহের আক্রমণ গতি প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সিংহেরা সচরাচর রাত্রিকালেই শিকার করিয়া থাকে। আফ্রিকার সিংহ সুযোগ পাইলে লোকালয়ে যাইয়াও আক্রমণ করে। তখন তাহারা গৃহস্থ বাড়ীর গরু, মহিষ ও অন্যান্য গৃহ-পালিত জন্তু, এমন কি, সুযোগ পাইলে মানুষও শিকার করে।

সিংহের গর্জন শুনিলেই এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, সিংহ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে। ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হইলেই সিংহ গর্জন করে। শিকার করিবার সময় সিংহ কখনও গর্জন করে না। অনেক সময় পরস্পরকে আহ্বান করিবার জন্য গর্জন করে। গভীর নিশীথে যখন আফ্রিকার মরু প্রান্তর ও গভীর বন নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে তখন সিংহের সুগম্ভীর গর্জন ভীতি উৎপাদক।

সিংহশাবক ছেলেবেলায় বিড়ালের বাচ্চার মতই খেলিয়া বেড়ায়। সে সময়ে ইহাদের পোষ মানান যায়। কিন্তু হঠাৎ যখন মেজাজ বিগড়াইয়া যায় তখন উহাদের হিংস্র স্বভাব তীব্রভাবে প্রকাশ পায়, কাজেই ইহাদের পালন করা খুব নিরাপদ নহে।

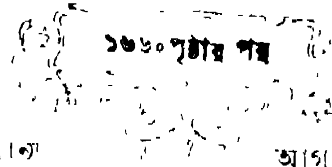
সিংহের স্বভাব সম্বন্ধে জীবতত্ত্ববিদেরা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, সিংহ স্বভাবতঃই হিংস্র ও সাহসী, আবার অনেকে বলেন, সে কথা ঠিক নয় ইহারা অত্যন্ত ভীরু স্বভাবের জানোয়ার। আমাদের মনে হয়, এই দুই বিভিন্ন মতের মধ্যেই অনেক সত্য আছে! সাধারণতঃ দিবালোকে সিংহ কাহাকেও আক্রমণ করিতে চাহে না, কিন্তু যদি আহত বা ক্ষুধার্ত্ত হয়, তাহা হইলে ইহারা মানুষ, গরু, মহিষ যাহা পায় তাহাই কি দিবালোকে, কি রাত্রিতে তখনই আক্রমণ করে। সিংহীর সন্তান-স্নেহ অতি প্রবল। শাবক রক্ষার জন্য ইহারা নির্ভীকভাবে যে কোন বিপদের সম্মুখীন হয়।





কুষণ-সম্রাট কনিষ্ক

বিম কদফিসের উত্তরাধিকারীর নাম কনিষ্ক। মৌর্য-সম্রাট অশোকের পর ভারতবর্ষে এরূপ অসামান্য



হবে

হইয়াছিল।

তিব্বত, চীন ও মোঙ্গোলিয়ার বহু প্রাচীন উপাখ্যানে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু যদিও কনিষ্ক মহান সম্রাট ছিলেন, তথাপি তাঁহার ইতিহাসের উপকরণ বড়ই অল্প। কদফিস দ্বিতীয়ের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল, সে বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

কিন্তু তিনি যে কদফিস দ্বিতীয়ের পরবর্তী, সে বিষয়ে আর কোনরূপ সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি কদফিস দ্বিতীয়ের পুত্র ও তাঁহার অব্যবহিত পরেই রাজা হইয়াছিলেন। কাহারও মতে আবার কদফিস দ্বিতীয় ও কনিষ্কের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল ব্যবধান ছিল। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি ক্ষুদ্র ইয়েচি (Little yuechi) নামক জাতির রাজা ছিলেন ও খোটান দেশ হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; কদফিস বংশের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। এই সব পণ্ডিতেরা নানা জনে নানা কথা বলেন। সে সব কথা শুনিয়া তোমাদের কোন লাভ নাই।



কনিষ্কের মস্তকহীন মূর্তি

কনিষ্কের কাল লইয়াও পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া বাদ-বিবাদ চলিতেছে। তবে ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান দল আছে। প্রথম দলের মতে তিনি ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন ও তিনিই শককালের প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় দলের মতে তাঁহার রাজ্যের আরম্ভ ১২৫ খৃষ্টাব্দের পরে, এমন কি, ১৩৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছিও হইতে পারে। দ্বিতীয় দলের মতটি অধিক সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। চীনদেশীয় প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাসে কনিষ্কের নাম পাওয়া যায় না। যদি তাঁহার রাজ্যারম্ভ ৭৮ খৃষ্টাব্দে ধরা হয়, তবে পান-

চাওর সহিত সংগ্রামে যে কুষণরাজ পরাজিত হইয়াছিলেন, তিনি কনিষ্ক। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার নামের উল্লেখ না থাকিবার কারণ কি? এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, মধ্য এসিয়ার এক বিস্তৃত অংশ কনিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। টারিম নদীর উপত্যকায় খৃষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবের এতদ্দেশে নিদর্শন, কনিষ্কের ন্যায় একজন বড় রাজার অস্তিত্ব সেখানে স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকে না. তা ছাড়া খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগেও ক্যাস্পিয়ান্ হ্রদের উপকূল পর্য্যন্ত মধ্য এসিয়ার বিস্তৃত অংশ চীনসম্রাটের অধীনে ছিল; একারণেও কনিষ্ককে খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে স্থাপন করা বেশ একটু কঠিন হইয়া পড়ে।

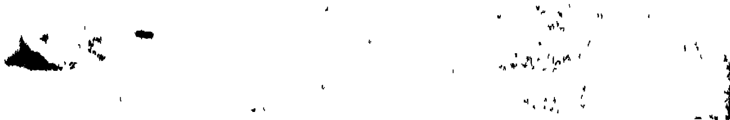


খননের পূর্ব্বে কনিষ্কের স্তূপের সাধারণ দৃশ্য

কনিষ্কের রাজ্য বিস্তার—

রাজ্যারম্ভের কিছুকাল পরেই কনিষ্ক কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করেন। কনিষ্ক এখানে বহু বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ও কনিষ্কপুর নামক একটি নূতন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগর এক্ষণে সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে। কনিষ্ক ভারতবর্ষের ভিতর বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি পাটলিপুত্রের তখনকার রাজাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সভার রত্নস্বরূপ বৌদ্ধ শ্রমণ অশ্বঘোষকে স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। এই অশ্বঘোষ বৌদ্ধধর্ম্মের ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন তিনি একাধারে বিদ্বান, দার্শনিক,





স্তূপ প্রাচীর

প্রখ্যাত কবি ও সংসারত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন।

ভারত বিজয় করিয়াই কনিষ্ক ক্ষান্ত হন নাই। তিনি পার্থিয়ার রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তিব্বতের উত্তরে ও পামীর নামক অধিত্যকাপ্রদেশের পূর্ব্বে অবস্থিত চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত খাসগড়, ইয়ারখন্দ ও খোটান নামক দেশগুলি জয়



স্তূপের একদিকের খনিত অংশ

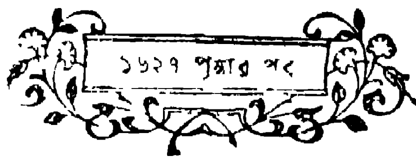
করিয়াছিলেন। বিম কদফিস যেখানে পরাজিত হইয়াছিলেন, কনিষ্ক সেখানে জয়ী হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ভীষণ বিপৎসঙ্কুল এই সকল দুর্গম পার্ব্বত্য দেশ জয় করিয়া কনিষ্ক অতুল সাহসের পরিচয় দান করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। এই জয়ের ফলস্বরূপ কনিষ্ককে আর চীন-সম্রাটের নিকট কর পাঠাইতে হয় নাই। তা ছাড়া জামিনস্বরূপ রাজবংশের কতিপয় ব্যক্তি চীন-সম্রাট কর্ত্তৃক তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন।

কনিষ্কের সাম্রাজ্য—ভারতবর্ষের নানা স্থানে কনিষ্কের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে। পঞ্চম হইতে দশম রাজ্যাঙ্কের মধ্যে উৎকীর্ণ বহু লিপি মথুরায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বারাণসীতেও কনিষ্কের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের একটি লিপি পাওয়া গিয়াছে। তথায় কনিষ্কের প্রতিনিধি স্বরূপ মহাক্ষত্রপ খরপল্লান ও ক্ষত্রপ বনস্পার শাসন করিতেন। কনিষ্কের সুবিশাল সাম্রাজ্য পশ্চিমে সু লিং পর্ব্বতশ্রেণী হইতে পূর্ব্বে পাটলিপুত্র পর্যন্ত ও হয়ত আরও অধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি তাঁহার রাজ্যের সীমা ছিল। অর্থাৎ খাসগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান, কাফিরিস্তান, বাহ্লীক, কাবুল, পঞ্চনদ সিন্ধু, মথুরা, কৌশাম্বী, বারাণসী, পাটলিপুত্র ইত্যাদি প্রদেশ কনিষ্কের সুবিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।



রামমোহন রায়

পিতৃপরিচয় ও প্রথম জীবন



ইংরেজ শাসনকালে ভারতবর্ষে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রামমোহন রায় তাঁহাদের একজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বর্দ্ধমান হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের ঠিক তারিখ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। তবে আমাদের হাতে যে সকল তথ্য প্রমাণ আছে, তাহার বলে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ তাঁহার জন্মের বৎসর বলিয়া ধরিলে অসঙ্গত হইবে না।

রামমোহনের পিতৃপিতামহ আত্মীয়স্বজন সকলেই বিষয়ী ভদ্রলোক ছিলেন। ইঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজার নিকট হইতে পাওয়া ব্রহ্মোত্তরই প্রধান ছিল। তাহা ছাড়া ইঁহারা চাকুরী করিয়াও কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মুসলমান সরকারে কাজ করিয়া 'রায়-রায়ান্' উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। তাঁহার পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর আমলে চাকুরী করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় বর্দ্ধমানের ইজারাদার ও কর্ম্মচারী ছিলেন। রামকান্ত সেকালের বিষয়ী ভদ্রলোক যেরূপ হয় সেইরূপই ছিলেন। তিনি অন্য তালুক ছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থাৎ সে যুগের গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভুরসুট পরগণা ইজারা লইয়াছিলেন। এই সকল সম্পত্তি হইতে নানা উপায়ে অর্থলাভ করিয়াই রামকান্ত সন্তুষ্ট থাকেন নাই, তিনি পরে জমিদার ও কোম্পানীর খাজনা না দিয়া ও বর্দ্ধমানের মহারাজাকে প্রবঞ্চনা করিয়া পুত্রদিগকে টাকা-পয়সা ও সম্পত্তি দিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু খাজনা না দেওয়ার জন্য শেষে তাঁহাকে ফেরারী হইয়া থাকিতে হয় ও তুইনার দেওয়ানী জেলে যাইতে হয়। এইরূপ বিষয়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ও মানুষ হওয়ার ফলে রামমোহনও অল্প বয়স হইতেই বিষয়-বুদ্ধিতে প্রবীণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরজীবনে শাস্ত্রালোচনায়, ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে যেমন আমরা তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাই, তেমনি অর্থোপার্জ্জন, মোকদ্দমা ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণেও তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিতে পাই। এই ক্ষমতা তাঁহার বাল্য-শিক্ষার ফল।

রামমোহনের মাতার নাম তারিণী দেবী। তিনি তেজস্বিনী, প্রখর বুদ্ধিশালী ও নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। রামমোহনের চরিত্রের অনেক গুণ সম্ভবতঃ তাঁহার মাতার নিকট হইতে পাওয়া। কিন্তু বয়স্ক হইবার পর রামমোহনের সহিত তাঁহার মাতার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। ইহার প্রধান কারণ, রামমোহনের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন। মাতা ছাড়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সহিতও রামমোহনের হৃদ্যতা ছিল না, সেজন্য উহাদের সহিত তাঁহার মতান্তর,

মোকদ্দমা প্রভৃতি হইত। রামমোহন বহু বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার তিনটি আনুষ্ঠানিক বিবাহের কথা আমরা জানি। কিন্তু তাঁহার পত্নীরা তাঁহার সহিত বেশীদিন ঘর করেন নাই। রামমোহনের পারিবারিক জীবন সুখের না হওয়ায় তাঁহার সমস্ত ভালবাসা স্নেহ-লালিত পুত্র রাধাপ্রসাদের উপর পড়িয়াছিল। তাঁহাকে তিনি বিলাত লইয়া যান ও সযত্নে শিক্ষা দেন। এইরূপ যত্ন তিনি তাঁহার অন্যান্য পুত্রদেরও করেন নাই।

রামমোহনের বাল্যকাল সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলিলেই চলে। তবে তিনি যে তাঁহার জীবনের প্রথম কুড়ি বাইশ বৎসর প্রধানতঃ রাধানগর ও তাহার নিকটে লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে কাটান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাধানগরে থাকার সময়ে তাঁহার সহিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের পরিচয় হয়। এই নন্দকুমার একজন বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন ও পরজীবনে তান্ত্রিক সাধনা করিয়া হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী নামে পরিচিত হন। মনে হয়, রামমোহনের সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার অনেকটা ইঁহার শিক্ষার ফল। অন্ততঃ তিনিই যে রামমোহনকে তান্ত্রিক মতে আকৃষ্ট করেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

রামমোহনের বয়স যখন বাইশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা নিজের সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। এই বাটোয়ারায় রামমোহন পৈতৃক বাড়ির অর্দ্ধেক, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমিজমা ও কলিকাতা জোড়াসাঁকোতে একটি বাড়ি পান। এই সময় হইতেই রামমোহন কলিকাতায় যাতায়াত আরম্ভ করেন ও অর্থোপার্জ্জনে মন দেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি নিজের চেষ্টায় ও পিতার সাহায্যে অবস্থার অনেকটা উন্নতি করিয়া ফেলেন। ১৮০০ সনে রামমোহন একবার পশ্চিমে কাশী পর্য্যন্ত যান ও পর বৎসর কলিকাতা ফিরিয়া আসেন।

ইহার পরবর্ত্তী চোদ্দ বৎসর রামমোহনের চাকরী ও অর্থোপার্জ্জনের যুগ। অনেকের ধারণা আছে যে, রামমোহন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে দেওয়ানী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বাংশে ঠিক নয়। কারণ, এই কয় বৎসরের মধ্যে রামমোহন দুই তিন বৎসরের বেশী সরকারী চাকরী করেন নাই এবং তখনও তিনি অস্থায়ী দেওয়ান ও সেরেস্তাদার মাত্র ছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, রামমোহন সিভিলিয়ান সাহেবদের খাস মুন্‌শীর কাজ করিতেন ও তাঁহাদের সহিত বাংলা দেশের নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই সকল সাহেবের মধ্যে যাঁহার অধীনে রামমোহন প্রথম কাজ করেন তাঁহার নাম টমাস্ উড্‌ফোর্ড। তিনি রামমোহনকে ঢাকা জালালপুরে (বর্ত্তমান ফরিদপুর) লইয়া যান। ইহার পর জন্ ডিগবীর সহিত রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর ও শেষে রঙ্গপুর যান। কিন্তু ডিগবীর সহিত রামমোহনের কেবল মাত্র মনিব চাকরের সম্বন্ধ ছিল না। রামমোহন ডিগবীর নিকট হইতে গভীর ভাবে ইংরেজী শিক্ষা করেন। ডিগবীও রামমোহনকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন।

শুধু ডিগবীর সহিতই নয়, রামমোহন যখন যেখানে যে চাকরীই করুন না কেন, সর্ব্বদাই আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে একটি অতি সুন্দর ঘটনার কথা এইখানে বলিব। ১৮০৯ সনে ডিগবী ভাগলপুরে বদলী হন এবং রামমোহনও তাঁহার সহিত ভাগলপুর যান। যেদিন রামমোহন ভাগলপুরে পৌছেন, সেই দিনই তাঁহার সহিত সেখানকার কালেক্টর স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনের একটা সংঘর্ষ হয়। মুসলমান আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের সম্মুখ দিয়া সাধারণ লোকদের পাল্কীতে বা ঘোড়ায় চড়িয়া বা ছাতা মাথায় যাইবার অধিকার ছিল না। ইংরেজেরা যখন প্রথম এই দেশে আসেন, তখন তাঁহাদের কেহ কেহ এইরূপ সম্মান আদায় করিতে ভালবাসিতেন। স্যর ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনও এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। রামমোহন যখন পাল্কীতে করিয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি এক ইটের পাঁজার উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। একজন দেশীয় লোককে সম্মুখ দিয়া পাল্কী চড়িয়া চাপরাশী বরকন্দাজ লইয়া যাইতে দেখিয়া স্যর ফ্রেডারিকের অত্যন্ত রাগ হইল। তিনি চীৎকার করিয়া রামমোহনকে পাল্কী হইতে নামিতে বলিতে লাগিলেন, এবং ইহাতে রামমোহনের পাল্কী থামে না দেখিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া গিয়া তাঁহার পাল্কী আটকাইলেন। তখন রামমোহন পাল্কী হইতে নামিয়া স্যর ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনকে ভদ্রভাবে অভিবাদন করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে স্যর ফ্রেডারিকের রাগ থামে না দেখিয়া গালাগালিতে কর্ণপাত না করিয়া আবার পাল্কীতে চড়িয়া চলিয়া গেলেন ও কিছুদিন

পরে স্বয়ং বড়লাট লর্ড মিণ্টোর নিকট এই অপমানের প্রতীকারের জন্য আবেদন করিলেন। এই আবেদনের ফলে আদেশ হইল যে, ভবিষ্যতে স্যর ফ্রেডারিক হ্যামিল্টন যেন দেশীয় লোকের সহিত এইরূপ বচসা না করেন।

১৮১৪ সনের মাঝামাঝি রঙ্গপুর কলেক্টরীর ভার অন্য এক সাহেবকে বুঝাইয়া দিয়া ডিগবী দীর্ঘ ছুটি লইলেন। রামমোহন তখন অর্থশালী ব্যক্তি, জীবিকার্জ্জনের জন্য তাঁহার আর দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ানর বা পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং তিনিও এই সঙ্গে রঙ্গপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার কলিকাতার স্থায়ী বাস আরম্ভ হয়।

কলিকাতায় রামমোহনের একটি বাড়ী ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু উহা আর তাঁহার অবস্থার উপযুক্ত নয় বলিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলা হইল এবং দুইখানি বড় বাড়ি কেনা হইল। উহাদের একটি চৌরঙ্গীতে ও অপরটি মাণিকতলায়। রামমোহন প্রধানতঃ মাণিকতলার বাড়িতেই থাকিতেন। উহা এখন [illegible]র নিকট উত্তর-কলিকাতার পুলিসের ডেপুটি কমিশনরের আপিসে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতায় বাড়ি করিবার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন গ্রামেও একটি নূতন বাড়ি করিতে আরম্ভ করেন। লাঙ্গুলপাড়ার পৈতৃক বাড়ির প্রতি তাঁহার আর কোন আকর্ষণ ছিল না। সেজন্য তিনি সেই বাড়ি ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুর গ্রামে জমি কিনিয়া বাগান-বাগিচা ও একটি নূতন বাড়ি করেন।

কলিকাতায় আসিবার অল্পদিনের মধ্যেই রামমোহন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন ও কলিকাতার ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সহিত সমভাবে মিশিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনযাত্রার প্রণালী উচ্চ ধরণের ছিল, সুতরাং তিনি সাধারণ লোকের কাছে আমীর-ওমরাহের মত মান্য হইতেন। তাঁহার মাণিকতলার বাগানবাড়িতে শহরের বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইত। উহাদের মধ্যে দেশী লোক ভিন্ন বহু বিদেশী ব্যক্তিও থাকিত। বিদেশ হইতে যাঁহারা ভারত-ভ্রমণে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এইরূপ পরিব্রাজকদের মধ্যে ফিট্‌স্‌ক্লারেন্স (আর্ল অফ্ মান্‌ষ্টার), ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভিক্তর জাকমঁ ও ইংরেজ মহিলা ফ্যানী পার্কসের নাম উল্লেখযোগ্য। ফ্যানী পার্কস তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে রামমোহনের বাড়িতে একটি উৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহার বাড়িতে শুধু যে শাস্ত্রচর্চ্চাই হইত তাহা নহে, আমোদ-প্রমোদ, নাচগান প্রভৃতিও হইত।

ইহা হইতে দেখা যায়, সেকালের সকল বড় লোকের মত রামমোহনও মুসলমানী ধরণধারণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজে মুসলমানী জোব্বা চাপকান প্রভৃতি পরিতেন এবং এই পোষাক শোভন বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি, অনেকের ধারণা ছিল, তিনি মুসলমানের সহিত পান ভোজনও করেন। এই জন্য গোঁড়া হিন্দু আচারের পক্ষপাতী লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিত ও 'যবন' বলিয়া নিন্দা করিত। রামমোহন কিন্তু সেজন্য নিজের আচার ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন বা মুসলমান বন্ধুদিগকে বর্জ্জন করেন নাই।

ধর্ম্মমতের বিকাশ ও ধর্ম্মসংস্কারের প্রথম চেষ্টা

কলিকাতার স্থায়ী অধিবাসী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রামমোহন ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের কাজে ব্রতী হইলেন। তিনি প্রচলিত দেবদেবীর পূজাকে নিম্নস্তরের অধিকারীর উপযুক্ত মনে করিতেন। তিনি নিজে এক ও অভিন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন ও বলিতেন, এইরূপ ধর্ম্মই প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত। রামমোহন সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। সে সময়ে বাংলা দেশে বেদ-উপনিষদ প্রভৃতির চর্চ্চা ছিল না বলিলেই হয়। রামমোহনই প্রথম এই সকল গ্রন্থ পড়িয়া ও প্রকাশ করিয়া হিন্দুদের প্রকৃত ধর্ম্ম ও দর্শন কত উন্নত, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রাচীন দর্শন পাঠ রামমোহনের ধর্ম্মমত প্রবর্তনের একটি কারণ। ইহা ছাড়া মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থও রামমোহনকে খুব প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। রামমোহন আরবী ও ফারসী ভাষা এরূপ ভাল জানিতেন যে, সকলে তাঁহাকে মৌলবী রামমোহন রায় বলিত। প্রথম জীবনে তিনি ইংরেজী জানিতেন না, সুতরাং মুসলমানী

বিদ্যাই তাঁহার উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেজন্য পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তিনি প্রথম যে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন, তাহা আরবী ও পারসী ভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তকটির নাম তুহ্‌ফাৎ-উল্‌ মুয়াহ্‌হিদীন। উহা খুব সম্ভব ১৮০৪ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময় বা তাহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই রামমোহনের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছিল ধরা যায়। পরবর্ত্তী দশ বৎসরে তিনি ভাল করিয়া ইংরেজী শেখেন ও ধর্ম্ম রাজনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থ ভাল করিয়া অধ্যয়ন করেন। ইহার ফলে তাঁহার একদিকে যেমন জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, আর একদিকে তেমনই সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারের ইচ্ছাও প্রবল হইয়া উঠে।

সে যুগের সমাজ অত্যন্ত গোঁড়া ছিল। তাহাতে শিক্ষাও খুব বিস্তৃত ছিল না। এইরূপ সমাজে রামমোহনের মত একজন সংস্কারকের আবির্ভাব কি করিয়া হইল, সে-সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। রামমোহনের ধর্ম্মমতের বিকাশ ও বাল্য-শিক্ষা সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী আছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি অল্প বয়সে পাটনা ও কাশীতে শিক্ষা-লাভ করেন, এমন কি, নানা দেশের ধর্ম্ম দেখিবার জন্য তিব্বত পর্য্যন্ত যান। কিন্তু এই সকল গল্পের সপক্ষে এমন কোন প্রমাণ নাই যাহাতে এগুলিকে অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমরা যাহা নিঃসন্দেহে জানি' তাহা হইতে দেখা যায় যে, রামমোহন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত সে যুগের সকল সম্পন্ন ভদ্রসন্তানের মত স্বগ্রামে থাকিয়া পিতার ও নিজের বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তখন অবশ্য তিনি সাধারণ ভদ্রলোকের অপেক্ষা আরবী, পারসী ও সংস্কৃত অনেক বেশী ভাল জানিতেন, কিন্তু প্রচলিত ধর্ম্ম বা দেশাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই। তাঁহার মনে প্রথমে প্রচলিত ধর্ম্মে সংশয় উপস্থিত হয়, যখন তিনি তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সে বৈষয়িক কাজের জন্য কলিকাতায় আসিয়া নূতন জ্ঞান ও চিন্তার সন্ধান পান। কলিকাতা ইংরেজদের নূতন রাজধানী বলিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলমানী, হিন্দু ও ইংরেজী এই তিন প্রকার বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থোপার্জ্জনের জন্য তখন বহু পণ্ডিত ও মৌলবী কলিকাতায় বাস করিতেন ও শাসনের সুবিধার জন্য ইংরেজরাও মুসলমানী ও হিন্দু শাস্ত্রাদির আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এই সকল বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র ছিল। এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহিত রামমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সুতরাং কলিকাতা যেমন রামমোহনের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, তেমনই শিক্ষা-পীঠও ছিল বলিয়া মনে হয়।

রামমোহনের যেরূপ পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনই মনের প্রসারও ছিল। সেজন্য তিনি কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়া ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত আন্দোলনই তিনি সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি তাঁহার এই ধর্ম্মমত প্রচার করিবার জন্য চারি প্রকার পথ অবলম্বন করিলেন—(১) পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, (২) কথোপকথন ও আলোচনা, (৩) সভা স্থাপন, (৪) বিদ্যালয় স্থাপন। কলিকাতা আসিবার অল্পদিন পরেই রামমোহন অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বেদান্ত প্রকাশ করেন। বাংলা দেশে তিনিই আধুনিক পদ্ধতিতে বেদান্ত চর্চ্চার সূত্রপাত করেন, এবং বাংলা ভাষায় তিনিই বেদান্তের সর্ব্বপ্রথম ভাষ্যকার। ইহা ছাড়া ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য "আত্মীয়-সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন। ইহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে 'কঠ', 'ঈশ' 'কেন' প্রভৃতি অনেকগুলি উপনিষদ প্রকাশ করেন। রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি হিন্দুদের প্রাচীন ও অতিসম্মানিত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করিবেন, হিন্দুধর্ম্মে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

রামমোহনের প্রগাঢ় জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনায় একদিকে যেমন অনেক গণ্যমান্য ও বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, আর একদিকে রক্ষণশীল দল তেমনই তাঁহার প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। এই দল কেবলমাত্র তাঁহার মতের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রকাশ করিয়া ও তর্কবিতর্ক করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল না, তাঁহার চরিত্র, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে নানারূপ নিন্দা রটনাও করিতে লাগিল। রাম-মোহন ধীরতা না হারাইয়া ইহাদের যুক্তির উত্তর দিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' পুস্তকে তাঁহার প্রতি অনেক কটুবাক্য বর্ষণ করিয়াছিলেন। রামমোহন এই সকল

কথার প্রসঙ্গে লিখিলেন যে, "আমাদের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহার উত্তর না দিবার তিন কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয় দ্বিতীয়ত আমাদের এমৎ রীতিও নহে যে দুর্ব্বাক্য কথন বলের দ্বারা লোককে জয়ী হই অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধি রহিলাম।" রামমোহন কোথাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। তিনি প্রতিপক্ষকে অনেকবার শ্লেষ করিয়াছেন, কিন্তু গালিগালাজ বা ব্যক্তিগত নিন্দা করেন নাই।

নূতন ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য রামমোহনের একদিকে যেমন গোঁড়া হিন্দুদের সহিত বিরোধ আরম্ভ হইল, আর এক দিকে তেমনই গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরীদের সহিতও তর্কবিতর্ক বাধিল। খ্রীষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে রামমোহনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বাইবেলের পুরাতন অংশ মূলে অধ্যয়ন করিবার জন্য তিনি হিব্রু ভাষা শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি খ্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীকেই খৃষ্টধর্ম্মের সবচেয়ে মূল্যবান তত্ত্ব বিবেচনা করিতেন না, এবং খ্রীষ্টকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিতেন, বাইবেলে মানুষের মন, চরিত্র ও ধর্ম্মবুদ্ধি উন্নত করিবার জন্য যে বহু উপদেশ আছে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। এই উপদেশ এদেশের লোকের বোধগম্য করিবার জন্য তিনি বাইবেল হইতে নানা বিষয়ের একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেন। এই সঙ্কলন লইয়াই খ্রীষ্টান পাদরীদের সহিত তর্ক বাধে। তখন শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান পাদরী মার্শম্যান ও কেরী খুব প্রতিপত্তিশালী। তাঁহারা তাঁহাদের পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, রামমোহন খ্রীষ্টধর্ম্ম বোঝেন নাই এবং তাহার সারাংশই বাদ দিয়াছেন। রামমোহনও এই সমালোচনার উত্তর দিলেন। এইরূপে উত্তর-প্রত্যুত্তর হিসাবে বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ হইতে লাগিল। পরিশেষে যখন এই তর্কের শেষ হইল তখন রামমোহন অ্যাডাম নামে একজন খ্রীষ্টান্ পাদরীকে নিজের দলে টানিয়া আনিলেন। এই অ্যাডাম তাঁহার আজীবন সুহৃদ্ ছিলেন।

এই সকল পুস্তক ভিন্ন রামমোহন কয়েকখানি পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন' 'ব্রাহ্মণ সেবধি' 'সম্বাদ কৌমুদী' ও 'মীরাৎ-উল আখবার'। এইগুলির মধ্যে প্রথমটি ইংরাজীতে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি বাংলাতে ও শেষেরটি ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত হইত। 'সম্বাদ কৌমুদী' খুব উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। উহাতে বহু সারগর্ভ প্রবন্ধাদি থাকিত। রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্য ১৮২৩ সনে যখন সংবাদপত্রের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি উহা নিষ্প্রয়োজন ও অসম্মানসূচক জ্ঞান করিয়া 'মীরাৎ-উল-আখবার' বন্ধ করিয়া দেন।

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও সহমরণ-প্রথার উচ্ছেদ

কলিকাতায় আসিয়াই রামমোহন আত্মীয়-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সভায় বেদ পাঠ ও ব্যাখ্যা, ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি হইত। প্রথমে এই সভায় অনেকেই আসিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন রামমোহনের ধর্ম্মমত লইয়া তুমুল দলাদলি আরম্ভ হইল, তখন অনেকেই ভয় পাইয়া আত্মীয় সভায় আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সভা খুব কার্য্যকরী ও স্থায়ী না হওয়ায় রামমোহন 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি' নাম দিয়া আর একটি সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার ধর্ম্মমত খ্রীষ্টান ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছিল ও ইহাতে খৃষ্টান মতেই উপাসনা প্রভৃতি হইত। রামমোহন নিজের পুত্র, কয়েকজন আত্মীয় ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব নামে দুইজন শিষ্য লইয়া এই সভায় যাইতেন। এই সভা প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনে অ্যাডাম রামমোহনের প্রধান সহায়ক ছিলেন। কিন্তু এই সভাও খুব কার্য্যকরী হইল না।

একদিন রামমোহন ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির অধিবেশন হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন, আমাদের বিদেশী উপাসনা-মন্দিরে যাইবার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজেদেরই একটি মন্দির থাকা আবশ্যক। এই কথাটি রামমোহনের মনে লাগিল। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি নূতন সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৮ সনের ২০শে আগষ্ট। এইরূপে

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু সে সময়ে লোকে এই সভাকে ব্রহ্মসভা বলিত।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা সাতটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত সভার কাজ হইত। দুইজন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ করিতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইত। এই সঙ্গীত করিতেন বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ও পাখোয়াজ বাজাইতেন গোলাম আব্বাস নামে একজন মুসলমান।

প্রথমে এই ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মসভার কোন বাড়ি ছিল না। কিছুদিন অর্থ সংগ্রহ করিয়া জোড়াসাঁকোয় জমি কিনিয়া বাড়ি করা হইল। ১৮২৯ সনের ২৩শে জানুয়ারি এই নূতন বাড়িতে সমাজের কাজ আরম্ভ হয়। রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত এই সমাজ আজও আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত।

রামমোহনের স্থাপিত সভায় কি ভাবে কাহার উপাসনা হইবে, তাহা তিনি একটি দলিলে লিখিয়া যান। তিনি নির্দ্দেশ করিয়া যান যে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালনকর্ত্তা, আদিঅন্তরহিত, অগম্য ও অপরিবর্ত্তনীয় পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য। কোন সাম্প্রদায়িক নামে তাঁহার উপাসনা হইতে পারিবে না। যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন, তাঁহারই জন্য জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ নির্ব্বিশেষে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। কোন প্রকার চিত্র, প্রতিমূর্ত্তি বা খোদিত মূর্ত্তি এই মন্দিরে ব্যবহৃত হইবে না। প্রাণিহিংসা হইবে না, পানভোজন হইবে না, কোন জীব বা মনুষ্য বা কোন সম্প্রদায়ের উপাস্যকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভাবে উল্লেখ করা হইবে না। যাহাতে পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার প্রসার হয়, প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতি হয়, এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে, অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না।

রামমোহন যখন ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এদেশে সহমরণ-প্রথা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। রামমোহন সহমরণ-প্রথার বিরোধী ছিলেন ও যাহাতে এই নৃশংস প্রথা রহিত হয়, তাহার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছিলেন। মুসলমান সম্রাট আকবর প্রথমে এই প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করেন। ইংরেজশাসন স্থাপন হওয়া অবধি ইংরেজরাও এই প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু এদেশের লোকের ধর্ম্মবিশ্বাসে পাছে আঘাত লাগে এই ভয়ে তাঁহারা সহমরণ একেবারে নিষেধ করিতে ভরসা পাইতেছিলেন না। ইংরেজ শাসকদের মধ্যে লর্ড ওয়েলেস্‌লী প্রথমে এই প্রথা সংযমিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার পর হইতে গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে নানা নিয়ম করিতেছিলেন, কিন্তু একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন কিনা, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। রামমোহন কলিকাতা আসার অল্পদিন পর হইতেই সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করেন যে বিধবাদিগকে স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতেই হইবে এমন কোন নির্দ্দেশ নাই। গোঁড়া হিন্দুরা সতীদাহ বন্ধ হইলে হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইবে, এই কথা বলিতে লাগিলেন ও তাঁহাদের মত প্রচার করিবার জন্য ধর্ম্মসভা বলিয়া একটি সভা করিলেন। এই সভার মুখপত্র ছিল 'সমাচারচন্দ্রিকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। কিন্তু তাঁহাদের আন্দোলনে কোন ফল হইল না। ১৮২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

সতীদাহ-প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টাই এদেশের নারীদের জন্য রামমোহনের একমাত্র কাজ নহে। নারীজাতি সম্বন্ধে রামমোহনের অতিশয় উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁহারা যাহাতে সম্পত্তির অধিকারিণী হয়, সে বিষয়েও রামমোহন আন্দোলন করিয়াছিলেন। রামমোহন সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে আরও যে সকল কাজ করেন, তাহাও এইখানে উল্লেখ করা উচিত। রামমোহন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। সেই সময়ে এদেশের লোকদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটা তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল। এক পক্ষের মত ছিল যে, এদেশে ইংরাজী শিক্ষা না দিয়া সংস্কৃত ও ফার্সী পড়ানই সঙ্গত; অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে ছিলেন। রামমোহন ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার সপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া ১৮২৩ সনে লর্ড আমহার্ষ্টকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি বলেন যে, এদেশের লোকদের কেবলমাত্র সংস্কৃত ও ফার্সি শিক্ষায় কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, ইংরেজী শিক্ষা ভিন্ন তাহাদের কুসংস্কার দূর হইবে না—হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থাও ঘুচিবে না। রামমোহন

এ-বিষয়ে কেবলমাত্র মত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের জন্য নিজের ব্যয়ে একটি ইংরেজী স্কুলও স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাংলা ভাষার উন্নতি ও প্রচারের জন্য রামমোহন যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে বাংলা ভাষায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন ও বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সে যুগের বাংলা গদ্যে সংস্কৃত শব্দের খুব বাহুল্য থাকিত, সেজন্য সাধারণ লোকের উহা বুঝিতে কষ্ট হইত। রামমোহন এই রীতির বিরোধী ছিলেন। তিনি বাংলা রচনা যাহাতে সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় তাহার পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য তাঁহার নিজের লেখাও আজকালকার বাংলা-গদ্যের তুলনায় অনেক বেশী সংস্কৃত বহুল ও আড়ষ্ট। তবু তিনি যে সে যুগের একজন বিশিষ্ট বাংলা গদ্য লেখক সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ধর্ম্ম, শিক্ষা, ও সমাজ সংস্কারে রামমোহনের যেরূপ আগ্রহ ছিল রাজনৈতিক ব্যাপারেও তেমনই আগ্রহ ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অতিশয় গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে উদারনৈতিক ছিলেন। ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে উদারনৈতিক দল জয়ী হইতেছেন শুনিয়া তাঁহার অতিশয় আনন্দ হইত। ফ্রান্সে ১৮৩০ সনে যে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হয় তাহাতে তিনি অতিশয় আনন্দিত হন। ইংলণ্ডে যাইবার পথে তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে, তখন দুইটি ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতাসূচক নূতন তিন রঙের নিশান উড়িতেছে দেখিয়া ভাঙ্গা-পা গ্রাহ্য না করিয়া উহাকে গিয়া অভিবাদন করেন ও "ফ্রান্স ধন্য, ধন্য, ধন্য" বলিয়া আনন্দধ্বনি করেন। ইংলণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে যখন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্য প্রবর্ত্তিত হয় তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে তিনি যখন বিলাতে, তখন 'রিফর্ম্‌স্ বিল' পাস হওয়া সম্বন্ধেও খুব উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপার ছাড়া, এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইন পরিবর্ত্তন, জুরী-প্রথার প্রবর্ত্তন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি আন্দোলন করেন। তখন এদেশে রাজনৈতিক আলোচনা মোটেই ছিল না। রামমোহনকেই এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক বলা চলে।

বিলাত প্রবাস ও মৃত্যু

বাঙালীদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথম বিলাত যাত্রা করেন। তিনি ১৮৩০ সনের ১৫ই নভেম্বর যাত্রা করিয়া পর বৎসরের ৮ই এপ্রিল লিভারপুল সহরে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। ইউরোপ গিয়া সেখানকার আচার-ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা রামমোহনের বহুকাল হইতেই ছিল। কিন্তু সুযোগের অভাবে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়-আকবর তখন নামে মাত্র দিল্লীশ্বর। তিনি ১৮৩০ সনে রামমোহনকে দূত স্বরূপ বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করায় এই সুবিধা ঘটিল। দিল্লীর কাছে কতকগুলি জমীদারীর রাজস্বে অধিকার আছে বলিয়া বাদশা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। এই আবেদনে কোন ফল না হওয়ায় বাদশা ইংলণ্ডের রাজার নিকট আবেদন করিতে সঙ্কল্প করেন ও রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়া বিলাতে পাঠাইতে মনস্থ করেন। মোগল-বাদশার দেওয়া এই 'রাজা' উপাধির জন্যই আমরা তাঁহাকে 'রাজা রামমোহন রায়' বলিয়া থাকি। কোম্পানী রামমোহনের এই দৌত্য এবং উপাধি স্বীকার করিলেন না এবং তাঁহাকে দূত হিসাবে বিলাত যাইতে অনুমতিও দিলেন না। তখন রামমোহন সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে বিলাত যাইবার অনুমতি চাহিলেন ও অনুমতি পাওয়ার পর বিলাত পৌঁছিয়া নিজেকে দিল্লীশ্বরের দূত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

দিল্লীশ্বরের দৌত্য ভিন্ন অন্য কারণেও রামমোহন সেই সময়ে বিলাত যাওয়া প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। তখন সহমরণ-প্রথা রহিত করিবার বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দুরা যে আপীল করিয়াছিলেন, তাহা প্রিভি-কাউন্সিলে শুনানী হইবার উদ্যোগ হইতেছিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নূতন সনন্দ দিবার ও ভারতবর্ষের ভাবী শাসন-প্রণালী স্থির করিবার সময়ও নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। রামমোহন বিলাতে গিয়া এই সকল বিষয়েই নিজের মতামত ব্যক্ত করেন ও যাহাতে এদেশের শাসনপ্রণালীর বিধিব্যবস্থা ভাল হয় তাহার জন্য চেষ্টা করেন।

রামমোহন যখন রাজারাম ও দুই জন সঙ্গী, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রামহরি দাসকে লইয়া ১৮৩১ সনে বিলাত পৌঁছিলেন তখন সকলে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। পণ্ডিত ও সমাজসংস্কার হিসাবে রামমোহনের খ্যাতি বহু পূর্ব্বেই বিলাতে পৌঁছিয়াছিল। সেখানে তাঁহার অনেক গণ্যমান্য বন্ধু-বান্ধব ছিল। তিনি বিলাত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং সেখানে পৌঁছিলে তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ৮ই এপ্রিল লিভারপুল পৌঁছিয়াই রামমোহন ঐতিহাসিক রস্কোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান ও দু-চার জায়গায় বক্তৃতা করেন। এই সময়ে তিনি সংবাদ পান যে, শীঘ্রই পার্লামেন্টে 'রিফর্ম্মস্ বিল' সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইবে। শুনিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ১৬ই এপ্রিল লিভারপুল হইতে রওনা হইয়া ১৮ই তারিখে লণ্ডন পৌঁছান।

লণ্ডনে পৌঁছিবার অল্প সময় পরেই বিখ্যাত দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বেন্থাম সে-যুগের এক জন বিখ্যাত লেখক ও চিন্তাবীর। তিনি রামমোহনকে যে সমাদর করেন তাহা হইতেই বিলাতে রামমোহনের কিরূপ খ্যাতি হইয়াছিল, তাহা বোঝা যায়। ইহা ছাড়া রামমোহন রাজসম্মানও পান। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে দূত বলিয়া স্বীকার না করিলেও রাজার নিমন্ত্রণে তাঁহাকে দূতদিগের মধ্যেই আসন দেওয়া হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও তাঁহাকে ভোজ দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।



রাজা রামমোহন রায়
(ডাঃ প্রিচার্ডের গ্রন্থ হইতে)

বিলাতে রামমোহন ভারতবর্ষ সংক্রান্ত নানারূপ রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন ও যাহাতে ইংরেজ শাসনে এদেশের লোকদের উন্নতি হয় ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া দিল্লীশ্বরের যে-কাজের জন্য বিলাত গিয়াছিলেন তাহাতেও তিনি কৃতকার্য্য হন। তাঁহার চেষ্টার ফলে বাদশার বৃত্তি বৃদ্ধি হয়। ইংলণ্ড হইতে রামমোহন নিজের গ্রন্থাবলীও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দার্শনিক ও রাজনৈতিক আলোচনায় উন্নত বলিয়া ফ্রান্স ও ফরাসী জাতি সম্বন্ধে রামমোহনের অতিশয় উচ্চ ধারণা ছিল। এই ফ্রান্স দেশ স্বচক্ষে দেখিবার জন্য রামমোহন ১৮৩২ সনের শেষের দিকে

প্যারিসে যান। তখন ফ্রান্সের রাজা লুই-ফিলিপ তাঁহাকে অতিশয় সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন। সে-দেশের পণ্ডিতরাও তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ফ্রান্সের 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সভ্য মনোনীত করেন।

ইহার পর রামমোহন বিলাতে ফিরিয়া আসেন ও পর বৎসর ব্রিষ্টলে বাস করিতে যান। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত আর্থিক দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতেছিলেন। তিনি কলিকাতার যে হৌসের সহিত টাকা পয়সার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ফেল হইয়া যাওয়ায় এই অসুবিধা ঘটে। রামমোহনের যখন এই অবস্থা, তখন তিনি কয়েকটি ইংরেজ-পরিবারের নিকট হইতে খুব যত্ন পাইয়াছিলেন, এই সকল পরিবারের মধ্যে হেয়ার ও কার্পেণ্টার পরিবারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার রামমোহনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ও তাঁহার পর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন।

ব্রিষ্টলে থাকা কালেই রামমোহনের জ্বর হয়। এই জ্বরে আট দিন মাত্র ভুগিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। পীড়ার সময়ে রামমোহন তাঁহার বহু ইংরেজ বন্ধু কর্তৃক পরিবৃত ছিলেন। তাঁহাদের বহু যত্নেও রোগের কোন উপশম হইল না। ১৮৩৩ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার দেহান্তর ঘটিল।

পাছে তাঁহার পুত্রদের বিষয়-সম্পত্তি পাওয়া সম্বন্ধে কোন অসুবিধা ঘটে, সেজন্য রামমোহন পূর্ব হইতেই বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন খ্রীষ্টান সমাধিস্থানে সমাহিত করা না হয়। তাঁহার এই নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার দেহ ব্রিষ্টলে যে-বাড়িতে তিনি থাকিতেন তাহারই নিকট এক নির্জ্জন স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। দশ বৎসর পরে তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত গিয়া তাঁহার দেহ স্থানান্তরিত করিয়া ব্রিষ্টলের নিকট 'আর্নোস ভেল' নামে একটি জায়গায় সমাধিস্থ করেন ও তাহার উপর একটি সুন্দর মন্দির তৈয়ার করাইয়া দেন।



রামমোহনের বিলাতযাত্রার সঙ্গী রামরত্ন মুখোপাধ্যায়

রামমোহনের কীর্ত্তি

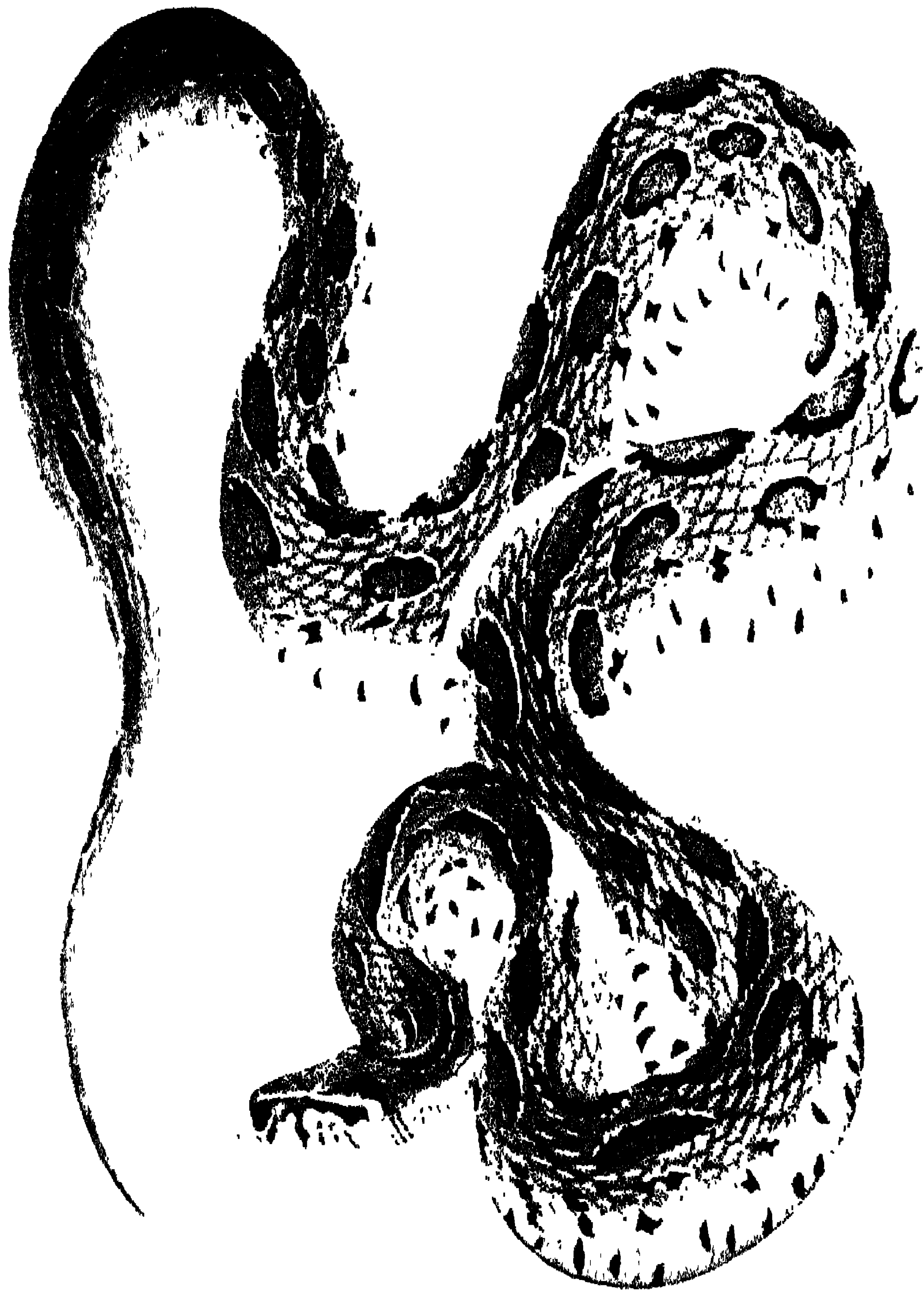
রামমোহন পাণ্ডিত্যে যেমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন, দৈহিক শক্তি ও সৌন্দর্য্যেও তেমনই অসাধারণ ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ ও বলশালী দেহ, উজ্জ্বল চক্ষু ও শ্রী-সম্পন্ন মুখ দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। গল্প আছে যে তিনি দিনে বারো সের দুধ খাইতেন, এবং একাই একটি পাঁঠা খাইয়া ফেলিতে পারিতেন। ইহা সত্য হউক আর না-ই হউক, এইরূপ গল্প যে তাঁর শারীরিক শক্তির পরিচায়ক, সে-বিষয়ে কোন

সন্দেহ নাই। রামমোহন অতিশয় তেজস্বী ছিলেন বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি চাকুরী করিবার সময়ে স্যর ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনের অভদ্রতার বিরুদ্ধে যে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনই তিনি আবার চরিত্রমাধুর্য্যেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্যকালে রামমোহনকে অনেক বার দেখিয়াছিলেন, তাঁহার বাড়িতে প্রায়ই যাইতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, রামমোহনের মত সুমিষ্ট মেজাজের লোক তিনি আর দেখেন নাই। এই ভদ্রতা ও বিনয় ও তেজস্বিতার সম্মিলন রামমোহনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।



রামমোহনের সমাধি—'আরনোস ভেল'

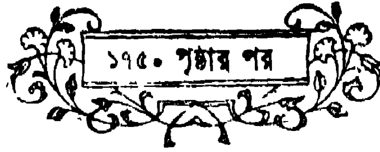
পাশ্চাত্য জ্ঞান, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সহিত ভারতীয় জ্ঞান, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সমন্বয়ের পথ নির্দ্দেশ রামমোহনের প্রধান কীর্ত্তি। তিনি চিন্তায় ও কর্ম্মে সার্ব্বভৌমিক ছিলেন, জাতীয় সঙ্কীর্ণতা পছন্দ করিতেন না। তবুও তিনি জাতীয় ধর্ম্ম ও আচার বর্জ্জন করিবার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, এক জাতির আচার-ব্যবহার অন্য জাতির মধ্যে জোর করিয়া প্রবর্ত্তন করা সম্ভব নহে, উচিতও নহে; সুতরাং সংস্কারের প্রয়োজন হইলেও প্রত্যেক জাতিরই উহা জাতীয় ভাবে করা উচিত। সেজন্য একেশ্বরবাদও তিনি উপনিষদের সাহায্যেই প্রচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বিদেশী শাস্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও উহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করেন নাই। রামমোহনের পর যে সকল মহাপুরুষ ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে বা ধর্ম্মজীবনে, সাহিত্যে বা শিল্পকলায় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার প্রদর্শিত পথ নূতন ধারার অনুসরণ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছে। এই জন্যই রামমোহন রায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক।







কুষণ-সম্রাট কনিষ্ক


১৭৫০ পৃষ্ঠার পর

কনিষ্কের রাজধানী—কাশ্মীর অধিকার করিবার পরেই কনিষ্ক পুরুষপুর (আধুনিক পেশোয়ার) নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর কনিষ্ক এই স্থানে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই স্তূপটির নির্ম্মাণকৌশল দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করিত। সপ্ততলবিশিষ্ট এই স্তূপটির উচ্চতা প্রায় ৮০০ ফুট ছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুং-য়ুং নামক চৈনিক পরিব্রাজক ভারত-ভ্রমণে আগমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এই স্তূপটি তিন বার অগ্নিদাহে ভস্মসাৎ হইয়াছিল ও ঠিক ততবারই পুণ্যশীল রাজাদের দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমেই ফা-হিয়ান নামক আর একজন চৈনিক পরিব্রাজক এই স্তূপটিকে দেখিয়াছিলেন। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি স্তূপটিকে দেখিয়াছিলেন। এই স্তূপের পার্শ্বে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। মগধরাজ দেবপালের রাজত্বকালে বীরদেব নামক বৌদ্ধ পণ্ডিত এই বৌদ্ধ বিহারে আগমন করিয়াছিলেন। তোমরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা 'শিশু-ভারতীতে' পড়িয়াছ ত? এই বীরদেব পরে নালন্দার অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পেশোয়ার স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি ধাতুনির্ম্মিত শরীর-নিধান (relic-casket) পাওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধেরা ভগবান বুদ্ধের শরীরাংশ, যথা—নখ, কেশ, দন্ত ইত্যাদির পূজা ভক্তিসহকারে করিতেন। এই সকল শরীরের অংশ পেটিকার মধ্যে রক্ষিত হইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত হইত ও তদুপরি স্তূপ নির্ম্মিত হইত। কনিষ্কের স্তূপও ঐ জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রাচীন স্তূপ ভারতবর্ষে অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে। পেশোয়ার স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে শরীর-নিধানটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার আচ্ছাদনের উপরে কনিষ্কের প্রতিমূর্ত্তি ও খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি লিপি আছে। লিপি হইতে জানা যায় যে, কনিষ্কের Agesailos নামক একজন গ্রীক এঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

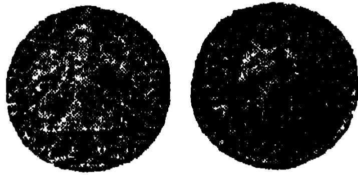
মৌর্য্য-সম্রাট অশোকের ন্যায় কনিষ্ক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অজস্র নরশোণিত পাত করিয়া কনিষ্কও হয়ত অশোকের ন্যায় অনুতাপের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিলেন ও সেই

জ্বালা নিবারণ করিবার জন্যই বোধ হয় তিনি বুদ্ধদের পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কথা বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। তাছাড়া তাঁহার



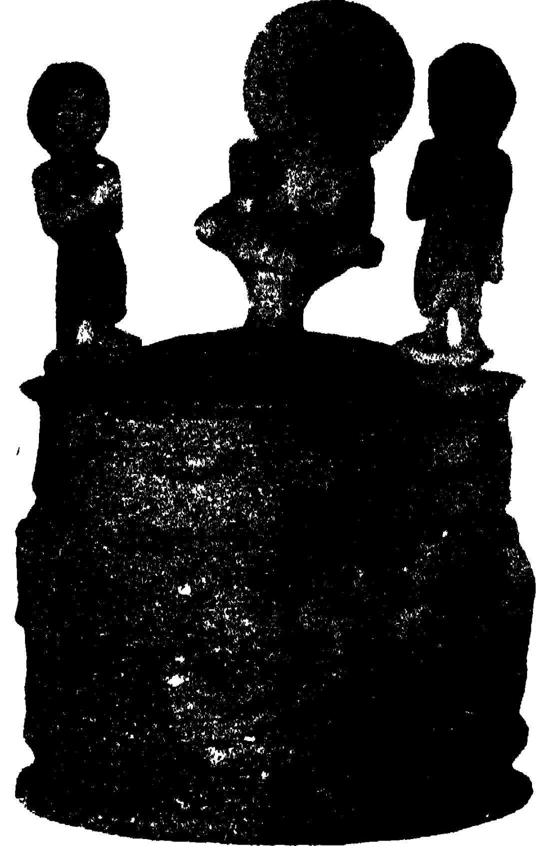
শরীর-নিধানের সম্মুখভাগ

মুদ্রাসমূহেও ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কনিষ্কের বহু স্বর্ণ ও তাম্র মুদ্রা



কনিষ্কের মুদ্রা

আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রায় ও খোটানী নামক এক প্রকার প্রাচীন ইরাণীয় বা পারস্য ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় ভাষাই গ্রীক অক্ষরে লিখিত। এই সকল মুদ্রার অপর দিকে গ্রীক, পারসিক ও হিন্দু জাতির দ্বারা পূর্ব্বে বহু মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।



শরীর-নিধানের পশ্চাদ্‌ভাগ

হেরাক্লিস্, হেলিওস্ ও সেলিনি (গ্রীক দেবতা); অহীশ অর্থাৎ আমাদের সুপরিচিত শিব ঠাকুর ও আথ্রো, ওএডো, নানো ইত্যাদি পারসিকদের দেবতার মূর্ত্তি পাওয়া যায়। এরূপ বহুসংখ্যক দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত করার ইহাই অর্থ যে, কনিষ্ক তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অধিবাসিগণের ধর্ম্মবিশ্বাসকে সম্মান দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য মুদ্রাতে বোড্ডো অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তি

দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার মুদ্রা তাঁহার রাজত্বের পরবর্ত্তিকালে অঙ্কিত হইয়াছিল ও ইহাই তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহন সূচিত করে। বৌদ্ধজগতে কনিষ্কের স্থান অশোকেরই নিম্নে। তাঁহার অদম্য উৎসাহের ফলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রায় সমগ্র মধ্য এবং উত্তর এসিয়ায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। রোমক সম্রাট Constantine খৃষ্টধর্ম্মের জন্য যাহা করিয়া-ছিলেন, কনিষ্ক শাক্যমুনির শান্তির ধর্ম্মের জন্য তাহাই করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আর একবার নিষ্প্রভ হইয়াছিল— বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের জয় আবার বিঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের এরূপ বিস্ময়কর প্রচার হইলেও ধার্ম্মিক সাম্প্রদায়িকতার সমধিক প্রভাব লক্ষিত হইয়াছিল। বৌদ্ধদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি পূর্ব্বেই হইয়া-ছিল। কনিষ্কের রাজত্বকালে মহাযান নামক বৌদ্ধধর্ম্মের একটি নবীন রূপ ক্রমশঃ বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছিল, ও তাহার ফলে বৌদ্ধেরা চিরকালের জন্য দুইটি বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একটির নাম হীনযান ও অপরটির নাম মহাযান। মহাযান মতাবলম্বীরা প্রাচীনপন্থীদিগকে হীনযান নামে অভিহিত করিতেন। কারণ, তাঁহাদের মতে নবীন পন্থাটি প্রাচীন হইতে উৎকৃষ্ট ছিল। তাঁহারা গৌতম বুদ্ধকে পরম দয়ালু ভগবান মনে করিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করিতেন। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম শুদ্ধোধনতনয় গৌতম বুদ্ধকে দেবতার আসনে বসাইয়া তাঁহারই প্রতিমা গড়িয়া মন্দিরে মন্দিরে পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাছাড়া তাঁহারা অসংখ্য বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধে বিশ্বাস করিতেন। বোধিসত্ত্বের অর্থ, যিনি এখনও বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন নাই। এই সকল বোধিসত্ত্ব নির্ব্বাণ পদকে তুচ্ছ করিয়া জীবের কল্যাণের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকে বাস করিতেন। বোধিসত্ত্বগণ দেবতারূপে পূজিত হইতেন। তাঁহাদেরও মূর্ত্তি গঠিত হইত। জীবের চরম লক্ষ্য—সেবা ও ভক্তির সাহায্যে, প্রথমে বোধিসত্ত্বের পদ লাভ করিয়া ক্রমশঃ, হয়ত জন্মজন্মান্তর পরে, বুদ্ধত্ব লাভ করা। তোমরা এখন দেখিতে পাইতেছ যে, মহাযান ধর্ম্মের বিশেষত্ব—(১) ভক্তির প্রাধান্য, (২) বহুসংখ্যক বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বকে দেবতা বোধে পূজা করা, (৩) মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তন, (৪) বুদ্ধত্ব লাভ করাই জীবের চরম লক্ষ্য মনে করা।

বৌদ্ধধর্ম্মের এই রূপান্তরের হেতু আর কিছুই নহে, কেবল হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব। হিন্দু-দের তেত্রিশ কোটি দেবতা ও গীতার ভাগবত ধর্ম্মের প্রভাব বৌদ্ধেরা শেষ পর্য্যন্ত কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তোমাদিগকে পূর্ব্ববারে অশ্বঘোষের কথা বলিয়াছি। এই অশ্বঘোষ পরে মহাযান-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া-ছিলেন ও ঐ ধর্ম্মসংক্রান্ত কিছু কিছু শাস্ত্রাদিও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাযান ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তার নাম নাগার্জ্জুন। ইঁহার কাল অশ্বঘোষের কিছু পরেই। ইনি মাধ্যমককারিকা নামক মহাযান ধর্ম্মের প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কনিষ্কের সময়ে চতুর্থ বৌদ্ধ-সভা আহূত হয়। কাশ্মীরের রাজধানীর নিকট কুন্দলবন নামক সঙ্ঘারামে এই সভার অধিবেশন হয়। পাঁচ শত বৌদ্ধ শ্রবণ এই সভায় মিলিত হন।



গান্ধার শিল্পের নিদর্শন বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি

ভিক্ষু বসুমিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ও অশ্বঘোষ সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই সভায় বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনার উদ্দেশ্য, শাস্ত্রসমূহের প্রামাণিকতা নির্ণয় করা। আলোচনার ফলে ত্রিপিট নামক বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রামাণিক ব্যাখ্যাস্বরূপ অনেক







গান্ধার শিল্পের নিদর্শন—বুদ্ধ মূর্ত্তি

গ্রন্থ রচিত হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, সভার অধিবেশন সমাপ্ত হইবার পর এই সকল গ্রন্থ যত্নসহকারে বড় বড় তাম্রপত্রে খোদিত হইয়া স্তূপের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত হইয়াছিল।

কনিষ্কের রাজত্বকালে গান্ধার শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। গান্ধার প্রদেশে এই শিল্পের বিকাশ হয় বলিয়া ইহাকে গান্ধার শিল্প বলা হয়। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, প্রায় তিন শত বৎসর যাবৎ গান্ধার দেশ গ্রীক রাজাদের অধীনে ছিল। তাহার ফলে এইখানে একটি নূতন শিল্প রচনা প্রণালীর সৃষ্টি হয়। এই প্রণালীতে গ্রীক শিল্পীদের প্রভাব সুস্পষ্ট। এক কথায় বলিতে গেলে গ্রীক শিল্পীদের ধরণে ও তাঁহাদের কলাকৌশলের অনুকরণে ভারতীয় আদর্শ ও ভাবতীয় ভাবকে রূপ দিবার প্রচেষ্টাই গ্রীকশিল্পকে সৃষ্টি করিয়াছিল। কনিষ্কের রাজত্বকালের কতকগুলি উৎকৃষ্ট গান্ধার শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। গান্ধার শিল্পের ভাস্করেরা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের অসংখ্য মূর্ত্তি গঠন করিয়াছিল। এই সকল মূর্ত্তি পাষাণের ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তিত রূপকে স্পষ্টরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

প্রায় ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিবার পর কনিষ্ক মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার রাজসভা বহু রত্নে সমুজ্জ্বল ছিল। শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি তাঁহার সভাকে অলঙ্কৃত করিতেন। পার্শ্বে, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, চরক, সঙ্ঘরক্ষ, মাঠর, গ্রীক এঞ্জিনীয়র পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ Agesailos প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাঁহার রাজসভাকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য ও ইতিহাসে কনিষ্ক উপেক্ষিত। হয়ত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নগণ্য মনে করিয়া তাঁহার অতুল কীর্ত্তির কথা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কেবল কহ্লণ তাঁহার "রাজতরঙ্গিণী" নামক কাশ্মীর দেশের ইতিহাসে, কনিষ্কের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে কনিষ্কের সমকক্ষ রাজা ভারতবর্ষে খুব অল্পই হইয়াছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক গগনে ছোট-বড় অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অশোক ও কনিষ্ক রবি-শশীর ন্যায় দীপ্যমান্ হইয়া তাহাদের জ্যোতিঃকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিলেন।



জৈন-নারী

১১১৭ পৃষ্ঠার পর

বৌদ্ধনারীদের ন্যায় মহাবীর বর্দ্ধমানের প্রভাবে জৈন গৃহস্থ নারীরাও জৈনসমাজের উপর বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। আমরা জৈন ইতিহাসে দুইজন খুব প্রসিদ্ধ জৈনমহিলার কথা জানিতে পারি। তাঁহাদের একজনের নাম সুলসা, অপরের নাম রেবতী।

সুলসা ও রেবতী

সুলসা গৃহস্থ-নারীর আদর্শস্বরূপা ছিলেন, আর রেবতী দানশীলা নারীদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন।

এক সময়ে মহাবীর পীড়িত হইলে পর জানিতে পারেন যে, রেবতী মোরব্বা প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা খাইলেই তিনি রোগমুক্ত হইতে পারিবেন। রেবতী যদি প্রফুল্ল মনে এই মোরব্বা দেয়, তাহা হইলে তোমরা উহা গ্রহণ করিবে,—মহাবীর তাঁহার শিষ্যদিগকে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। রেবতী সন্তুষ্ট হইয়া ঐ মোরব্বা মহাবীরকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ছত্রিশ হাজার মহিলা মহাবীরের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সংসার-ত্যাগ করিয়াছিলেন। বৈশালীর রাজা চেটকের চন্দনা নামে এক কন্যা ছিল। চন্দনা এই সকল মহিলাদের অন্যতমা।

চন্দনা

চন্দনা রাজকন্যা হইয়াও নানা বিপদের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। একবার চন্দনা একটি নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিদ্যাধর নামক এক দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায় এবং পরে অরণ্য মধ্যেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সে সময়ে একদল পর্ব্বতবাসী তাহাকে কোশাম্বী নগরে লইয়া গিয়া ধন্যসেন নামে এক ধনী ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে। ধন্যসেনের স্ত্রী, চন্দনার উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিত। এই সময়ে মহাবীর ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে কৌশাম্বী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। চন্দনা পৃথিবীর অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া মহাবীরের নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া একজন ধার্ম্মিকা মহিলা রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

মহাবীরের জননীর নাম ছিল ত্রিশলা। ত্রিশলার বিদেহদত্তা এবং প্রিয়কারিণী এই দুইটি নামও ছিল।

ত্রিশলা

ত্রিশলার সহিত ক্ষত্রিয় নাথ জাতির নেতা সিদ্ধার্থের বিবাহ হয়। ত্রিশলা ছিলেন, পার্শ্বনাথের শিষ্যা। মহাবীরের আর একজন ভক্ত ছিলেন আনন্দের পত্নী শিবনন্দা।

শিবনন্দা

তাঁহার পত্নী যশোদাও স্বামীর ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। মহাবীর ও যশোদার পুত্রের নাম ছিল প্রিয়দর্শন।

হাস্তিনাপুরের রাজা সুদর্শনের মহিষী রাণী-দেবীও জৈনধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন।

রাণীদেবী

ইঁহার পুত্র অমরনাথ একজন তীর্থঙ্কর ছিলেন।

সেকালে অনেক রাজপরিবারের মহিলারা জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে

মিথিলার রাজা কুম্ভের কন্যা; রাজগৃহের রাজা সুমিত্রের রাণী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

নন্দুওরা

কুরুরাজ্যে নন্দুওরা নামে এক ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিলেন। তিনি সেকালের প্রচলিত সমুদয় ললিতকলা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে জৈনধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন কিন্তু পরে গৌতম বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য মহামৌদ্গল্যায়নের নিকটে তর্কে পরাজিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন।

ভদ্রা

সে সময়ে ভদ্রা নামে একজন বিদুষী জৈন নারী ছিলেন। তিনি কোনও কারণে জৈন-ধর্ম্মের প্রতি বিরক্ত হইয়া একটি গ্রামের দ্বারদেশে গাছের একটি শাখা রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি আমার সহিত তর্ক করিতে চায়, সে যেন এই গাছের শাখাটি পদদলিত করিয়া যায়।" —সারিপুত্র শাখাটি পদদলিত করিয়াছিলেন এবং ভদ্রাকে তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ভদ্রা পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অর্হত্ব লাভ করেন।

সম্রাট্ বিম্বিসারের মহিষী চেল্লনা ছিলেন রাজা চেটকের সাতটি কন্যার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। চেল্লনা জৈনধর্ম্মে বিশেষরূপ অনুরক্তা ছিলেন। রাজা চেটকের তৃতীয়া কন্যা মৃগাবতীও (কৌশাম্বীর রাজা শতানীকের পত্নী) মহাবীরের একজন অনুরক্তা শিষ্যা ছিলেন। রাজা শতানীকের মন্ত্রীর পত্নীও জৈনধর্ম্মে বিশেষরূপ অনুরক্তা ছিলেন। চেটকের অপর এক কন্যা জ্যেষ্ঠার সহিত মহাবীরের ভ্রাতা নন্দীবর্দ্ধনের বিবাহ হয়। জ্যেষ্ঠা এবং সুজেষ্ঠা মহাবীরের শিষ্যা ছিলেন।

জৈন ভিক্ষুণী

সেকালে জৈন-ভিক্ষুণীদের সমাজে অত্যন্ত আদর ছিল। তাঁহারা দু'তিনজন একত্র হইয়া যাতায়াত করিতেন। মহিলারা যখন জৈনধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিতেন, তখন তাঁহাদের মস্তক মুণ্ডন করা হইত এবং একজন জৈন-নারী তাঁহাকে দীক্ষা দিতেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহাকে অনেক কিছু নিয়ম পালন করিতে হইত।

ভিক্ষুণীগণ কোন প্রাণীকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবেন না। মাটির পাত্রে রক্ষিত কোনও খাদ্য ভিক্ষুণীর গ্রহণ করিতে নাই। যে পথে বিপদের আশঙ্কা আছে, সেইরূপ পথ তাঁহার ত্যাগ করিতে হইবে। মাংসের উপর রক্ষিত কোন খাদ্য তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না। সাঁতার দিবার সময় তাঁহারা সতর্ক হইয়া সাঁতার দিবেন যেন অন্য কোন লোকের হাত পা ছোঁওয়া না যায়। জলের মধ্যে ওঠা-নামা করিবেন না। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিবার সময় কোনও গৃহস্থের সহিত বাক্যালাপ করিবেন না। কোনও পুরোহিতকে স্পর্শ করিবেন না।

ভিক্ষুণী পশম কিংবা উলের বস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কোনও মূল্যবান্ বস্ত্র গ্রহণ করিবেন না। বাস করিবার জন্য মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কিংবা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত স্থান ভিক্ষুণী গ্রহণ করিতে পারেন। ভিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কোন্ দিকে কতদূর যাইবেন, তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। ভিক্ষুণী কখনও কর্কশ বাক্য উচ্চারণ করিবেন না। যদি কখনও পরস্পরের মধ্যে কলহ হয়, তাহা হইলে বয়সে যিনি ছোট, তাঁহার জ্যেষ্ঠার নিকট ক্ষমা চাহিতে হইবে।

জৈন উৎসব

জৈনদের বিবাহের রীতি ও অন্যান্য উৎসবাদি স্বতন্ত্র রকমের। তোমাদের কাছে তাহাদের কয়েকটি প্রধান প্রধান উৎসবের কথা বলিতেছি। ইহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পার্ব্বণের নাম—"আম্বেল" চৈত্র পূর্ণিমার আট দিন আগে এই পার্ব্বণ হয়। যে সকল নারী বিবাহিত জীবনে সুখী হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সেদিন গুরুভোজন করেন না। জৈন নারীরা 'শীতলা' পূজা করেন। 'বীর পসলি' নামে আর একটি জৈন-পার্ব্বণের কথাও পাওয়া যায়। এই পার্ব্বণে ভ্রাতা, ভগিনীর নিকট উপহার পাঠান, আবার ভগিনীও ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করেন। 'ভৈজীর' নামক পার্ব্বণে ভগিনী ভ্রাতাদিগকে তাঁহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। 'দশেরা' পার্ব্বণে জৈন মহিলারা ভোজনের প্রচুর আয়োজন করেন, আর মকর সংক্রান্তির দিনে গরীবদিগকে বস্ত্র এবং গরুদিগকে খাদ্য দান করিয়া থাকেন।

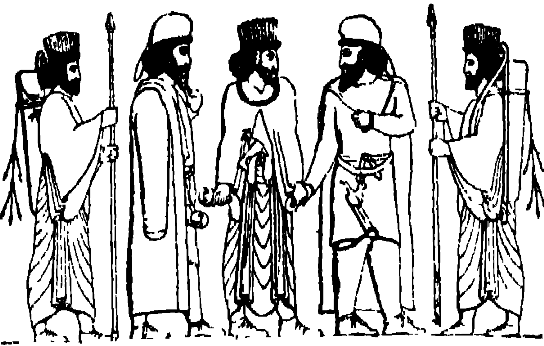


পারসিক জাতি



সে সময়ে এদিকে সালামিস (Salamis) দ্বীপের সন্নিকটে গ্রীক নৌবাহিনী অবস্থান করিতেছিল। নৌসেনাপতিরা ঐ স্থান ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু থেমিষ্টক্লিসের তাহা মনঃপূত হইল না। তিনি গোপনে পারস্যরাজকে এই সংবাদ জানাইলেন। তখন পারস্য নৌবাহিনী গ্রীকনৌবাহিনীকে আক্রমণ





সেকালের পারসিক রাজাদের শোভাযাত্রা ও দেহরক্ষী সৈন্য

করিল। এই যুদ্ধে গ্রীকেরা জয় লাভ করিল। অনেক পারস্য-যুদ্ধ-জাহাজ বিনষ্ট হইল। (৪৮০ খৃঃ পূঃ)।

সালামিসের যুদ্ধের পর ক্ষয়ার্শ মার্দানিয়াসকে পারস্য-সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া স্বদেশ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। মার্দানিয়াস এথেন্সের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হন। ইহার পর সম্মিলিত গ্রীক-বাহিনীর সহিত প্লেটিয়ায় তাঁহার যুদ্ধ হয়। গ্রীক বাহিনী পারস্য-সৈন্যকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে। মার্দানিয়াস যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইবার পারস্য-সৈন্য গ্রীস ছাড়িয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করে।

ইহার পর স্পার্টা ও এথেন্সের নেতৃত্বে থ্রেস, এসিয়ামাইনর ও ঈজিয়ান্ সাগরের গ্রীকরাজ্যগুলি পারস্যের অধীনতা পাশ হইতে নিজেদের মুক্ত করে। মাইকের যুদ্ধে পারস্য সৈন্য ও নৌবাহিনী পরাস্ত হয়। ইহার কিছুদিন পরে ক্ষয়ার্শ আর একটি নৌবাহিনী সংগ্রহ করেন। কিন্তু ইউরিমিদনের যুদ্ধে এথেন্সের নৌসেনাপতি কাইমন (Cimon) পারস্যবাহিনী একেবারে বিধ্বস্ত করেন। ইহার ফলে সমস্ত গ্রীকরাজ্যই পারস্যরাজের হাতছাড়া হইয়া যায়।

ইহার পর হইতে পারস্য সাম্রাজ্যের ভাগ্য পরিবর্তন উপস্থিত হয়। ক্ষয়ার্শের পরে রাজা হন আর্তক্ষত্র (Artaxerxe I)। তিনি ছিলেন ভালমানুষ ও শান্তিপ্রিয়। যুদ্ধবিগ্রহ তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। গ্রীসের বিরুদ্ধে তিনি কোন অভিযান করেন নাই। নিজের সাম্রাজ্য রক্ষার

জন্য তাঁহাকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। তবে রাজা দ্বিতীয় দারয়বৌস (Darius II) ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি ছিলেন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী জবরদস্ত নরপতি। সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে তিনি মন দিলেন। তাঁহার রাজধানীও সুসাতেই ছিল। এই সময়ে গ্রীসের রাজগুলি স্পার্টা ও



দারয়বৌসের রাজপ্রাসাদ—সুসা

এথেন্সের নেতৃত্বে পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে রত হইয়াছিল। এই সুযোগে তিনি নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার অধীনস্থ এসিয়ামাইনরের ক্ষত্রপেরা স্পার্টার সঙ্গে যোগ দিয়া এথেন্সের সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ পারস্যরাজ এসিয়ামাইনরের গ্রীকরাজ্যগুলি নিজের অধিকারভুক্ত করিতে পারিবেন, ঠিক হইল। প্রথম প্রথম পারসিকেরা বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। কারণ, সার্দিসের ক্ষত্রপ তিসাফার্নিস (Tissaphernes) ও ফ্রিজিয়ার ক্ষত্রপ ফার্ণাবাজাজের (Pharnabazus) মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। সুতরাং তাঁহারা স্পার্টাকে বিশেষ কোন সাহায্য করিলেন না। তবে কিছুদিন পরে পারস্যরাজ তাঁহাদের অকর্মণ্যতায় বিরক্ত হইয়া তিসাফার্নিসের জায়গায় নিজেদের কনিষ্ঠ পুত্র কুরুশকে (Cyrus) ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিয়া পাঠান। কুরুশ ছিলেন বিশেষ কর্মদক্ষ ও চতুর লোক। তিনি স্পার্টার সেনাপতি লাইসান্দারকে (Lysander) রীতিমত অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি, এই সময়ে দারয়বৌসের মরণাপন্ন অসুখ হওয়াতে কুরুশ লাইসান্দারের হাতে নিজ প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিয়া পিতার রোগশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হন। লাইসান্দার ঈগস্‌পটেমির যুদ্ধে (Azgos potami) এথেন্সের নৌবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে। ইহার কিছুদিন পরে এথেন্স লাইসান্দারের কাছে আত্মসমর্পণ করে ও এথেন্সের সাম্রাজ্য স্পার্টার করতলগত হয়।

এদিকে দ্বিতীয় দারয়বৌসের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় আর্ত্তক্ষত্র (Artaxerxes II) রাজা হন। কুরুশ এসিয়ামাইনরে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভ্রাতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রকাণ্ড এক সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেন—ইহাদের মধ্যে অনেক গ্রীক সৈন্যও ছিল। তারপর তিনি ভ্রাতার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ব্যাবিলনিয়া প্রদেশের কিউনাক্সাগ্রামে (Cunaxa) আর্ত্তক্ষত্রের সৈন্যের সঙ্গে তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পারস্যরাজ পরাজিত হন। তবে যুদ্ধে কুরুশের মৃত্যু হওয়াতে আর্ত্তক্ষত্র নিষ্কণ্টকে সিংহাসনে আসীন হইলেন।

তিসাফার্নিস পুনরায় নিজের প্রদেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার প্রথম লক্ষ্য হইল, এসিয়ামাইনরের গ্রীকরাজ্যগুলি অধিকার। কিন্তু ফ্রিজিয়ার ক্ষত্রপ ফার্ণাবাজাজের শত্রুতায় তিনি বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাহা ছাড়া স্পার্টাও গ্রীকরাজ্যগুলির সাহায্যের জন্য একদল স্পার্টান সৈন্য প্রেরণ করে। এই সময়ে ফার্ণাবাজাজের পরামর্শে আর্ত্তক্ষত্রপ কনোন (Conon) নামে একজন এথিনীয় নৌসেনাপতিকে পারস্যের নৌবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন।

এদিকে স্পার্টাও রাজা এজিসিলাসকে Agicilsus পারস্যরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে পাঠান। তিনি প্রথমে ফার্ণাবাজাজের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। তারপর

তিনি তিষাফার্নিসকে ভীষণভাবে হারাইয়া দেন। ইহার ফলে তিষাফার্নিসকে পদচ্যুত করিয়া হত্যা করা হয়। তারপর পুনরায় তিনি ফার্ণাবাজাজের রাজ্য আক্রমণ করেন। কিছুকাল যুদ্ধের পরে ফার্ণাবাজাজের সঙ্গে তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হয় ও তিনি গ্রীসে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইতিমধ্যে কনোনের সঙ্গে স্পার্টার নৌবাহিনীর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে স্পার্টা ভীষণ ভাবে পরাজিত হয়। এসিয়ার গ্রীকরাজ্যগুলি হইতে স্পার্টার প্রভাব বিলুপ্ত হয় এবং তাহারা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এদিকে গ্রীসে স্পার্টার সঙ্গে তাহার মিত্ররাজ্যদের মনান্তর উপস্থিত হয়। ইহার পরিণামে তাহাদের সঙ্গে স্পার্টার যুদ্ধ বাধে। তাহারা এবার ভূতপূর্ব শত্রু এথেন্সের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। তাহাদের সাহায্যের জন্য ফার্ণাবাজাজকে সঙ্গে লইয়া কনোন পারস্যের নৌবাহিনী লইয়া গ্রীসে আগমন করে। এই সুযোগে এথেন্স নূতন প্রাচীর নির্মাণ করিয়া তাহার রাজ্য সুরক্ষিত করে। কয়েক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলে। স্পার্টা এবার তেমন সুবিধা করিতে পারিল না। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, এই সময় সাইপ্রাস দ্বীপে কনোনের মৃত্যু হয়।

এদিকে কোন কারণে পারস্যরাজের সঙ্গে এথেন্সের অসদ্ভাব উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে স্পার্টা পারস্যরাজকে নিজের দলে টানিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে সে অ্যান্টালকিদাস (Antalcidas) নামে একজন রাজনীতি-বিশারদকে পারস্যের রাজধানী সুসায় প্রেরণ করিল। সে আসিয়া আর্তক্ষত্রকে বুঝাইল যে, তিনি ইচ্ছা করিলে গ্রীসের ভাগ্যবিধাতা হইয়া গ্রীসে শান্তি স্থাপন করিতে পারেন। তাঁহার পরামর্শমত পারস্যরাজ এক ফার্মান জারি করিলেন। তাহাতে তিনি দাবী করিলেন যে, এসিয়ামাইনরের গ্রীক্‌রাজ্যগুলি ও সাইপ্রাস দ্বীপ তাঁহার অধিকার-ভুক্ত। ইহা ছাড়া অন্যান্য গ্রীক্ রাজ্য স্বাধীন। এই প্রস্তাব যদি কেহ অমান্য করে, তবে তিনি তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। সমস্ত গ্রীক্ রাজ্যই এই আদেশ শিরোধার্য করিল। এইরূপে নিজেদের পরস্পরের শত্রুতার ফলে এতদিন পরে সমগ্র গ্রীসের উপর পারস্যরাজের আধিপত্য স্থাপিত হইল (৩৮৭খৃঃ পূঃ)। এখন হইতে গ্রীক্‌রাজ্যগুলি পারস্যরাজকে নিজেদের অভিভাবক বলিয়া মানিয়া লইল। এই ঘটনার ২০ বৎসর পরে (৩৬৭ খৃঃ পূঃ) গ্রীক্ রাজ্যগুলি পুনরায় সুসার দরবারে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া গ্রীক্ রাজ্য-সম্বন্ধে তাঁহার নির্দেশ জানিতে চাহিল। এই সময়ে থিবস্ ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গ্রীক-রাজ্য। তাহার দূত পেলোপিদাস (Peolopidas) আর্তক্ষত্রকে স্বপক্ষে আনিয়া থিব্‌স্‌কে গ্রীসের শীর্ষ-স্থানীয় বলিয়া এক ঘোষণা-পত্র আদায় করিল।

দ্বিতীয় আর্তক্ষত্রের মৃত্যুর পর তৃতীয় আর্তক্ষত্র রাজা হন (৩৫৯ খৃঃ পূঃ)। তাঁহার রাজত্বকালে গ্রীসে এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হয়। ক্ষুদ্র ম্যাসিদন-রাজ ফিলিপ নিজ ক্ষমতা বলে তাঁহার রাজ্যের প্রভূত পরিবর্তন সংঘটিত করেন এবং অনেকদিন যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে সমগ্র গ্রীসকে তাঁহার পদানত করেন। ৩৩৭-৩৩৮ খৃঃ পূর্বে তিনি করিন্থ-নগরে গ্রীসের এক জাতীয় মহাসভা আহ্বান করেন। সেখানে তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক অভিযানের প্রস্তাব করেন। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তাঁহাকে এই অভিযানের নেতা নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেই গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে তিনি প্রাণ হারান।

ফিলিপের মৃত্যুর পর তাঁহার অনারব্ধ কার্যভার তাঁহার পুত্র আলেক্‌সান্দার গ্রহণ করেন। সম্মিলিত গ্রীসের প্রতিনিধি ও সেনাপতি পদে বৃত হইয়া



গ্র্যানিকাসের যুদ্ধ

৩৩৪ খৃঃ পূর্বে তিনি সসৈন্যে এসিয়া মাইনরে পদার্পণ করেন। এই সময়ে পারস্যের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন দারয়বৌস (Darius Codomannus) নামে একজন ভীরু অপদার্থ নরপতি। গ্র্যানিকাসের (Granicus) যুদ্ধে আলেক্‌সান্দার তাঁহার ক্ষত্রপদিগকে পরাজিত

করিয়া এসিয়া মাইনর অধিকার করেন। এইবার তিনি পারস্যরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। আইসাসের যুদ্ধে (Issus) দারয়বৌস প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই যুদ্ধের ফলে সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন আলেকসান্দারের পদানত হয়। তারপর টায়ার ও গাজা অধিকার করিয়া আলেকসান্দার মিশরে উপস্থিত হন। বিনাযুদ্ধে মিশর তাঁহার হস্তগত হয়। এইবার গ্রীকবীর পারস্যসাম্রাজ্যের রাজধানী ব্যাবিলনের দিকে অগ্রসর হন। গগামেলার (Gaugamela) যুদ্ধে আবার দারয়বৌস প্রাণভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। আলেকসান্দার বিনাবাধায় ব্যাবিলনে নিজেকে পারস্য অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া সুসা ও পার্সিপলিস্ অধিকার করেন ও তারপর তিনি দারয়বৌসের



আইসাসের যুদ্ধ— তৃতীয় দারয়বৌসের পরাজয়

পশ্চাদনুসরণ করিয়া মিদিয়ায় আগমন করেন। কিন্তু তাঁহাকে তিনি জীবন্ত ধরিতে পারিলেন না। কারণ, তাঁহার হস্তে পড়িবার পূর্ব্বেই বেসাস্ (Bessus) নামে দারয়বৌসের এক বিশ্বাসঘাতক অনুচর প্রভুকে হত্যা করে। ইহার পর আলেকসান্দার একে একে পারস্যসাম্রাজ্যের সকল প্রদেশই অধিকার করেন। এই-রূপেই হকামনিষ্য রাজবংশের শেষ হয়। এইখানে স্বাধীন পারস্যের প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে (৩৩০ খৃঃ পূঃ)।

আলেকসান্দার অবশ্য পারস্যসাম্রাজ্য জয় করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি পূর্ব্বদিকে বিপাশা (Beas) নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা আর অগ্রসর হইতে অস্বীকার করাতে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ব্যাবিলনে ফিরিয়া আসিতে হয়। সেখানে ৩২৩ খৃঃ পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলেকসান্দারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষেরা ভাগ করিয়া লয়েন। এসিয়ার সাম্রাজ্য সেলিউকাস নিকাতর (Seleucus Nikator) অধিকার করেন। যদিও তিনি মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কাছে হারিয়া যান, তবু তিনি একজন বিচক্ষণ ও ক্ষমতাবান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম অ্যান্টিকোয়াস (Anticolus I) পিতৃ সিংহাসন অধিকার করেন (২৮১-২৮১ খৃঃ পূঃ)।

সেলিউকাসের বংশের রাজারা অবশ্য বীর ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের অনেকাংশ বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হয়। ইহাদের



তৃতীয় দারয়বৌসের মৃতদেহ সম্মুখে আলেকসান্দার

মধ্যে বক্ত্রিয়া ও পার্থিয়ার (খোরাশান) বিদ্রোহ উল্লেখ যোগ্য। খৃঃ পূঃ ২৪৮ অব্দে পর্ণিসর্দ্দার কাস্পিসাগরের নিকটস্থ ইরাণী গোষ্ঠী আর্স (Arsaces) পার্থিয়া অধিকার করিয়া অস্কাণী বংশের (Arsacids অথবা Ascanian প্রতিষ্ঠা করিন। এই বংশের ফরহাদ্ Phraates 175-170) ও মিলাদ Mithridates I-170-138) বিশেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে অস্কাণীসাম্রাজ্য ইউফ্রেটিস্ নদ হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তবে এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় রাজা ছিলেন দ্বিতীয় মিলাদ Mithidrates II—124-88 B.C. ও তৃতীয় ফরহাদ্ Phraarte III-70-57)।

অস্কাণী বংশ অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক বেশ বড় যোদ্ধা ছিলেন। রাজা হুবান্দ (Orodes I) রোমান সেনাপতি ক্রাসাস্‌কে (Crassus) কারহির (Carrhe) যুদ্ধে হাবাইয়া দেন (৫৩ খৃঃ পূঃ)। বিখ্যাত রোমান যোদ্ধা মার্ক অন্টনী (Mark Antony) চতুর্থ ফরহাদের কাছে হারিয়া যান (৩৬ খৃঃ পূঃ)। বলগাস্‌ও (Vologess) খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। তবে তাঁহার পর হইতে অস্কাণী বংশের পতন আরম্ভ হয়। অবশেষে ২২৬ খৃষ্টাব্দে সাসানীয় বংশীয় (Sasanean) আর্দশীর (Artaxerxes) অস্কাণীবংশের শেষরাজা আর্ত্তবানকে (Artabanus IV) রাজ্যচ্যুত করিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করেন।

আর্দশীর ছিলেন সাসানের বংশধর। সাসান হইতে এই বংশের নাম সাসানীয় (Sasanid বা Sasanian)। প্রথমে তিনি ছিলেন ইস্তখর অথবা পার্সিপলিসের এক ক্ষুদ্র রাজা। আস্তে আস্তে তিনি



রাজা আর্দশীর ও হোরমজদ

নিজ রাজ্য বাড়াইতে আরম্ভ করেন। অবশেষে আর্ত্তবানকে হারাইয়া অস্কাণী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি সাম্রাজ্যের রাজধানী বর্ত্তমান বাগদাদের নিকটস্থিত মদাইয়নচ অথবা টেসিফনে (Ptesiphon) প্রতিষ্ঠা করেন। আর্দশীর অনেকবার এসিয়া মাইনর আক্রমণ করেন এবং তথাকার রোমান সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহার বীরপুত্র সাপুর (Shapur-241-272-3.) রোমানদের সঙ্গে বারবার যুদ্ধ করেন। ২৬০ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট ভ্যালেরিয়ান (Valerian) এদেশের যুদ্ধে তাহার কাছে ভীষণ ভাবে হারিয়া যান এবং তাঁহার হাতে বন্দী হন। সাপুর এই হতভাগ্য বন্দীর পৃষ্ঠদেশে পা রাখিয়া ঘোড়ায় উঠিতেন

নৃপতি নার্সিসও পারস্যের একজন প্রধান নৃপতি ছিলেন। সাপুরের বংশধরদের রাজত্বকালে আমীর ওমরাহদের ক্ষমতা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়। তাহাদিগকে পহলবান্ (Pahlavan) বলা হইত। তাহারা ছিল সর্ব্বেসর্ব্বা এবং নিজেদের খুসীমত যাহাকে তাহাকে সিংহাসনে বসাইত। এই বংশীয় রাজারা সাধারণতঃ খৃষ্টানদের উপর যার পর নাই অত্যাচার করিত। রাজা দ্বিতীয় সাপুর (৩১০-৩৭৯) ছিলেন



সাপুর

ঘোরতর খৃষ্টান-বিদ্বেষী। বহ্‌রামগোর (Bahram Gor 420-438) তাঁহার চাইতে কম যাইতেন না।

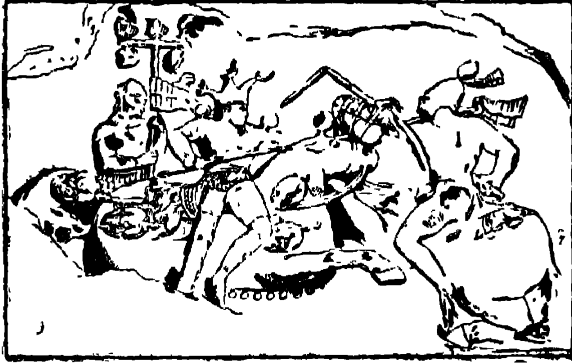


রাজা নার্শিস

তবে যজদাজিদ (Yazdajire-399-420) অন্য প্রকৃতির ছিলেন। তিনি খৃষ্টানদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন এবং তাহাদের ধর্ম্মমতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। এইজন্য তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে

দেখিতে পারিত না। তাহাদের মতে তিনি ছিলেন ঘোরতর পাপী। এই কারণে রাজা কুবাদকেও (Kubad-488-531) তাহারা ভাল চক্ষে দেখিত না, আর অনুশিরবান অথবা খসরু (Chosroes-531-579) ছিলেন বীর ও পুণ্যাত্মা।

তবে খসরু বাস্তবিকই বড় রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য বিশেষ অবহিত ছিলেন। যাহাতে প্রজারা অন্যায় করভারে প্রপীড়িত না হয়,



বহ্‌রাম গোর

সেদিকে তাঁহার বিশেষ নজর ছিল। পণ্ডিত ও দার্শনিক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। যোদ্ধা হিসাবেও তিনি কম ছিলেন না। আরবদেশ ও

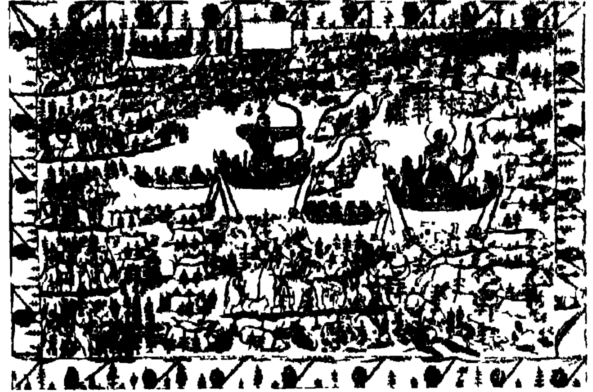


খসরু

বাক্ট্রিয়া তিনি জয় করেন। সিরিয়া ও এসিয়া মাইনারে তিনি সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তুর্কী সরকারের সাহায্যে তিনি হূণদের ভীষণভাবে পরাস্ত করেন। তবে রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার সঙ্গে তুর্কীদের সংঘর্ষ বাধে।

খসরুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র চতুর্থ হোরমজ্‌দ (Hormozd-579-590) রাজা হন। তিনি ছিলেন উদার প্রকৃতির; কাজেই, তিনি খৃষ্টানদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে তাঁহার প্রজারা তাঁহার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হয় এবং অকালে তিনি প্রাণ হারান।

হোরমজ্‌দের পরে রাজা হন খসরু পরভেজ্‌ (Chosroes II-590-628)। তিনি একজন বিখ্যাত নৃপতি। তিনি এসিয়া মাইনর, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন জয় করেন। জেরুসালেমের মন্দির হইতে ক্রশ তিনি টেসিফনে লইয়া আসেন। মিশরও তিনি জয় করেন। তবে শেষের দিকে ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতি বিশেষ বিরূপ হন। রোমান-সম্রাট হিরোক্লিয়াস (Heroclius) তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া এসিয়া মাইনর সিরিয়া প্রভৃতি পুনরধিকার করেন। এমন কি, টেসিফন হইতে ক্রশটি পর্য্যন্ত তিনি ফিরাইয়া লইয়া আসেন। এইখানেই তাঁহার



খসরুর প্রাসাদের খোদিত চিত্র

বিড়ম্বনার শেষ হয় না। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র কুবাদ্‌ (Kubad II) তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া হত্যা করে। তবে খসরু পারস্য-সাহিত্যে অমর হইয়া আছেন কবি নিজামীর দৌলতে। তাঁহার রচিত খসরু ও সিরিনের প্রেমকাহিনী পারস্য সাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন।

খসরুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ইহার অল্পদিন পরেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী আরবেরা পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। কাদিশিয়া (৬৩৭) ও নিহারবন্দরের (৬৪১) যুদ্ধে তাহারা পারস্যরাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে ও পারস্য সাম্রাজ্যের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। ৬৫১ খৃষ্টাব্দে তাহারা পারস্য সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে

দখল করে। সাসানীয় বংশের শেষ রাজা ছিলেন তৃতীয় যজ্‌দাজির্দ।

এইবার পারসিকদের ধর্ম্মমতের বিষয় কিছু আলোচনা করা দরকার। অতি প্রাচীন কালে তাহারা নানা দেব-দেবীর পূজা করিত। এই সমস্ত দেবতার পূজার জন্য একদল পুরোহিত ছিলেন—তাঁহাদিগকে আথ্রবন (athravan) বলা হইত। পরবর্ত্তিকালে ইহাদের নাম হইয়াছিল মাগি (Magi)। ইঁহারা ছিলেন অনেকটা হিন্দুদের ব্রাহ্মণের মত। তাঁহারাই কেবল ধর্ম্মের সমস্ত



নাক্‌সা-ই-রুস্তামের অগ্নি-মন্দির

খুঁটিনাটি জানিতেন, তাঁহাদের ছাড়া দেব-দেবীর আরাধনা সম্ভব ছিল না। কাজেই, সমাজে ও রাষ্ট্রে তাঁহাদের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। হিন্দুদের মত পারসিকেরাও গরু ও অগ্নিকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। মাটিও তাহাদের কাছে বিশেষ পবিত্র ছিল। তাহাদের অগ্নি-মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। নাক্‌সা-ই-রুস্তাম নামক পার্ব্বত্য উপত্যকার পারসিকদের প্রাচীন অগ্নি-মন্দির এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

তারপর খৃষ্টের জন্মের আনুমানিক ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ইরাণ দেশে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁহার নাম ছিল জরথুষ্ট্র (Zoroaster)। তিনি প্রচলিত ধর্ম্মমতের সংস্কার করেন। তিনি অবশ্য তাঁহার নবধর্ম্মে পুরাতন দেব দেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তবে তাঁহাদের স্থান আর পূর্ব্বের মত উচ্চে রহিল না। জরথুষ্ট্রের ধর্ম্মের মূল কথা হইল এই যে, জগতে দুইটি প্রধান শক্তি আছে—সৎ ও অসৎ। এই সৎ-শক্তি হইল প্রধান দেবতা অহুরমজ্দ (Ahuramazda) আর অসৎ শক্তি ছিল অহ্রিমণ (Ahriman)। অহুরমজদ ও অহ্রিমণের মধ্যে আছে চিরশত্রুতা। এই দুই শক্তিতে অনাদিকাল হইতে চলিতেছে ঘোরতর সংগ্রাম। ইঁহাদের আবার আছে অনেক চেলাচামুণ্ডা—যেমন সূর্য্যদেব মিথ্রস, সুরাদেব হাওম (Haoma-Soma), জলদেবী অনাহিত অদ্বিসুরা ও বিবিধ্রহন্তা বিরিত্রঘ্ন (বৃত্রঘ্ন)। এই দুই যুধ্যমান্ দেবতার মধ্যে একজনকে মানুষ তাহার স্বাধীন বিচারশক্তির সাহায্যে বাছিয়া লইয়া শরণাপন্ন হইবে। আর যে যার কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিবে। পারসিকদের প্রধান জেন্দ-আবেস্তা। বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা তোমরা শিশু-ভারতীর ২৪৮-২৫০ পৃষ্ঠায় পাইবে।



[ঈশপের গল্প]

শৃগাল ও সারস

(১৭০৪ পৃষ্ঠার পর)

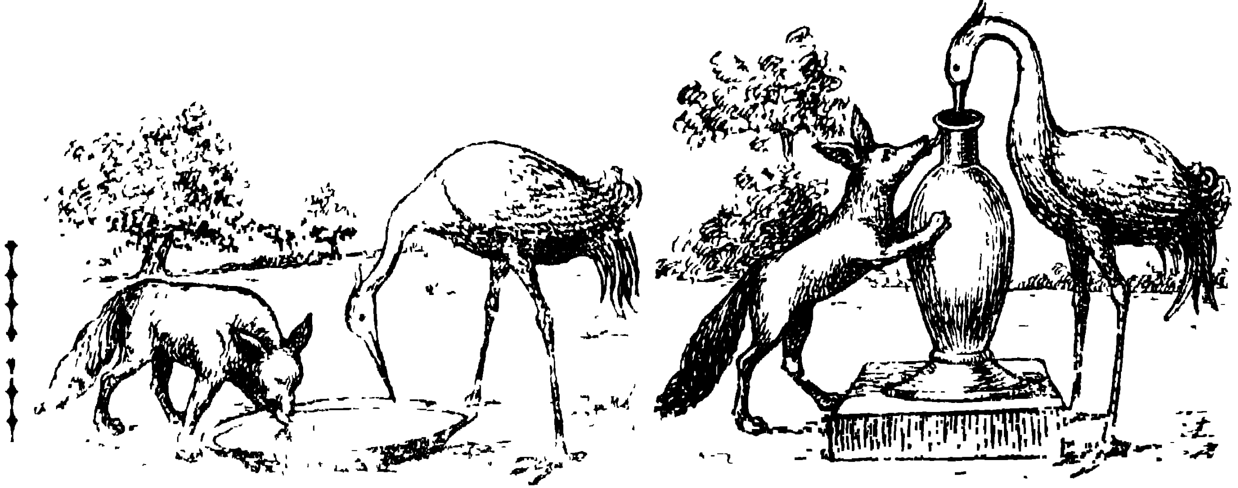
এক শৃগালের সহিত এক সারসের আলাপ হইয়াছিল। একদিন শৃগাল সারসকে নিজের বাটীতে খাইবার নিমন্ত্রণ করিল। যথাসময়ে সারস উপস্থিত হইলে শৃগাল একখানা চিট্‌কে



ঈশপ

থালায় করিয়া শুধু খানিকটা ঝোল সারসকে খাইতে দিল। সারস লম্বা ঠোঁট দিয়া ঝোল টানিবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছু-তেই এক ঢোক ঝোলও মুখে তুলিতে পারিল না, সে যে-ক্ষুধা লইয়া নিমন্ত্রণে আসিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক ক্ষুধা সঞ্চয় করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল। শৃগাল মৌখিক ভদ্রতা দেখাইয়া বলিতে লাগিল, "আহা, তোমায় কষ্ট দিলাম মাত্র, রন্ধন বোধ হয় ভাল হয় নাই, তাই তুমি খাইতেছ না।" সারস কোন উত্তরই করিল না। এদিকে শৃগাল নিজে অনায়াসে চক চক করিয়া সমস্ত ঝোলটা জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া খাইয়া ফেলিল। গৃহে ফিরিবার সময় সারস শৃগালকে পাল্টা নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে শৃগাল উপস্থিত হইলে

সারস একটা গলাসরু কুঁজোতে করিয়া খাদ্য উপস্থিত করিল। তাহার মধ্যে শৃগালের মুখ



ঢুকিল না, কিন্তু সারস তাহার লম্বা ঠোঁট তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া মহানন্দে আহার করিতে লাগিল। শৃগাল আপনার ধূর্ত্ততার প্রতিদান পাইয়া অপ্রতিভাবে বলিয়া গেল, “আমি যে পথে গিয়াছিলাম, সারসও সেই পথে গিয়াছে।”

কাঠির আঁটি

এক গৃহস্থের কতকগুলি পুত্র ছিল। তাহারা প্রায়ই কলহ বিবাদ করিত। পিতা উপদেশ দিয়া



বুঝাইয়া কিছুতেই যখন তাহাদিগকে প্রীতিসম্পন্ন করিতে পারিলেন না, তখন তিনি তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাদের বিবাদ মিটাইবার জন্য এক আঁটি কাঠি আনিতে বলিলেন। তাহারা এক আঁটি কাঠি আনিলে তাহাদিগকে তিনি সেই কাঠির আঁটিটি ভাঙ্গিতে বলিলেন। তাহারা একে একে সকলেই ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইল না। তখন তাহাদের পিতা আঁটি খুলিয়া এক একটা কাঠি আলাদা সকলের হাতে দিয়া ভাঙ্গিতে বলিলেন। তাহারা তাহা অনায়াসেই ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন গৃহস্থ আপন পুত্রদিগকে বলিলেন, “দেখ বৎসগণ, যতদিন পর্য্যন্ত তোমরা পরস্পর সদ্ভাবে একত্র থাকিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিবে, ততদিন শত্রু তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। আর যখনই তোমরা পৃথক হইবে অমনি শত্রু অনায়াসে তোমাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে।”

একতাই বল।

অল্পানাম্ অপি বস্তুনাম্ সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈঃ গুণত্বম্ আপন্নৈর্ বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ॥

তুচ্ছ জিনিষেরো বল বাড়ে একতায়
তৃণগুচ্ছে দড়ি হ'লে হাতী বাঁধা রয়।

সিংহ ও ইঁদুর

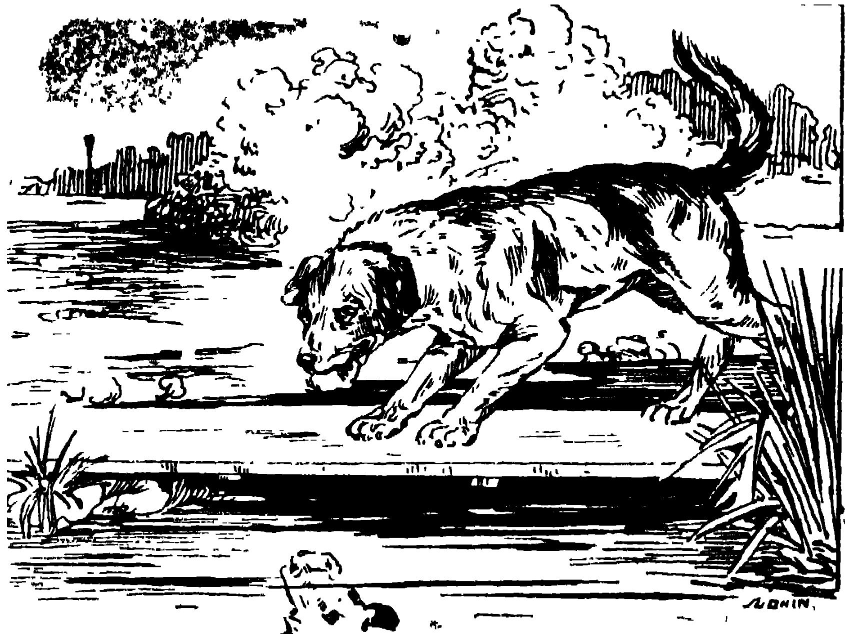
এক সিংহ পর্ব্বত গুহার সম্মুখে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। একটা নেংটি ইঁদুর হঠাৎ সিংহের নাকের উপর দিয়া দৌড়াইয়া যাওয়াতে সিংহের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রকাণ্ড থাবা চাপা দিয়া ইঁদুরকে ধরিয়া মারিতে উদ্যত হইল। তখন ইঁদুর কাকুতি করিয়া সিংহকে বলিল, "প্রভু, আপনি পশুরাজ। আমি সামান্য মূষিক। আমাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিন্, আমি কখনো না কখনো আপনার প্রত্যুপকার করিতে পারিব।" এই বাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া সিংহ ইঁদুরকে ছাড়িয়া দিল।



একদা শিকারের অন্বেষণ করিতে করিতে সিংহ এক শিকারীর জালে পড়িল। সিংহ অনেক চেষ্টা করিয়াও আপনাকে মুক্ত করিতে না পারিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে বন কম্পিত করিয়া তুলিল। সেই মূষিক আপনার প্রাণদাতা সিংহের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং অবিলম্বে সিংহের পাশবন্ধ, আপনার তীক্ষ্ণ দন্তে ছেদন করিয়া সিংহকে মুক্ত করিয়া দিল। তখন সিংহ বুঝিতে পারিল, উপকার কখনো বৃথা যায় না। উপকৃত যতই ক্ষুদ্র বা সামান্য হউক না কেন, সেও উপকারকের প্রত্যুপকার করিতে পারে।

কুকুর ও প্রতিবিম্ব

এক কুকুর এক মাংসের দোকান হইতে এক খণ্ড মাংস সংগ্রহ করিয়া আপনার বাড়ীতে যাইতেছিল। পথে একটা ছোট নদী পার হইতে গিয়া সাঁকোর উপর হইতে জলে তাহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল। সে মনে করিল, জলের মধ্যে অপর একটা কুকুর এক খণ্ড মাংস মুখে করিয়া যাইতেছে। সে সেই মাংসখণ্ড কাড়িয়া লইবার ইচ্ছায় যেমন মুখ হাঁ করিয়া মাংসের প্রতিবিম্ব ধরিতে গেল, অমনি তাহার মুখের মাংসখণ্ড জলে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। তখন কুকুর হতবুদ্ধি হইয়া প্রস্থান করিল

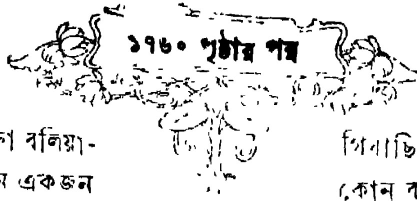


যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি, অধ্রুবং নষ্টমেব হি ॥





মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর, আমাদের দেশে অনেক শোক-সভা হয়। তাহার একটি সভায় একজন বক্তা বলিয়াছিলেন—"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এমন একজন মানুষ যাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া মনে হয়, তিনি আরও শ্রদ্ধা-ভক্তির উপযুক্ত। এইরূপে অনুভব করা যায় যে, তিনি যেন অসীম শ্রদ্ধা-ভক্তির উপযুক্ত।" এ কথাকয়টি বড় সুন্দর। ইহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিতেছ যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদের দেশের কত বড় একজন বড়লোক ছিলেন।

জন্ম ও শৈশব

১৭৯৩ শক (ইংরাজী ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ) ৩রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার সূর্যগ্রহণের দিন দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দ্বারকানাথ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ও মাতৃভক্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি ধীরে ধীরে বৈষয়িক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। সে সময়েও তাঁহার পৈতৃক গোলপাতার ঘর ছিল। মহর্ষি লিখিয়াছেন—"যখন আমার তিন বৎসর বয়স, তখন আমি একটা ছোট মোড়ার উপর দাঁড়াইয়া ঘরের কপাটের খিল খুলিতাম, আমার বেশ মনে পড়ে। প্রথম যে দিন শাল আমার গায়ে উঠিল তাহাও আমার মনে পড়িতেছে।" মহর্ষি অতুল ঐশ্বর্যোর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাহার সূচনা কালে জন্মিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ নিজের বিষয়-বুদ্ধির গুণে অল্পদিনের মধ্যেই কলিকাতা সহরের একজন প্রধান ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তি হইতে পারিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ যখন বিলাতে গিয়াছিলেন, তখন সেখানে লোকে তাঁহাকে কোন বড় রাজা, মহারাজা মনে করিত এবং তাঁহাকে "প্রিন্স দ্বারকানাথ" বলিয়া সম্বোধন করিত।

শিক্ষা ও রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা হেদুয়ার নিকট বালকদের জন্য স্কুল করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে সেখানে পড়িতে যাইতেন। রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ ছিলেন তাঁহার সমপাঠী। প্রায় প্রতি শনিবার তিনি রমাপ্রসাদের সহিত রামমোহনের মাণিকতলা বাড়ীতে যাইতেন। দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে রামমোহনের প্রশান্ত ও গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। দ্বারকানাথের সহিত রামমোহনের বন্ধুত্ব ছিল, এজন্য বন্ধুর পুত্রকে তিনি খুব ভালবাসিতেন, এবং 'রাদার' বলিয়া ডাকিতেন। মহর্ষি তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের গাছের লিচু ছিঁড়িয়া, কখনও কড়াই সুঁটি ভাঙ্গিয়া মনের সুখে খাইতাম। রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, রাদার, রৌদ্রে হুটাপুটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বসো। যত লিচু খেতে পার, এখানে বসিয়া খাও। মালিকে বলিলেন—যা, গাছ থেকে লিচু পেড়ে নিয়ে আয়। সে তৎক্ষণাৎ একটা থালা ভরিয়া লিচু আনিয়া দিল। তখন রামমোহন

বলিলেন, যত ইচ্ছা লিচু খাও। বাগানে একটি কাঠের দোলা ছিল। রামমোহন রায় অঙ্গচালনার জন্য তাহাতে দোল খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন, ক্ষণেক পরে আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন, "ব্রাদার, এখন তুমি টান।"



জোড়াসাঁকোর বাড়ী

বাল্যকালে দেবেন্দ্রনাথের মনে ধর্ম্মভাবের বিশেষ কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সংসারের অন্য দশজন যেমন হয়, তেমনি ছিলেন। তাহার পর যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার জীবনে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আসে। তাঁহার বয়স যখন আঠার বৎসর

ধর্ম্মভাবের বিকাশ

সেই সময়ে তাঁহার দিদিমার (পিতামহী) মৃত্যু হয়। পিতামহী দেবেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তিনিও তাঁহার খুব অনুগত ছিলেন। দিদিমার মৃত্যুর সময় তিনি শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন—সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। একখানি চাঁচের উপর বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে এক উদাস ভাব উপস্থিত হইল। তাঁহার মনে হইল—"আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্য্যের উপরে একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল, গালিচা, দুলিচা সকল হেয় বোধ হইল, মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব-আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়স তখন আঠারো বৎসর।'

এই সময় হইতেই তাঁহার জীবনের মধ্যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। এখন হইতে তিনি ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইলেন। সেই সময়ে তিনি সর্ব্বদা গাহিতেন—"হবে, কি হবে' দিবা আলোকে,

জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।" তিনি ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়া দেশে দেশে ছুটিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কখনও মাসের পর মাস নৌকাতে করিয়া, কখনও সিমলা পাহাড়ে, কখনও অতি দূরের পর্ব্বত পল্লীতে বেড়াইয়াছেন। এসময়ে ঈশ্বরের চিন্তায় এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ থাকিত না। জ্যোৎস্না



মহর্ষি—পঁয়তাল্লিশ বৎসর

রাত্রিতে সমস্ত রাত্রি ছাদের উপর কাটাইয়াছেন। ধর্ম্মের নিকট—পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্য তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হইয়াছিল। ঈশ্বরও তাঁহার নিকট এক ভীষণ বিপদ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে একত্রিশ বৎসর বয়সে প্রিন্স দ্বারকানাথ বিলাতে প্রাণত্যাগ করিলেন: একদিকে পিতৃশোক—অন্যদিকে ভীষণ ঋণের জ্বালা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার পিতার হুগলী, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি নানা জেলায় যেমন বৃহৎ জমিদারী, নীলের কুঠি এবং অন্যান্য কারবার ছিল, তেমনি তাঁহার যথেষ্ট ঋণ ছিল। দ্বারকানাথের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাঁহাদের কারবার নষ্ট হইল। তখন দেখা গেল যে, তাঁহাদের এক কোটি টাকা ঋণ রহিয়াছে।

সমস্ত বিষয় বিক্রয় করিয়া মাত্র ৭০ লক্ষ টাকার সংস্থান হয়। কিন্তু তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ অতি বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা করিয়া এমন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, ঋণদায়ে তাঁহার জমিদারী বিক্রীত হইবার উপায় ছিল না। পাওনাদারেরা

অপূর্ব আত্মত্যাগ ও মহত্ত্ব



ধ্যানস্থ মহর্ষি

আদালতে নালিশ করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইতে পারিতেন না। ইচ্ছা করিয়া মহর্ষি পাওনাদারদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগের হাতে সকল সম্পত্তিই ছাড়িয়া দিবেন। তাঁহারা মহর্ষির এই সাধুতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা তখন এই প্রস্তাব করিলেন যে, ইনি যখন সকলই ছাড়িয়া দিলেন, তখন সম্পত্তি হইতে ভরণ-পোষণের জন্য ইনি প্রতি বৎসর ২৫,০০০ টাকা করিয়া পাইবেন। মহর্ষি এই সময়কার ঘটনার উল্লেখ করিয়া আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"আমি যাহা চাই তাহাই হইল। বিষয়-সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই, তেমনি বিষয়ও নাই, বেশ মিলে

গেল। আমি বলি যে, হে ঈশ্বর, আমি তোমা-ছাড়া আর কিছু চাই না। তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিয়া আমার নিকট প্রকাশ হইলেন এবং আর সব কাড়িয়া



ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

লইলেন।" এই সময়ে তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। তৎপর বহু বৎসরের মিতব্যয়িতা, সততা, ও পরিশ্রমে তিনি সকল সম্পত্তিই পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্রস্বরূপ উপনিষৎ হইতে তিনটি উপদেশ পাইয়াছিলেন।

জীবনের-মূলমন্ত্র

(১) অনন্তস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পূজা করিবে। (২) অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিবে। (৩) পরধনে লোভ করিবে না। এই তিনটি উপদেশ তিনি নিজ জীবনে সার্থক করিয়াছিলেন। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানকে তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করিয়া বাঙ্গলাদেশে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মপ্রচার এবং ইহার প্রত্যেকটি কার্য্যে শুভদৃষ্টি, অর্থসাহায্য, শ্রম ও যত্ন দেবেন্দ্রনাথই করিয়াছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দিয়া কলিকাতা ব্রহ্ম মন্দিরের আচার্য্যের পদে বরণ করেন, ইহা তাঁহার কম সাহসিকতা এবং গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক নহে।

তোমরা সকলেই বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কথা জান। এই শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। শান্তি-নিকেতনের আবিষ্কারের ইতিহাসটি এই রায়পুরের সিংহ পরিবারের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। একদিন সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় বোলপুর ষ্টেশন হইতে রায়পুরের পথে শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইলেন। সমস্ত প্রান্তরের মধ্যে তখন ঐ দুইটি মাত্র গাছ ছিল। * * উপরে অনন্ত আকাশ, নীচে এই স্থলসমুদ্র। এই জায়গাটিতে হঠাৎ তাঁহার মনকে টানিল। এই ছাতিম ছায়াটিকে তাঁহার নির্জ্জন সাধনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনে হইল। * * যে জায়গা ছিল বিষম ভয়ের জায়গা, তাহাই হইল পরম আশ্রয়ের জায়গা—"আশ্রম"। তিনি তাঁহার নিজের ব্রাহ্মধর্ম্ম দীক্ষার বার্ষিক দিবসে উক্ত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। বীরভূম জেলার ভুবনডাঙ্গার ভীষণ প্রান্তর, দস্যু-ডাকাতের ক্রীড়াক্ষেত্র আজ বোলপুর শান্তিনিকেতনের আশ্রম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার্য্যে শৃঙ্খলা

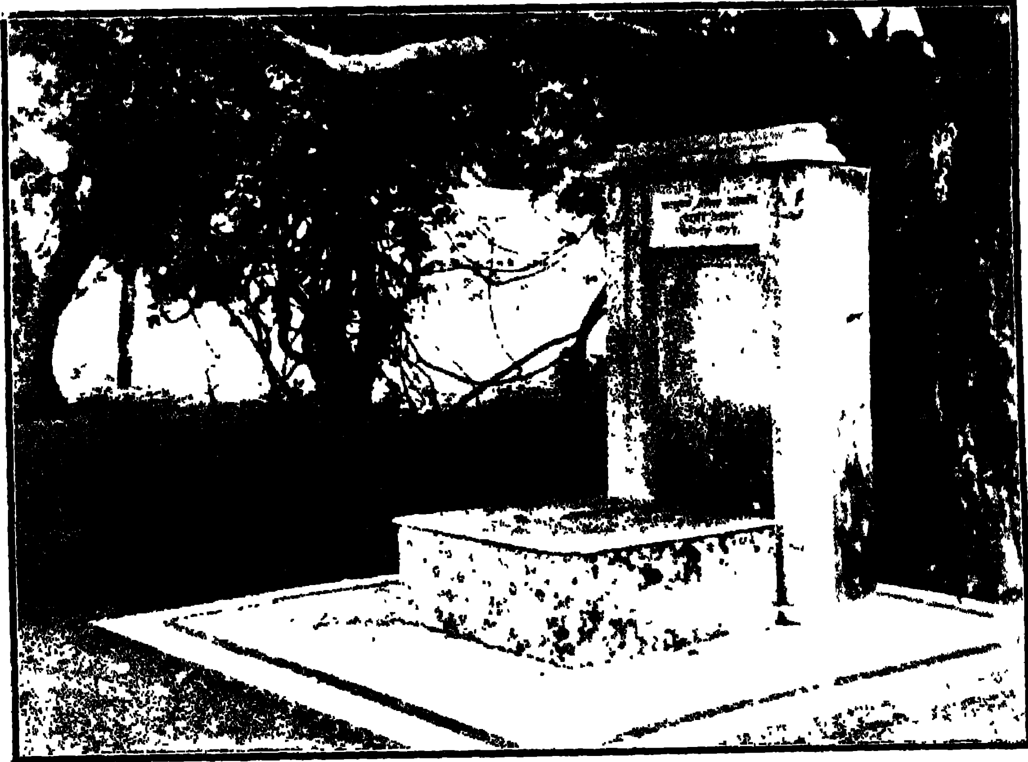
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সকল কার্য্য শৃঙ্খলামত করিতেন। তাঁহার সম্মুখে সর্ব্বদা একটি ঘড়ি থাকিত ঘড়ির কাঁটা দেখিয়া তিনি স্নানাহার করিতেন। এই শৃঙ্খলতা প্রিয়তাও তাঁহার ধর্ম্মভাব হইতে উদিত হইত। তিনি বলিতেন—"ঈশ্বরের ন্যায় শোভন ও সুশৃঙ্খলরূপে কেহ কার্য্য করে না প্রতিদিন যথাসময়ে তাহার সূর্য্য উদিত হয়, ঋতু সকল যথা নিয়মে যাতায়াত করে, সর্ব্বত্রই নিয়ম ও শৃঙ্খলা। তাঁহার ভাব লইয়া জীবন যাপন করিতে হইলে আমাদিগকেও সুশৃঙ্খল ও সুশোভনরূপে কার্য্য করিতে হইবে।"

দেশ-প্রীতি, শিক্ষা, গ্রন্থানুরাগ

দেশের কল্যাণের কথা তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিতেন। যাহাতে দেশে জ্ঞানের বিস্তার হয়, শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি হয়, এ জন্য তিনি যত্নবান ছিলেন। এই জন্যই তিনি জ্ঞানচর্চ্চাতে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। লোকে তাঁহাকে মহর্ষি বলিয়াই জানে, কিন্তু তিনি হিমালয়ের শৃঙ্গে বসিয়াও বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ইতিহাস, উদ্ভিদ তত্ত্ব, বিবিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্রসম্পর্কিত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন।

রক্ষণশীলতা

দেবেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ রক্ষণপ্রয়াসী ছিলেন। তিনি যে ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতি রচনা করিলেন, তাহা যথাসাধ্য প্রাচীনপদ্ধতির অনুরূপ করিয়া করিলেন। ১৮৪৩ সালে তিনি তাঁহার সঙ্গী কুড়িজন বন্ধুর সহিত যখন আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের



মহর্ষির উপাসনা-স্থান—শান্তিনিকেতন, ছাতিমতলা

নিকট দীক্ষিত হন, তখনকার সেই দীক্ষা পদ্ধতি তিনিই রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটি প্রতিজ্ঞা ছিল যে—"রোগাদি দ্বারা অশক্ত না হইলে প্রতিদিন গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিব।" মহর্ষি চিরদিন দীক্ষাদিনের প্রতিজ্ঞানুসারে চলিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে নানা দলাদলির সৃষ্টি হয়। সে সময়ে তাঁহার সহিত কেশব-চন্দ্র সেনেরও মত বিরোধ হয়। তাহা সত্ত্বেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আজীবন কেশবকে পুত্রেরই ন্যায় স্নেহ

করিতেন। কেশব বাবুর মৃত্যুশয্যাতে মহর্ষি যাইয়া পিতার ন্যায় স্নেহে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

দানশীলতায় দেবেন্দ্রনাথ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম এবং সৎকার্য্যের জন্য যে কত অর্থ দান করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। তাঁহার দানের কোন আড়ম্বর ছিল না। লোক দেখাইবার জন্য তিনি দান করিতেন না, লোকের খাতিরেও তিনি দান করিতেন না। সৎকার্য্য হইতেছে বুঝিয়া নিজের প্রাণ যেখানে টানিত, তাহাতেই তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন।

দানশীলতা

মহর্ষির বন্ধু-প্রীতি ছিল অসাধারণ। সুখে দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সকল সময় তিনি বন্ধুগণের সহায় ও সুহৃদ ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীকণ্ঠ সিংহ প্রভৃতি তাঁহার বন্ধু ও সুহৃদ ছিলেন। কেশবচন্দ্র প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি অনেক ছিলেন তাঁহার পুত্রস্থানীয় স্নেহভাজন।

বন্ধুপ্রীতি

দেবেন্দ্রনাথ দেশের জন্য, সমাজের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, শিক্ষার জন্য যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহাও বড় কম নহে। এখানে আমরা তাহার দুই একটি মাত্র উল্লেখ করিলাম। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে (১৭৬১শকে) কেবল মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে (১৭৬৫ শকাব্দ) ঐ সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। মহর্ষি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন।



মহর্ষি—চুরাশী বৎসর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাঙ্গালা রচনা অতি মধুর ছিল। তাঁহার লিখিত 'আত্মচরিত' একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। আমরা তাহা হইতে অতি সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

আমি অমৃতসরে রামবাগানের নিকট যে বাসা পাইয়াছিলাম তাহা ভাঙ্গা বাড়ী, ভাঙ্গা বাগান, এলোমেলো গাছ, জঙ্গলা রকম। কিন্তু আমার নবীন উৎসাহের চক্ষু সকলি তাজা—সকলি নূতন—সকলি সুন্দর করিয়া দেখিত। অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম যখন আফিমের শ্বেত, পীত লোহিত ফুল সকল শিশির-জলের অশ্রুপাত বর্ষিত, যখন ঘাসের রজত-কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যানভূমিতে জরির মসনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন পাঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীতস্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহা আমার নিকট গন্ধর্ব্বপুরী বলিয়া বোধ হইত।

ইংরাজী ১৯শে জানুয়ারী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই মাঘ ১৩১১ সালে মহর্ষি অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন।

মহর্ষির বাণী

সত্যকথা কহিবে। সহসা কখনও প্রতিজ্ঞা করিবে না। একবার যাহা বলিবে, তাহা সত্য কি মিথ্যা যদি কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করে তাহাও তোমার পক্ষে অপমান কর।



আলস্য ও উপেক্ষা সর্ব্বদা দূরে রাখিবে।

* * * *

স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হওয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া।

* * *

বিনয় অবলম্বন করিবে; বিনয়ী ও নম্র না হইলে ঈশ্বরের নিকট কেহ যাইতে পারে না।

* * *

অন্যের দোষ দেখিলে দ্বেষ অথবা ঘৃণা করিবে না। দ্বেষ ও ঘৃণা পাপের প্রতি ধাবিত হইবে, পাপিলোকের প্রতি নহে।

দোষ করা মনুষ্যের স্বভাব, ক্ষমা করা দেবতাদের ধর্ম্ম।

* * *

যে হৃদয়ে পরনিন্দা বাক্য, সে হৃদয়ে প্রীতি বাস করিতে পারে না।

* * * *

অসময়ে অন্যকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে।

* * * *

জীবনের কর্ম্ম তিন প্রকার—স্বকীয়, পরকীয় ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয়।

* * * *

মুক্তিলাভের প্রধান উপায় উপাসনা।

* * * *

সকল মনুষ্য এক জাতি এবং ধর্ম্মে সকলের সমান অধিকার।

রাগের প্রতি রাগ করিবে, কিন্তু রাগীকে গ্রহণ করিবে।

* * * *

চরিত্র ভাল না হইলে, কেহ বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা করে না। উপদেষ্টাগণ বিশুদ্ধ ও পুণ্যমান্ হয়।

* * * *

শিশুর ন্যায় সরল, নির্দ্দোষ ও স্বর্গীয় গুরু আর কে আছে? পিতামাতা ক্ষুদ্র সন্তানদিগের সহবাসে ধর্ম্ম সাধন করেন।

* * * *

বিশ্বাসই ধর্ম্মের জীবন, বিশ্বাসই ধর্ম্মের পরম সোপান, জীবন গেলেও এ বিশ্বাসকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না।

* * *

মলিন-বস্ত্র পরিধান, দুর্গন্ধ বায়ু সেবন, অপরিমিত আহার, আলস্য, রাত্রিজাগরণ—এ সকল রোগও দুর্ব্বলতার কারণ; ইহাতে বিরত থাকিবে। আহার পরিশ্রম ও বিশ্রাম এই তিন বিষয়ে পরিমিতাচারী হইবে।

* * * *

পরহিংসা অতি নীচ প্রকৃতির লক্ষণ। এ কুটিল ভাব যেন তোমার হৃদয়কে দূষিত না করে।

* * *

ধনের সদ্ব্যয় করিবে, বৃথা অপব্যয় করিবে না, কৃপণতাও অভ্যাস করিবে না। আপনার ও পরিবারের ও জনসমাজের মঙ্গলের জন্য অর্থব্যয় করিবে।

* * * *

ঈশ্বরকে একমাত্র প্রভু জানিবে। তাঁহারই আজ্ঞা বহন করিবে, তাঁহারই কার্য্য সাধন করিবে।

ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন

বংশ পরিচয়

হুগলী নগরীর পূর্ব্বপারে গঙ্গাতীরে গৌরিভা গ্রাম। এই গৌরিভা গ্রামের বৈদ্য-বংশীয় সেন পরিবার বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেশবচন্দ্র সেনের প্রপিতামহ গোকুলচন্দ্র সেন এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গোকুলচন্দ্রের পুত্র রামকমল সেনের সময় হইতেই এই পরিবারের লোকেরা কলিকাতা কলুটোলায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। সেই সময় হইতেই কলুটোলার সেনবংশীয়েরা কলিকাতার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

রামকমল ছিলেন কেশবচন্দ্রের পিতামহ। তোমাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই তাঁহার নাম শুনিয়া থাকিবে।

মানুষ চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া বড় লোক হইতে পারে, রামকমল তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল।

রামকমল সেন

তিনি বাল্যকালে গৌরিভা গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্য কিছু লেখাপড়া শিক্ষা করেন। পরে কলিকাতা আসিয়া ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। অর্থাভাবে তিনি তথায় বেশীদিন পড়িতে পারেন নাই সেইজন্য স্কুল ছাড়িয়া প্রথমে এসিয়াটিক সোসাইটির অধীনে এক ছাপাখানায় মাসিক আট টাকা বেতনে কম্পোজিটারের কাজ করেন এবং সেই সময় হইতেই নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রম গুণে কম্পোজিটারের পদ হইতে সেখানকার কেরানীর পদে উন্নীত



শ্রীকেশবচন্দ্র

হন। তিনি সে সময়ে অবসরকালে উক্ত সোসাইটির পুস্তকালয়ের সংস্কৃত ও ইংরাজী অনেক পুরাতন পুস্তক পাঠ করিতেন। কিছুদিন পরে তিনি তথাকার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন, এবং গুণক্ষমতা ও চরিত্রবলে টাকশালের দেওয়ানী পদে এবং পরে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী পদে দুই হাজার টাকা বেতনে চাকরী করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত সুবৃহৎ ইংরাজী বাঙ্গলা অভিধান সে সময়ে শিক্ষা-বিস্তার

ইংরাজী ও বাঙ্গালা অভিধান

বিষয়ে সাধারণের প্রচুর উপকার সাধন করিয়াছিল। এই রামকমল সেনই কলুটোলার সেন পরিবারের মান-সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র এই রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারী-মোহনের পুত্র। প্যারীমোহন—প্রিয়দর্শন, বুদ্ধিমান্, নির্দ্দোষ চরিত্র এবং দয়ার্দ্র-

পিতা-মাতা

হৃদয়ের লোক ছিলেন। দরিদ্র ভিখারীদিগকে তিনি গোপনে দান করিতেন। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, শত্রু কেহ তাঁহার ছিল না। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেশবচন্দ্রের মাতা সারদাসুন্দরী পঁচিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া সন্তানদের সহিত অতি সাবধানে অভিভাবকদের অধীনে কালযাপন করিতেন। পূজা, আহ্নিক, ব্রত, উপবাস, তীর্থভ্রমণ, দুঃখী-কাঙ্গাল জনের সেবা, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত।

কেশবচন্দ্র কলুটোলার এই বিখ্যাত সেন পরিবারে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৯শে নবেম্বর প্রাতে জন্মগ্রহণ

জন্ম

করেন। কেবলমাত্র দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। কেশব পিতামহের স্নেহে ও মাতার আদর ও যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বুদ্ধি প্রখর, কিছু অসাধারণ এবং চরিত্রটি নির্ম্মল ছিল। ছেলেবেলা কেশবচন্দ্র দেখিতে কৃশ ছিলেন, কিন্তু স্বভাবটি ছিল গম্ভীর; সে বয়সেই ছিলেন মিতভাষী, ধীর-

বাল্যশিক্ষা

প্রকৃতি এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি আপনার বাক্স, ডেস্ক, এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতেন। তাহাতে কাহাকেও হাত দিতে দিতেন না। কেশবেরা তিন ভ্রাতা,—প্রথম নবীনচন্দ্র, দ্বিতীয় কেশবচন্দ্র, তৃতীয় কৃষ্ণবিহারী। প্রথমে বাড়ীতে, পরে গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া কেশব হিন্দু-কলেজে ভর্ত্তি হন। সে সময়ে তিনি প্রতি বৎসর পারিতোষিক লাভ করিতেন। যথেষ্ট পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও মনোযোগের সহিত পড়াশুনা করিতেন। পড়িবার প্রতি তাঁহার এতদূর আগ্রহ

ছিল যে, পড়িতে পড়িতে একদিন একাকী পুস্তক বুকে করিয়া ছাদের উপর ঘুমাইয়া পড়েন। বাড়ীর সকলে তাঁহাকে কোথাও না পাইয়া চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে ঐ অবস্থায় দেখিতে পান।

কেশবচন্দ্র বাল্যকালে ও কিশোর বয়সে অন্যান্য বহু বিষয়েও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কি খেলাধূলায়, কি ম্যাজিক দেখাইতে, কি ডিস্পেন্‌সেরি করিয়া ডাক্তার সাজিতে, কি ডাকঘর প্রস্তুত করিয়া নীল চশমা নাকে দিয়া পোষ্টমাষ্টার হইতে, কি বাড়ীর ভৃত্য এবং ছোট ছোট ছেলেদিগকে হনুমান ও রাক্ষস সাজাইয়া রামযাত্রার গান গাইতে—সকল দিকেই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব ছিল। সদ্বিষয়ের অনুকরণ প্রবৃত্তি তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

খেলাধূলা আমোদ-প্রমোদ

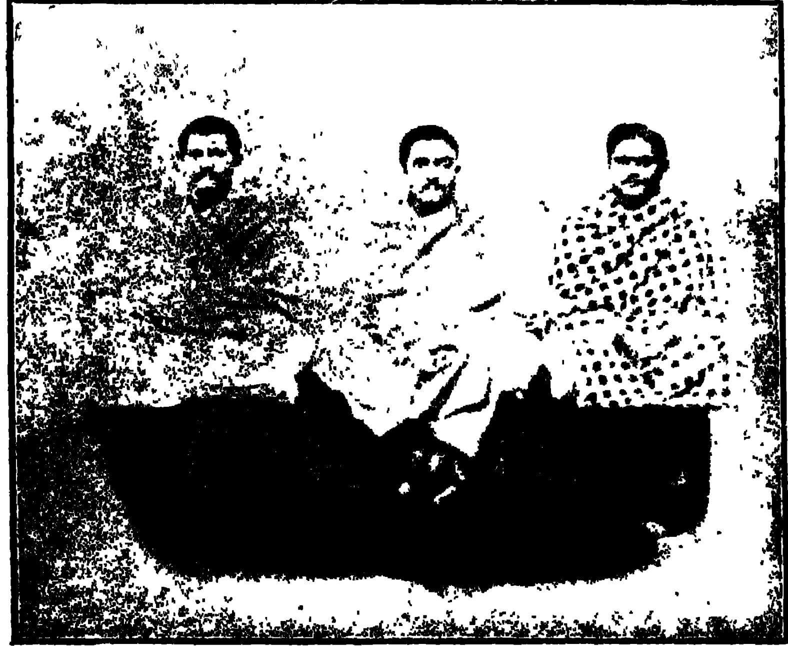
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কেশবের বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ হয়। ১৮৫৬ ১৮৫৮ সন এই দুই বৎসর কাল তিনি হিন্দু কলেজের লাইব্রেরীতে বসিয়া কেবল মনোবিজ্ঞান এবং নীতিবিজ্ঞান পাঠ করেন। অল্প বয়সে দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া অন্যান্য ছাত্রেরা তাহাকে একজন জ্ঞানী পণ্ডিত মনে করিত। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি মৎস্য ভক্ষণ ত্যাগ করেন। বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান, সুতরাং মাংসের সহিত কোন কালেই তাঁহার সংস্রব ছিল না। যৌবনের প্রথম অবস্থায় বিজ্ঞ জ্ঞানীদের কাছে থাকিতে, বিজ্ঞানের বই পড়িতে এবং নির্জ্জনে চিন্তা করিতে তাঁহার বড় ভাল লাগিত।

বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্তি

কেশবচন্দ্র যে একদিন দেশের একজন বড়লোক হইবেন, তাহার আভাস তাঁহার বাল্যজীবনেই পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। তাঁহার প্রতিভাজ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা তাঁহাকে নেতৃত্ব পদে বরণ করিয়াছিল। তাঁহার আকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করিয়া যাওয়া তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইত। কেশবের বয়োবৃদ্ধির সহিত এই আকর্ষণ শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া কিরূপ ভাব ধারণ করিয়াছিল, সেকথা তোমাদিগকে পরে বলিতেছি।

সেকালে সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বালি গ্রামের চন্দ্রনাথ মজুমদারের নবম বর্ষীয়া কন্যা জগমোহিনী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। নিজ ইচ্ছায় তিনি বিবাহ করেন নাই।

বিবাহ



কেশবচন্দ্র নবীনচন্দ্র কৃষ্ণবিহারী

এই বিবাহের পর হইতেই কেশবচন্দ্রের মনে কেমন পরিবর্তন হইল। তিনি ধর্ম্মশিক্ষা এবং ধর্ম্মদীক্ষার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কোথা হইতে যেন আদেশ আসিল—"প্রার্থনা কর! প্রার্থনা কর! প্রার্থনা ভিন্ন অন্য গতি নাই।" চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সেই তাঁহার মনে প্রথম বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। যখন ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, উপাসনা আরম্ভ হইল, সেই অবস্থায় তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন। এই ভাবে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ এবং আত্মচিন্তা করিতে করিতে তিনি ধর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করেন। এ সময়ে

ধর্ম্মভাবের উন্মেষ

23—F. 4

"ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি" দাতব্য নৈশবিদ্যালয়, 'গুডউইল ফ্রেটারনিটি সভা প্রভৃতি স্থাপন করেন। এই সভায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সহসা উপস্থিত হইয়া সভ্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া যান। আবার এ সময়ে সেক্সপিয়ার পড়িতেন, শুধু পড়িতেন না। একবার নিজে হ্যামলেট সাজিয়া গোবিন্দ গামে অভিনয় করেন। চিত্রপট, রঙ্গমঞ্চ সমস্ত নিজে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সংগোপনে অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়া কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হন। তখন কেহ ব্রাহ্মসমাজের কথা বড় একটা

ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা

ভাব করিয়া জানিতেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন সিমলা পর্ব্বতে ছিলেন। এই দীক্ষা-গ্রহণ কেবল ছিল—"আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য স্বীকার পূর্ব্বক তাহাতে বিশ্বাস প্রকাশ করিলাম।" দেবেন্দ্রনাথ যখন শুনিলেন, কেশব ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার মনে আশাতীত আনন্দ হইল। পরে তাঁহার পুত্র কেশবের সহপাঠী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে নানাকথা জানিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দিত হন। অতঃপর দুইজনে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ-যোগে একসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করেন। দেবেন্দ্র-নাথ ও কেশবচন্দ্রের মিলনে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভূত কল্যাণ হইল। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় পরিবার পরিজনের নিকট ও সমাজের নিকট যে কিরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিলেন তাহা মহর্ষি জানিতেন। এ সময়ে তাঁহার সুমিষ্ট বচনে ও তাঁহার সহিত বাস করিয়া কেশবের মনে উৎসাহ, শান্তি এবং কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশবের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হইল। মহর্ষি চিরজীবন কেশব-চন্দ্রকে আপনার পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্রও আজীবন তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র কিছুদিনের জন্য বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কার্য্য করেন, কিন্তু চাকরী তাঁহার ভাল লাগিল না। চাকরী ছাড়িয়া সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রচার-ব্রতী হইলেন। ধর্ম্ম-প্রচারে তাঁহার এইরূপ প্রণালী ছিল। (১) প্রাত্যহিক ভজন, উপাসনা, প্রার্থনা। (২) প্রকাশ্য সভায় ইংরাজি ও বাঙ্গলা উপদেশ ও বক্তৃতা। (৩) ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং সাময়িক পত্রিকা প্রণয়ন। (৪) কথোপকথন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রথমে কেশবচন্দ্র সেন 'বাঙ্গালী যুবক, ইহা

ধর্ম্ম-প্রচার

তোমারই জন্য (Young Bengal, this is for you) নামক ইংরাজী পুস্তিকা বাহির করেন। পরে আরও দশ বার খানি এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচারিত হয়। তাঁহার এই সকল পুস্তিকা প্রচারে দেশের মধ্যে সে সময়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। মহর্ষির পুত্রদের সহিত মিলিত হইয়া কেশবচন্দ্র এ সময়ে কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দেশে দেশে প্রচার ও সিংহল ভ্রমণ

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ বহু পুরাতন, কলিকাতার পরেই এখানে সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় কৃষ্ণনগর মাতিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মুখে ইংরাজী বক্তৃতা শুনিয়া সকলে মোহিত



ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিরূপে কেশবচন্দ্র

হইয়া গেলেন। দেবেন্দ্রনাথ কেশবের প্রতি আরও অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে তিনি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সিংহল ভ্রমণে গিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের সিংহল ভ্রমণের যে ডায়েরী মুদ্রিত আছে, তাহাতে আমরা সেই ভ্রমণ-কাহিনীর বিষয় বিস্তারিতরূপে জানিতে পারি।

তাহার ভাষাও অতি মনোহর। কেশবচন্দ্র যখন সিংহল গমন করেন, তখন পরিবারের সকলেরই অমতে গমন করেন। কিন্তু সিংহল হইতে ফিরিয়া আসিলে পরিজনেরা তাঁহাকে বাটীতে গ্রহণ করিতে কোনও আপত্তি করেন নাই। কিন্তু কেশবচন্দ্র যখন কলিকাতায় ফিরিয়া সর্ব্ববিষয়েই দেবেন্দ্রনাথের সহিত যোগদান করিলেন এবং দিনের পর দিন তাহা ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল, তখন আত্মীয়-স্বজনেরা প্রমাদ গণিলেন। এদিকে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই

কলিকাতা সমাজের আচার্য্য পদ লাভ

এপ্রিল কেশবচন্দ্রকে কলিকাতা সমাজের আচার্য্যপদে বরণ করা হয়। এই উপলক্ষে মহর্ষি তাঁহাকে "ব্রহ্মানন্দ" উপাধি এবং একখানি সনদ প্রদান করেন। গুণগ্রাহী মহর্ষি কেশবচন্দ্রকে

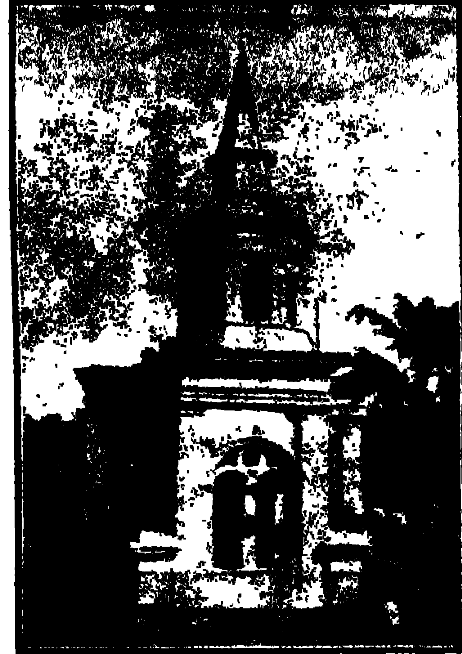


আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন

যেমন চিনিয়াছিলেন, এমন কেহই চিনিতে পারেন নাই। এই সময়ে তাঁহাকে পরিজনের সহিত সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্ত্রীর সহিত কলুটোলা হইতে জোড়াসাঁকো চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ এই সমাজচ্যুত জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিকে পুত্র-স্নেহে পালন করেন।

এই সময় হইতে কেশবচন্দ্রের কার্য্যক্ষেত্র আরও বাড়িয়া গেল। তিনি আদি সমাজে বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। কলিকাতা ও বাঙ্গালাদেশে নবজীবনের এক সাড়া পড়িয়া গেল। 'ইণ্ডিয়ান মিরার' নামক পত্রিকা এবং 'ক্যালকাটা কলেজ' নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। মিরার প্রথমে পাক্ষিক-রূপে প্রকাশিত হয়। পরে কেশবচন্দ্র বিলাত যাইবার পূর্ব্বে ইহাকে ইণ্ডিয়ান মিরার সাপ্তাহিক করিয়া যান। তাহার পর ইহা এদেশের প্রথম দৈনিক ইংরাজী সংবাদ-পত্র হইয়া শিক্ষিত সমাজের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একযোগে ছয় বৎসর কাল কার্য্য করিয়া, পরে ধর্ম্মসম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। কেশবচন্দ্রের অতিদ্রুত সামাজিক সংস্কারও মহর্ষি অনুমোদন করিতে পারেন নাই। ফলে, সমাজ দুই



নববিধান মন্দির

ভাগে বিভক্ত হইল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। ইহার কিছুদিন পরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর তারিখে ভারতবর্ষীয়

ব্রাহ্ম সমাজ

ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়। এখানকার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, নববিধানের ব্রাহ্মধর্ম্ম। কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের নাম এ সময়ে আদি সমাজ হইল। কিন্তু মহর্ষির প্রতি কেশবচন্দ্রের যে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা এবং কেশবচন্দ্রের প্রতি মহর্ষির যে স্নেহ-ভালবাসা, তাহা নির্ব্বাপিত হইল না।

এইবার ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কেশবচন্দ্র বাহির হইলেন। তিনি মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রচার কার্য্যালয় ও

ধর্ম্ম প্রচার

প্রচারকদল গঠিত হইল এবং প্রচারকগণ নানাদেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক বহুলোককে আপনাদের দলভুক্ত করেন। কেশবচন্দ্র তখন বক্তৃতার দ্বারা দেশকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তিনি টাউনহলে "মহাপুরুষ" (Great man) বিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়া স্বদেশ ও বিদেশের যাবতীয় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাজনগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র যখন ঢাকা অঞ্চলে প্রচার করিতে যান, তখন সাধু অঘোরনাথ ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের নানা জেলায়ও তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি নৌকাযোগে ময়মনসিংহও গমন করেন। পর বৎসরে তিনি হিন্দুস্থান এবং পাঞ্জাবে গমন করেন। কেশবচন্দ্রের ইংরাজী বক্তৃতা সব দেশের লোকের নিকটই এক স্বর্গীয় বস্তু বলিয়া মনে হইত। পাঞ্জাব হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মাঘোৎসবের দিবস 'বিবেক ও বৈরাগ্য' নামে একটি বাঙ্গালা বক্তৃতা পাঠ করেন, ইহাই তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা রচনা। কলিকাতাতে যখন তিনি ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তখন অনেক শিক্ষিত যুবা তাঁহার নিকট আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন। এইরূপে দেশে দেশে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংল্যাণ্ড গমন করেন।

সেখানে যাইয়া কেশবচন্দ্র ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে প্রধান প্রধান চতুর্দ্দশটি নগরে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সকল শ্রেণীর লোক-

ইংল্যাণ্ডে ভ্রমণ

সমাজেই কেশবচন্দ্র সম্মানিত হইয়াছিলেন। লণ্ডনে যত প্রধান প্রধান সভা আছে, প্রায় সমস্ত সভাতেই তিনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সে সময়ে ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার আলাপ ও পরিচয় হয়। পরিশেষে স্বয়ং মহারাণী ভারতেশ্বরী কেশবচন্দ্রকে সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিয়া অনুগৃহীত করেন। কেশবচন্দ্র অস্‌বরন্ নামক প্রাসাদে উপস্থিত হইলে রাজকুমারী লুইসের সহিত মহারাণী তাঁহাকে দেখা দিলেন। ভারতের উন্নতি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা কহিলেন। পরে তিনি আপনার ছবি এবং স্বামীর জীবনচরিত দুইখণ্ড পুস্তক উপহার দেন। ঐ পুস্তকদ্বয় তাঁহার হস্তাক্ষর-শোভিত ছিল।



ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তনরত—কেশবচন্দ্র

কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং তাহার অল্পদিন পরেই "ভারত-সংস্কারক" সভা স্থাপিত হয়। সুলভ সমাচার সাহিত্য, দাতব্য, শ্রমজীবীদের শিক্ষা, স্ত্রী বিদ্যালয় এবং মদ্যপান নিবারণ এই পাঁচভাগে ইহা বিভক্ত। 'সুলভ সমাচার' দ্বারা বঙ্গসমাজে সাহিত্য বিষয়ে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এক পয়সা মূল্যে সংবাদ-পত্র চলে, পূর্ব্বে কেহ জানিত না। নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহা প্রচারিত হইল।

অনেকে কাগজে পড়িতে শিখিল। প্রতি সপ্তাহে সহস্র সহস্র খণ্ড সুলভ সমাচার দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইত। অনন্তর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' দৈনিক হয়।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী তোমরা পড়িয়াছ। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তাঁহার সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে কেশব পরমহংস দেব যে কত বড় একজন উচ্চ সাধক তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সম্পাদিত Indian Mirror, 'সুলভ-সমাচার' প্রভৃতি কাগজে তাঁহার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন ও তাঁহাকে সর্ব্বত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে পরমহংস দেবকে বড় কেহ জানিতেন না। কেশবচন্দ্রের আদেশে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় পরমহংসের প্রথম জীবনী লেখক, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ঐ জীবনী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাঁহার বিষয়ে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামক পত্রিকায় তখন নিয়মিত ভাবে নানা কথা থাকিত।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ

কেশবচন্দ্রের সংস্কারের মধ্যে পৌত্তলিকতা, গুরুবাদ ও জাতিভেদ উন্মূলন, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন, চরিত্র গঠন ও নীতিজ্ঞান প্রসারণ, লোক-সেবা ও সাক্ষাৎ ভাবে ভগবানের উপাসনা, এইগুলি প্রধান ছিল। ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আত্মাকে স্বাধীন করাই তাঁহার স্ত্রীস্বাধীনতার অর্থ ছিল। সামাজিক বাহ্য স্বাধীনতার তিনি বিরোধী ছিলেন। স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও আচরণ স্ত্রীজাতির উপযোগী হওয়াই তাঁহার মত ছিল। তিনি তাঁহার মতানুযায়ী আদর্শ পরিবার গঠনের জন্য 'ভারতাশ্রম' ও আদর্শ স্ত্রী-শিক্ষা দিবার জন্য "ভিক্টোরিয়া কলেজ" স্থাপন করিয়াছিলেন।

সংস্কারের নীতি

কেশবচন্দ্রের সংস্কার ও ধর্ম্মসাধনের মতের সহিত সমাবেশ রক্ষা করিতে না পারায় ক্রমে তাঁহার অনুবর্ত্তী একদল লোক পৃথক হইয়া পড়িতেছিলেন। কেশবচন্দ্রের প্রথমা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তাঁহারা একেবারে পৃথক্ হইয়া পড়েন এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। এই সময়েই তিনি অপার সারকুলার রোডে "কমল কুটীর" ক্রয় করেন। এদিকে কেশবচন্দ্রও প্রকাশ্যভাবে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজকে নববিধান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র ও সকল দেশের সাধুভক্তগণ নববিধানের শ্রদ্ধার পাত্র। স্বয়ং ভগবানই সকল মানবের গুরু। ঈশ্বর এক, এবং তিনিই সকলের পিতামাতা। ভগবান ও মানবের মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তিতা নাই সুবিশাল বিশ্বই পবিত্র দেবমন্দির, সুনির্ম্মল চিত্তই প্রকৃত তীর্থ, সত্যই অনশ্বর, শাস্ত্র বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল, প্রীতিই পরম সাধন, স্বার্থনাশই বৈরাগ্য, --ইহাই নববিধানের মূলমন্ত্র।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ

নব বিধানের মূলমন্ত্র



কেশবচন্দ্রের কলিকাতাস্থ বাস-ভবন—কমল-কুটীর

কেশবচন্দ্র বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী উভয় ভাষাতেই তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তাঁহার বাঙ্গলা রচনার মধ্যে জীবনবেদ, সেবকের নিবেদন, ব্রহ্মগীতোপনিষৎ

সাধুসমাগম প্রধান। তাঁহার উৎসাহে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ইংরাজীতে, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দুশাস্ত্রের "শ্রীমদ্ভাগবত গীতার সমন্বয় ভাষ্য," "বেদান্ত সমন্বয়" 'গীতা প্রভৃতি' (ভাগবতসার 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" প্রভৃতি অনেকগুলি অতি উপাদেয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ধর্ম্ম-বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র সেন

কেশবচন্দ্র ও বাঙ্গালাসাহিত্য



ভজনরত—কেশবচন্দ্র

কোরাণ সরিফ, তাপসমালা, মুহম্মদচরিত প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল চিরঞ্জীব শর্ম্মা) সহস্রাধিক সঙ্গীত ও কবিতা, ঈশাচরিত প্রভৃতি রচনা করেন। তাঁহার লিখিত 'ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা' শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। কেশবচন্দ্র অভিনয়ের দ্বারাও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। অভিনয়ের জন্য তাঁহার অভিমত অনুসারে ত্রৈলোক্যনাথ "নব-বৃন্দাবন নাটক" রচনা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সকল বিষয়ে অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। তাঁহার হস্তলিপিও অতি সুন্দর ছিল। আমরা পর পৃষ্ঠায় তাঁহার ইংরাজী ও বাঙ্গালা হাতের লেখা ছাপিলাম।

ধর্ম্ম সাধনে ও প্রচার কার্য্যে অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া কেশবচন্দ্রের শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে। শেষ কয়েক বৎসর যন্ত্রণাদায়ক পীড়া ভোগ করিয়া কেবল মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইংরাজ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বহু লোক যোগদান করিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া অতি অতি সামান্য লোক পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

কেশবের শেষ দিন

কেশবচন্দ্রের চরিত্র কিরূপ মহৎ ও উদার ছিল, তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দুই একটি পত্রের লিখিত অংশ হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"আমার জীবনে বঙ্গভূমি মধ্যে তোমার অপেক্ষা বিশুদ্ধ, পবিত্র ও মহৎ ব্যক্তি আমি দেখি নাই। বিশুদ্ধতার সঙ্গে ঘৃণাভাব কখনই থাকিতে পারে না। অতএব তোমাকে আমি কখনই ঘৃণা করিতে পারি না। বিশেষতঃ তোমার হৃদয়ে যখন পবিত্রস্বরূপ বাস করিতেছেন।"

কেশবের চরিত্র-আলোচনা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কেশবের মধ্যে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল যে, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ধর্ম্মবিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায়ে সুপণ্ডিত ব্যক্তিরও চমৎকার বোধ হইত। যে কোন প্রকারের যতই কঠিন হউক না কেন, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করিবামাত্র অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক কেশবচন্দ্র তদ্দণ্ডে নিজ স্বভাবসুলভ সরলভাবে ও সরল ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন।"

কেশবের প্রতিভা

কেশবচন্দ্রের মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ—মাতৃ-আজ্ঞা ছিল তাঁহার শিরোধার্য্য। কেশবচন্দ্র একদিন রোগ যন্ত্রণায় খুব অস্থির হইয়াছিলেন; তখন তাঁহার মা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"কেশব, আমি কি পাপ করিয়াছি জানি না, তাহাতেই বুঝি তুমি এত কষ্ট পাইতেছ।" এই কথা শুনিয়া সেই কষ্টের মধ্যেও তিনি বলিয়াছিলেন,—'না মা, তুমি আমার বড় ভাল মা, এ রকম মা কে পায়, আমার যা কিছু ভাল সব তোমার কাছ থেকে পেয়েছি।' এই বলিয়া মাতার পায়ের ধূলা মাথায় নিলেন।

ভদ্রব্যবহার, বিনয় ও মহানুভবতা তাঁহার অঙ্গ ছিল। ক্ষমা ছিল তাঁহার চরিত্রের ভূষণ। একবার কেশবচন্দ্রের একজন ভৃত্য কোন জিনিস চুরি করিয়া ধরা পড়িলে সকলে তাহাকে পুলিশের হাতে দেওয়া

স্থির করিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র শান্তভাবে তাহার হাত ধরিয়া দেবালয়ে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে তাহার জন্য প্রার্থনা করিলেন। সে অনুতপ্ত হইয়া দোষ স্বীকার করিল। কেশবচন্দ্র তাহাকে কোন দণ্ডই প্রদান করিলেন না। অর্থের অভাবে এইরূপ করিয়াছে মনে ভাবিয়া তাহার বেতন বাড়াইয়া দিলেন এবং গৃহ কার্য্যের বিশেষ ভার তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। এই সময় হইতে ঐ চাকর আর কোনও দুষ্কার্য্য করে নাই।

এইরূপ নানা মহত্ত্বের ভাবে কেশবচন্দ্রর হৃদয় পূর্ণ ছিল।

কেশবচন্দ্রের হস্তাক্ষর—বাংলা



পরমকল্যাণীয় —

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার রাজরাজেন্দ্র ভূপ বাহাদুর —

শুভাশীর্ব্বাদ।

আগামী কল্য ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে তুমি আমার ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবে। বৃদ্ধ মাতামহের সঙ্গে কিঞ্চিৎ অন্ন খাইয়া এবং সকলের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিয়া গৃহ মাতাইবে। তুমি

সুনীতিনন্দন হৃদয়রঞ্জন।
নৃপেন্দ্রনন্দন নয়নঅঞ্জন॥
প্রসন্ন বদন মধুর গঠন।
প্রাণ ভূষণ মোহন দর্শন॥

এখানে আসিলে 'পাপা' ডিম, চপ, কুস্তি, কুশন, বড় মজার ব্যাপার: নাম সুন্দর খালি কাড়িও না বিদ্যা বুদ্ধি বাড়াইয়া সকলকে সুখী করিবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, কিছু মনে করিবে না। আমাদের ভালবাসা জানিবে এবং একটী Kiss hand শীঘ্র পাঠাইয়া দিবে।

চির শুভাকাঙ্ক্ষী
মাতামহ

কেশবচন্দ্রের হস্তাক্ষর—ইংরাজী



Calcutta
27 September 1882.

My dear Nathuram,

You should have been with us during our dramatic festivities. It is quite a new festival. On the stage we play and glorify our Maker, and joy is great. The stage has become a very Temple of the Lord where the devotees joyfully worship and serve Him in a novel style. Men ridicule the idea for they comprehend it not,— it is so vast. To sanctify our very amusements and entertainments with the touch of the Holy Spirit, to purify the stage hitherto a source of impurity and scandal is indeed a blessed work. Have you made any progress towards securing a house for the Himalayan Mandir? Are you going to carry out the idea of laying the foundation stone this season? When are you coming down to Calcutta?

I hear there has been some fresh trouble again in the Punjab Brahmo Somaj. How would you put an end to it?

With best wishes

Yours affly
Keshub



জল



জল 'পঞ্চভূতের' অন্যতম। গ্রীসদেশেও প্রাচীন কালে জলকে একটি মূল পদার্থ বলিয়া ধরা হইত। ভারতবর্ষেও জল জীবনরক্ষার একটি প্রধান সহায়ক মঙ্গলময় দেবতা বলিয়া বন্দিত হইত।

পঞ্চভূত কথাটির প্রাথমিক অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। জলকে তরলতার প্রতীক্ বলিয়া ধরা হইত। কালে কথাটির অপব্যাখ্যায় ইহা মৌলিক পদার্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ

মৌলিক পদার্থ,রাসায়নিক সহস্র প্রক্রিয়াতেও নিজের ভিতর হইতে দুই বা ততোধিক পদার্থ বাহির করিয়া দেয় না। কিন্তু, যে বস্তু মিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাকে যৌগিক পদার্থ বলে। মিশ্র ও যৌগিক পদার্থের প্রভেদ এই যে, মিশ্রপদার্থ রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যতিরেকে সহজেই তাহার ভিতরকার বস্তুগুলি বাহির করিয়া দেয়। বালুকা ও শর্করার মিশ্রণ হইতে সহজেই জলের সাহায্যে চিনি দ্রবীভূত করিয়া ছাঁকিয়া, বালুকা চিনি হইতে পৃথক্ করা যায়। আবার, অগ্নিতাপে বা অন্যবিধ উপায়ে, শর্করা-দ্রব হইতে, শর্করাও পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া যায়। কাজেই, এইরূপ মিলনকে মিশ্রণ কহে। যৌগিক পদার্থ হইতে ভিতরকার বস্তু এত সহজে পাওয়া যায় না।

শীল, প্রীষ্টলি, ওয়ার্ল টায়ার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অনেকেই হাইড্রোজেন অক্সিজেনে জ্বালাইয়াছেন ও তাহা কিরূপভাবে জ্বলে, তাহা দেখিয়াছেন। এই দহনে যে জলের উৎপত্তি হয়, তাহা বোধ হয় ওয়ার্ল টায়ার পরীক্ষাদ্বারা সামান্য একটু বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু মনীষী ক্যাভেণ্ডিসেরই নয়নপথে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে ধরা পড়ে। কতটা হাইড্রোজেন কতটা অক্সিজেনের সংযোগে লোপপ্রাপ্ত হয়, পরীক্ষার পর পরীক্ষায় তিনি তাহাও নির্ণয় করেন। তবে জলের সৃষ্টি-কৌশলটি তিনিও ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। সেই সময়কার রীতি অনুসারে তিনি হাইড্রোজেনে জলকণা বর্ত্তমান ছিল, এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার সহকর্মীর নিকট, মনীষী ল্যাভোশিয়ে (Lavoisier) এই পরীক্ষাটির বিষয় অবগত হইয়া, নিজে পুনরায় এই পরীক্ষাটি করেন ও নিজের বুদ্ধিবলে তাহার সত্য-ব্যাখ্যাটি বাহির করেন। ব্যাখ্যার কথা ছাড়িয়া দিলে, ক্যাভেণ্ডিস্‌কে পরীক্ষাগারে জলসৃষ্টির আবিষ্কারক বলিতে হইবে। কিন্তু ল্যাভোশিয়েই জলের যৌগিক তত্ত্বের সত্য ব্যাখ্যাতা।

জলের যৌগিকতত্ত্বের আবিষ্কার

জল যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগ-বস্তু—মৌলিক পদার্থ নহে, ইহা ল্যাভোশিয়ে ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করেন। মনীষী ল্যাভোশিয়ে রসায়ন-ভাণ্ডারে কত যে দান করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই জন্য তাঁহাকে 'নব্য রসায়ন শাস্ত্রের জনক' বলা হয় ও ফরাসীরা রসায়নশাস্ত্রকে ফরাসী শাস্ত্র বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ফরাসী দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ক্ষিপ্ত

ফরাসীরা, 'আমাদের দেশে পণ্ডিতের দরকার নাই' বলিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল।

একটি বোতলের ভিতর হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ভরিয়া, বৈদ্যুতিক অগ্নিকণায় তাহা জ্বালাইয়া লুপ্ত করিয়া, বোতলের ভিতরকার গায়ে, ক্যাভেণ্ডিস কুয়াসার মত জলকণা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

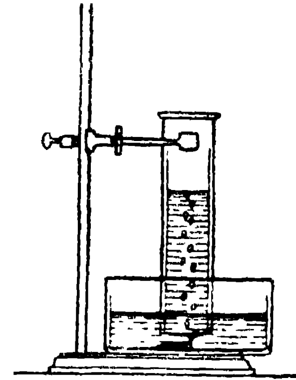
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগ পরিমাণ, রসায়ন শাস্ত্রে একটি বিশেষ কারণে পরম প্রয়োজনীয় জলে তথা বলিয়া ডুমা, মর্লি প্রভৃতি হাইড্রোজেন পরীক্ষা কুশলীগণ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম- ও অক্সিজেনের তর ভাবে তাহা নির্দ্দেশ করিতে পরিমাণ চেষ্টা করিয়াছেন। আরও অভ্রান্ত ভাবে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা এখনও মাঝে মাঝে হইয়া থাকে। ওজনের হিসাবে, একভাগ হাইড্রোজেন ও আট ভাগ অক্সিজেন বা আয়তন হিসাবে এক ভাগ হাইড্রোজেন ও দুইভাগ অক্সিজেন, মোটামুটি ভাবে এইরূপ ধরিয়া সংযুক্ত করিলে জলের সৃষ্টি হয়।

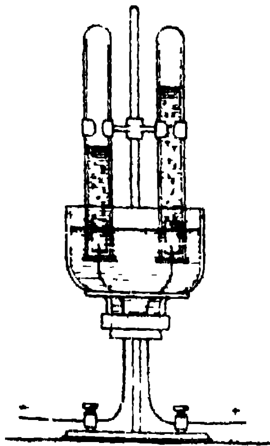
আমাদের শরীরে বহু পদার্থে হাইড্রোজেন আছে ও তাহার দহনক্রিয়া অনবরতঃই চলিতেছে। এইজন্য প্রশ্বাসে আমরা বাষ্প পাই। বায়ু প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। জল যে মিশ্রণ নহে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কারণ, মিশ্র পদার্থ হইলে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকায়, ইহা যুগপৎ দাহ্য ও দাহক হইত। কিন্তু ইহা মোটেই দাহ্য ও দাহক নহে।

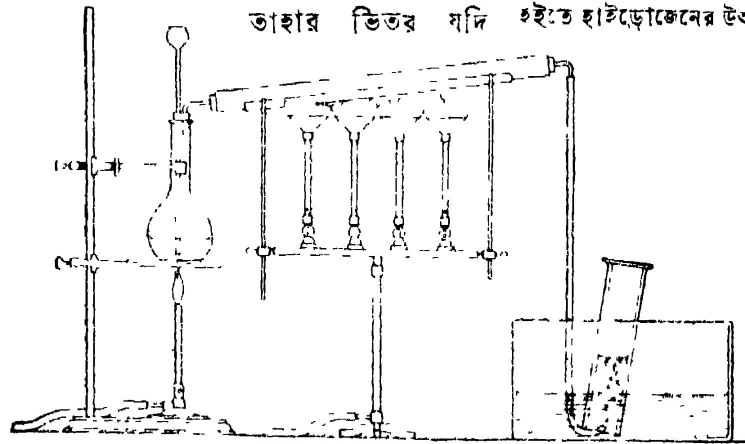
জলের যৌগিক প্রকৃতি বিশ্লেষণের দ্বারাও প্রমাণ করা যায়। জলে সামান্য অম্লরস দিয়া তাহাতে বিদ্যুৎযন্ত্রের দুইটি তার ডুবাইলে, সে তার-দুইটির মুখে, একটি হইতে হাইড্রোজেন ও অন্যটি হইতে অক্সিজেন বাহির হইতে থাকে। যে যন্ত্রে এই ক্রিয়াটি করা হয়, তাহার ছবি দেওয়া হইল। ছবিতে দেখিবে যে, পাত্রটির তলদেশ দিয়া দুইটি বৈদ্যুতিক তার প্রবেশ করিয়াছে ও দুইটি দণ্ডায়মান চোঙ্গে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন জমা হইতেছে। আয়তন হিসাবে দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন পাওয়া যায়। জলের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ ভাল করিয়া চলে না, সেই জন্য তাহাতে সামান্য অম্লরস দেওয়া হয়।

উপরিউক্ত বিবিধ পরীক্ষার ফলে জলকে রাসায়নিকগণ H_2O অর্থাৎ হা$_2$অ লেখেন। ইহা একরূপ সাঙ্কেতিক লিখন। ইহার অর্থ যে, জলের অণুগুলিতে ২পরমাণু হাইড্রোজেন ও ১পরমাণু অক্সিজেন আছে।

জলে যে হাইড্রোজেন যৌগিক ভাবে আছে, তাহা, কয়েকটি ধাতুর উপর তাহার ক্রিয়ায় দেখাইতে পারা যায়। জলে একখণ্ড সোডিয়ম ধাতু ফেলিলে, এই ধাতুটি তীব্রবেগে হাইড্রোজেনকে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেয়। আরও কয়েকটি ধাতু এইরূপ করিতে পারে। একটি লোহের নলের ভিতরে কিছু লোহখণ্ড উত্তপ্ত রক্ত বর্ণ করিয়া, তাহার ভিতর যদি


জলে সোডিয়ম ফেলিলে জল হইতে হাইড্রোজেনের উৎপত্তি


বৈদ্যুতিক তার দুইটি দিয়া একটি চোঙ্গে হাইড্রোজেন ও অন্য একটি চোঙ্গে অক্সিজেন জমা হইতেছে


উত্তপ্ত লোহখণ্ডের ভিতর দিয়া জলীয় বাষ্প চালিত করিয়া জল হইতে হাইড্রোজেন বাহির করা যায়

জলীয় বাষ্প চালিত করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ লৌহের দ্বারা জল হইতে হাইড্রোজেন বাহির করিতে পারা যায়।

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ জ্বালাইলে ভীষণ তেজের সহিত জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হয়। ইহাতে প্রভূত উত্তাপ নির্গত হয় ও এই উত্তাপে জলীয় বাষ্প সহসা এত বর্দ্ধিত আয়তন হইয়া পড়ে যে, চতুর্দ্দিকে বায়ুকণার ভীষণ ঠেলাঠেলি পড়িয়া যায়। আমরা তাই এই সংযোগে বোমার ন্যায় শব্দ শুনি। হাইড্রোজেন বাতাসে জ্বালাইলে ও শিখার একটু উপরে একটি শীতল পাত্র ধরিলে, পাত্রটির গায়ে জল জমিতেছে দেখা যাইবে।

হাইড্রোজেন আজকাল অনেক ব্যাবসায়িক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার উৎপাদনের নানাবিধ উপায়ের ভিতর জল হইতে উৎপাদনও একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

জলীয় বাষ্প, তীব্র উত্তাপে পুনরায় কথঞ্চিৎ পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

জলের রাসায়নিক ক্রিয়া

অনেক বস্তুর সহিতই জলের রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। তাজা চূণ জলে দিলে তাহা ফুটিয়া উঠে। জলে গন্ধকদ্রাবক মিশাইলে, মিশ্রণটি উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তুঁতে, সোডা প্রভৃতি লবণ-জাতীয় অনেক বস্তু জলে পুনরায় তাহাদের নিজস্ব অম্ল ও ক্ষারে বিশ্লেষিত হইয়া পড়ে।

অনেক রাসায়নিক স্ফটিকে জল সংযুক্ত থাকে। যথা—ফটকিরি, তুঁতে, হীরাকস প্রভৃতি। সংযুক্ত কথাটির অর্থ এই যে, এই স্ফটিকগুলি আর্দ্র নহে। অথচ ইহাদের ভিতর জলের পরমাণুগুলি আছে। এইরূপ সংঘটনকে মিশ্রণ না বলিয়া সংযুক্ত অবস্থা বলা হয়। এই স্ফটিকগুলিকে উত্তপ্ত করিলে জল বাহির হইতেথাকে ও জল বিযুক্ত হইবামাত্র ইহাদের স্ফটিকত্ব ঘুচিয়া যায়—ইহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়ে। রঙ্গীন স্ফটিকগুলির বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—নীল তুঁতে শ্বেতবর্ণ হইয়া পড়ে। কোবাল্ট ক্লোরাইড নামক একটি বস্তুর দব, ফিকা গোলাপী বর্ণের। ইহার দ্বারা কোনও কাগজে কিছু লিখিলে, লেখাটি শুষ্ক হইলে অত্যন্ত ফিকা হওয়ায় তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু কাগজখানি একটু গরম করিলেই ঘোর নীলবর্ণে লেখাটি ফুটিয়া উঠে। কোবাল্ট, ক্লোরাইড স্ফটিকের জল বিযুক্ত হওয়ায় এইরূপ বর্ণান্তর প্রাপ্তি ঘটে।

জলের রাসায়নিক ক্রিয়া সম্বন্ধে তোমরা যখন বড় বড় রসায়নের পুস্তক পড়িবে, তখন সে বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারিবে।

জলের যাহা সাধারণ ব্যবহার, তাহার সম্বন্ধে এখনও আমরা বিশেষ কিছু বলি নাই। এইবার সে-সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বিশুদ্ধ জল পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। কারণ, জল একটি মহাদ্রাবক। ইহা সকল বস্তুই কিছু না কিছু দ্রবীভূত করে। কাজেই, যাহাতে

দ্রাবক

রাখ না কেন, তাহাতে তাহার দুই চার কণা দ্রবীভূত হইবেই। যতই সাবধান হওয়া যাউক না কেন, বাতাসের স্পর্শ ত এড়াইতে পারা যায় না। কাজেই, বাতাসও কিছু না কিছু ইহাতে দ্রবীভূত থাকিবে। মাছেরা এই দ্রবীভূত বাতাস শ্বাসগ্রহণে ব্যবহার করে।

সোডাওয়াটার

জলে অনেক গ্যাস প্রভূত পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। যথা অ্যামোনিয়া, লবণাম্ল ইত্যাদি। চাপের দ্বারা ইহাতে বেশী পরিমাণে গ্যাস দ্রবীভূত করা যায়। সোডাওয়াটার, লিমনেড প্রভৃতি বায়ুপূরিত জল এইরূপে প্রস্তুত করা হয়। অঙ্গারাম্ল গ্যাস চাপের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের সরবতে ইচ্ছামত পরিমাণে দ্রবীভূত করাইয়া সুদৃঢ় বোতলে বন্ধ অবস্থায় রক্ষিত হয়। বোতলের মুখ টিনের ছিপি বা কাচের গুলিতে বন্ধ রাখা যায়। মুখ খুলিলেই গ্যাসের আধিক্য বোতলের জল ফেনায়মান করিয়া বাহির হইয়া আসে।

যে সকল বস্তু জলে অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত হয়, তাহাদের সহিত জলের অধিক পরিমাণে আকর্ষণ আছে, বলিতে হইবে। জলে ও সুরাসারে যথেষ্ট আকর্ষণ আছে, কিন্তু জলে তৈলে সেরূপ নাই। জল গরম করিলে, তাহাতে পদার্থ সকল আরও অধিক পরিমাণে ও ত্বরিতগতিতে দ্রবীভূত হয়।

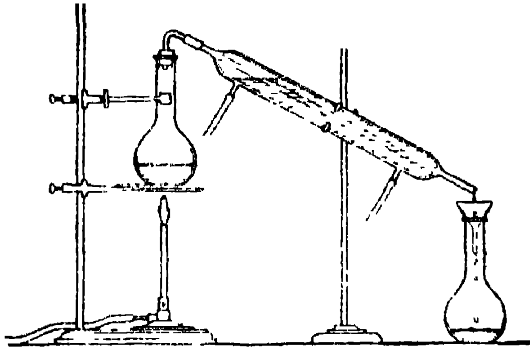
উত্তাপে দ্রাবকত্বের বৃদ্ধি

বিভিন্ন তাপাঙ্কের আপন আপন পরিমাণ আছে। উষ্ণ দ্রব শীতল হইলে দ্রবীভূত বস্তুর আধিক্য পুনরায় পৃথক হইয়া পড়ে ও যে সকল বস্তু দানা বাঁধিতে পারে, তাহারা প্রথমে

ছোট ছোট দানা হইয়া বাহির হয় ও পরে তাহা হইতে বড় বড় দানা হইতে থাকে। মিছরী, ফটকিরি প্রভৃতির দানা এইরূপে প্রস্তুত হয়।

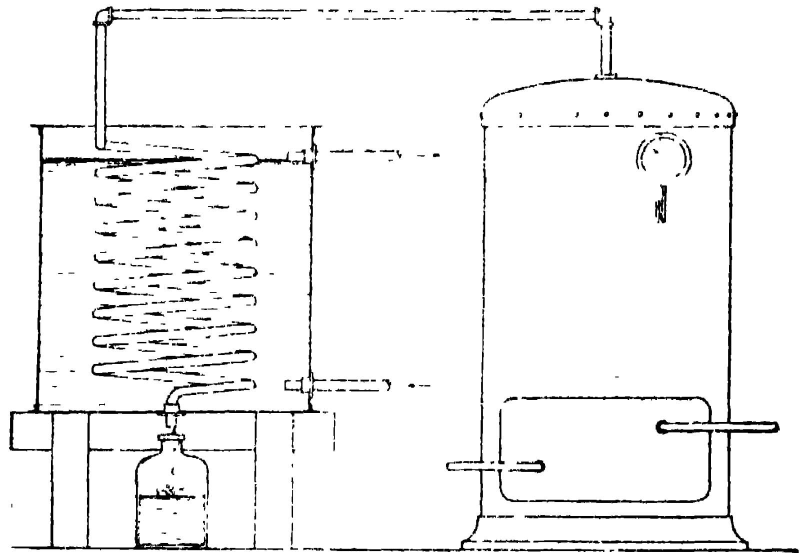
গরম জলে ধৌত করিলে দ্রব্যাদি শীঘ্র পরিষ্কৃত হইয়া যায়। তাহাও উপরিউক্ত কারণে অর্থাৎ গরম জলে ক্লেদাদি বস্তু সমূহের বেশী দ্রবীভূত হইয়া যাওয়ার জন্য হয়।

নিখুঁত বিশুদ্ধ জল যখন পাওয়া যায় না, তখন রসায়ন কার্য্যের জন্য পরিস্রুত জলকেই



জল পরিস্রুত হইতেছে

আমরা বিশুদ্ধ জল বলি। পরিস্রুত করা প্রক্রিয়াটি কিরূপে সাধিত হয় তাহা ছবি হইতে বুঝিতে পারিবে। ঘট হইতে বাষ্প ঢালু অবস্থায় অবস্থিত চোঙ্গটির ভিতর প্রবেশ করে। শীতল জলে চোঙ্গটি শীতল থাকায় প্রবিষ্ট বাষ্প জমিয়া জল হইয়া বাহিরের পাত্রটিতে আসিয়া পড়ে। এই বাষ্পোৎপন্ন জলকে পরিস্রুত জল বলে। ইহা খাইতে বিস্বাদ। আমাদের সাধারণ জলে বায়ু ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দ্রবীভূত থাকায়, তাহা খাইতে মিষ্ট লাগে, নতুবা জলের নাকি কোনও স্বাদ নাই। বহুবিধ কার্য্যে প্রভূত পরিমাণে চোয়ান বা পরিস্রুত জল ব্যবহৃত হয়। বহৎ পরিমাণে জল চোয়াইবার একটি যন্ত্রের ছবি দেওয়া গেল। অর্ণবপোতে প্রয়োজন হইলে, সমুদ্রজল পরিস্রুত করিয়া ব্যবহৃত হয়।



এই যন্ত্র দ্বারা অর্ণবপোতে সমুদ্রজল পরিস্রুত করা হয়

প্রাকৃতিক জল

প্রাকৃতিক জল ন্যূনাধিক অবিশুদ্ধ। ইহাকে সাধারণতঃ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা বৃষ্টির জল, নদী, উৎস ও কূপের জল, খনিজ জল, সমুদ্র জল ইত্যাদি। ভাসমান ও দ্রবীভূত, এই দুই প্রকারের অবিশুদ্ধতা জলে থাকে। কাদা, বালি প্রভৃতি ভাসমান পদার্থ ছাঁকিয়া পৃথক করা যায় কিন্তু দ্রবীভূত অবিশুদ্ধতা হইতে মুক্ত করিতে হইলে, জল অন্ততঃ পরিস্রুত করা দরকার। তাহাতেও জল সম্পূর্ণরূপ বিশুদ্ধ হয় না, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

বৃষ্টির জল অনেকটা পরিস্রুত জলের মত। তবে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে লবণ কণা, নগরে ধূমকণা ও গন্ধক নাইট্রোজেনের বিভিন্ন পদার্থ সমূহ এই জলে পাওয়া যায়। বায়ু ও অঙ্গারাম্ল ত থাকেই। বজ্রপাতাদি অবস্থায় যবক্ষারাম্ল ইত্যাদি পদার্থও পাওয়া যায়।

নদীর জল

নদীর জল মোটেই বিশুদ্ধ নয়। তাহাতে যে কত রকমের জৈবিক ও অজৈবিক ভাসমান ও দ্রবীভূত পদার্থ ও কত প্রকারের জীবাণু থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পর্ব্বত ও বিভিন্ন প্রদেশের ভিতর দিয়া যাওয়ায়, এই সকল স্থানের বহুবিধ বস্তু উহাতে আসিয়া পড়ে। পর্ব্বত-অভ্যন্তরস্থ খড়িপ্রধান স্থানের সংস্পর্শে, বিশেষতঃ চাপ ও অঙ্গারাম্লের সংযোগে, এই জলে যথেষ্ট পরিমাণে খড়ি, রাসায়নিক

ক্রিয়ায় ক্যালসিয়ম বাইকার্বনেট রূপে দ্রবীভূত হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় জল যখন পর্ব্বত হইতে নির্গত হয়, তখন চাপ অন্তর্হিত হওয়ায়, সেই দ্রবীভূত খড়ির আধিক্য বাহির হইয়া পড়ে। গুহার ভিতর এইরূপে সুন্দর সুন্দর খড়ির স্তম্ভের সৃষ্টি হয়। গুহার ভিতর যে স্থান হইতে জল পড়ে ও যে স্থানের



ষ্টালাক্টাইটস্

উপর জল পড়ে, এ দুই স্থানেই খড়ি জমা হইতে থাকে ও একটি উপর হইতে নিম্নমুখী ও একটি নিম্ন স্থান হইতে ঊর্দ্ধমুখী স্তম্ভ গঠিত হয় ও ক্রমে ক্রমে তাহারা মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়।

খড়ির স্তম্ভ

এইরূপ স্তম্ভাংশ দুইটির নাম ষ্টালাক্টাইট্ ও ষ্টালাগমাইট (Stalactite & Stalagmite)।

প্রাকৃতিক উৎস, কূপ ও খনিজ জলেও বহুবিধ পদার্থ থাকে। ধরণীর বিভিন্ন স্তরে বর্ত্তমান খড়ি, লোহ, গন্ধক ইত্যাদি জাত বহুবিধ পদার্থ ইহাতে পাওয়া যায়। উপকারী বস্তু থাকিলে ইহা ঔষধের মত স্নান ও পানে ব্যবহৃত হয়।

উৎস বা গভীর কূপের জলে বীজাণু বড় পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা বলিয়া চক্ষু বুজিয়া সকল কূপের জল ব্যবহার করা উচিত নহে। অব্যবহৃত কূপের জল জীবাণু প্রভৃতির দ্বারা দূষিত হইয়া উঠে।

দূষিত কূপ

এই সকল বস্তু উপর হইতে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। পাড়ে বসিয়া মলিন বা রোগবীজাণু-সংক্রামিত বস্ত্রাদি ধৌত করিলে, সেই জলের ছিটা ফোঁটার দ্বারাও কূপ-জলে রোগবীজ সংক্রামিত হইয়া উঠে। নিকটে আবর্জ্জনাপূর্ণ গর্ত্তাদি থাকিলে, মাটির ও কূপ-গাত্রের ফাটল দিয়াও বীজাণু জলে আসিয়া পড়িতে পারে।

আমাদের দেশে পুষ্করিণীর বহুল প্রচলন। যত্ন না লইলে ইহাও পঙ্কিল ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। যে সকল কারণে কূপ-জল দূষিত হয়, পুষ্করিণীর জল সম্বন্ধে তাহারা ত আছেই, বরং অধিক পরিমাণে আছে, বলিতে হইবে। আমাদের গ্রামের ডোবাগুলি ত নরককুণ্ডের মত। সকল প্রকার দূষিত পদার্থ জানিয়া শুনিয়া তাহাতে সর্ব্বদা ফেলা হইতেছে।

পুষ্করিণী

নদীর পরে সমুদ্র। নদীতে যাহা কিছু থাকে, সমুদ্রে তাহা যাইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া সমুদ্রে লবণ ত আছেই। এই জলের শতকরা ৩৩ ভাগ লবণজাতীয় পদার্থ, যাহার ভিতর ২৫ ভাগ খাইবার লবণ।

সমুদ্র

সমুদ্রে কত লবণ আছে ও প্রতি বৎসরে কতটা লবণ নদীবাহিত হইয়া তাহাতে প্রবেশ করে, তাহা হইতে সমুদ্রের কত বয়স হইল, বৈজ্ঞানিকের মোটামুটি বাহির করিতে পারেন। সমুদ্রের গভীরতা কোথাও কোথাও, এমন কি ছয় মাইল পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে নাকি ৩২৪ কোটি ঘন মাইল জল আছে। সমুদ্রের তলদেশেও জলচর জন্তু বাস করে। ভাবিয়া দেখ, কি গভীর চাপেও তাহারা বাঁচিয়া থাকে।

এখন আমরা সাধারণ জলের বিষয় আরও কিছু আলোচনা করিব। খাইবার লবণ ছাড়া ক্যালসিয়ম বাইকার্বনেট, ম্যাগনিসিয়ম সাল্‌ফেট প্রভৃতি লবণজাতীয় অন্যান্য বস্তুও জলে থাকিতে পারে। সাবান লবণহীন বা মাত্র খাইবার লবণযুক্ত জলে ঘষিলে বেশ ফেনা উৎপাদন করে। কিন্তু অন্যান্য লবণজাতীয় বস্তুযুক্ত জলে ফেনা দেয় না। তৎপরিবর্ত্তে খানিকটা ময়লাটে পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইহা উক্ত লবণ ও সাবানের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্তু। যতক্ষণ না উক্ত লবণ নিঃশেষিত হইয়া যায়, ততক্ষণ ফেনা উৎপন্ন হয় না। খাইবার লবণ ছাড়া অন্য লবণযুক্ত জলকে "শক্ত" জল কহে।

"শক্ত" জল

কারণ, তাহা হইতে ফেনা পাওয়া শক্ত ব্যাপার।

বাইকার্বনেটজাতীয় লবণ জলে থাকিলে সেই জলকে "সাময়িক শক্ত" জল বলে। কারণ, তাহা ফুটাইলে বা তাহাতে পরিমিত পরিমাণ চূণ মিশাইলে, বাইকার্বনেট ভাঙ্গিয়া খড়ি বা তদ্রূপ বস্তু হইয়া থিতাইয়া যায়। এইবার ছাঁকিয়া লইলে যে জল পাওয়া যায়, তাহাতে আর সাবানের কোনও অনিষ্ট হয় না।

ম্যাগনিসিয়ম সালফেট বা তজ্জাতীয় লবণ থাকিলে, তাহাকে "স্থায়ী শক্ত" জল বলে। চোওয়াইয়া অথবা বিশেষরূপ রাসায়নিক উপায়ে ইহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

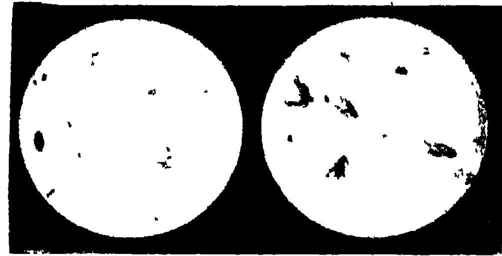
শক্ত জল শুধু যে কাপড় কাচার পক্ষে অসুবিধাকর, তাহা নহে, ইহা এঞ্জিনের পক্ষেও হানিকর। কারণ ইহার ব্যবহারে এঞ্জিনের বাষ্পাধারে (boiler) স্তর পড়িতে থাকে। এজন্য এঞ্জিনে বাষ্প প্রস্তুত করিতে অত্যধিক কয়লার খরচ হয়। কারণ ঐ স্তরের ভিতর দিয়া তাপ ভাল করিয়া ভিতরে আসিতে পারে না। সময়ে সময়ে ঐ স্তরগুলির বিদ্যমানতা বিপজ্জনকও হয়। আরও বহুবিধ কার্য্যেও এরূপ জল অনিষ্টকর, যথা, চিনি, রং ও তুলা হইতে বস্ত্র প্রস্তুতের কারখানায় ইহা পরিত্যক্ত হয়।

লোহের আধিক্য থাকিলেও সে জল পানানুপযোগী হয়। ক্ষার জলও অহিতকর, ঐরূপ জলে বৃক্ষ লতাদি মোটেই বাঁচিতে পারে না। ধাতুর উপর জলের বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়া হয়। সীসকের পাইপে বিশুদ্ধ জল সীসক সংঘটনে বিষাক্ত হইয়া উঠে।

আমরা সাধারণতঃ যাহাকে ভাল জল বলি, তাহা বিশুদ্ধ কি না, তাহা বিচার করিয়া বলি না; তাহা খাইবার পক্ষে অহিতকর ভাল জল না হইলেও, তাহাকে সাধারণ কথায় "ভাল জল" আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

পানীয় জল দূষিত কি না, তাহা দেখিবার জন্য, প্রথমত তাহাতে জৈবিক কোনও বস্তু আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে। জৈবিক পদার্থ থাকিলে তাহাতে লবণের আধিক্য ও নাইট্রাইট নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়া সংক্রান্ত বস্তুসমূহ থাকিবে এবং তাহা পটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেটের মাত্র এক আধ ফোঁটায় রক্তিম হইয়া উঠিবে না। জীবজন্তুর মলমূত্রে লবণের আধিক্য থাকে ও এই সকল বস্তু পচিয়া নাইট্রেট, নাইট্রাইট ও অ্যামোনিয়া সংক্রান্ত বস্তুসমূহ প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে জৈবিক পদার্থ থাকায় তাহা পারম্যাঙ্গানেট হজম করিয়া ফেলে।

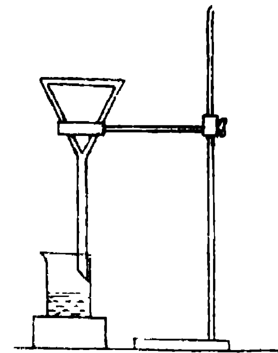
তাহার পর, উপরিউক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জলে রোগ-বীজাণু আছে কি না, দেখিতে হইবে। ইহারা এতই সূক্ষ্ম যে, উপরিউক্ত রাসায়নিক পরী-



টাইফয়েড রোগ-বীজাণু

ক্ষায় ইহারা ঠিক ধরা পড়ে না। অনেক রোগ জলের দ্বারা সংক্রামিত হয়। যথা—কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি। এই সকল রোগীর মলমূত্র, নিষ্টীবনাদি জলে ফেলিলে বা মক্ষিকাদি দ্বারা বাহিত হইয়া জলে প্রবেশ লাভ করিলে, সেই জলে ঐ রোগ সমূহের বীজাণু বাহিত হইয়া পড়ে। ঐ জল ব্যবহারে রোগ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই জন্য রোগীর মলমূত্রাদির বিষয়ে খুবই সাবধান থাকা উচিত। মক্ষিকা বসিবার পূর্ব্বে ইহা ঔষধাদির দ্বারা ধ্বংস করিয়া ফেলা কর্তব্য।

পানীয় জল প্রথমতঃ ছাঁকিয়া লওয়া দরকার। ময়লা জল কেহই পান করিতে চাহে না। ব্লটিং বা ছাঁকিবার কাগজে জল ছাঁকা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া ছাঁকিবার অনেকগুলি উপায় আছে—যাহাতে শুধু কর্দ্দম দূর হয়, তাহা নহে, রোগ-বীজাণু হইতেও সেই জল অনেকটা মুক্তি লাভ করে। অনেক প্রাচীনরা এখনও ক্ষুদ্র একখণ্ড ফটকিরি ফেলিয়া জল থিতাইয়া লন। ইহাতে



জল ছাঁকিবার যন্ত্র

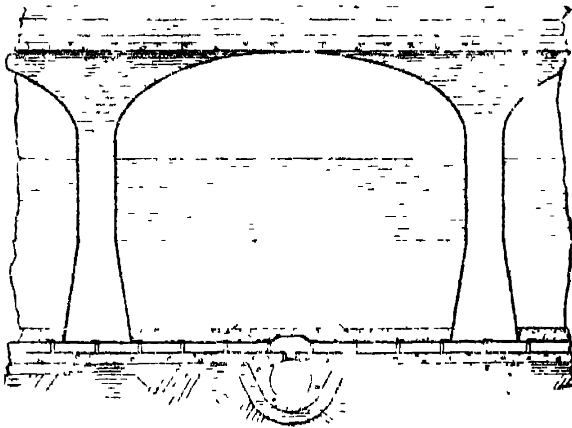
কর্দম ধীরে ধীরে থিতাইয়া যায় ও তাহার সহিত অনেক রোগবীজাণুও নীচে থিতাইয়া পড়ে। পরে উপরকার স্বচ্ছ জল বাহির করিয়া লওয়া হয়। সামান্য মাত্রই ফটকিরি ব্যবহার হয়, অধিক পরিমাণে ইহা অনিষ্টকর হয় ও জল অব্যবহার্য্য করিয়া দেয়।

বালি ও কয়লা দিয়া জল পরিষ্কারের বিষয় তোমরা স্বাস্থ্যপাঠে পড়িয়া থাকিবে। অনেক ছোট ষ্টেশনে দেখিয়া থাকিবে যে, কাঠের মঞ্চে উপর্য্যুপরি চারটি ঘড়া রাখা হইয়াছে। ইহাদের তিনটি উপরের ঘড়ায় তলদেশে ছিদ্র করিয়া পলিতা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও মাঝের দুইটি ঘড়ার, একটিতে কয়লা ও অন্যটিতে বালি রাখা হইয়াছে। উপরের ঘড়াটিতে জল ভরিয়া দিলে ক্রমে চুইয়া চুইয়া সব নিম্ন ঘড়াটিতে স্বচ্ছ জল জমা হয়। ঘড়াগুলির কয়লা ও বালি মাঝে মাঝে বদলাইয়া ফেলা হয়। কারণ, তাহা না হইলে ইহারা শীঘ্রই ক্লেদ ও বীজাণুপূর্ণ হইয়া পড়ে ও নীচের ঘড়ায় ঐ সকল দ্রব্য চুইয়া আসে।

জল পরিষ্কার করা

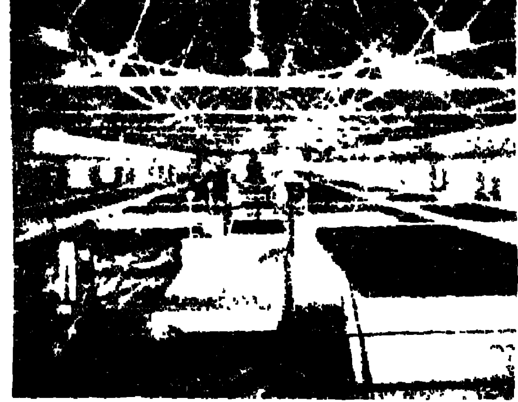
অনেক বিলাতী দোকানে, চিনেমাটির সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত নলের মত ছাঁকনী যন্ত্র বিক্রীত হয়। তাহাতেও বীজাণু শূন্য জল পাওয়া যায়, তবে মাঝে মাঝে নলটিকে পরিষ্কার করা চাই।

সহরের "কলের জল" ঐরূপ বালি ও ফটকিরি জাতীয় লবণের দ্বারা পরিষ্কৃত। গাত্রে ছিদ্রবিশিষ্ট



জল বিশোধনের কারখানা

বড় বড় নলের উপর এক প্রস্থ বড় বড় ঘুটিং রাখা হয়, তাহার উপর ছোট ঘুটিং ও তাহার উপর বালি সাজাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ সমাবেশের উপর জল রাখিলে তাহা পরিষ্কৃত হইয়া নলগুলির ভিতর যাইতে থাকে। জল সরবরাহের কারখানার তলায় এইরূপ নলের সমাবেশযুক্ত অনেকগুলি পুষ্করিণী থাকে।



জল বিশোধনের আধুনিক কারখানা

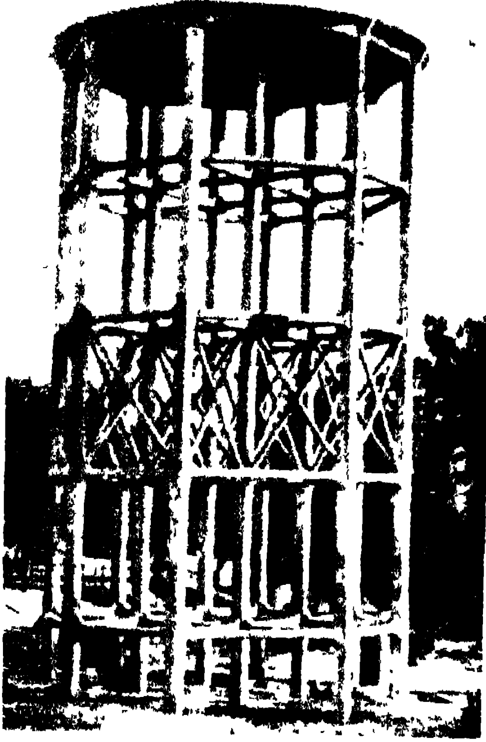
ছাঁকনী-পুষ্করিণীতে জল আনিবার পূর্ব্বে তাহাকে অনেক স্থলে অন্য একটি পুষ্করিণীতে ফটকিরি বা ঐ জাতীয় লবণযুক্ত করিয়া রাখা হয়। ফটকিরির গুণে ঐখানেই ইহা বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়। পরে ছাঁকনী-পুষ্করিণীগুলিতে আরও নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করা হয়।

কিছুদিন পরেই, ব্যবহৃত পুষ্করিণীগুলির বালি ও ঘুটিং তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় ও সেই সময় পালাক্রমে অপর পুষ্করিণীগুলি ব্যবহৃত হয়।

তাহার পর, জল সম্পূর্ণভাবে বীজাণুশূন্য হইল কিনা, তাহা রীতিমত পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজন বোধ করিলে জলে ক্লোরিণ প্রভৃতি বীজাণুনাশক ঔষধ দেওয়া হয়। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, ততক্ষণ ইহা সহরে পাঠান হয় না।

সহরে সরবরাহের জন্য প্রথমতঃ ইহা বিরাট পিচকারী সহযোগে, বিশেষ উর্দ্ধে অবস্থিত একটি অতিকায় চৌবাচ্চায় তোলা হয়। সহরে যতটা উর্দ্ধ পর্য্যন্ত জল চালাইবার কথা থাকে, তাহা হইতে এই চৌবাচ্চাটি উর্দ্ধে রাখা হয়। ইহা হইতে নল সহযোগে জল সহরের বিভিন্ন পথে ও তথা হইতে নল সহযোগে বাড়ি বাড়ি প্রেরিত হয়। জলের সমতলত্ব প্রাপ্তি প্রয়াসের জন্য, চৌবাচ্চা হইতে সহজেই সকল স্থানে জল যাইতে থাকে

ও বেশ জোরের সহিত তোমাদের বাড়ির কলের মুখ দিয়া বাহির হয়। যে সকল স্থানে জল সরবরাহের কারখানা আছে, তোমরা, তোমাদের



জল সরবরাহ কারখানার উচ্চে অবস্থিত জলাধার

শিক্ষক বা অভিভাবকগণের সহিত, যাইয়া কারখানার ব্যাপারগুলি বেশ করিয়া দেখিয়া আসিয়ো।

জলের রোগ-বীজাণু বেশ করিয়া মারিয়া ফেলিতে হইলে, ঔষধাদি ব্যবহার করিতে হয়। এই সকল কার্য্যে ক্লোরিন, ব্লিচিং পাউডার ও পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহৃত হয়। বেশ করিয়া ফুটাইয়া লইলেও রোগ-বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য জল ফুটাইয়া বা তাহাতে সামান্য পারম্যাঙ্গানেট দিয়া রঞ্জিত করিয়া খাইবার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। জৈবিক পদার্থের ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত জলে পারম্যাঙ্গানেটের রং খোলে না। তবে অধিক পরিমাণে কোন বস্তুই ব্যবহার্য্য নহে। কারণ এই ঔষধগুলির, শরীরের চর্ম্মের উপর প্রতিক্রিয়া আছে।

ঔষধাদির দ্বারা জীবাণুনাশ

আলোক ও বায়ুর সাহায্যেও অনেক বীজাণু ধ্বংস হয়। অনেক স্থলে জলের ভিতর দিয়া বাতাস বহাইয়া জলের দোষ নষ্ট করাইবার চেষ্টা করা হয়।

আলোক ও বায়ু

নদীর জল মলমূত্র ও জীবদেহ যোগে অনবরতই দূষিত হইতেছে। তবে তাহাতে স্রোত থাকায় ও মুক্ত আলোক এবং বাতাসের সাহায্য পাওয়ায় ইহার দোষ সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা কাটিয়া যাইতে থাকে।

পানীয় জল সম্বন্ধে তোমরা সর্ব্বদাই সাবধান থাকিবে। স্নান ও পানে কখনও দূষিত জল ব্যবহার করিবে না। জল যে আমাদের জীবন রক্ষা করে, শুধু তাহাই নহে, আমাদের ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, সকল বিষয়েই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমরা তাহার নিকট স্পর্শ অনুভব করি।



রবিন্সন্ ক্রুসো

[রবিন্সন্ ক্রুসো-র লেখক ডেনিয়েল ডিফো (Daniel Defoee) ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ডিফোর বাবা ছিলেন কশাই বা মাংস-বিক্রেতা। প্রথম জীবনে তিনি যাজক হইবার উপযোগী শিক্ষা লাভ করেন, কিন্তু তাহা তাঁহার ভাল না লাগায় তিনি নানাপ্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাহাতেও তেমন সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। সব ছাড়িয়া তিনি সাহিত্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ডিফো প্রায় বারটি বিভিন্ন ভাষা জানিতেন। ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তাঁহার লিখিত পুস্তকাবলির মধ্যে—'Essay on Projects' (১৬৯৭), 'The True Born Englishman' (১৭০১), 'The shortest way with the Dissenters'; 'Hymn to the Pillory,' 'The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York,' 'Mariner ......related by himself' ইত্যাদি প্রধান। রবিন্সন্ ক্রুসো ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরেই ডিফোর নাম চারিদিকে বিখ্যাত হইয়া পড়িল। তিন মাসের মধ্যে 'রবিন্সন্ ক্রুসো-র' তিনটি সংস্করণ বিক্রয় হইয়াছিল। এই গ্রন্থের এইরূপ সমাদর দেখিতে পাইয়া ডিফো রবিন্সন্ ক্রুসো-র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন—১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে ডিফোর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কেবল উপন্যাস এবং ঐতিহাসিক কাহিনীই রচনা করিতেন।

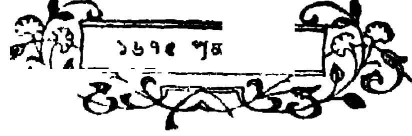

ডেনিয়েল ডিফো

'রবিন্সন্ ক্রুসো'র গল্পের প্রেরণা ডিফো পাইয়াছিলেন Alexander Selkirk এর জুয়ান ফার্নানদেজ্ (Juan Fernandez) দ্বীপের বর্জ্জন কাহিনী হইতে। Alexander Selkirk একাকী সেই নির্জ্জন দ্বীপে চারি বৎসর, চারি মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। সেই সামান্য কাহিনীর অনুসরণ করিয়াই ডিফো এই বিখ্যাত উপন্যাসখানি রচনা করেন। ডিফো নিজে Alexander Selkirk-এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সমালোচকেরা বলেন—On this slight foundation Defoe built his immortal Romance অর্থাৎ এই সামান্য কাহিনীটিকে অবলম্বন করিয়া ডিফো তাঁহার এই অতুলনীয় উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর প্রায় সমুদয় ভাষাতেই ইহা অনূদিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায়ও ইহার একাধিক সংস্করণ আছে।]

রবিন্সন্ ক্রুসো

[এক]

আমার সমুদ্র যাত্রা



ইয়র্ক শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম এবং সেখানেই আমি আমার বাবার সহিত বাস করিতাম। বাবা আমাকে নানারূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি যেন ভবিষ্যতে আইন-ব্যবসায় অবলম্বন করি। কিন্তু আমার নিজের জীবনের লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। কারণ, অতি অল্পবয়সেই আমি সমুদ্র যাত্রার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম। এই সসাগরা বিশাল পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া নূতন নূতন দেশের অধিবাসী ও বিচিত্র দৃশ্যাবলী দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় আমার মন এমনই আকুল হইয়া উঠিয়াছিল যে, কোনও কিছুতেই আমার সে সঙ্কল্পের পরিবর্তন ঘটাইতে পারিল না।

অবশেষে [illegible] খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে আমি আমার আত্মীয়-স্বজনের কাছ হইতে বিদায় লইয়া বন্দরে আসিয়া একখানি জাহাজে চড়িলাম। শুনিলাম, সে জাহাজখানি লণ্ডন অভিমুখে যাইবে।

বন্দর হইতে বাহির হইয়া অল্প কিছুদূর যাইতেই সমস্ত আকাশটি মেঘ জমিয়া কালো হইয়া উঠিল এবং বাতাস এমন জোরে বহিতে লাগিল ও গর্জ্জন করিতে লাগিল যে সমুদ্র বক্ষকে তোলপাড় করিয়া তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ উঠিল। আমি ইহার পূর্ব্বে আর কখনও সমুদ্র দেখি নাই। সুতরাং সমুদ্রের এরূপ রুদ্রলীলা দেখিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল এবং সমুদ্র-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আমি ভয়ে ও অসুস্থতায় একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। বাল্যে মনে মনে যে কল্পনার জাল বুনিয়াছিলাম, তাহা সেই নিমেষেই মিলাইয়া গেল, এবং বাড়ী ফিরিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু পরদিনই বাতাসের বেগ অনেকটা কমিয়া আসিল এবং তাহার পর কয়েকদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার রহিল। স্থির সমুদ্র দেখিয়া আবার আমি আমার পূর্ব্বেকার সাহস ফিরিয়া পাইয়াছিলাম।

ছয়দিন অবিশ্রাম গতিতে নীল জলরাশির উপর পাড়ি দিয়া জাহাজখানি ইয়ারমাউথ্ রোড্স্ নামক বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল। আমাদের আতঙ্কের শেষ কিন্তু তখনও হয় নাই ঐ বন্দর ছাড়িয়া যাত্রা করার অল্প কয়েকদিন পরেই আবার সমুদ্র-বক্ষে ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইল। আমি দেখিলাম যে, এবারকার ঝড়ে পড়িয়া সেই জাহাজের নাবিকগণের মুখেও আতঙ্কের ছায়া পড়িয়াছে। দু-একবার যখন জাহাজের কাপ্তেন্ আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন, তখন আমি শুনিলাম যে, তিনি চাপা গলায় বারবারই কেবল বলিতেছিলেন "আজ আমাদের সর্ব্বনাশ নিশ্চয়।" সেদিন আমার মনে যে কিরূপ ভয় হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ঝড়ের বেগ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল এবং সমুদ্রে এত বড় বড় ঢেউ উঠিতে লাগিল যে, মনে হইল, বুঝি সমুদ্রে ও ঝড়ে যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে আর আমাদের জাহাজখানি তাহার মাঝখানে পড়িয়া গিয়া একটি খেলনার মত দোল খাইয়া এপাশে ওপাশে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। জাহাজের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মাঝে মাঝে জাহাজের নাবিকেরা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতেছিল, "আর রক্ষা নাই। এইবার জাহাজ ডুবিল।" অল্পক্ষণ পরেই একজন নাবিক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "জাহাজের নীচে এক জায়গায় ফুটা হইয়া গিয়াছে।" এই খবর পাইয়া প্রায় সকল নাবিকই সেখানে জুটিল এবং দমকল দিয়া জল ফেলিতে লাগিল। কিন্তু এমন বেগে জাহাজের খোলের ভিতর জল ঢুকিতেছিল যে, তাহা বাহির করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন সাহায্য প্রার্থনার সঙ্কেত জানাইয়া আমাদের জাহাজ হইতে বন্দুক ছোঁড়া হইল। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই আর একটি জাহাজ অতি কষ্টে ঝড়ের সীমাটি অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়াছিল। সেই জাহাজ হইতে আমাদের জাহাজের বন্দুকের গুলির শব্দ শুনিতে পাইয়া উহারা একখানি নৌকা পাঠাইয়া দিয়াছিল। অতি কষ্টে সেইরূপ অশান্ত সমুদ্রের উপর দিয়া নৌকাটি আমাদের

জাহাজের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। জাহাজে আমরা যে কয়জন ছিলাম, সকলে ঐ নৌকায় উঠিয়া কোনওরূপে তীরে পৌঁছিয়াছিলাম। তার পর সেখান হইতে বহু কষ্টে হাঁটিয়া হাঁটিয়া পুনরায় ইয়ারমাউথে ফিরিয়া গেলাম।

আমার কাছে সম্বল বলিতে যৎসামান্য কিছু টাকাকড়ি ছিল। তাহারই সাহায্যে আমি লণ্ডনে



নৌকাটি আমাদের জাহাজের কাছে পৌঁছিল

গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। লণ্ডনে গিয়া আমার সহিত একটি জাহাজের অধ্যক্ষের পরিচয় হইয়াছিল। এই জাহাজখানি গিনি উপকূলে বাণিজ্য করিত। জাহাজের ক্যাপ্টেন্ আমার সহিত কথাবার্তা বলিয়া এমনই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, একদিন তিনি বলিলেন, তিনি আমাকে তাঁহার জাহাজে করিয়া লইয়া যাইতে পারেন এবং আমি ঐ জাহাজে থাকিয়া আমার নিজের মূলধনের সাহায্যে অল্প-স্বল্প ব্যবসা-বাণিজ্যও করিতে পারি। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার এই প্রস্তাবটি সাগ্রহে গ্রহণ করিলাম।

কয়েকজন আত্মীয়স্বজনের কাছ হইতে আমি চল্লিশ পাউণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এবং তাহা দিয়া কিছু খেলনা, মালা প্রভৃতি ছোটখাট জিনিস কিনিয়া ফেলিলাম। কারণ, পূর্বেই জাহাজের ক্যাপ্টেন্ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, গিনি উপকূলে ঐ-সব জিনিসের চাহিদা খুব বেশি। বাস্তবিক এইবারের সমুদ্রযাত্রায় আমার প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হইল। এই যাত্রায় আমি নাবিকের কাজ শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম এবং লণ্ডনে ফিরিয়া দেখিলাম যে, প্রায় তিনশত পাউণ্ড আমার লাভ হইয়াছে। ইহাতে আমার উৎসাহ খুব বাড়িয়া গেল। সেই সময় হইতে 'গিনি উপকূলের ব্যবসায়ী' বলিয়া আমি পরিচিত হইয়াছিলাম এবং পুনরায় সেই পূর্বের জাহাজখানিতে চড়িয়া যাত্রা করিবার জন্য মন স্থির করিলাম। কিন্তু আমাদের সেইবারের যাত্রা এমনই অশুভ ও বিপজ্জনক হইয়াছিল যে, মানুষের ভাগ্যে সেইরূপ দুর্ভোগ খুব অল্পই ঘটিয়া থাকে। কারণ, আফ্রিকা মহাদেশের তীর ছাড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই একদল মুরজাতীয় জলদস্যু আমাদের জাহাজের পিছনে পিছনে তাড়া করিয়াছিল। তাহাদের অসংখ্য পাল তোলা একখানি জাহাজ অবিলম্বে আমাদের জাহাজটিকে ধরিয়া ফেলিল। বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করার পর আমরা পরাজিত হইয়াছিলাম। বন্দী হইয়া আমরা সবাই এক বন্দরে গেলাম এবং ক্রীতদাসরূপে আমরা সেখানে বিক্রীত হইলাম।

সৌভাগ্যবশতঃ আমার ভাগ্যে একজন খুব দয়ালু প্রভু মিলিয়াছিল। প্রভুটি জাতিতে মুর। তিনি প্রায়ই মাছ ধরিতে যাইতেন, এবং মাছ ধরায় আমার আগ্রহ ও কুশলতা দেখিয়া তিনি এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, মাছ ধরিতে যাইবার সময় তিনি কখনও আমাকে সঙ্গে লইতে বিস্মৃত হইতেন না।

একদিন তিনি আমাকে তাঁহার এক আত্মীয়ের সহিত মাছ ধরিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। সেদিন আমার মনের মধ্যে দাসত্ব হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, মাছ ধরার চেয়ে পলায়ন করিবার জন্য আমি অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। মাছ ধরিবার সকল রকম সরঞ্জাম লইয়া আমরা যথাসময়ে একস্থানে পৌঁছিলাম। আমি খানিকক্ষণ মাছ ধরার ভাণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই একটিও মাছ ধরিলাম না। তখন আমি

তাঁহাকে বলিলাম, "চলুন, আমরা নৌকাটি লইয়া ডাঙ্গা হইতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া যাই। এখানে মাছ মোটেই পাইতেছি না"। এই কথায় আমার প্রভুর সেই আত্মীয়টি সহজেই রাজি হইয়াছিলেন, এবং তখনই দাঁড় চালাইয়া আমি নৌকাখানিকে বেশ কিছুদূর লইয়া গেলাম। নৌকাটি থামাইয়া আমি আবার মাছ ধরিবার ভাণ করিতে লাগিলাম, এবং আড চোখে আমার সঙ্গীটিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। একবার দেখিলাম যে, তিনি আমার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছেন। সেই সুযোগে আমি তাঁহার পিছন হইতে হঠাৎ এমন এক ধাক্কা মারিয়াছিলাম যে, তিনি ডিগবাজী খাইয়া ঝপ্ করিয়া জলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়া খুব জোরে নৌকার দাঁড়ের কয়েকটি টানে নৌকাটিকে তাঁহার কাছ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়াছিলাম। তিনি সাঁতার কাটিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইবার জন্য বার বার আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি নৌকার মধ্য হইতে একটি বন্দুক উঠাইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলাম যে, তিনি যদি নৌকার নিকটে আসিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গুলি করিব, বরং তিনি যদি ভালো চাহেন তো ডাঙ্গায় উঠিয়া পলাইতে পারেন। বেগতিক দেখিয়া প্রাণের ভয়ে তিনি অগত্যা তীরের দিকেই সাঁতার কাটিতে লাগিলেন। আমি আর সেদিকে না চাহিয়া অন্যদিকে নৌকার মুখ ফিরাইয়া দিয়া রওনা হইলাম এবং আশা করি যে, আমার সেই সঙ্গীটি বেশ নিরাপদেই বাড়ী গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

নৌকা বাহিতে বাহিতে আমি অসীম সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছিলাম। সেইজন্য কোন্ দিকে গেলে যে তীর পাইব, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। ডাঙার সন্ধানে দিন দশেক অনবরত নৌকা চালাইয়াছিলাম। অবশেষে একদিন একটি পর্তুগীজ জাহাজ দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমাকে ঐভাবে অসহায় অবস্থায় জলের উপর ভাসিতে দেখিয়া জাহাজটি আমার নৌকার নিকটে আসিয়াছিল এবং জাহাজের সকলেই সাদরে আমাকে জাহাজে তুলিয়া লইয়া আমাকে নানান্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি পর্তুগীজ ভাষা জানিতাম না, কাজে কাজেই আমি নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। শেষকালে স্কটল্যাণ্ডবাসী একজন ভদ্রলোক আমার কাছে আসিয়া আমার সহিত কথা বলিয়া পরিচয় ইত্যাদি নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম যে, আমি জাতিতে ইংরেজ এবং আমি মূরদের কাছ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি। আমার পরিচয় ও বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলে অশেষ করুণার সঙ্গে আমাকে সেই জাহাজে আশ্রয় দিলেন।

নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের উপর পাড়ি দিয়া অতি অল্পদিনের ভিতর আমাদের জাহাজখানি ব্রেজিলে পৌঁছিল। সেখানে পৌঁছিয়া ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন্ তাঁহার পরিচিত একজন সদাশয় চিনির ব্যবসায়ীর সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। ইহাতে আমি সেখানে থাকিয়া চিনি-সংক্রান্ত বিষয়গুলি শিখিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে নিজেই খানিকটা জমি কিনিলাম এবং আখের চাষ করিয়া ও চিনি তৈয়ারী করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলাম। কয়েক মাসের মধ্যে আমার ভাগ্য বেশ সুপ্রসন্ন হইল, এবং আমি যদি সেই স্থানেই ঐ ব্যবসা অবলম্বন করিয়া বরাবর বসবাস করিতাম, তাহা হইলে আমি বহু সুখ সুবিধা ভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার ভাগ্যদেবী যেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তিনি আমাকে বেশিদিন শান্তিতে থাকিতে দিবেন না। শীঘ্রই আমি আবার নিজেই আমার নিজের বিপদ সৃষ্টি করিলাম।

[দুই]
একটি দ্বীপের রাজা

আমার কয়েকজন প্রতিবেশী একবার শুনিয়াছিলেন যে, গিনি উপকূলের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ইহা শুনিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, তাঁহারা গিনি উপকূলে একখানি জাহাজ পাঠাইবেন, এবং সেখানে গিয়া আমাদের চিনি-সংক্রান্ত কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায়ের কার্য্যের জন্য কয়েকজন নিগ্রো ক্রীতদাস লইয়া আসিবেন। এই সিদ্ধান্তে আমি বিশেষ প্রীত হইলাম। তাহার পর যখন তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহারা আমাকেই এই দাস-ব্যবসায় পরিচালনা করিবার কর্তৃত্বপদ দিবেন, তখন আমি

আনন্দের আবেগে সমুদ্রের আপদ বিপদের কথা ভুলিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গিয়াছিলাম। অবশেষে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের পয়লা তারিখে আমাদের জাহাজ গিনি অভিমুখে যাত্রা করিল।

বারো দিন ধরিয়া আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। তাহার পর একদিন রাত্রে এমন ভীষণ জল-ঝড় উঠিল যে, জাহাজখানি ঝড় ও স্রোতের গতিতে দিক্‌হারা হইয়া লক্ষ্যহীনভাবে যাইতে লাগিল। আমরা নিরুপায় হইয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলাম। একদিন ভোর-বেলার দিকে ঝড়ের বেগ একটু কমিল বটে, কিন্তু প্রকৃতির থমথমে ভাব তখনও কাটে নাই এবং সমুদ্রে খুব বড় বড় ঢেউ উঠিতেছিল। দিক্‌হারা হওয়াতে সকলেই বাঁচিয়া ফেরা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া উঠিয়াছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একদল লোক "ডাঙা- ডাঙা," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এই কথা বলিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানি এক চড়ায় আট্‌কাইয়া গেল। বিপদের মধ্যে ডাঙার সন্ধান পাইয়া আশায় বুক বাঁধিয়া আমরা জাহাজ হইতে নৌকা নামাইয়া নৌকায় চড়িলাম এবং ডাঙার দিকে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু ডাঙায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে পিছন হইতে এক বিশাল ঢেউ আসিয়া নৌকাটিকে একেবারে উল্‌টাইয়া দিয়া গেল। নৌকায় আমরা সবশুদ্ধ পনেরো জন আরোহী ছিলাম। একা আমি ভিন্ন আর সকলেই কোথায় যে সমুদ্রের অতল তলে তলাইয়া গেলেন, তাহা বলিতে পারি না। সমুদ্রের লোনা জলে দুই চারিটি চুবানি খাইয়া আমি একা কোন প্রকারে তীরের কাছে গিয়াছিলাম এবং অবসন্ন দেহটিকে টানিয়া টানিয়া খাড়া পাড় বাহিয়া তীরের উপর উঠিতে পারিয়াছিলাম। জাহাজে কয়দিন ধরিয়া কেবলই ঝড়ের সঙ্গে যুঝিয়া এমনই ক্লান্ত হইয়াছিলাম যে, আধ-মরার মত আমি এক তৃণভূমির উপরে শুইয়া রহিলাম। চারিদিকে চাহিয়া কোনও লোকজন দেখিতে পাই নাই। কেবল মাঝে মাঝে সমুদ্রের কল্লোল ও পাড়ের উপর সমুদ্রের ঢেউয়ের আছড়াইয়া ভাঙিয়া পড়ার শব্দটুকু কানে যাইতেছিল। রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটি গাছের উপর উঠিয়া আশ্রয় লইয়া সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন অনেক বেলায় আমার ঘুম ভাঙিয়াছিল। জাগিয়া দেখিলাম, ঝড় থামিয়াছে এবং মেঘ কাটিয়া গিয়া আকাশ খুব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। জল স্থল সোনালী সূর্য্যকিরণের আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং সূর্য্যের রশ্মিচ্ছটা ভিজা গাছপালার পাতার উপর পড়িয়া ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। সমুদ্রের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে, জোয়ার আসিয়া রাত্রের মধ্যেই আমাদের জাহাজখানিকে একেবারে তীরে আনিয়া ভিড়াইয়াছে। ইহা দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, আমরা যদি কাল ডাঙায় আসিবার জন্য তাড়া না করিয়া জাহাজেই থাকিতাম, তাহা হইলে আমরা নিরাপদে থাকিতে পারিতাম এবং আমিও এইভাবে সঙ্গীহীন হইয়া একা পড়িতাম না।

যাহা হউক, আমি সাঁতার কাটিয়া জাহাজখানিতে গিয়া উঠিলাম। জাহাজের ভিতরে গিয়া দেখিলাম যে, আমরা যে-সব খাবার জিনিস জাহাজে করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাম, তাহার কিছুই বৃষ্টির জলে ভিজিয়া নষ্ট হয় নাই। আমি কিছু খাবার পকেটে ভরিয়া লইয়া খাইতে খাইতে জাহাজ হইতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম। জাহাজের মধ্যে কতকগুলি অতিরিক্ত তক্তা ও পেরেক ছিল। তাহার সাহায্যে তাড়াতাড়ি একখানি কাজ চলা-গোছের ভেলা তৈয়ারী করিয়া ফেলিলাম। সেই কাঠের ভেলার ভিতরে গোটা তিনেক খালি বাক্স চড়াইয়া তাহার মধ্যে জাহাজের যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য বোঝাই করিলাম এবং তাহার পর ছুতার মিস্ত্রীর জিনিসপত্র-ভরা একটি বাক্স ও কয়েকটি বন্দুক ও টোটা বারুদও সঙ্গে লইলাম। এই সব জিনিসপত্র লইয়া আমি নিরাপদে ডাঙায় ফিরিয়া আসিলাম।

এইবার সেই দ্বীপটি দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় একটি খুব উঁচু খাড়া পাহাড়ের উপর উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে, আমি এমন এক দ্বীপে আসিয়া পড়িয়াছি, যেখানে কোনও জনমানবের বসতির কোন চিহ্নই নাই, কেবল বনে বনে ও পাহাড়ের গুহায় বন্যজন্তুর বাস।

আমার এইরূপ অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, জাহাজ হইতে আরও কিছু কিছু জিনিস দ্বীপে লইয়া আসিলে আমার খুব সুবিধা

হইবে। প্রতিদিন যখন সমুদ্রের ঢেউ থাকিত না, তখন আমি জাহাজের উপরে যাইতাম এবং রোজই কিছু না কিছু জিনিস ডাঙায় আনিয়া উপস্থিত করিতাম। ক্রমশঃ এইরূপ করিতে করিতে আমার জিনিসপত্রের ভাঁড়ারটি বিরাট হইয়া উঠিয়াছিল। আমার মনে হয় যে, যদি আরও কিছুদিন জল-ঝড় না হইত, তাহা হইলে আমি হয়ত জাহাজের সমস্ত জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানিকেও টুকরা টুকরা করিয়া ডাঙায়



জাহাজ হইতে কিছু না কিছু জিনিস আনিতাম

আনিয়া আমার ভাঁড়ার ভরিতাম। কিন্তু দিন পনেরো পরে একদিন রাত্রে ভীষণ ঝড় উঠিল এবং পরদিন সকালবেলা উঠিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, কোথায় জাহাজ, কোথায় কি! ঝড়ের বেগে জাহাজখানি কোথায় কোন্ দূর সমুদ্রের বুকে অদৃশ্য হইয়াছে, কে জানে?

জাহাজ হইতে আমি দুইটি বিড়াল ও একটি কুকুর আনিয়া আমার সঙ্গী করিয়া লইয়াছিলাম। কুকুরটি বহুদিন ধরিয়া নানান্ কাজে আমার সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সহায়তা অথবা সঙ্গ অপেক্ষা কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বলা আমার অধিকতর আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, কাহারও সহিত একটিও কথা বলিতে না পারিয়া আমার প্রাণ একেবারে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য আমি ঐ কুকুরটিকে কথা বলাইতে পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। কিছুকাল পরে আমি একটি টিয়াপাখী ধরিয়া পুষিয়াছিলাম। ঐ পাখীটিই নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া আমাকে আনন্দ দান করিত। আমি তাহাকে কথা বলিতে শিখাইয়াছিলাম, এবং অতি করুণ স্বরে সে মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিত—"রবিন্—বেচারী রবিন্সন্ ক্রুসো!"

এইবার বাসস্থানের জন্য আমি একটি ভাল জায়গা খুঁজিতে লাগিলাম। একটি খাড়া পাহাড়ের ঠিক নীচে একটি ক্ষুদ্র সমতল ভূমি দেখিয়া আমি উহা পছন্দ করিয়া লইলাম। আমি দেখিলাম যে, ঐ পাহাড়টির গা ঘেঁসিয়া বাস করিলে জন্তু জানোয়ারের উপদ্রবের কোন ভয় থাকে না। কারণ, পাহাড়টি ঠিক একটি দেওয়ালের মত এমন খাড়াভাবে উঠিয়াছে যে, সেখানে উপর হইতে কোনও জন্তুর নামিয়া আসা একেবারেই অসম্ভব। সেই সমতল ভূমিটুকুর সামনে অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে দুই সারি মোটা মোটা গাছের ডালের খুঁটি পুঁতিয়া একটি বেড়া তৈয়ারী করিলাম। বেড়া শেষ করিয়া আমি দেখিলাম যে, উহা প্রায় পাঁচফুট উঁচু হইয়াছে। তারপর প্রত্যেকটি খুটির মাথা চাঁছিয়া চাঁছিয়া সেগুলিকে বর্শার অগ্রভাগের মত তীক্ষ্ণ করিয়া ফেলিলাম। জাহাজ হইতে কিছু মোটা তারও আনিয়াছিলাম। তাহা দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সেই দুই সারি খুঁটির সবগুলি বেশ করিয়া জড়াইয়া এমন বেড়া তৈয়ারী করিয়াছিলাম যে, মানুষ বা জন্তুর পক্ষে উহার ভিতরে আসা একরকম অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। পাহাড়ের গায়ে একটি মই লাগাইয়া আমি নিজে নীচে নামিতাম এবং নামিয়াই সেই মইটি সরাইয়া আবার ভিতরে রাখিয়া দিতাম।

বহু পরিশ্রম করিয়া সেই বেড়ার ভিতরে আমি আমার সমস্ত জিনিসপত্র, খাবার প্রভৃতি লইয়া গিয়াছিলাম। ঝড়-বৃষ্টি ও রৌদ্রের তাপ হইতে

রক্ষা পাইবার জন্য আমি একটি ছোট্ট পাতার ছাউনি দেওয়া কুটীর তৈয়ারী করিয়াছিলাম এবং ঠিক তাহার পিছনেই পাহাড়ের গা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মাটি ও পাথর বাহির করিয়া ফেলিয়া একটি সুন্দর গুহাও নির্মাণ করিয়াছিলাম। কোনও সময়ে প্রয়োজন হইলে যাহাতে আর একটি বাস করিবার স্থান থাকে এই উদ্দেশ্যেই উহা তৈয়ারী করিয়াছিলাম।

কুটীরের মধ্যে জিনিসপত্র গুছাইতে গুছাইতে একদিন দেখিলাম যে, একটি ছোট থলিতে কেবল কতকগুলা তুঁষ রহিয়াছে। থলিটি কাজে লাগিবে ভাবিয়া সমস্ত তুঁষ আমি বাহিরের জমির একপাশে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। বর্ষাকালের বৃষ্টিপাতের প্রায় একমাস পরে দেখিলাম যে, যেখানে তুঁষ ফেলিয়াছিলাম, ঠিক সেই স্থানে সবুজ সবুজ কয়েকটি অঙ্কুর জন্মিয়াছে। আরও কিছুদিন গত হইলে পর আমি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে, দশ-বারোটি যবের চারা হইয়াছে। আমি প্রথমে একবার আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিয়াছিলাম যে, যব গাছ ওখানে জন্মিল কেমন করিয়া? কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়িল যে, আমি যে তুঁষ ফেলিয়াছিলাম, তাহার সহিত নিশ্চয়ই ঐ শস্যের কয়েকটি বীজ ছিল। আমি যে তুঁষের সঙ্গে সঙ্গে শস্যকণাও ফেলিয়াছিলাম, তাহা কিন্তু আমি পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবি নাই। আর কিছুদিন পরে লক্ষ্য করিলাম যে, যবের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ধান-গাছও জন্মিয়াছে। আমি ঐ শস্যের চারাগুলির খুব যত্ন লইতে লাগিলাম এবং স্থির করিলাম যে, যেটুকু শস্যই উৎপন্ন হউক না কেন, সমস্টাই আবার পর বৎসরের জন্য বীজ করিয়া রাখিয়া দিব। ধান ও যবের চারাগুলি ক্রমশঃ বড় হইল এবং কিছুদিন পরে শস্য জন্মিয়াছিল। শস্য পাকিলে পর গাছগুলি কাটিয়া ফেলিলাম এবং হাত দিয়াই শীষ হইতে যব ও ধানগুলি ছাড়াইয়া পৃথক্ করিয়া লইলাম। সেবারে প্রায় ছ-সের ধান এবং আড়াই-সের যব আমি পাইয়াছিলাম। সেগুলি আমি বীজের জন্য রাখিয়া দিলাম।

আমি দেখিলাম যে, কুটীরের মধ্যে যদিও দীনভাবে বাস করি, তথাপি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমার আরও বহু জিনিসের প্রয়োজন রহিয়াছে। একখানা চেয়ার আর টেবিল না হইলে নেহাৎ অসভ্য বর্ব্বরজাতির মত বাস করিতে হইবে বলিয়া ঐ দুটি জিনিস তৈয়ারী করিবার সঙ্কল্প করিলাম। উহার পূর্ব্বে আমি জীবনে কখনও যন্ত্রপাতি ধরি নাই, কিন্তু আমার সঙ্গে একটি করাত, একটি কুড়াল এবং কয়েকটি পেরেক ও হাতুড়ি ছিল। শীঘ্রই আমি সেগুলি ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলাম। টেবিল চেয়ার তৈয়ারী করার জন্য তক্তার প্রয়োজন। আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, তক্তা পাইতে হইলে গাছ কাটিয়া উহা বাহির করিতে হইবে। তখন আমি মস্ত একটি গাছ কাটিয়া ফেলিয়া সেই গাছের মোটা গুঁড়ি হইতে প্রয়োজন মত পুরু করিয়া কয়েকখানি তক্তা বাহির করিয়া লইলাম। ছোট মাপের তক্তা জুড়িয়া জুড়িয়া আমি আমার টেবিল



আমি আমার টেবিল ও চেয়ার তৈয়ারী করিলাম

ও চেয়ার তৈয়ারী করিলাম। আর যে-কয়েকখানি বড় তক্তা অবশিষ্ট রহিল, তাহা দিয়া গুহার দেয়ালের গায়ে তাক তৈয়ারী করিলাম। ঐ তাকের উপর আমি আমার জিনিসপত্র সাজাইয়া রাখিতাম।

ধীরে ধীরে আমি আরও অনেক নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস নিজে নিজেই তৈয়ারী করিয়া লইতে লাগিলাম। বনের মধ্যে গাছ হইতে আমি একটা লোহা-কাঠ জোগাড় করিয়াছিলাম। তাহা দিয়া মাটি খুঁড়িবার উপযোগী একটি শাবল তৈয়ারী করিলাম। উহা লোহার শাবলের মত শক্ত না হইলেও উহার দ্বারা আমার সকল কাজই বেশ চলিয়া যাইত। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া একখানি কোদালের অভাব বড়ই অনুভব করিতেছিলাম। একদিন দেখিলাম যে, জাহাজ-হইতে আনা কয়েকখানি লোহার শক্ত পাত এক বাক্সের ভিতর রহিয়াছে। একখানি চৌকা পাত আগুনে তাতাইয়া অল্পে অল্পে পিটাইয়া একখানি কোদাল তৈয়ারী করিলাম। কোদালখানি একটু বেশি ভারী হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে আমার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। একদিন দেখিলাম যে, কোনও জিনিসপত্র বহিতে হইলে দু-একটি ঝুড়ির নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সহজে বাঁশ অথবা বেতের সন্ধান না পাইয়া সাধারণ গাছের নমনীয় সরু সরু ডাল বুনিয়া বুনিয়া কাজ-চলা গোছের বহু ঝুড়ি তৈয়ারী করিয়া ফেলিলাম। ঝুড়িগুলি দেখিতে সুশ্রী না হইলেও উহা অশেষ প্রকারে আমার কাজে লাগিয়াছিল।

কিন্তু বহুদিন ধরিয়া রুটির অভাবে আমি সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাইয়াছিলাম। আমার কাছে যে যব ছিল সেগুলি বেশ বড় বড় আর খুব উৎকৃষ্ট। কিন্তু রুটি প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে ঐ যবগুলি পিষিয়া তবে তো উহা হইতে ময়দা বাহির করিতে হইবে! অনেক খুঁজিয়াও যাঁতা তৈয়ারী করিবার উপযুক্ত একখানিও পাথর পাইলাম না। আর পাথর পাইলেও তাহাতে ছিদ্র করিতাম কেমন করিয়া? শেষকালে পাথরের আশা ছাড়িয়া দিয়া খুব মোটা মোটা দুখানা ভারী শক্ত কাঠ জোগাড় করিলাম। সেই কাঠের খণ্ড দুইটিকে কাটিয়া ঘষিয়া গোল করিয়াছিলাম এবং আগুন জ্বালাইয়া উহাতে ছিদ্র করিয়া লইয়া সেখানে হাতল লাগাইয়া যাঁতা তৈয়ারী করিয়াছিলাম।

যব পিষিয়া কোনওরূপে ময়দা প্রস্তুত করিবার তো উপায় করিয়াছিলাম। কিন্তু তখন ভাবনা হইল যে, রুটি সেঁকিব কেমন করিয়া? রুটি সেঁকিবার উপযুক্ত একটি উনান তৈয়ারী করিতে আমার অনেক ভাবিতে হইয়াছিল। অবশেষে আমি আমার পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিয়া সফলকাম হইয়াছিলাম। রুটি সেঁকিবার জন্য আমি কতকগুলি মাটির সরা তৈয়ারী করিয়াছিলাম। প্রত্যেকটি সরার বেড় প্রায় দুই ফিট এবং গভীরতা প্রায় নয় ইঞ্চি হইবে। ঐ মাটির সরাগুলিকে আমি বেশ করিয়া আগুনে পোড়াইয়া লইয়াছিলাম। ইহাতে সেগুলি টালির মত লাল এবং লোহার ন্যায় শক্ত ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

যখন আমি রুটি সেঁকিতাম, তখন এইরূপ একখানি সরা লইতাম এবং মাটি খুঁড়িয়া তৈয়ারী করা উনানে বেশ করিয়া আগুন ধরাইতাম। সরার মধ্যে মাখা ময়দার ডেলাটি বসাইয়া দিয়া আর একখানি সরা দিয়া চাপা দিয়া প্রথমে উনানের উপরে বসাইয়া দিতাম। তাহার পর উহার উপরে এবং পাশেও শুক্‌না কাঠ জমাইয়া আগুন ধরাইতাম। এইরূপে চারিদিক হইতে আগুন পাইয়া গরমে রুটিগুলি বেশ সুন্দর সেঁকা হইয়া যাইত। এইরূপে অল্প-দিনের মধ্যেই আমি একজন পাকা রাঁধুনীও হইয়া উঠিলাম।

অভাব বোধের সঙ্গে সঙ্গে বহু জিনিসপত্র আমি নিজে নিজেই উদ্ভাবন করিয়া লইয়া আমার সেই ছন্নছাড়া জীবনটাকে এমন সহজ করিয়া লইয়াছিলাম যে, জীবনটাকে দুঃখের চেয়ে সুখের ভাগটাই অধিকতর বলিয়া মনে হইত।

সে সময়ে আমার পোষাক-পরিচ্ছদ এমন অদ্ভুত হইয়াছিল যে, আমার দেশবাসী কেহ যদি তখন আমাকে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে, হয় সে খুব ভয় পাইত অথবা তাহার খুব হাসি পাইত। আমি আমার মাথায় একটা আকারহীন মস্ত উঁচু ছাগলের চামড়ার টুপি পরিতাম। মোজা অথবা জুতা আমার ছিলই না, কিন্তু আমি এমনই অদ্ভুত এক জোড়া পাদুকা নিজে নিজেই তৈয়ারী করিয়া পায়ে পরিয়া থাকিতাম যে, তাহার যে কি নামকরণ করিব, তাহা ভাবিয়াই পাই না! আমার গায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলওয়ালা একটা শার্ট, আর পরণে একটা হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত ঝুলের পাজামা ছিল। বাহিরে যাইবার সাজ আমার একটু অন্য রকমের ছিল। ছাগলের চামড়ায় তৈয়ারী একটা চওড়া বেল্ট্ আমি কোমরে পরিতাম এবং তাহার একপাশে একটা করাত, আর অপর পাশে একটা হাতুড়ি ঝুলিত। আমার দুই কাঁধের নীচে দুটি থলিতে

বন্দুকের বারুদ আর টোটা থাকিত। পিঠে একটা ঝুড়ি এবং আমার বন্দুকটি ঝুলাইয়া মাথার উপরে একটি মস্ত বড় ছাগলের চামড়ার তৈয়ারী অদ্ভুত রকমের ছাতা মাথায় দিয়া আমি বাহির হইতাম।



অদ্ভুত রকমের ছাতা মাথায় দিয়া বাহির হইতাম

আমি যখন খাইতে বসিতাম, তখন আমাকে দেখিলে খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোকেও নিশ্চয় হাসিয়া ফেলিত। খাইবার সময় আমি টেবিলের সামনে চেয়ারের উপর এমনভাবে বসিতাম, যেন আমি সেই দ্বীপটির অধিপতি এক মস্ত পরাক্রমশালী রাজা! রাজার মতই আমি কেমন একা একা বসিয়া খাইতাম এবং মনে ভাবিতাম, চারিদিকে চাকরবাকরেরা আড়ষ্ট ও নির্বাক হইয়া আমার হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। টিয়াপাখীটিই যেন আমার একমাত্র প্রিয়পাত্র এবং কেবল তাহারই যেন আমার সহিত কথা বলিবার অধিকার ছিল। কুকুরটি আমার ডান পাশে বসিয়া থাকিত এবং টেবিলের উপরে দুপাশে বিড়াল দুইটি এমনভাবে বসিয়া থাকিত, যেন তাহারা আমার দেওয়া এক আধ টুক্‌রা খাবার পাইলে ধন্য ও চরিতার্থ হইয়া যাইবে।

তিন

বালির উপর পায়ের দাগ

প্রতিদিনই আমি সেই দ্বীপটির কোনও না কোনও স্থানে বেড়াইয়া আসিতাম। একদিন সমুদ্রতীরে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, বেলাভূমির এক জায়গায় মানুষের খালি পায়ের চিহ্ন স্পষ্ট মুদ্রিত রহিয়াছে। আমি আশ্চর্য্য হইয়া বজ্রাহতের মত সেখানে দাঁড়াইয়া উহা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।



আমি আশ্চর্য্য হইয়া উহা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম

কোনও শব্দ কানে যায় কি না, সেজন্য আমি অনেকক্ষণ কান পাতিয়া রহিলাম। তারপর চারিদিকে চাহিয়াও কোনও জনমনুষ্য দেখিতে

পাইলাম না। নিকটেই একটি উঁচু ভূমি ছিল, আমি তাহার উপরে উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সমুদ্রতীরের এপাশ ওপাশ করিয়া আমি খুব দেখিলাম কিন্তু কোনও মানুষের সন্ধান পাইলাম না।

ঘুরিয়া ফিরিয়া আমি আবার সেই পদচিহ্নের সামনে গেলাম। গিয়া দেখিলাম যে, সেই পায়ের দাগটি অবিকৃত অবস্থায় ঠিক সেই ভাবেই রহিয়াছে—পায়ের উপর পাতার বুড়া-আঙুল, গোড়ালি প্রভৃতি পায়ের প্রত্যেক অংশের স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। এখানে পায়ের ছাপ যে কেমন করিয়া পড়িয়াছিল, তাহা আমি ভাবিয়া পাইলাম না। তখন আমি আবার বাড়ীর পথ ধরিয়া ফিরিতে লাগিলাম। পথ চলিতে চলিতে আমার গা যেন ভয়ে কিরকম ছমছম করিতেছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমার নিজের পায়ের শব্দে মনে হইতেছিল যে কে যেন আমার অনুসরণ করিতেছে। দু-এক পা অগ্রসর হইয়াই আমি ভয়ে ভয়ে কেবলই পিছনে চাহিয়া দেখিতেছিলাম এবং সামনে যে ছোট ছোট গাছ ছিল, তাহা দেখিয়া কেবলই মানুষ বলিয়া আমার ভ্রম হইতেছিল ও চমকাইয়া উঠিতেছিলাম।

সেদিন রাত্রে আমি একেবারেই ঘুমাইতে পারি নাই। কিন্তু কিছুদিন পরে ক্রমশঃ আমার ভয় চলিয়া গেল এবং সেই পায়ের দাগের সহিত আমার নিজের পা মাপিয়া দেখিবার জন্য সাহসে বুক বাঁধিয়া আমি সমুদ্রতীরের দিকে চলিতে লাগিলাম। সমুদ্রতীরে গিয়া দেখিলাম যে, সেই পদচিহ্নটি আমার পায়ের চেয়ে অনেক বড়। ইহা দেখিয়া আমার মনে আবার নানারকম ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। কারণ, আমার মনে হইয়াছিল, বুঝি বা ইহা অপরের পায়ের চিহ্ন।

বাড়ী ফিরিয়া আমি শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। আমি আমার বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীর উঠাইয়া তুলিলাম, ভরিয়া পাথর রাখিয়া, বাড়ীটাকে একরকমে দুর্গে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইলাম। এমন কঠিন পরিশ্রমেও আমি অতি সহজে মানাইয়া লইয়াছিলাম এবং অনেক পরিশ্রম করিয়াও আমি কিছুমাত্র ক্লান্ত হইতাম না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ির সহিত আমি আমার বাড়ীর বেড়ার বাহিরে আবার আর একটি গাছের ডালের খুঁটির তৈয়ারী বেড়া তুলিয়া ফেলিলাম। ইহাতে আমার বাসস্থানটি একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেল। কারণ বাহির হইতে সেই ডাল-পাতা বেষ্টিত বেড়াটি দেখিয়া একটি ঝোপ বলিয়া মনে হইবার সম্ভাবনা ছিল।

মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল, কিন্তু আমার ভয় কমিল না। রাতে রোজই স্বপ্ন দেখিতাম যে, আমি যেন বর্বর শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রক্ষা পাইবার জন্য তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছি। কুড়ি বৎসর আমি সেই দ্বীপে বেশ নির্ভয়ে বাস করিয়াছিলাম এবং সেই প্রথম পায়ের চিহ্ন দেখিয়া আমি ভয় পাইলাম।

একদিন সকালে সমুদ্রতীরে পাঁচখানি ডিঙি নৌকা দেখিয়া আমি খুব আশ্চর্য হইয়া গেলাম। ভয়ে বিহবল ও দিশেহারা হইয়া কি যে করিব, তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আমি আমার দীন কুটীরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও এমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম যে, কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। তখন আবার বাহির হইয়াছিলাম এবং একটা পাহাড়ের উপর চড়িয়া একটা দূরবীন দিয়া দেখিলাম যে, প্রায় ত্রিশজন লোক পাড়ের উপর আগুন জ্বালাইয়া তাহার চারিদিকে অসভ্যজাতির রীতিতে নৃত্য করিতেছে। খানিক পরে তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন লোক নৌকার কাছে আগাইয়া গিয়া দুইজন লোককে বন্দীর মতো টানিতে টানিতে নৌকা হইতে বাহির করিয়া আনিল। তাহাদের একজনের মাথায় হঠাৎ ঐ বর্বরেরা এমন জোরে একটা লাঠির ঘা বসাইয়া দিয়াছিল যে, সেই লোকটা তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। অপর লোকটি সেই অবসরে মুক্তির উপায় পাইয়া উহাদের কাছ হইতে পলাইয়া প্রাণপণে আমি যেদিকে দাঁড়াইয়াছিলাম সেইদিকে দৌড়িতে লাগিল। ইহাতে আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম,—বিশেষতঃ যখন ভাবিয়া দেখিলাম যে, এইবার সেই পলাতক বেচারার পিছনে এই বর্বর লোকগুলি তাড়া করিয়া দৌড়াইতে থাকিবে, তখন আমার ভয়ের আর সীমা ছিল না। কিন্তু যখন দেখিলাম যে, মাত্র তিনজন তাহার অনুসরণ করিয়া দৌড়িতেছে, তখন আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কিছু সাহস পাইলাম।



"আলো"কে তরঙ্গ বলি কেন ?

১৪৯৩ পৃষ্ঠার পর

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি দুর্দ্দমনীয় জানিবার ইচ্ছা রহিয়াছে। তাই আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহাই আমাদের বুঝিবার সীমার মধ্যে আনিয়া লইতে চাই। এই বুঝিবার চেষ্টা, ইহা আমাদের মনের একটা স্বাভাবিক ক্রিয়া। ইহা আমাদের জন্মগত। আমাদের সমস্ত জানিবার ইচ্ছা শুধু মাত্র বুঝিবার জন্যই।

চোখ মেলিলেই আমরা দেখিতে পাই, আকাশ নীল, গাছের পাতা সবুজ, ধরিত্রী শ্যামলা, ফুল নানা বর্ণের। আমরা আরও দেখি, সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়, ত্রিশ দিন পর পর চাঁদ একবার পূর্ণ হয়, মেঘে বিদ্যুৎ চমকাইলে সমস্ত পৃথিবী আলোময় হইয়া উঠে। এই ব্যাপারগুলি আমরা আমাদের জানার মধ্যে পাইয়াছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও এইগুলিকে এই ভাবেই পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব-বর্ত্তিগণও সেই ভাবেই পাইয়াছিলেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের পরে যাহারা জন্মলাভ করিবে, তাহারা আকাশকে সবুজ বা গাছের পাতাকে লাল, কিংবা সূর্য্যকে কখনও বা একদিন পরে, আবার কখনও বা পাঁচদিন পরে অথবা সূর্য্যদেবতার ইচ্ছানুযায়ী পশ্চিমে বা উত্তরে উদিত হইতে দেখিবে না। কিংবা তাহাদের অভিজ্ঞতায় বিদ্যুৎ চমকাইলে সমস্ত পৃথিবী আলোর পরিবর্ত্তে জলেও ভরিয়া যাইবে না।

চিরকাল ধরিয়া অভিজ্ঞতার (Experience) ভিতর দিয়া আমাদের যে জ্ঞান সঞ্চিত হইয়া আসিয়াছে এবং যাহার কোনও ব্যতিক্রম আমরা কখনও পাই না, তাহাকে "বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকেরা "প্রাকৃতিক নিয়ম" নিয়ম" বলিয়া নাম দিয়াছেন। সমস্ত কিছুকে স্পষ্ট করিয়া জানিবার প্রধান ও প্রথম সোপান হইল এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলি আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করা। আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের স্নান করিবার টবের তলা হাত দিলেই ছুঁইতে পারি। অথচ ছুঁইতে গেলে হাতের গোড় পর্য্যন্ত ভিজিলে পর তবে হয়

তলাটা হাতে আসিয়া ঠেকে। কাঁচের গ্লাসে জল থাকিলে, এবং সে জল কুটা ইত্যাদিতে অপরিষ্কার হইলে কুটাগুলি বড় দেখায়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা আবিষ্কার করিলাম যে, আলোক-রশ্মি এক বস্তু হইতে অন্যতে যাইবার সময় যদি তাহার চলিবার দিক পরিবর্ত্তন করে, তবেই এইরূপ সম্ভব। তাহার পর রশ্মি লইয়া হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, বাস্তবিক পক্ষে তাহাই বটে। আলোক-রশ্মি তাহার চলিবার পথ এই অবস্থায় পড়িলে সত্যসত্যই বাঁকাইয়া লয়। এই ভাবে আলোক-রশ্মির চলিবার একটা নিয়ম আমরা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। অবশেষে আমরা দেখিলাম যে, আলোকের দিক্ পরিবর্ত্তন বা কিরণ বিবর্ত্তন (Refraction) ব্যাপারটি জগতের যেখানেই দেখিতে পাওয়া যাক না কেন, আমাদের এই একটি মাত্র অভিজ্ঞতা দিয়াই তাহার সবই বুঝিতে পারা যায়। একটি মাত্র অভিজ্ঞতা দিয়া নানারকম অভিজ্ঞতার অর্থবোধ হয়। এই যে বিশেষ একটি অভিজ্ঞতা, ইহাকেই বৈজ্ঞানিকেরা "নিয়ম" বলেন।

তোমরা কিন্তু একটি কথা পরিষ্কার ভাবে মনে রাখিও। প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া যাহা আমরা বলিতেছি, তাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বাহিরের কিছু নয়। তাহাও আমাদের ইন্দ্রিয়গত ব্যাপার। নিয়মকে আমরা আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আবিষ্কার করি। ইহা আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলির সার বা Extract।

যুগ যুগ ধরিয়া আলো ব্যাপারটি লইয়া গবেষণা করিতে করিতে মানুষ আলোকের কতগুলি নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে। "শিশু-ভারতীর" গত কয় সংখ্যা ধরিয়া এই নিয়মগুলি

বিজ্ঞানের "উপপত্তি"

কি এবং কি ভাবে তাহা সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ছড়াইয়া আছে তাহা তোমাদের বলিয়াছি এবং মানুষ এই নিয়মগুলি লইয়া কি ভাবে তাহা নিজের কাজে লাগাইয়াছে তাহাও তোমরা যথাস্থানে জানিতে পারিবে। কিন্তু তোমাদের প্রথমেই বলিয়াছি যে, মানুষের জানিবার ইচ্ছার অন্ত নাই। শুধু "নিয়ম" আবিষ্কার করিয়াই সে সন্তুষ্ট থাকে না। তাহার মন ও বুদ্ধি এমন ভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে যে, সে বিশ্বপ্রকৃতির শুধু বাহিরের রূপ দেখিয়া শান্ত হয় না। এই সব অসংলগ্ন নিয়মগুলির মধ্যে সে একটি ঐক্য-সূত্রের সন্ধান খোঁজে এবং ইহাতেই তাহার মন প্রফুল্ল ও তাহার বুদ্ধি উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

এইমাত্র তোমাদের বলিয়াছি যে, প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কারের জন্য আমাদের চোখ, কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলির প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই নিয়মগুলির ভিতরকার ঐক্যসূত্রটি ধরিতে হইলে এই সকল বাহিরের ইন্দ্রিয়-গুলিকে আমাদের ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। এই ছাড়াইয়া গিয়া আমরা যেখানে যাই, তাহা প্রধানতঃ কল্পনার রাজ্য বা মনের জগৎ। সেই জন্য সমস্ত অভিজ্ঞতার ঐক্যসূত্র বলিয়া বৈজ্ঞানিকরা যাহা প্রচার করেন তাহাও সম্পূর্ণভাবে কল্পনারই ব্যাপার। বিজ্ঞান অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কল্পনার ব্যবহার তোমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হইতে পারে। কারণ, সাধারণতঃ সকলের মধ্যে এই ধারণা বর্ত্তমান যে, কল্পনার ক্ষেত্র শুধু গল্প, উপন্যাস এবং কবিতার মধ্যেই। বাস্তবিক পক্ষে এরূপ ধারণা ঠিক নয়। বিজ্ঞানের রাজ্যেও কল্পনার প্রয়োজন আছে। সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, কল্পনা না থাকিলে বিজ্ঞান এক পদও অগ্রসর হইতে পারিত না। বরং কল্পনা আছে বলিয়াই মানুষ তাহার অভিজ্ঞতা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সমস্ত কিছুর ভিতরের রহস্যটুকুর ছবি তৈয়ার করিতে পারে। অবশ্য বিজ্ঞানের কল্পনা কবির কল্পনার মত যাহা ইচ্ছা তাই বা উন্মাদের কল্পনার মত বাস্তবকে ডিঙাইয়া ও

বুদ্ধিকে এড়াইয়া অর্থহীন প্রলাপ হইয়া দেখা দেয় না। বরং তাহাকে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং কঠিন ন্যায়শাস্ত্ররূপ দুইটি নির্মম রক্ষককে দুই পাশে লইয়া খুব সঙ্কীর্ণ পথে এবং অতিশয় সন্তর্পণে পা ফেলিতে হয়। তাহা হইলেও এই ভাবে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

বাস্তবকে লইয়া তাহার ভিতরকার তত্ত্বটি পাইবার এইরূপ যে চেষ্টা, এক কথায় ইহাকে বলা হয় উপপত্তি (theory) তৈয়ার করা। মূলতঃ কল্পনাকে ধরিয়া ইহা গঠিত হয় বলিয়া যাহার কল্পনা করিবার শক্তি যত গভীর, যে যত ভাবিতে পারে, মনন করিতে পারে, তাহার দেওয়া উপপত্তিই সাধারণের মধ্যে বেশী সম্মান পায়। তাহা হইলে কি হয়। তোমরা মহাভারত নিশ্চয় পড়িয়াছ। তাহার মধ্যে একস্থানে বক পাখীর প্রশ্নের উত্তরে রাজা যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং' অর্থাৎ এমন দুই জন মুনি পাওয়া যায় না যাদের মত ভিন্ন নয়। সোজা ভাষায় যাহাকে বলা হয় 'নানা মুনির নানা মত।' বিজ্ঞানের উপপত্তি গঠনের বেলাতেও ঐ একই কথা। যদিও সকলকেই নিয়ম ও যুক্তি মানিয়া চলিতে হয় তবু তাহারও মধ্যে নানা মতের উদ্ভব হয়। বিশ্বপ্রকৃতি 'নিয়ম'কে অবলম্বন করিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে একটি মাত্র জগৎ সৃষ্টি করেন, আর মানুষ তাহার মধ্যে "উপপত্তি" বাহির করিয়া কল্পনার ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ জগতের স্বপ্ন দেখে।

আলোর সাধারণ নিয়মগুলি কি, তাহা আমরা শিখিয়াছি। ইহা পথে বাধা পাইলে আট্‌কাইয়া যায়, চক্‌চকে জিনিষের উপর পড়িলে প্রতিফলিত বা পরাবর্তিত হইয়া ফিরিয়া আসে (Reflection), স্বচ্ছ বস্তুতে তেরছা হইয়া ঢকিবার সময় চলিবার দিক্ পরিবর্তন করিয়া লয় (Refraction) এবং এই অবস্থায় শাদা আলো বা মিশ্র আলো হইলে তাহা নানা রঙে ভাঙ্গিয়া যায় (dispersion) অর্থাৎ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। তাছাড়া ইহার গতির সীমা আছে এবং শূন্যমার্গে চলিবার সময় এই গতি সর্বদা একইরূপ থাকে। এখন সমস্যা হইল এই—সেই বস্তুর স্বরূপটি কি, যাহাকে এই সব নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়।

দেকার্তের মত

দেকার্তে নিজের সময়ে খুব নামজাদা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ইঁহার আলোর গতি মাপিতে চেষ্টা করিবার কথা তোমরা আগেই জানিয়াছ। তোমাদের মনে থাকিতে পারে যে, ইনি আলোর কোনও সীমাবদ্ধ গতি পরীক্ষার দ্বারা নিষ্পন্ন করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। তাই তিনি বলিলেন, জগৎ ভরিয়া একটা বস্তু অব্যক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই বস্তুর একস্থানে কোনও ক্রিয়া হইলে



রেনে দেকার্তে

সেই ক্রিয়ার ফল (effect) সেই মুহূর্ত্তেই সর্বত্র ফুটিয়া উঠে। তিনি তাঁহার কথা পরিষ্কার করিবার জন্য একটি উদাহরণ দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, অন্ধের যষ্টিকে মনে কর। যে মুহূর্ত্তে লাঠিটার ডগাটা কোনও স্থানে বাধা পায় অন্ধের হাত ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তাহা বুঝিতে পারে। লাঠির ডগা হইতে কোনও কিছু ছুটিয়া আসিয়া অন্ধের হাতে লাগে না, তাহা সত্ত্বেও সে বুঝিতে পারে যে সম্মুখে বিপদ বর্ত্তমান। এই উদাহরণ দিয়া তিনি বুঝাইতে চাহিতেছিলেন যে, বাস্তব জগতে এমন সব ব্যাপার আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পাওয়া যায় যাহার চলাচলের জন্য কোনও বস্তু বা সময়ের প্রয়োজন হয় না। বস্তু পড়িয়া থাকে অথচ তাহার ক্রিয়া স্থানান্তরিত হইয়া যায়। দেকার্ত্তের মত অবশ্য পরবর্ত্তিকালে টিকে নাই। যেদিন রোয়েমার প্রচার করিলেন যে, আলোর গতিরও সীমা আছে সেই দিন হইতেই তাঁহার মত খণ্ডিত হইয়াছিল। তবে দেকার্ত্তে-সম্বন্ধে একটা খুব বড় কথা বলা যাইতে পারে এবং সেইজন্যই তাহার কথা তোমাদের বলিতেছি। ইনি "আলো"-কে কোনও বস্তু বলেন নাই, কোনও বস্তুর মধ্যে "ক্রিয়া বিশেষ" বলিয়াছিলেন। কোন কিছুকে বস্তু বলা এবং ক্রিয়া বলার মধ্যে কি প্রভেদ, তাহা তোমরা ক্রমে জানিতে পারিবে।

এই ক্রিয়া যে কি রকমের, তাহা স্পষ্টভাবে বলেন ক্রিষ্টিয়ান হুইগেন্স। (Christian Huygens) ইনি হল্যাণ্ড দেশের হেগ Hague নগরে ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি খুব বড় গণিতজ্ঞ ছিলেন এবং বহু বিষয়ে গবেষণা করিয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে সময় মাপিতে হইলে বালুকা ঘড়ি বা জল ঘড়ির মত একটা অতিশয় স্থূল (crude) উপায়ে সময়ের পরিমাপ করা হইত। ইনিই প্রথমে দোলকযুক্ত (pendulum clock) ঘড়ি আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানের এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতের অসামান্য উপকার সাধন করিয়াছিলেন। প্রায় তিন শতাব্দী অতীত হইতে চলিল, হুইগেন্স দোলক ঘড়ির যতটা উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পর আর তাহাতে কোনও বিশেষ উন্নতি বিধান করিতেকেহ সমর্থ

ক্রিষ্টিয়ান হুইগেন্স

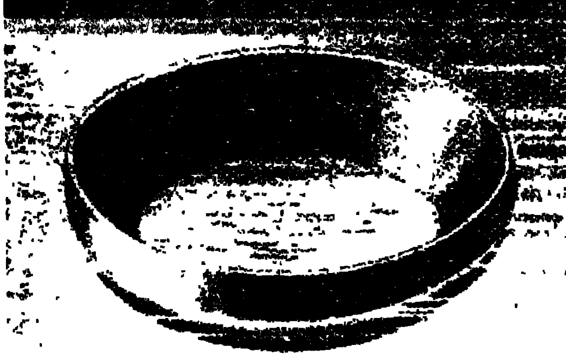


ক্রিষ্টিয়ান হুইগেন্স



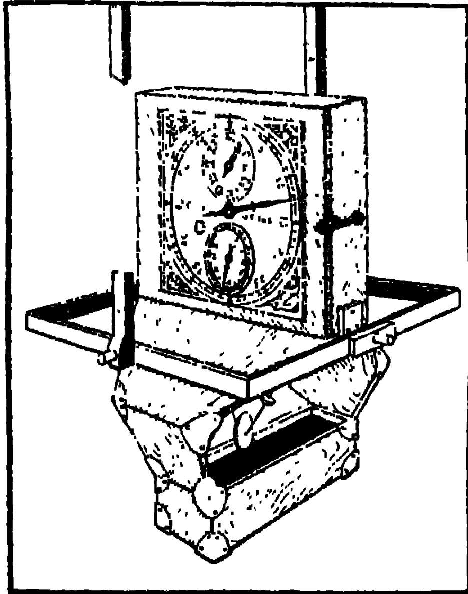
বালুকা ঘড়ি

হন নাই। ইনি নিউটনের ঠিক পূর্ববর্ত্তী ছিলেন এবং গতিবিজ্ঞান, ভারকেন্দ্র তত্ত্ব এবং চক্রাকার পথে ঘুরিবার সময় সমস্ত বস্তুর ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টার ভিতর



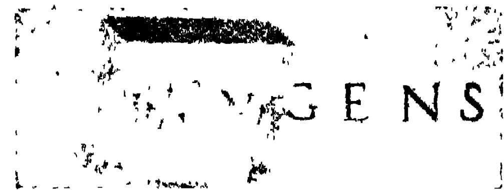
জল ঘড়ি

যে তত্ত্ব রহিয়াছে, সেই সকল ব্যাপার লইয়া ইনি যে সব গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহা



দোলকযুক্ত ঘড়ি

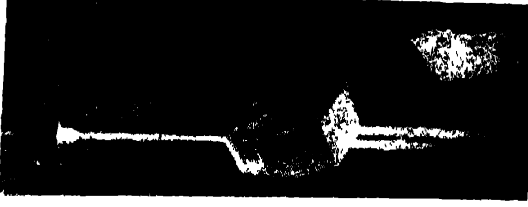
প্রচারিত না হইলে যে গতিবিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক বলিয়া নিউটন এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাগ্যে হইত কিনা সন্দেহ। "আলো" লইয়াও হুইগেন্স বহু গবেষণা করিয়াছিলেন। দেকার্ত্তে আলো-কে একরূপ ক্রিয়া বলিয়াছিলেন। ইনি এই ক্রিয়াকে তরঙ্গ বলিয়া অভিহিত করেন। শব্দ যেমন বাতাসের ভিতর তরঙ্গ, আলোও সেইরূপ এক রকমের তরঙ্গ। ইহা অবশ্য বাতাসের ভিতর নহে, কারণ বাতাস-শূন্য স্থানেও আলো যাওয়া-আসা করিতে পারে। তাই হুইগেন্স বাতাস হইতে আরও স্বচ্ছ ও সর্ববিব্যাপক একটা মাধ্যম (medium) কল্পনা করিয়া বলিলেন যে, বাতাসে তরঙ্গ উঠিলে যেমন আমরা কানে শব্দ শুনিতে পাই, সেইরূপই ইহাতে তরঙ্গ উত্থিত হইলে আমরা চোখে আলো দেখি। এই স্বচ্ছ ও সর্ববিব্যাপক মাধ্যমটির নাম হুইগেন্স ইথার (ether) বলিয়া অভিহিত করেন। আলো-কে ইথারের ভিতর তরঙ্গ কল্পনা করিয়া হুইগেন্স reflection, refraction ইত্যাদি সমস্ত নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। Iceland spar-এর মত কোনও কোনও স্ফটিকের (Crystal) ভিতর দিয়া কোনও জিনিস দেখিলে তাহাকে দুইটা হইয়া যাইতে দেখা যায়। ছবি দেখিলেই



আইসল্যাণ্ড স্পারের ভিতর দিয়া দেখিলে সব কিছু দুইটা করিয়া হইয়া যায়। ছবিতে আইসল্যাণ্ড স্পার Huygens এই লেখাটির খানিকটা অংশে রাখা হইয়াছে। লেখাটির যে অংশটুকু স্পারটির ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে তাহা দুইটা দুইটা করিয়া দেখাইতেছে।

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিবে। ইহা যে কিরূপে হয় তাহা একটি সত্যকার জটিল বিষয়। হুইগেন্স তাঁহার তরঙ্গের কল্পনা দিয়া ইহার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা বিজ্ঞান জগতে প্রচার করিয়া বহুদিনের একটি গভীর সমস্যার সমাধান করেন। পৃথিবীতে নানারকমের

অদ্ভুত ব্যাপার সর্ব্বসময়েই ঘটিয়া থাকে। "আলো কি ?" এই সমস্যাটির উপর হুইগেন্স মূলতঃ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এখন সকলেই



এই ছবিটিতে আর এক ভাবে দেখান হইতেছে যে একটি রশ্মি আইসল্যাণ্ড স্পারের ভিতর দিয়া চলিয়া গেলে তাহা দুইটি রশ্মি হইয়া বাহির হয়।

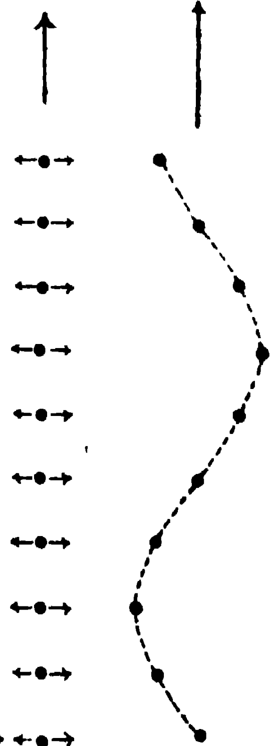
স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু তিনি যখন প্রথমে উহাকে প্রচার করেন তখন তাহা গৃহীত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ১২৫ বৎসর পর

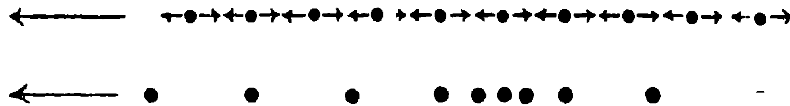


বস্তুতে তরঙ্গ

দুইজন বৈজ্ঞানিক তাঁহার মতকেই আবার প্রচার করেন। হুইগেন্স ৬৬ বৎসর পরমায়ু পাইয়া ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

কোনও বস্তুতে তাহার কণাগুলি অনবরত নাড়িতে থাকিলে সেই বস্তুতে তরঙ্গ উত্থিত হয়। পর পর কণাগুলিকে বাহিয়া এই তরঙ্গ সম্মুখে আগাইয়া যায়। এইখানে একটা কথা আছে। কণাগুলি যেদিকে নড়ে তরঙ্গের গতি সেদিকে হইতে পারে এবং তাহার সমকোণেও হইতে পারে। পাশের ছবিতে কোনও বস্তুর একটিমাত্র কণাকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। বাহির হইতে তাড়না খাইয়া বা যে কোন কারণেই হোক, ইহা নাচিতে আরম্ভ করিল। কণাটির এই নাচিবার দিকটি ছোট তীর দুইটি দিয়া ছবিতে দেখান হইয়াছে। এই কণাটির নাচিয়া উঠার দরুণ পাশের কণাগুলিও নাচিয়া উঠিবে। নীচের ছবিতে ইহা দেখান হইয়াছে। কণাগুলি এইভাবে নাচিয়া উঠার জন্য বস্তুটির মধ্যে তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়া তাহা বাহিরেরদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। দুইটি বড় তীর চিহ্ন দিয়া এই তরঙ্গ চলিয়া যাইবার দুইটি দিক দেখান হইয়াছে। পাশের ও নীচের ছবিটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে একটি ব্যাপার তোমরা লক্ষ্য করিবে ; উপর দিকে যে তরঙ্গটি চলিয়া যাইতেছে তাহাতে কণাগুলি নাচিতেছে তরঙ্গটি চলিয়া যাইবার দিকেই অথচ





পাশের দিকে যে তরঙ্গটি যাইতেছে তাহাতে কিন্তু সেরূপ হইতেছে না। এখানে কণাগুলি

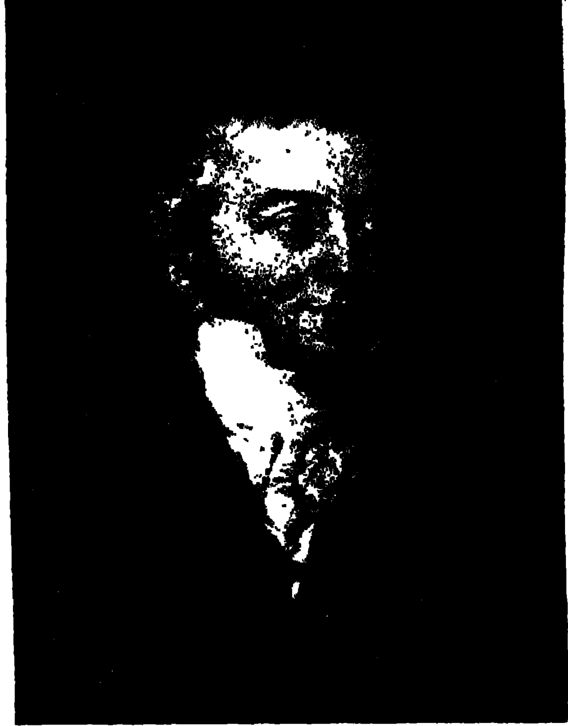
নাচিতেছে তরঙ্গটির যাইবার দিকের সমকোণে (at right angles)। অতএব তোমরা দেখিলে যে, কোনও বস্তুর মধ্যে দুই রকমের তরঙ্গ উঠিতে পারে। প্রথমরূপ তরঙ্গ তাহাকেই বলা হয়, যখন এই তরঙ্গটির গতি এবং কণাগুলির স্পন্দন এক দিকেই হয়। অপর পক্ষে যখন তরঙ্গটির গতি ও কণাগুলির স্পন্দন পরস্পরের সমকোণে (at right angles) হয়, তখন তাহাকে দ্বিতীয় রকমের তরঙ্গ বলা হয়। প্রথম রকমের তরঙ্গের বৈজ্ঞানিক নাম longitudinal waves এবং দ্বিতীয়টির নাম Transverse waves। নাম যাহাই হউক না কেন, ব্যাপারটা এমন কিছু কঠিন নয়। শব্দ তৈয়ারী হইতে হইলে



আলোকের তির্য্যক তরঙ্গ

বাতাসের মধ্যে কণাগুলিকে স্পন্দিত হইতে হয় প্রথম রকম ভাবে। কিন্তু আলো তৈয়ারী হইতে হইলে ঈথারের কণার স্পন্দন হয় দ্বিতীয়ভাবে। বিজ্ঞানের ভাষায় শব্দের ঢেউ-এর নাম longitudinal waves আর আলোর ঢেউ-এর নাম transverse waves.

আলো যে তরঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট, তাহার নাচিবার বা স্পন্দিত হইবার রকম যে এইরূপ তাহা ধরিয়া দেন একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক। ইঁহার নাম টমাস ইয়ং (Thomas Young)। ইয়ংএর জন্ম হয় ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে। বলা হয় যে, ইয়ংযের মত প্রতিভা লইয়া তাঁহার সমকালে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি চিকিৎসক ছিলেন এবং লণ্ডনে ডাক্তারী করিতেন। কিন্তু একটিমাত্র বিষয়ে আবদ্ধ থাকা ইঁহার স্বভাব ছিল না। চিকিৎসা-শাস্ত্রে ত বিশেষজ্ঞ ছিলেনই, অন্যান্য বিজ্ঞানও অনেক পড়িয়াছিলেন। তাহার উপর শিশুকাল হইতেই ভাষা শিক্ষার দিকে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল এবং সে বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতাও দেখাইয়াছিলেন। একশত বৎসরের উপর



টমাস ইয়ং

ধরিয়া বৈজ্ঞানিকেরা নিউটনের মতের অনুসরণ করিয়া বলিতেন যে, প্রজ্বলিত বস্তু হইতে বস্তুকণার মত কোনও কিছু ছুটিয়া আসিয়া আমাদের চোখে পড়িলে আমরা আলো দেখি। ইয়ং দেখাইলেন যে, তাহা হইতে পারে না। হুইগেন্স যেমন বলিয়াছিলেন, আলোক-রশ্মির তরঙ্গ হওয়াই অধিক সম্ভাবনা। দুইটি বস্তু এক সঙ্গে এক স্থানে একই মুহূর্ত্তে কখনও থাকিতে পারে না। ইহা বিজ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ। অথচ দুইটি তরঙ্গ একস্থানে এক মুহূর্ত্তে এক সঙ্গে হওয়া সম্ভব। অতএব তরঙ্গ বস্তু হইতে পারে না। ইয়ং আলোক-

রশ্মি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখান যে, তাহারা একস্থানে একই মুহূর্ত্তে একসঙ্গে হইতে পারে। এইভাবে আলো যে বস্তু হইতে পারে না, তাহা তিনি নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করেন। হুইগেন্সের ভাগ্যে যেরূপ ঘটিয়াছিল সেইরূপ ইঁহারও কথা প্রথমতঃ লোকে গ্রহণ করে নাই। লোকে ইঁহাকে আলোকে তরঙ্গ-ধর্ম্মী বলার জন্য উপহাস করিত। তাহাতে তিনি বিজ্ঞানের গবেষণা পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাস ও লিপিতত্ত্বে মন দিয়াছিলেন। তাহারই ফলস্বরূপ এখন লোকে ইজিপ্টের লিপি পড়িতে পারিতেছে। ইয়ং বিজ্ঞান অনুশীলন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন বলিয়া বিজ্ঞান হয়ত কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে অন্য দিকে যে প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহাও সামান্য নহে। ইজিপ্টের চিত্র-লিপি hi-er-oglyph কিভাবে পড়িতে পারা সম্ভব হইবে তাহার প্রথম সন্ধান ইঁহারই অসাধারণ প্রতিভাবলে লোকসমাজে প্রচারিত হয়। জগতের মঙ্গল কোন পথে কখন্ কিভাবে প্রবাহিত হয় তাহা কে বলিয়া দিতে পারে?

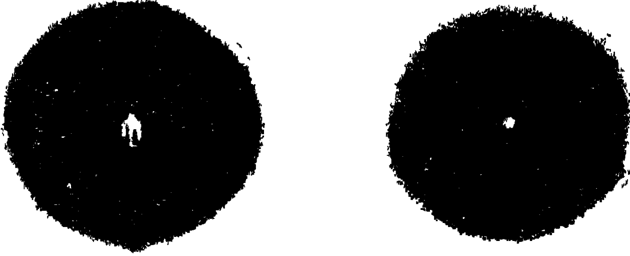
সে যাহাই হৌক, হুইগেন্স এবং ইয়ং অত্যন্ত চেষ্টা করিয়াও যে কথা বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃত করাইতে সমর্থ হন নাই, ফরাসী বৈজ্ঞানিক অগাস্তাঁ ফ্রেনেল আসিয়া তাহা নিষ্পন্ন করিলেন। এইজন্য ফ্রেনেলকেই কেহ কেহ "আলো" যে তরঙ্গ, এই কল্পনা বা "উপপত্তির" স্রষ্টা বলেন। ফ্রেনেল নরম্যাণ্ডির (Normandy) লোক ছিলেন। ছেলেবেলায় বিদ্যালয়ে ইঁহার খ্যাতি হইয়াছিল পড়াশুনায় ভাল ছেলে বলিয়া নহে—পড়াশুনা করিতে পারেন না বলিয়া। ইনি কোনও দিন কিছু করিতে পারিবেন এ ধারণা ইঁহার শিক্ষকদের ছিল না। এইজন্য ইঁহার অভিভাবকেরা ইঁহার ১৭ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে ইঁহাকে একটি কারিগরি বিদ্যালয়ে (Technical High School) ভর্ত্তি করিয়া দেন। এখানে আসিয়াই ইঁহার বুদ্ধি খুলিয়া গেল। গণিত এবং বিজ্ঞানে ইঁহার প্রতিভার বিকাশ দেখা দিল এবং বিশ বৎসর বয়সে এঞ্জিনিয়ার হইয়া সরকারী চাকুরীতে ঢুকিলেন। ফ্রেনেলের স্বাস্থ্য জন্মাবধিই ভাল ছিল না, তাহা সত্ত্বেও দুর্ব্বল শরীরেই ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান যখন এল্‌বা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন তাঁহাকে প্যারী নগরে ঢুকিবার সময় যাহারা বাধা দিয়াছিলেন ফ্রেনেল সেই দলে যোগ দিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহাকে আধ-মরা অবস্থায় বন্দী করিয়া লন। বন্দী করিলেও ইঁহার প্রতি খুবই ভদ্র ব্যবহার করা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।



অগাস্তাঁ ফ্রেনেল

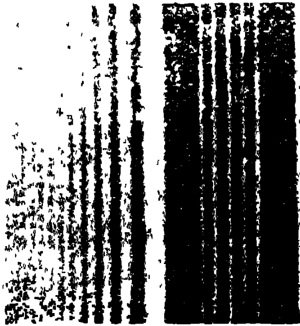
ইহার পর ইনি আলোকবিজ্ঞানে মনোনিবেশ করেন। তিনি নয় বৎসর ধরিয়া গণিত এবং পরীক্ষা উভয় দিক দিয়াই পর পর যে সমস্ত অদ্ভুত গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে এখনও বিস্মিত হইতে হয়। আলোক-রশ্মি সোজা পথেই চলে, বাধা পাইলে বাঁকিয়া যায় না।

আলো যদি ঢেউ হয়, তাহা হইলে তাহার বাঁকিয়া যাওয়া উচিত। যাহা বাধা দিতেছে, তাহার ছায়ার মধ্যেও আলো পাওয়া উচিত। ছায়ার ভিতরেও আলোকের ঢেউ ভাঙ্গিয়া গিয়া ঢুকিয়া যায়, ফ্রেনেল তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখান। তাঁহার আর একটি কাজের কথা তোমাদের কাছে বলিতেছি। এখন পর্য্যন্ত কলেজের ছাত্রেরা এই পরীক্ষাটিকে তাহাদের



ইহা একটি গোল চাকৃতির ছায়া। ছায়াটির মধ্যে শাদা দাগটি দেখিয়া মনে হয় যে, চাকৃতিটির মধ্যে ছিদ্র বর্ত্তমান। বাস্তবিক পক্ষে গোল চাকৃতিতে একটুও ছিদ্র নাই। আলোর ঢেউ চাকৃতিতে লাগিবার পর ভাঙ্গিয়া গিয়া ছায়াটির মধ্যে ঢুকিয়া এই কাণ্ডটি করিয়া তুলিয়াছে।

পরীক্ষাগারে (Laboratory) হাতে-কলমে নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। দুইটি খুব পাতলা



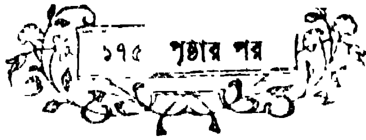
দুইটি একই রকমের আলোক দুই দিক দিয়া এক স্থানে একই সময়ে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। মিলিত হইবার পর স্থানটি দ্বিগুণ ভাবে আলোকিত না হইয়া খানিকটা অন্ধকার ও খানিকটা আলো এইরূপ হইয়া যায়।

প্রিস্ম দিয়া একটি দীপশিখা হইতে দুইটি আলোক-রশ্মিকে লইয়া একস্থানে তাহাদের একত্র করা হইল। যে স্থানে রশ্মি একত্র হইল রশ্মিটি বস্তু-কণা দ্বারা গঠিত হইলে সেই স্থানের সর্ব্বত্র সমানভাবে দুই গুণ আলো হইবে। ফ্রেনেল দেখাইলেন যে, তাহা হয় না। রশ্মিটি মূলতঃ ঢেউ হইলে যেরূপ হওয়ার কথা, খানিকটা আলো ও খানিকটা অন্ধকার —অবিকল। সেইরূপই হইতেছে। দুইটি আলো সমানভাবে মিশিয়া খানিকটা আলো ও খানিকটা অন্ধকার সৃষ্টি করার একটি ছবি এখানে দেওয়া হইল।

ফ্রেনেল সম্বন্ধে আর একটি কথা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বিজ্ঞানের চেয়েও এ জগতে আর একটি বড় জিনিস আছে। তাহা চরিত্র। মানুষের চরিত্র মানুষের বুদ্ধির চেয়ে উচ্চ আসনের অধিকারী। কিন্তু যখন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও উন্নত চরিত্র একই লোকের মধ্যে আসন লয়, তখন তাহার তুলনা হয় না। এই ফরাসী যুবকটি, যাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা এই মাত্র জানিলে, তাঁহার মধ্যে এই দুইটি গুণই সমানভাবে মিশিয়াছিল। ফ্রেনেল আলোক সম্বন্ধে গবেষণাগুলি নিজে স্বাধীনভাবে করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন যে, ইংলণ্ডে একজন লোক ঐ ধরণের গবেষণা করিয়া তাঁহার মত কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, তখন তিনি তাহাকে শুধু স্বীকার করিয়া লইলেন, তাহাই নহে ; বরং ইয়ং-এর প্রতি তাঁহার দেশবাসীরা যে অন্যায় করিয়াছিল সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নিজের সমস্ত গবেষণা মৌলিক বলিতে পারিলে তিনি বিজ্ঞান-জগতে খুব বড় হইতেন, সন্দেহ নাই, এবং ইচ্ছা করিলে তাহা তিনি পারিতেনও, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে টমাস ইয়ংকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়া তিনি বিজ্ঞান-জগৎ হইতেও আর এক বৃহত্তর জগতে বড় হইয়া গেলেন।



স্যামুয়েল বেকার


১৭৫ পৃষ্ঠার পর

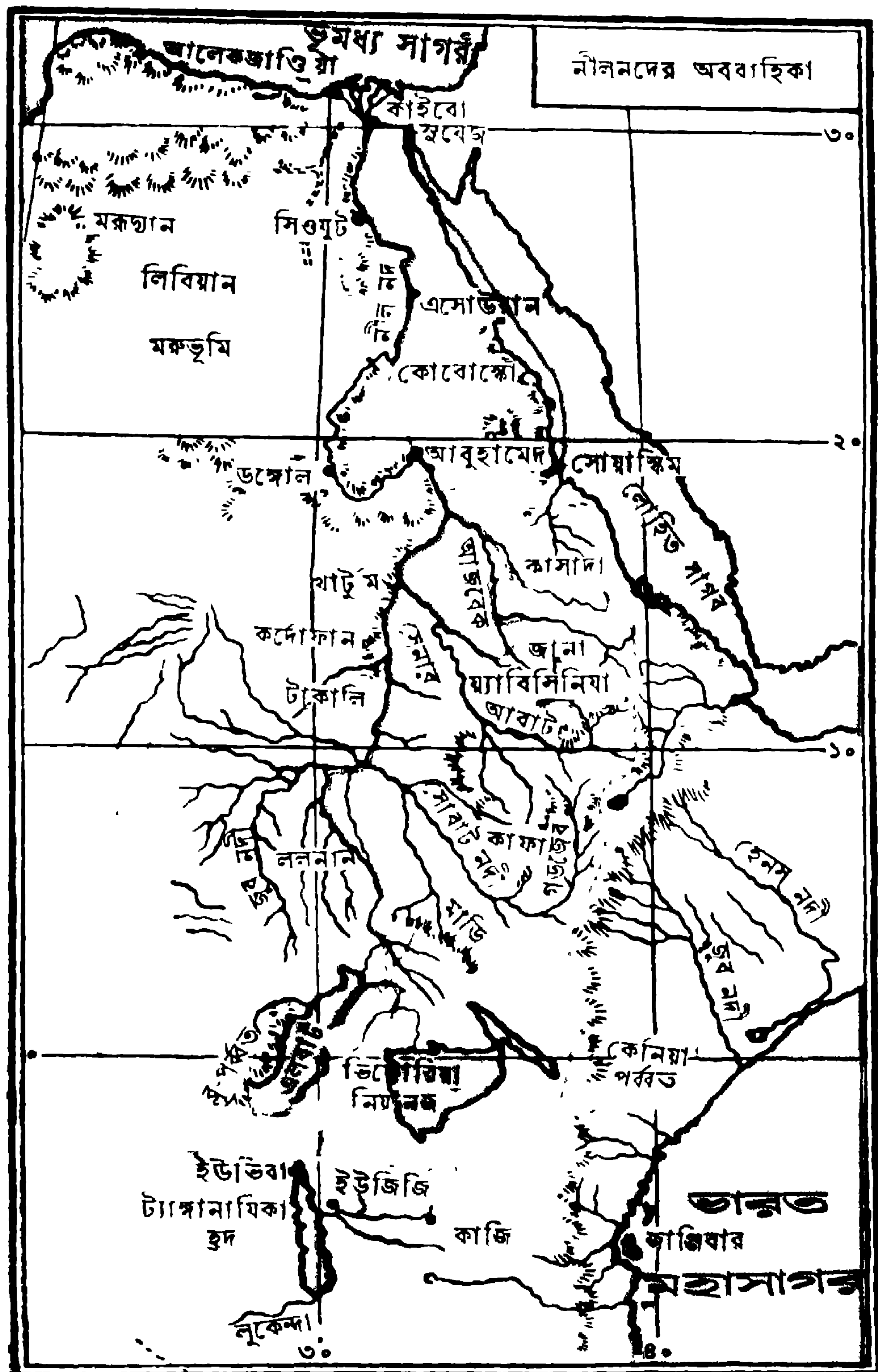
প্রত্যেক যুগেই পৃথিবীতে এমন একদল ছেলে জন্ম লাভ করে, যাহাদের অজানাকে জানিবার, অচেনাকে চিনিবার আগ্রহ অপরিসীম। কিন্তু এই যে ছোট্ট ছেলেটি—যাহার মাথায় ছিল একরাশ সোনালী কোঁকড়ান চুল, শরতের আকাশের চাইতেও সুনীল, নির্মল চোখদুটির চাউনি ছিল নির্ভীক্ অথচ দুষ্টুমিতে ভরা, সে ছেলেটি কিন্তু কোন জিনিস কেবলমাত্র জানিতে চাহিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত না, নিজের যথাশক্তি নিয়োজিত করিয়া যথাসম্ভব জানিয়া তবে ক্ষান্ত হইত। এই ছেলেটির নাম স্যামুয়েল হোয়াইট বেকার (Smuel White Baker)। বাল্যকালেই তাহার এই কৌতূহলী স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।





বেকার ও তাঁহার পত্নী

বাজী পোড়ান দেখিতে বালক স্যামুয়েলের খুবই মজা লাগিত। তবে কেন সে নিজেই বাজী তৈরী করিতে পারিবে না? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। পটকা তৈরী করা এমন কি আর শক্ত ব্যাপার। কাজেই স্যামুয়েল সেটা সহজেই প্রস্তুত করিল। ভাইবোনেরাও পরম উৎসাহের সহিত দাদার এই অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিতে লাগিল। তৈরী করা শেষ হইয়া গেলে মোম বাতির শিখায় ধরিয়া সেটাকে গৃহমধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ফট্ ফটাস্ শব্দ করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া বাজিটা পুড়িতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত তো বেশ। এদিকে একটা দারুণ ভুল হইয়া গিয়াছিল। একগাদা বারুদ টেবিলের উপর জড় করা ছিল। কয়েক মিনিট পরে বারুদ বিস্ফোরণের ভীষণ শব্দ। ভাগ্যক্রমে একজন চাকর অন্যান্য ভাইবোনেদের যথাসময়ে স্থানান্তরিত করিতে পারিয়াছিল, তাই তাহারা যে যাত্রা অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পাইল। বেচারা স্যামুয়েলের বাহুদুটি একেবারে পুড়িয়া গেল, চোখদুটিও আরেকটু হইলেই নষ্ট হইয়া



নীলনদের অববাহিকা
ভূমধ্য সাগর
আলেকজান্দ্রিয়া
কাইরো
সুয়েজ
৩০
মরূদ্যান
সিওয়ুট
লিবিয়ান
মরুভূমি
এসোউয়ান
কোরোস্কো
২০
আবুহামেদ
সোয়াকিম
ডঙ্গোল
কাসালা
খার্টুম
কর্দোফান
অ্যাবিসিনিয়া
টাকালি
১০
কাফা
ললনান
কেনিয়া
পর্বত
ভিক্টোরিয়া
নিয়ানজা
ইউভিরা
ইউজিজি
ট্যাঙ্গানায়িকা
হ্রদ
কাজি
ভারত
জাঞ্জিবার
মহাসাগর
লুকেন্দা
৩০
৪০

ছেলেবেলাকার এই দুঃসাহসিক কার্য্যের ফল এইরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। পরবর্ত্তী জীবনে বেকার আরও বহু সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তখন ফল এত শোচনীয় হয় নাই, বরং বহু সুফল ফলিয়াছিল।

বেকারের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন এলিজাবেথের আমলের নাবিক—কাজেই, দেশ বিদেশে ভ্রমণের নেশাটা বেকারের রক্ত-ধারায় প্রবাহিত ছিল। ১৮২১ খৃঃ অব্দের জুন মাসে লণ্ডন সহরে বেকারের জন্ম হয়। স্কুলে ভাল ছেলে হিসাবে বেকারের নাম ছিল না, কিন্তু সাহসী ছেলে হিসাবে ছিল। স্যামুয়েল বিদ্যালয়ের দুর্ব্বল ছেলেদের পক্ষ হইয়া লড়িতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। কেহ অন্যায় করিয়া তাঁহার হাত এড়াইতে পারিত না। কয়েক বৎসর গ্লষ্টারের কলেজস্কুলে অধ্যয়ন করিবার পর স্যামুয়েলকে স্কুল ছাড়াইয়া বাড়িতে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। পাঠে বিশেষ মনোযোগ না থাকিলেও তিনি ভূগোল ও ভূতত্ত্ব পড়িতে বিশেষ ভালবাসিতেন। ভবিষ্যতে এই উভয় বিদ্যাই তাঁহার বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল।

জার্ম্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্ট নামক স্থানে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যখন তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন, তখন বেকার সুস্থদেহ, সুদর্শন যুবক—উচ্চাশায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। স্যামুয়েলের পিতা পুত্রের স্বভাব ঠিক বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে লণ্ডনে নিজের ব্যবসা-কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিলেন। এ যেন দুরন্ত অশ্বকে বদ্ধ আস্তাবলে আটক করিয়া রাখা। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে হেনরিয়েটা মার্টিনের সহিত বিবাহের পর স্যামুয়েল মরিসাস দ্বীপে পলাইয়া যান। সেখানে তাঁহার পিতার অনেকগুলি আবাদ জমি ছিল।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সৌন্দর্য্যে স্যামুয়েলের মন মোহিত হইল। দেশ-বিদেশে ভ্রমণের ও নূতন দেশ আবিষ্কার করিবার আকাঙ্ক্ষা তখন তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। "দেশ-ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা আমার অস্থি-মজ্জায় মিশান"—স্যামুয়েল নিজেই লিখিয়াছিলেন। তখনকার দিনে সিংহল দ্বীপে ইউরোপীয়দের বসবাস তত স্থাপিত হয় হয় নাই। স্যামুয়েল বেকার সপরিবারে তথায় গমন করিলেন।

সিংহলের বনে শিকার করিয়া বেকার পরম সুখেই ছিলেন। হয়ত আরও অনেক বছর থাকিতেন কিন্তু হঠাৎ প্রিয় পুত্রের মরণাপন্ন অসুখের খবর পাইয়া তাড়াতাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। পথে দুর্ঘটনাবশতঃ সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতে যাইতে ভাগ্যক্রমে তিনি বাঁচিয়া যান কিন্তু তাহার ফলে প্রবল জ্বর হয়। দীর্ঘকাল রোগভোগের পরে তিনি স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য সিংহলের নিউআরা-ইলিয়া (Newara Eliya) নামক স্থানে প্রেরিত হন। বেকারের এ জায়গাটি খুবই ভাল লাগিল। উর্ব্বর ভূমি, ঘন-সবুজ বৃক্ষবীথি, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু,—এসব দেখিয়া তিনি এস্থানে একটা ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপন করিবেন, স্থির করিলেন। শরীর একটু সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতেই তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া গেলেন এবং ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন হইতে দুটি ভাইকে ও সেই সঙ্গে বহুসংখ্যক অশ্ব, গাভী শূকর, কুকুর, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

বেকারের মত কর্ম্মপটু বুদ্ধিমান্ লোকের পক্ষে মনের ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া তোলা শক্ত কাজ নয়। সাত বৎসর পরে ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া বেকার যখন পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার স্থাপিত উপনিবেশের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং আজ তাহা একটি সমৃদ্ধ প্রদেশ। এ সমস্তই একজন সাহসী, বলিষ্ঠমনা ইংরাজের পরিশ্রমের ফল।

এই সময় বেকারের পত্নী-বিয়োগ হয়। আকস্মিক দারুণ শোকে বেকার নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ ও মুহ্যমান হইয়া পড়েন। শোক ভুলিবার জন্য, তিনি কিছুকাল ঘুরিয়া বেড়াইলেন; এবং কিছুকাল পরে বলকান্ রেলওয়ে কোম্পানীর অধীনে ম্যানেজারের কাজ গ্রহণ করিয়া ডেনিউব (Danube) হইতে কৃষ্ণসাগর (Black Sea) পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেলপথের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করেন। এইখানে এক ব্যাপারে বেকারের অসাধারণ সাহসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সমুদ্রে প্রবল ঝড়ের ফলে একটা জাহাজ ভগ্ন হয়। তীর হইতে বেকার দেখিতে পাইলেন, জলে একজন লোক বহু কষ্টে ভাসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছে। সমুদ্রের ঢেউ তখন এত উত্তাল

হইয়া উঠিয়াছে যে, কোন নৌকা বাহিয়া যাওয়া দুষ্কর। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া বেকার সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই লোকটিকে কাঁধে করিয়া নিরাপদে তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

মধ্য আফ্রিকার রহস্য ভেদের যে আয়োজন বহু বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা বেকার অত্যন্ত কৌতুহলের সহিত শুনিতেন। এই সময় অন্ধকার রাজ্যের রহস্যও অনেকটা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বার্টন বাহির করিলেন টাঙ্গানিকা হ্রদ। স্পেক্, ভিক্টোরিয়া নায়নজা Victoria Nayanza) যে নীলনদের উৎসস্থল, তাহা বাহির করিয়া বার্টনের অপেক্ষাও খ্যাতনামা হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার লিভিংষ্টোনের ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও সেই অজ্ঞাতদেশের অসীম রহস্য অনেক প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তখনও অনেক কিছু জানা বাকী। আরও দুর্গম, আরও দুঃসাধ্য সে পথ। বেকারের মন সেই অজানা, অচেনা দেশের রহস্য-সন্ধানের জন্য উতলা হইয়া

নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও বেকার একথা ভাল করিয়াই জানিতেন যে, আফ্রিকার বিপৎসঙ্কুল অভিযানের জন্য আরও অভিজ্ঞতা দরকার। কাজেই, বেকার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন।

দ্বিতীয়া পত্নীকে (১৮৬০ খৃঃ অব্দে তিনি মিস্ ফ্লোরেন্স ভন সাস্‌কে বিবাহ করেন) সঙ্গে লইয়া তিনি সমগ্র আবিসিনিয়া প্রদেশ ভ্রমণ করেন এবং নীলনদের সমস্ত শাখা-প্রশাখা আবিষ্কার করেন। এ ভ্রমণে বেকারের যথেষ্ট উপকার হয়। সাধারণেও তাহার ফলে ঐ প্রদেশ সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য জানিতে পারেন। তিনি কিন্তু আফ্রিকার ভ্রমণের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার আশায়ই ইহা করিয়াছিলেন।

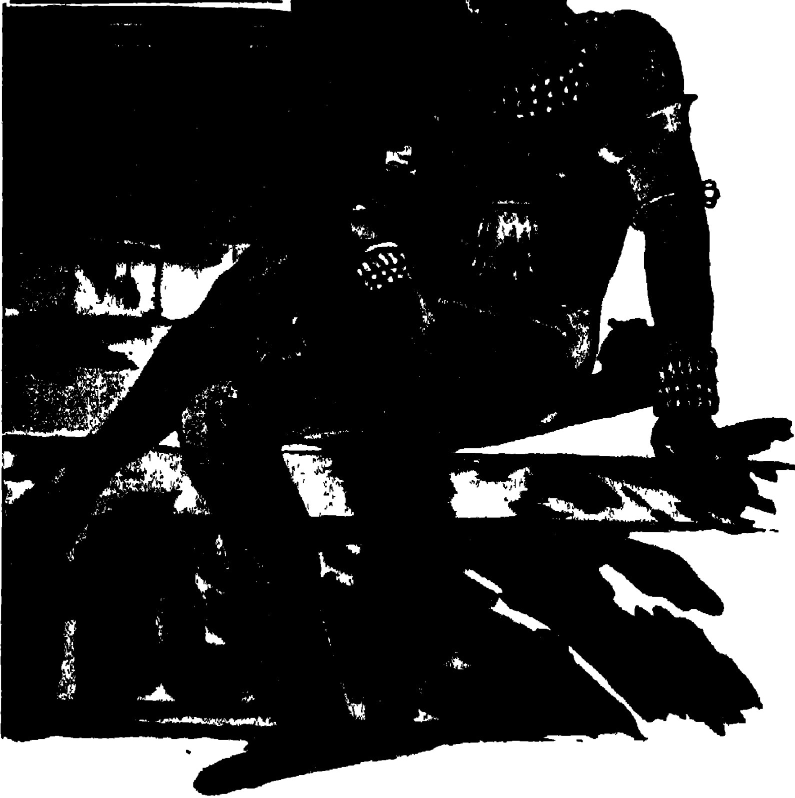
তিনিই প্রথম এ তথ্য আবিষ্কার করিলেন যে, নীলনদের প্লাবন—যাহার ফলে মিশরের ভূমি অত উর্ব্বরা, তাহা মধ্য অফ্রিকার হ্রদগুলির দ্বারাই হয় না। ইহার কারণ হইতেছে আবিসিনিয়ায় অবস্থিত নীলনদের শাখা ব্লু নাইল ও আটবারার (Blue Nile and Atbara) জলপ্রবাহ। বর্ষাকালে এই নদী দুটি কূলে কূলে ভরিয়া যায় এবং প্রবল উচ্ছ্বাসে বান ডাকে সেই জল-প্রবাহই আবার হোয়াইট নাইল-এ (White Nile) গিয়া পড়ে। তাহার ফলেই নীলনদের প্লাবনে দুকূল ভাসিয়া যায় এবং উর্ব্বর মিশর-ভূমি শস্যশ্যামলা হইয়া উঠে।

যে অভিজ্ঞতা লাভের আশায় বেকার আবিসিনিয়ায় গিয়াছিলেন তাহা লাভ হইল। এই অভিযানকাল এক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এত দুর্ঘটনা ও আকস্মিক বিপদের মুখে পড়েন যে, বেকার ইহার পর কিছুকাল নিরাপদে গৃহে থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সঙ্কল্প করিলে কি হইবে, অজানা দেশের মায়া ও বিপদের মুখে স্বেচ্ছায় ঝাঁপাইয়া পড়িবার অদম্য পিপাসা তাঁহার কিছুতেই মিটিল না। তিনি আবার আফ্রিকায় আসিলেন।

বেকারকে আফ্রিকার এই ভ্রমণে নানাদেশের ও গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে। কবে কোথায় গিয়াছেন, তাহার অতি সুন্দর বর্ণনা, তাঁহার The Albert N'yanza নামক গ্রন্থে আছে। সেদেশের লোকেরা তাঁহাকে নানারূপে যেমন সাহায্য করিয়াছে, তেমন অনেক সময় নানা-বিপদেও ফেলিয়াছে। 'নিউয়ার' (Nueher) দেশের লোকেরা অতিশয় অসভ্য এবং দুর্দ্দান্ত। ইহাদের আকৃতি যেমন ভীষণ, প্রকৃতিও ততোধিক ভীষণ। পর পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ, নিউয়ার সর্দ্দারের বলিষ্ঠ চেহারা। যেমন কদাকার তেমনি দুর্দ্দান্ত। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক ইহাদের সকলের সঙ্গেই এক একটা থলি ঝুলান থাকে। বিদেশীদের নিকট হইতে যাহা আদায় করিতে পারে তাহাই ঐ থলিতে পুরিয়া লয়।

বেকার অত্যন্ত শিকার-প্রিয় ছিলেন। মহিষ, হাতী, জিরাফ, সিংহ আরও অনেক হিংস্র জন্তু তিনি শিকার করিয়াছিলেন। শিকারে গিয়া একবার কিন্তু তিনি খুবই বিপদে পড়িয়াছিলেন। একটি বৃহৎ হস্তি-যূথ, সংখ্যায় প্রায় কুড়িটি হাতীর সম্মুখে তিনি আসিয়া পড়েন। হাতীগুলি শুঁড় দিয়া গাছের ডাল উপড়াইয়া তুলিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেছিল। ঘোড়া হইতে নামিয়া তিনি আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া বন্দুকটি হাতে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একেবারে সম্মুখে আসিয়া পড়িলেই গুলি করিবেন। এমন আসন্ন সময়ে একটা জিরাফ

যেটা এতক্ষণ লম্বা ঘাসের উপর চার পা ছড়াইয়া আরামে ঘুমাইতেছিল—হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইল। হাতীর দল এই আকস্মিক ব্যাপারে চমকিত হইয়া বেকারের সম্মুখের দিকে অগ্রসর না হইয়া অন্যদিকে চলিতে লাগিল। বেকার তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া তাহাদের যাত্রাপথ হইতে পলায়ন করিতে চাহিলেন। কিন্তু কয়েক গজ না যাইতেই দুর্ভাগ্যবশতঃ আবার হাতীর দলের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন। একটা মস্ত বড় হাতী সোজা তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল। (পর পৃষ্ঠায় ছবি দেখ) আশ্চর্য্য সাহসের সহিত বেকার নিশ্চল হইয়া হাতীটার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আসিবামাত্রই একসঙ্গে কয়েকটা গুলি করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ হাতীটা তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। পরে কি ঘটিল সে ব্যাপারটা বেকারের নিজের ভাষায় বর্ণনা করাই ভাল :—



নিউয়ার সর্দ্দার

"তখনও সমস্ত হস্তি-যূথ আমার নিকট হইতে প্রায় তিনশত গজ দূরে। আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়ে প্রাণপণ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমি হাতীগুলির কাছাকাছি এসে পড়লাম। ওদের ফেলে এগিয়ে যাবার জন্য আমি আরও জোরে ঘোড়া ছুটালাম। এমন সময় আমার ঘোড়াটা হঠাৎ ডিগবাজী খেয়ে পড়ে গেল। তারপর মাথায় আহত, হতবুদ্ধি আমাকে হাতীর দলের মুখে ফেলে রেখে নক্ষত্রবেগে ছুটে পালিয়ে গেল। আমার জীবনের কোন আশাই ছিল না। এই বুঝি হাতীর দল আমাকে থেঁৎলে চেপ্টা করে মেরে ফেলে। কিন্তু আশ্চর্য্য, হাতীর দল কিছুই করল না। এসব ব্যাপার দেখে বরং ভয় পেয়ে দলশুদ্ধ দ্রুতপদে পালিয়ে গেল।"

আরবেরা বন্দুক দিয়া শিকার করে না, তরবারী দ্বারা করে। ইহাতে তাহাদের অসাধারণ নিপুণতা আছে। নিজে বীর শিকারী ছিলেন, কাজেই বেকার আরবদের অশ্ব-বিদ্যায় পারদর্শিতা, সাহস, স্থৈর্য্য, বীরত্ব অসাধারণ মিত্রতা প্রভৃতি গুণের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন।

বেকার যে কেবল শিকারে গিয়াই একবার অল্পের জন্য মৃত্যুমুখ এড়াইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা নহে। একদিন তিনি বন্দুকগুলি পরিষ্কার করিতেছিলেন, পরিষ্কার করিবার আগে অন্যান্য বন্দুকগুলি প্রথমে ছুড়িয়া খালি করিয়া লইলেন। শেষের বন্দুকটার বেলায় কি তাঁর খেয়াল হইল একটা গাছে সেটাকে ঝুলাইয়া একটা ছিপের বাঁটের সাহায্যে দূর হইতে বন্দুকের ঘোড়া ধরিয়া টানিলেন। ভীষণ শব্দে বন্দুকটা ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল। ভগবান্ যেন সেইজন্যই বিপদ বুঝিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

বেকার চিকিৎসা-বিদ্যাও অল্পস্বল্প জানিতেন।

কাজেই, যেখানে যাইতেন সেইখানেই সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি পূর্ব্বেই রটিয়া যাইত। রোগ-মুক্ত হইয়া তাঁহার রোগীরা তাঁহাকে প্রায়ই মোরগ উপহার দিত। প্রথমতঃ তিনি এ উপহার গ্রহণ করিতে চাহিতেন না কিন্তু তাহারা কিছুতেই ছাড়িত না, তাঁবু পর্য্যন্ত আসিয়া নিজেরা মুরগী ছাড়িয়া দিয়া যাইত; অগত্যা তিনি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন।

দেশীয় লোকেরা সাধারণঃ তাঁহার সহিত অত্যন্ত ভদ্র ও বন্ধু ব্যবহার করিত; কিন্তু মাঝে মাঝে এক একজন দেশীয় সর্দ্দার বেকার ও তঁাহার সঙ্গী-গণের আসিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিত। সাধারণতঃ এ সকল ব্যাপার স্যামুয়েল বেকার অতি সহজেই সুকৌশলে মিটাইয়া ফেলিতেন। একবার কিন্তু ব্যাপার বিষম গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাঁহারা একটা গ্রামে বাস করিতেছিলেন। সে গ্রামের লোকেরা বেকারকে তুর্কী ভাবিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। একজন বিরাটকায় দেশীয় লোক মস্ত একখানা ছোরা হস্তে আসিয়া বেকারকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করে। বেকার সেই মুহূর্ত্তেই লোকটার নিকট অগ্রসর হইয়া লোকটাকে লাথি মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। এই অসম-সাহসিকতা দেখিয়া লোকটার অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গরাও ভীত হইয়া বেকারের নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিল। তাহাদেরও ভয় হইল, না জানি এই শাদা মানুষটা তাহাদিগকে মুরগী-ছানার মত অতি সহজেই গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে।



একটা মস্ত বড় হাতী সোজা তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল

এদেশে কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একজন সর্দ্দারের আধিপত্য। কোন কোন সর্দ্দার পাঁচ সাত হাজার গ্রামের উপরও প্রভুত্ব করে। আর এ দেশে নানা জাতির বাস। কতকগুলি ভয়ানক হিংস্র প্রকৃতিরও আছে। তারপর রীতি নীতি, চলা ফেরা সম্পর্কে ও পরস্পরের মিল দেখা যায় না। ভাষাও অনেক সময় ভিন্ন। এখানে বারি (Bari Tribe) জাতীয় লোকের স্ত্রী-পুরুষের ও গ্রামের একটি বাড়ির ছবি দেওয়া হইল। তারপর এক দেশের সর্দ্দারদের সঙ্গে অন্যদেশের সর্দ্দারদের যুদ্ধ প্রায়ই লাগিয়াই আছে। এ দেশের যোদ্ধারা একরূপ ঢাল ও বর্শা হাতে করিয়া যুদ্ধ করে। তীর ধনুকের প্রচলনও খুবই বেশি।

একবার একটা যুদ্ধের পর বেকারের লাটুকা জাতির লোকদের 'শ্মশান-নৃত্য' (The Funeral Dance) দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। যুদ্ধে যে সকল লোক মারা পড়িয়াছিল, তাহাদের পারলৌকিক সদ্গতির জন্য ইহারা নৃত্য করিতে থাকে। নাগারা পিটিয়া, শিঙ্গা ফুঁকিয়া গ্রামের সব পুরুষ ও নারী দলে দলে আসিয়া মিলিত হইল। তারপর বাজনার



বারি জাতির স্ত্রী, পুরুষ ও তাহাদের বাড়ী

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ও নারীরা চীৎকার করিতে করিতে সার বাঁধিয়া নাচিতে লাগিল। বেকারেরও উহাতে যোগ দিতে হইয়াছিল। সে কি তাণ্ডব নৃত্য! প্রলয় নাচন বলিলে এতটুকুও অত্যুক্তি হয় না। মৃতের উদ্দেশ্যে এই শ্মশান নৃত্য! সে কয়েক সপ্তাহ চলিবে। লাটুকাদের পুরুষ ও নারীর এই নৃত্যের মধ্যে যে একটা সুসামঞ্জস্য ভাব আছে, তাহাও নহে। বেকারের কাছে এই নৃত্য মন্দ লাগে নাই, তবে নাগারার বিকট ও গম্ভীর শব্দে এবং শত শত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বীভৎস চীৎকারে তাঁহার কাণে তালা লাগিয়াছিল।

নীলনদের শাখা আবিষ্কার করিবার সময়ই বেকার আরবীয় ভাষা শিখিয়াছিলেন ও তাহাদের আচার-ব্যবহার স্বভাব-চরিত্র সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে এই জ্ঞান মধ্য আফ্রিকা অভিযানে তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। খার্টুম পৌঁছিয়াই বেকারের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিল এবং তিনি অভিযানের উপযোগী বিধিব্যবস্থা করিতে ব্যগ্র হইলেন।

অন্যান্য অভিযান হইতে বেকারের দুই বিষয়ে বিভিন্ন। প্রথমতঃ, এই যাত্রার সংবাদ তিনি সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিলেন। কোন সংবাদপত্রেই জানান নাই এবং বাহিরের কোন অর্থসাহায্যও তিনি গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, তিনি নীলনদের উৎস পর্য্যন্ত যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন এবং যদি সম্ভব হয় উত্তর দিকের হ্রদগুলি পর্য্যন্ত যাইবেন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তিনি খার্টুম (Khartum) হইতে রওনা হইলেন। সঙ্গী লোকসংখ্যা প্রায় একশত জন ছিল। বেকার এই বৃহৎ দলের প্রায় কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু এ ছাড়া বিশ্বাসী অন্য কাহাকেও পাওয়া গেল না। লোকদের খুসী রাখিবার জন্য প্রত্যেককেই প্রায় তিন চার মাসের

বেতন অগ্রিম দেওয়া হইয়াছিল। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই বেকারের সন্দেহ সত্য হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ, বেকারকে সদলবলে এমন সব জায়গার ভিতর দিয়া যাইতে হইল—যেখানে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল। প্রায় সকলেই বেকারকে গুপ্তচর বলিয়া ভুল সন্দেহ করিত এবং তাঁহার দলের লোকদের বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে উত্তেজিত করিত। অভিযানের মুখে সঙ্গের লোকদের বিশ্বাসঘাতকতায় ও কাপুরুষতায় তিনি অনেকবার বহু বিপদে পড়েন। গণ্ডকোরোতে (Gondokoro) পৌঁছিয়াই দলের লোকেরা তাহাদের গরু চুরি করার অনুমতি না দিয়াছিলেন। কয়েকজন দেশীয় লোকদ্বারা তিনি স্বামীর চতুর্দ্দিকে এক দেহরক্ষীর দল সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। উত্তেজিত জনতাও এই আকস্মিক ব্যাপারে অনেকটা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। কাজেই, বেকার সহজেই শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইলেন। সে যাত্রা বেকার পত্নীর এইরূপ সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যই বাঁচিয়া যান।

গণ্ডকোরো (Gondokoro) থাকিতেই বেকার শুনিতে পাইলেন যে, দক্ষিণ হইতে একদল যাত্রী আসিতেছে, তাহাদের সঙ্গে দুইজন শ্বেতাঙ্গও আছেন। এই দুইজন হইতেছেন স্পেক্ ও গ্রাণ্ট।



শ্মশান নৃত্য

দেওয়ার অজুহাতে বিদ্রোহ করিল। বেকার অবশ্য এ ব্যাপারে মোটেই বিস্মিত হইলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি দলপতিকে স্বহস্তে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে ধরিতে গেলেন। এমন সময় চারিদিক হইতে লোকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। এই আসন্ন বিপদের মুহূর্ত্তে বেকারের স্ত্রী উন্মত্ত লোকগুলিকে সরাইয়া স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই ব্যাপারে বেকারের পত্নী অসাধারণ মানসিক স্থৈর্য্যের পরিচয় তাঁহারা তখন নীলনদ ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হইতে বাহির হইয়া যে বিপন প্রপাতে পড়িয়াছিল, তাহা আবিষ্কার করিয়া আসিয়াছিলেন। স্পেকের নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তনে অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া সত্ত্বেও বেকার এই ভাবিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন যে, তাঁহার জন্য নূতন কিছু আবিষ্কারের আর বাকী রহিল না! পরমবন্ধু স্পেকের মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া ঈষৎ ক্ষুণ্ণস্বরে বেকার প্রশ্ন করিলেন—

"বিজয়-মাল্যের সবটা কি তুমি একাই নিয়ে নিলে? আমার জন্য তার একটি ফুলও কি বাকী নেই ?" বেকারকে উৎসাহিত করিয়া স্পেক্ জবাব দিলেন— "এখনও বহু বাকী আছে।" ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদ যে নীলনদের প্রধান উৎস, এ বিষয়ে স্পেকের কোন সন্দেহই ছিল না। তবে তাঁহার বিশ্বাস,



লাটুকা পুরুষ ও নারী

আরও উত্তরে অবস্থিত এক হ্রদ হইতেও নীলনদের জল সরবরাহ হইয়া থাকে। তিনি ও গ্রাণ্ট সে হ্রদ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তবে নানা কারণে, দেশীয় লোকদের বিদ্রোহে ব্যস্ত থাকাতে অতদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই দুই আবিষ্কারক স্পেক্ ও গ্রাণ্ট বেকারকে সেই হ্রদ পর্য্যন্ত যাত্রাপথ সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন এবং তিনি যেন নীলনদের সম্বন্ধে সমুদয় রহস্য সত্বরই উদ্ঘাটিত করিতে পারেন, এই ভরসা দিয়া বেকারকে পরম উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন।

স্পেক্ ও গ্রাণ্টের পথপ্রদর্শক মহম্মদকে সঙ্গে লইয়া বেকার এই অভিযান সুরু করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মহম্মদ সাহায্য করিবার পরিবর্ত্তে সঙ্গী ভৃত্যদের উত্তেজিত করিতে লাগিল। তাহার ফলে সঙ্গীদলের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং দলের লোকেরা কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। বেকার এসব ব্যাপারে অতিরিক্ত অভ্যস্ত থাকায় কালবিলম্ব না করিয়া দলপতির নিকট গিয়া বন্দুকটি চাহিলেন। লোকটা বেকারের কথা অমান্য করিল দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুষ্ট্যাঘাতে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিলেন। কাজেই, বিদ্রোহটা ভাল করিয়া আরম্ভ না হইতেই সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল।

আর একবার বেকারের দেশীয় ভৃত্যেরা প্রভুকে ফেলিয়া একজন উদ্ধত আরব ব্যবসায়ীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। এই হীন বিশ্বাসঘাতকতায় বেকারের এত রাগ হইয়াছিল যে, তিনি আর একটু হইলেই আরবটার মাথায় গুলি চালাইতেন। কিন্তু পত্নীর অনুনয়ে তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং ক্রোধবশে তাহা না করিয়া বেকার খুবই ভাল করিয়াছিলেন। সে যাত্রার অভিযান তাহা হইলে সেইখানেই শেষ হইত। বেকার-পত্নী বুঝিলেন, আরব দলপতির সহিত মিত্রতা করা ব্যতীত উপায় নাই। তাই তিনি দলপতিকে নানা উপঢৌকন দানে সন্তুষ্ট করিয়া একসঙ্গে উভয়দল যাত্রা করিবেন, স্থির করিলেন।

বেকার-পত্নী আরব-দলপতির সহিত প্রীতির বন্ধন স্থাপন করিয়া ভালই করিয়াছিলেন। পথে কেয়ালা

(Kayala) নামক স্থানে লাটুকাদের সহিত আরবদের যুদ্ধ হইয়াছিল। সে যুদ্ধে বেকারকে কোনরূপ বিপদ-গ্রস্ত হইতে হয় নাই। লাটুকারা শেষটায় পরাজিত হইলেও অসাধারণ সাহসিকতার সহিত নগর রক্ষা করিয়াছিল। আরবেরা কেয়ালা নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। লাটুকারা যেমন সাহসী তেমনি যুদ্ধনিপুণ জাতি। ইহাদের পুরুষ ও নারী সকলেই বলিষ্ঠ, দুর্দ্দান্ত এবং রক্ত-



আরবদের সহিত লাটুকাদের যুদ্ধ

পিপাসু। যুদ্ধকে ইহারা একেবারেই ভয় করে না। আরবেরা শেষটায় বাধ্য হইয়া যুদ্ধে নিরস্ত হইয়াছিল।

ইহার পর হইতে বেকার কে শত্রু, কে মিত্র, কিছুই স্থির করিতে পারিতেন না। এ সময় দাসব্যব-সায়ীদের সহিত বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে মিত্রতা করিতে হইল। কাজেই, দেশীয় লোকেরা বেকারের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। এদিকে দাসব্যবসায়ীরাও বেকারকে নিতান্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিত। কয়েক মাস কাল তিনি অতি সন্তর্পণে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া আর পত্নীর সাহসে উজ্জীবিত হইয়া কোন রকমে প্রাণে বাঁচিতে পারিয়া-ছিলেন। এই পথে তিনি মাঝে মাঝে শিকারও করিয়াছিলেন। জিরাফ শিকার করিতে তাঁহার খুব উৎসাহ দেখা যাইত। জিরাফেরা ভীষণ বেগে দৌড়াইয়া যাইত, আর তিনিও তাহাদের পিছু পিছু ছুটিতেন। কখনও দুই একটি জিরাফ মারিতে পারিতেন, কখনও তাহা পারিতেন না। কিন্তু জিরাফদের পিছনে ছুটিতে কি জানি কেন তাঁহার খুব আনন্দ হইত।

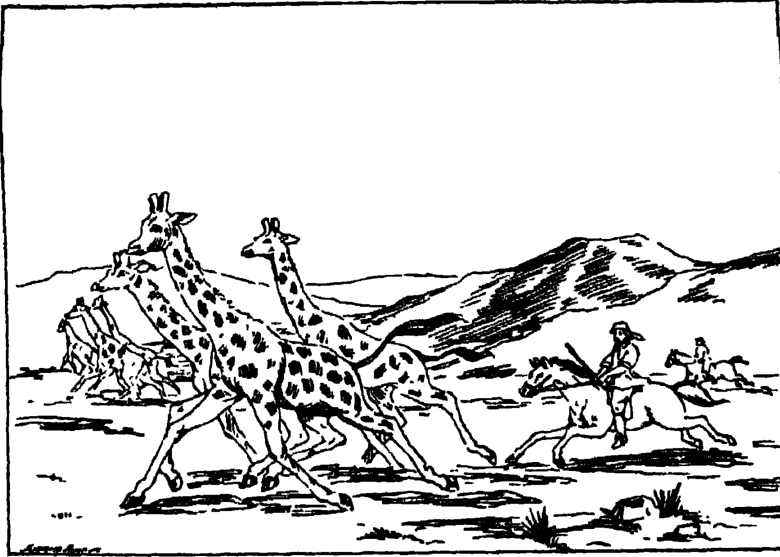


লাটুকা যোদ্ধা

এত কষ্টের পরে তাঁহারা আসিলেন এমন জলাজায়গায়, যেখানে জ্বরের

প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। মিসেস্ বেকার এখানে আসিয়া মরণাপন্ন জ্বরে শয্যাশায়িনী হইয়া পড়িলেন; বেকার নিজেও জ্বরে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে যখন তাঁহারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহাদের দেহ অসুস্থ, মুষ্টিমেয় সঙ্গীদলের অবস্থাও তদ্রূপ। সেই পরম আনন্দের মুহূর্ত্তে এলবার্ট নায়ানজা (Albert Nyanza) দেখিয়া বেকারের কি মনে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজের ভাষায় বলিতেছি।

—"নীচে শুভ্র রজত সমুদ্রের মত বিশাল জলরাশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আফ্রিকার দুর্গম দেশে এতকাল ধরে, এত কষ্ট সয়ে থাকা এতদিনে আমার সার্থক হ'ল। আমার অধ্যবসায়ের চরম পুরস্কার আজ আমি পেলাম। আগে ভেবে রেখেছিলাম এখানে পৌঁছে আমি উচ্চ হর্ষধ্বনি করে উঠ্ব কিন্তু সেখানে যখন সত্যি সত্যি পৌঁছালাম তখন সে আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা ব্যর্থ বলে মনে হ'ল। কেবল আমার আন্তরিক প্রার্থনা শুনলেন অন্তর্যামী ঈশ্বর —যাঁর কৃপায় এই দুর্গম প্রদেশের অভিযান আমার সার্থক হ'ল। আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম।"



জিরাফেরা ভীষণ বেগে দৌড়াইয়া যাইত

হ্রদটি আবিষ্কার করিয়া বেকার নীলনদ বাহির হইয়া যে বিশাল জল প্রণালীতে পড়িয়াছে তাহা দেখিলেন। নদী ধরিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি অপূর্ব্ব সুন্দর এক জলপ্রপাত আবিষ্কার করিয়া তাহার নাম রাখিলেন মার্চিসন প্রপাত (Murchison Falls)। এই প্রপাতের জল প্রায় ১২০০ ফিট উঁচু হইতে নীচে সামারসেট নদী (Somerset) বা ভিক্টোরিয়া নদীর বুকে পড়িতেছে। রাজকীয় ভৌগোলিক সমিতির সভাপতির নাম অনুসারে এই হ্রদের এই নাম রাখা হইয়াছিল। প্রায় আড়াই বৎসর পরে বেকার খার্টুমে ফিরিয়া আসিলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে তাঁহার অভিনন্দন আসিতে লাগিল। ইংল্যাণ্ডে পৌঁছিবামাত্র তাঁহাকে ইংরাজ ও ফরাসী উভয় ভৌগোলিক সমিতি হইতেই স্বর্ণপদক প্রদত্ত হইল এবং ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে তিনি স্যার অর্থাৎ নাইট উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

এত সম্মানেও কিন্তু বেকারের গৃহে বসিয়া থাকিতে মন টিঁকিল না। প্রায় তিনবৎসর পরে মিশরের খেদিবের (Khedive) পরামর্শে তিনি আবার নূতন অভিযান করেন। এই অভিযানের বিরাট্ আয়োজন হইয়াছিল। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দাসব্যবসায় বন্ধ করা। কিন্তু পূর্ব্ববার দাসব্যবসায়ীদের সঙ্গে অনেকটা মিত্রতা করায় বেকার যতটা আশা করিয়াছিলেন কার্য্যতঃ ততটা সফল হইতে পারেন নাই। কিন্তু চারি বৎসরের চেষ্টার পর যখন তিনি কাইরো ফিরিয়া আসিলেন, তখন এটুকু বোঝা গেল যে তিনি দাসব্যবসায়ের উচ্ছেদের মূলে প্রথম আঘাত দিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী গর্ডন, বেকারের অসমাপ্ত কার্য্যভার সমাপ্ত করেন।

এইবারে বেকার নিউটন এবটে (Newton Abbot) একটি সুদৃশ্য জমিদারী ক্রয় করিয়া পতিব্রতা পত্নীর সহিত কিছুদিন নিরাপদে গৃহসুখ ভোগ করিতে মনস্থ করিলেন।

বেকার অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যার সম্বন্ধে মতামত জনসমাজ সাদরে গ্রহণ করিত। গর্ডনকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। জেনারেল গর্ডনের মৃত্যু-সংবাদ ইংল্যাণ্ডে পৌঁছিলে তিনি গবর্ণমেণ্টের

কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করেন এবং অকারণে অমন একটা অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করা হইয়াছে বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হ'ন।

পূর্ব্বের ভ্রমণ-পিপাসা বেকারের আবার ফিরিয়া আসিল। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে তিনি সাইপ্রাসে বেড়াইতে গেলেন। ইহার পর তিনি সমগ্র পৃথিবী-ভ্রমণে যাত্রা করেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর বেকার শীতের সময় মিশর—ইহাকে তিনি "আমার দেবালয়" বলিয়া অভিহিত করিতেন, সেখানে থাকিতেন অথবা ভারতবর্ষে থাকিতেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বেকারের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, শিকার-প্রিয়তা, আনন্দময় নিঃস্বার্থ উদার স্বভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। একদিন অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে বেকার দুই জন রাস্তার গায়ক ভিখারীকে নিজের সঙ্গে চা খাইবার জন্য ধরিয়া লইয়া আসেন। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দেহ দাহ করা হয় এবং ওরচেষ্টার (Worchester)-এর নিকটবর্ত্তী গ্রিমলীন (Grimleen) নামক স্থানে চিতা-ভস্মের উপর সমাধি নির্ম্মিত হয়। এখানে বেকারের স্ত্রীর সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। স্যামুয়েল হোয়াইট বেকার যখন বিপত্নীক হইয়া ভগ্ন মন ও স্বাস্থ্য লইয়া ভবঘুরের মতন সারা ইউরোপের নানাদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সে সময়ে হাঙ্গেরীতে তাঁহার সঙ্গে কুমারী ফ্লোরেন্স ফন্ সাসের সহিত পরিচয় হয় ও এই পরিচয়ের ফলে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে উভয়ের বিবাহ হয়। বিবাহের পর তাঁহারা আফ্রিকার মধ্যপ্রদেশে, নীলনদের উৎস আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। চারি বৎসর নীলনদের ধারা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া বন্য ও অসভ্য আফ্রিকার হিংস্র জন্তু ও মানুষের প্রতিকূলতা ও বহু বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যে নীলনদের উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার করেন, সে-কথা, তোমরা জান। লেডি বেকারই প্রথম শ্বেতাঙ্গ মহিলা—যিনি আফ্রিকার অন্ধকার দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই হিসাবেও ইঁহার নাম স্মরণীয়।

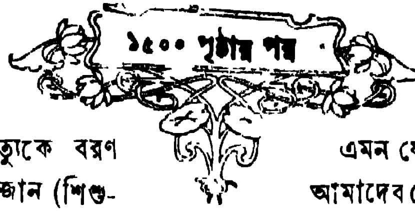
নীলনদের উৎস সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য দেওয়ায় বেকার বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। বেকারকে দেখিলেই সম্ভ্রম হইত। দীর্ঘ আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু ও গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত মুখে তাঁহাকে নৃপতির মত মহিমময় দেখাইত। তাঁহার উচ্চতা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু প্রশস্ত স্কন্ধ ও অসাধারণ বলিষ্ঠ দেহ তাঁহার ছিল। এত দৈহিক কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও অসাধারণ শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য তিনি দীর্ঘ জীবনলাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

প্রৌঢ় বয়সে তিনি লিখিয়াছিলেন—"দেশ ভ্রমণে বার্দ্ধক্য সহজে আসিতে পারে না।" দীর্ঘজীবন লাভের উপায় সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—"অতিরিক্ত শীতপ্রধান দেশে বাস করিও না, গরম জামা সর্ব্বদা ব্যবহার করিবে, ডাক্তার ও আইন-ব্যবসায়ীদের হাত এড়াইয়া চলিবে।" বেকার নিজে সত্তরেরও অধিক বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়াছিলেন। শেষ কয়েক বৎসর তিনি বাত রোগে ভুগিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ইংল্যাণ্ডের দারুণ শীতকে দোষারোপ করিতেন।

সে সময়ে শিকারে সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তিনি শিকার করিতে ভালবাসিতেন। স্যার স্যামুয়েল বেকার সম্বন্ধে, ষ্টান্লীর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় "বেকার অতি চমৎকার লোক ছিলেন।"



সর্প ও সর্পদংশন



জীবাণুর আক্রমণে এবং কেমন করিয়া কীট, পতঙ্গ, মশা ও মাছির দংশনে ও সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের অকালে মৃত্যুকে বরণ করিতে হয়, সে-কথাও তোমরা জান (শিশু-ভারতী, ১৪৯৪ পৃষ্ঠা)। ঐ সব শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার দিকে যেমন লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তেমনি আবার এমন দুই একটি শত্রু আছে, যাহাদের দংশনে মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত। তাহাদের মধ্যে যেটি সর্ব্বপ্রধান, তাহার নাম সাপ।

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর কুড়ি, বাইশ হাজার লোক শুধু সাপের কামড়ে মারা যায়। বাঘ, কুমীর ও অন্যান্য স্থলচর ও জলচর হিংস্র জন্তুর হাতে মানুষ ১০০০, ১২০০-র বেশি মারা যায় না, কিন্তু সর্পদংশনে বৎসরে হাজার হাজার লোক মারা যায়।

ভারতবর্ষে কোন্ প্রদেশে এক বৎসরে কত লোক মারা গিয়াছিল, তাহার একটি তালিকা দিলাম।

মাদ্রাজ বিভাগ	...	...	২০৩৭ জন
বাঙ্গালা দেশ	...	...	১০৫৫৭ "
বোম্বাই "	...	...	৭০১ "
যুক্তপ্রদেশ	..	...	৬০৫৬ "
পাঞ্জাব	...	.	৮৯৩ "
ব্রহ্মদেশ		..	৮৭৪ "
মধ্যপ্রদেশ		...	৯৯৭ "
আসাম	..	..	১৭০ "
কুর্গ	...	..	১১ "
বেরার	...		১০৪ "
আজমীর ও মারবার		...	৪ "
বেঙ্গালোর	...	...	২ "

বাঙ্গালাদেশে বর্দ্ধমান জেলায় সর্পদংশনে সব চেয়ে বেশী লোক মরে। প্রতি লক্ষে প্রায় ১৭৫ জন।

এমন যে প্রাণনাশক বিষধর সর্প, তাহাও আমাদের দেশে দেবতারূপে পূজা পাইয়া থাকে! নাগদেবতার পূজার বিষয়ে তোমাদিগকে পরে কিছু বলিব। এখন তোমরা মানুষের এই ভীষণ শত্রুর সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় কথা জানিয়া লও।

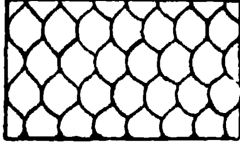
ভারতবর্ষকে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা "সাপের দেশ" বলেন। বলাটা যে অন্যায়, তাহা নহে, কেননা, পৃথিবীতে যত রকমের সাপ আছে, তাহাদের প্রায় সকল জাতীয় সাপই ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই, যদি কেহ আমাদের দেশকে 'সাপের দেশ" বলেন, তাহা হইলে ত তাহা মিথ্যা নয়।

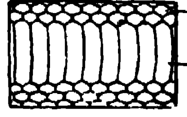
তোমরা সকলেই সাপ দেখিয়াছ। পল্লীগ্রামের ত কথাই নাই, কলিকাতার মত বড় বড় সহরে পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র সাপ না দেখিলেও যেখানে একটু সামান্য বনজঙ্গল বা গাছপালা আছে, সেইখানেই দুই চারিটি সাপ দেখিতে পাইবে। পুরানো পোড়ো বাড়ীর দেওয়ালেও সাপ দেখা যায়।

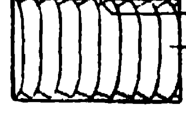
সাপ দেখিতে কেমন বল দেখি? এ বিষয়েও তোমাদের কাছে বেশী বলিবার নাই। এই মারাত্মক প্রাণীটির আকার ও গতি-বিধিও তোমরা নানারূপে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। কাজেই ইহার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা তোমাদের আছে। ইহাদের শরীর লম্বা ও গোল। দেখিতে অনেকটা দড়ির মত। এজন্যই ত কথায় বলে—"সর্পে রজ্জু ভ্রম।" সাপের শরীরের পিছনের দিকটা ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। ইহাদের শরীরের প্রথম ভাগটা অর্থাৎ মুণ্ডের পর

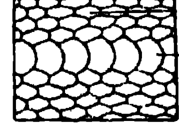
কোথা হইতে ধড় আরম্ভ হইয়া শেষ হইয়াছে এবং কোথায় বা তাহার শেষ, তাহা বলা বড় কঠিন।

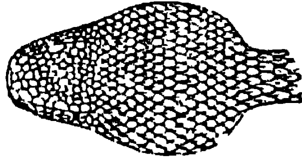
সাপের গায়ে ছোট ছোট আঁশ (Scale) থাকে।

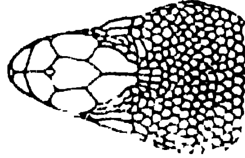

নির্ব্বিষ সাপের পেটির আঁশ

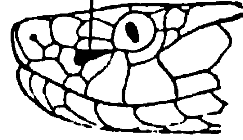

সাপের পেটির আঁশ

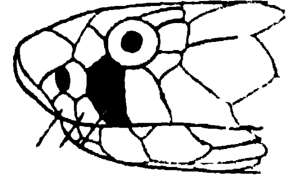

রাসেলস্ ভাইপারের পেটির আঁশ

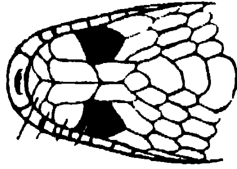

কারাইতের পৃষ্ঠ-দেশ


ভাইপারের মাথা

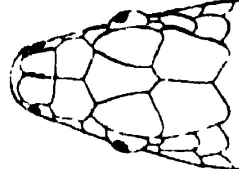

অন্য একপ্রকার ভাইপারের মাথার আঁশ (Ancistrodon)

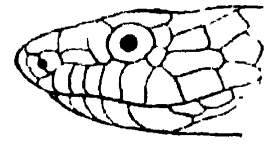

ভাইপারের মাথা


কেউটের মাথার আঁশ

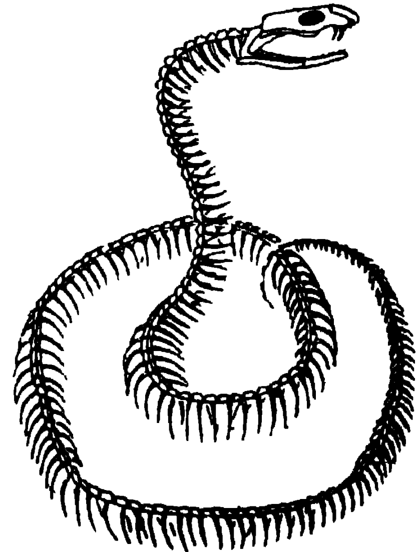

কারাইতের মুখের আঁশ

আঁশগুলি একটির পর একটি এইরূপ পর পর সাজানো। সব সাপের গায়ের আঁশই যে এক রকমের, তাহা নহে। এক এক জাতীয় সাপের আঁশ এক এক প্রকারের হয়। কোন কোন সাপের আবার আঁশ থাকে গায়ে গায়ে লাগানো। কোন্ সাপ কোন্ জাতীয়, তাহা তাহাদের গায়ের আঁশ দেখিয়াই অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। বিষধর সর্পের আঁশ ও নির্ব্বিষ সর্পের আঁশ বিভিন্নরূপ হয়। এই যে নানা সাপের গায়ে নানারূপ সুন্দর সুন্দর রঙ্ দেখিতে পাও, তাহা কিন্তু সাপের আঁশের রঙ। এই আঁশের উপর আবার সাপের একটা আবরণী থাকে, তাহা অতি পাত্‌লা। এই আবরণীটাকে আমরা সহজ ভাষায় বলি 'খোলস'—উহা অতি পাত্‌লা চামড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কোন একটি খোলস পরীক্ষা কর, তাহা হইলে দেখিবে যে, ঐ খোলসের গায়ে সাপের সারা শরীরের চিহ্ন—এমন কি, চোখ, মুখ, নাক প্রভৃতির দাগও সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। সাপের পিঠের আঁশ ও সাপের পেটের তলার আঁশে অনেক তফাৎ আছে। পেটের তলার আঁশ বেশ চওড়া ও মোটা। এই পেটের তলার আঁশের উপর ভর করিয়াই সাপেরা বুকে




Cobra-জাতীয় সর্পের মস্তক ও তাহার পার্শ্বের দৃশ্য

হাঁটিয়া চলে। সাপের মেরুদণ্ডের হাড়ের সংখ্যা অনেক। এমন কি, চারিশত পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। এখানে সাপের কঙ্কালের যে ছবি দেওয়া হইল, তাহা দেখিলে জানিতে পারিবে যে, সাপের মুখ হইতে লেজ পর্য্যন্ত যে মেরুদণ্ডটি বাঁকিয়া গিয়াছে, সেই মেরুদণ্ডের দীর্ঘ বাঁকানো হাড়টির গায়ে গায়ে কাঁটার আকারে সব পাঁজরার


সাপের কঙ্কাল

হাড় সাজানো রহিয়াছে। এখানে একটা কথা মনে রাখিবে—অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় সাপের পাঁজরার হাড় বুকের হাড়ের সঙ্গে আট্‌কানো থাকে না। কেননা, ইহাদের বুকে হাড় নাই। সাপ যখন চলে, তখন পাঁজরার হাড়ের উপর ভর দেয়, এজন্য পেটের তলার আঁশ উঁচু হয় এবং সেই আঁশের সাহায্যে মাটি আঁকড়াইয়া সাপ দ্রুত গমনাগমন করে। সাপ কিন্তু কাচের উপর দিয়া কিংবা তদ্রূপ মসৃণ পাথর বা তদনুরূপ অন্য কোনও পদার্থের উপর দিয়া সহজে চলিতে পারে না।

সাপের আর একটি প্রধান বিশেষত্ব, তাহার চক্ষু। তোমরা শুনিয়া থাকিবে যে, সাপের চোখের পলক পড়ে না। একথা সত্য। ইহার কারণ কি, জান? সাপের চোখের দু'খানা পাতাই পরস্পর সংলগ্ন বা জোড়া বলিয়া উহা দ্বারা সাপের চোখ ঢাকা থাকে। এই চোখের পাতা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ বলিয়া সাপেরা উহার ভিতর দিয়া দেখিতে পায়, কিন্তু পলক ফেলিতে পারে না। সাপেরা খোলস ছাড়িবার সময় কয়েক দিন পর্যন্ত চোখে দেখিতে পায় না।

সাপের কাণ নাই। ঐ যে তাহাদের জিহ্বাখানি অনবরত লক্ লক্ করিতেছে দেখিতে পাও, ঐ জিভ দিয়াই তাহারা শব্দ বুঝিতে পারে। সাপের জিভের বিশেষত্ব আরও আছে, উহা সরু এবং তাহার আগাটা দুই ভাগে চেরা। সাপের এই জিহ্বার সাহায্যে তাহারা অন্ধকার রাত্রিতেও কোন্ জিনিস কোথায় আছে, তাহা স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারে এবং সেইরূপভাবে চলাফেরা করে। আর একটা কথা মনে রাখিবে, সাপের বিষ সাপের জিহ্বাতে থাকে না।

সাপের মুখ দেখিলেই তোমাদের ভয় হয়, না? কেমন ছুঁচালো, আর কেমন চোখ—কেমন লক্‌লকে জিহ্বা! ইহাদের মুখের গঠনেও অনেক বৈচিত্র্য আছে। সাপের দুই চোয়ালের হাড় আমাদের মুখের মত আটকানো থাকে না। এই জন্য ইহারা যত বড় ইচ্ছা হাঁ করিয়া বড় বড় ইন্দুর, বেঙ্ সব টপাটপ্ মুখে ফেলিয়া দেয়। যদি কখন সাপের বেঙ ধরা কিংবা ইন্দুর ধরা দেখিবার সুযোগ পাও, তাহা হইলেই আমার একথা বেশ ভালভাবে বুঝিতে পারিবে।

সাপের দাঁতের গড়নেও বিশেষত্ব আছে। উহা মানুষের দাঁতের মত সোজা বা খাড়া নয়। সাধারণ সাপের মুখে ছয় সার দাঁত আছে। ইহাদের দাঁত-গুলি অনেকটা মাছ ধরিবার জন্য যে বঁড়শির ব্যবহার হয়, ঠিক্ তাহারি মত গলার দিকে বাঁকানো। কাজেই, একবার সাপ যদি শিকার ধরিতে পারে, তাহা হইলে কোন ক্রমেই সে শিকারের আর পলাইবার জো থাকে না। দাঁতগুলি শিকারের গায়ে এমনভাবে আট্‌কাইয়া যায় যে, উহার হাত হইতে বেঙ্, ইন্দুরের আর মুক্তিলাভের জো থাকে না। এদিকে কিন্তু আবার এক মজা এই যে, সাপের চিবাইবার কোন দাঁত নাই। যে দাঁতের কথা বলিলাম, তাহা শিকার ধরিবার জন্যই শুধু ব্যবহার করে। সাপেরা তৃণভোজী নহে। ইহারা নানাজাতীয় কীট, টিক্‌টিকি বেঙ, শামুক, ছোট ছোট পাখী প্রভৃতি খাইয়া জীবন-ধারণ করে।

সাপ শীতকে বড় ভয় করে। শীতকালে ইহারা গর্তের মধ্যে বাস করে। এসময়ে তাহারা কিছুই খায় না, অনায়াসে তিন চারিমাস না খাইয়া কাটায়। লোকে বলে, সাপেরা এ সময়ে কেবল বাতাস খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে।

সাপদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ আছে। স্ত্রী-সাপেরা গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে। ইহারা সাধারণতঃ



সাপ ডিমে তা দিতেছে

১২টা হইতে ৪০টা পর্যন্ত ডিম পাড়ে। অনেক ডিম হইতে বাচ্চা হয়। স্ত্রী-সাপেরা ডিমে তা দেয়, কতক বা আবার দেয় না। এই যে তোমরা অনেক সময় ছোট ছোট সাপের বাচ্চাগুলিকে কিলিবিলি করিতে

দেখিতে পাও, তাহাদের ঐ ডিম হইতেই জন্ম। সাপ জলে ও স্থলে উভয় স্থানেই বাস করে।

এইবার সাপের শরীরের যন্ত্রাদির কথা শোন। সাপের শরীরের মধ্যে মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত বরাবর একটা নল চলিয়া গিয়াছে। এই নল দিয়াই সাপেরা নিঃশ্বাস টানে। এই নলের সহিতই তাহাদের ফুসফুসের যোগ আছে। সাপের বাহিরের মোটা অংশটাই হইতেছে তাহাদের পেট। উদরের নীচের অংশে থাকে তাহাদের অন্ত্র। ফুসফুসের উপরেই ইহাদের হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থান। সাপের হৃদ্‌পিণ্ডে তিনটি কুঠরী আছে। ইহাদের শরীরের রক্ত চলাচলও অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় নহে, কতকটা নাকি কচ্ছপের মত। এইজন্যই সাপের শরীর একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা।

পৃথিবীতে মোট প্রায় ১৬০০ বা তাহারও বেশি নানা জাতি সাপ আছে। তাহাদের আবার শত শত উপজাতিও রহিয়াছে। তবে সব সাপই বিষাক্ত নহে। আমরা এখানে তোমাদের কাছে বিষাক্ত সাপের কথাই বলিব।

ভারতবর্ষের বিষধর সর্প

সাপের মধ্যে কোন্‌গুলি বিষাক্ত এবং কোন্‌গুলি বিষাক্ত নয়, তাহা চিনিবার উপায় এখানে বলিতেছি।

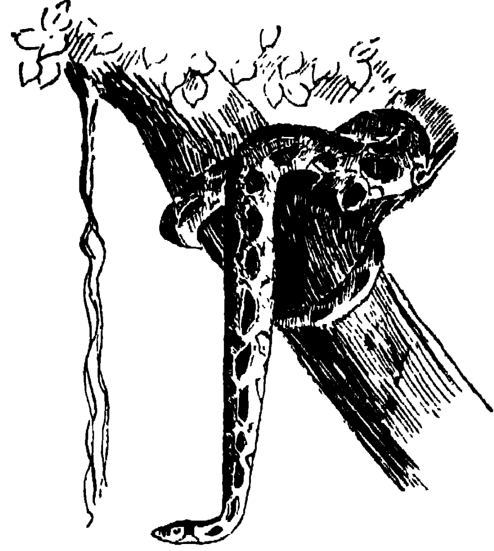
সাপকে এখানে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা হইল।

১। বড় সাপ—অজগর বর্গকে Boadae এই নাম দেওয়া হইয়াছে। এই শ্রেণীর অন্তর্গত হইতেছে বোয়া (Boa) এবং পাইথন (Pythons) বা ময়াল সাপ। এই জাতীয় সাপের বিষ নাই। এই জাতীয় সাপ সুন্দরবন, আসাম এবং হিমালয়ের নিম্নভাগে তরাই অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার এক একটি আকারে চৌদ্দ পনের হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। আমি হরিদ্বারের কাছে একটা জঙ্গলের মধ্যে এক সাপুড়িয়ার নিকট একটি পঁচিশ হাত লম্বা অজগর বা ময়াল সাপ নিজের চক্ষে দেখিয়াছি। ইহারা অনায়াসে ছাগল, ভেড়া, শিয়াল, এমন কি ছোট ছোট গরু বাছুর, মহিষ প্রভৃতি পর্য্যন্ত ধরিয়া গিলিয়া ফেলে।

২। Colubridae (Cobros)—এই জাতীয় সাপের সংখ্যা খুব বেশি। পৃথিবীতে যত রকম সাপ আছে, তাহাদের মধ্যে ⅔ ভাগ সাপই এই জাতীয়। ইহারা তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত।

(ক) Aglypha—ইহাদের বিষদাঁত নাই। ইহারা বিষাক্ত নহে।

(খ) Opisthoglypha—এই জাতীয় সাপের বিষদাঁত আছে। কিন্তু উহা মুখের এত পেছনের দিকে যে, ইহার কামড়ে মানুষের কোন ক্ষতি হয় না।



শিকার সন্ধানে—ময়াল বা বোড়া সাপ

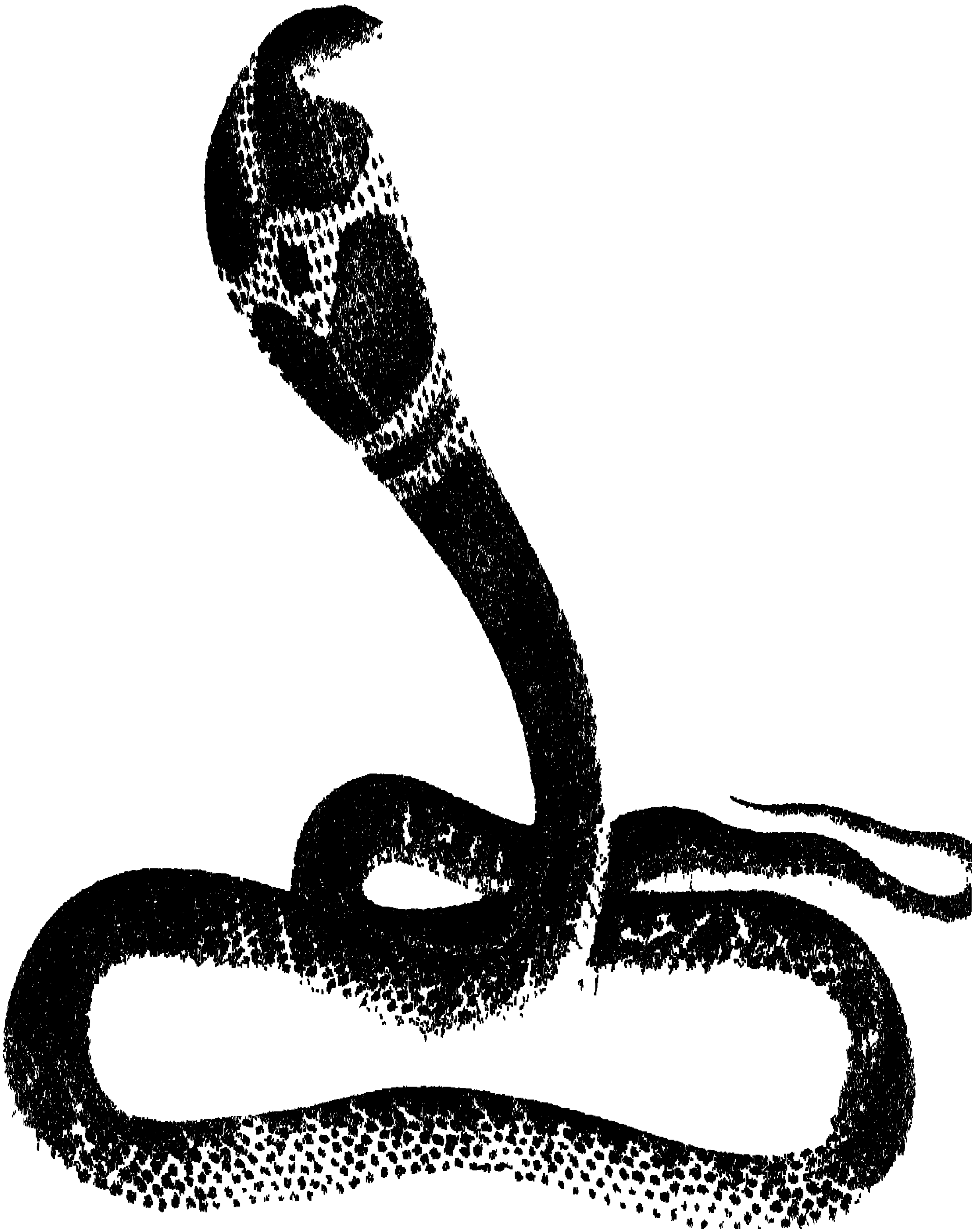
(গ) Proteroglypha—(গোখুরা ও কেউটে জাতীয়) এই সাপ অত্যন্ত বিষাক্ত। ইহার দংশনে মানুষের নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে।

৩। Viperidae (vipers)—এই জাতীয় সর্প অত্যন্ত বিষধর। ইহাদের বিষ এত ভয়ঙ্কর যে, ইহাদের দংশনে অতি অল্প সময়েই প্রাণান্ত হয়। কাজেই, আমরা ভারতবর্ষে স্থলচর সাপের মধ্যে দুই জাতীয় cobra (গোখুরা) এবং ১২ প্রকারের করেতা (Krait) সাপ দেখিতে পাই। তবে পাঁচটিই প্রধান। শঙ্খচূড় (King Cobra—Niabungarus Hamadryad) সাধারণ গোখুরা (Nia tropudians), সাধারণ করেতা Bungarus caæruleus), ফুরসা (Echis carinata) এবং রাসেলস্ ভাইপার Viper Russell's।

এখন বিষধর সর্পদের সম্বন্ধে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা বলিতেছি।

ভারতবর্ষে প্রায় ৩৯ জাতীয় বিষাক্ত সাপ আছে। ইহারা প্রধানতঃ দুই জাতিতে বিভক্ত। ১। Colubridae, ২। Viperidae। ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ জাতীয় সর্প সর্ব্বাপেক্ষা বিষধর—এখানে তাহাদের কথা বলিলাম।





সর্প ও সর্পদংশন

Colubridae বর্গ—**গোখুরা জাতি** (Cobra)—এই জাতীয় সর্প অত্যন্ত বিষাক্ত। গোখুরা সাপ তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে। সাপুড়িয়ারা অনেক সময় এই জাতীয় সাপ লইয়া খেলা দেখাইতে আসে। এই সাপ বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সুন্দরবনে গোখুরা সাপ এত বেশি যে, প্রতি পদবিক্ষেপেই ইহাদিগকে ইহারা জলার ধারে ও ধানের ক্ষেতেই বেশির ভাগ থাকে।

গোখুরা সাপ, কেউটের মত অতটা রাগী নয়। তাহাদের অনিষ্ট না করিলে কিংবা কোনরূপে তাড়া না করিলে সহজে ফণা তুলিয়া কাহাকেও আক্রমণ করিতে আসে না। গোখুরারা উচ্চ স্থানে এবং শুষ্ক স্থানে থাকিতে ভালবাসে। ইহাদিগকে প্রায়ই



রাসেলস্ ভাইপার

দেখিতে পাওয়া যায়। গোখুরা সাপ নানা রকম। এই সাপ নানা নামে পরিচিত। যথা— **নাগ, কেউটে বা কেউটিয়া, কাল সাপ, দেউ সাপ, খইয়ে গোখুরা।** এই জাতীয় সাপ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এবং হিমালয়ের ৮০০০ ফিট উচ্চ শিখর পর্য্যন্ত ও দেখা যায়। ইহাদের বিষ অত্যন্ত তীব্র, অতিশয় মারাত্মক। মানুষের রক্তের সহিত মিশিলে এক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ত সচরাচরই হয়। মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি যে সকল জন্তুর শরীরের রক্ত উষ্ণ, সাপের বিষে তাহাদের শীঘ্র মৃত্যু হয়।

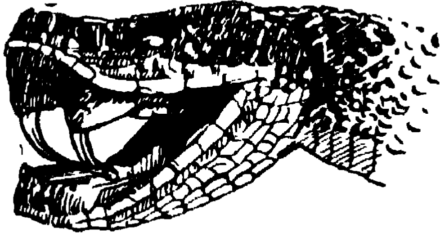
আমাদের দেশে কাল গোখুরা সাপকেই **কেউটে সাপ** বলে। এই সাপের স্বভাব অতি ভীষণ। মানুষ বা অন্য কোনও প্রাণী—যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি কাছে গেলে এমন ফোঁস্ ফোঁস্ করে ও তাড়া করে যে, ভয় পাইয়া পলাইয়া তবে প্রাণ রক্ষা করে। কেউটে সাপ, ভিজে ও স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় থাকিতেই বেশি পছন্দ করে। পল্লীগ্রামে গৃহস্থদের বাড়ীতে, এমন কি, ঘরের মেঝের মধ্যে ইন্দুরের গর্ত্তেও বাস করিতে দেখা যায়। গোখুরা সাপের ফণার উপর দুইটি চক্ষুর মত দাগ আছে। এই দাগ যে সব জাতীয় গোখুরা সাপেই আছে, তাহা নহে। কোন জাতীয় গোখুরার ফণায় একটি দাগ, কোনটির বা দুইটি দাগ, আবার কোন কোন গোখুরার ফণায় কোন দাগই থাকে না।

গোখুরা সাপ যখন ফণা ধরিয়া দুলিতে থাকে, তখন এমন লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার ভয় হয় না।

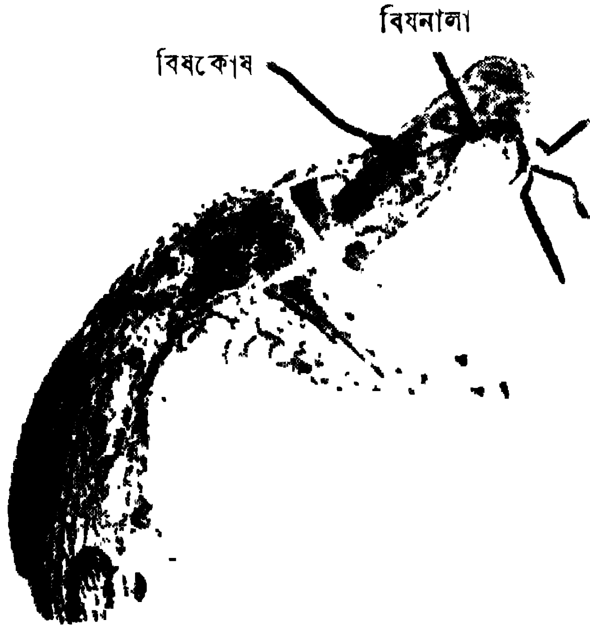
এখন বিষ-দাঁতের কথা শোন। গোখুরা সাপের মুখের সব দাঁতই যে বিষ-দাঁত, তাহা নহে। উহাদের মুখের উপরের চোয়ালে দুই দুইটি করিয়া পৃথক্ বিষ-দাঁত থাকে। পরপৃষ্ঠায় গোখুরা সাপের মুখের মধ্যে কিরূপে বিষ-দাঁত থাকে তাহার ছবি দিলাম। এই ছবিটির দিকে বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য কর। উহাতে ঐ যে বাঁকানো দাঁত দেখা যাইতেছে, তাহার পাশে যে উচ্চ মাংসখণ্ড দেখা যাইতেছে, তাহাই হইল

বিষ-দাঁত

উহাদের বিষের থলি। ইহাকে বিষের থলিই বল আর কোষই বল, উহাই হইতেছে প্রাণনাশক বিষের আধার। এই বিষদাঁতের গঠনে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। গোখুরার বিষ দাঁত মাড়ীর সহিত শক্ত



গোখুরা সাপের বাঁকানো বিষ-দাঁত



করিয়া আঁটা থাকে না। সাধারণতঃ উহা টাকরায় হেলান অবস্থায় থাকে। যখন কামড়াইবার দরকার হয়, তখন উহা খাড়া করে। এই বিষ-দাঁতের গায়ে আবার সরু সরু নালা আছে; কামড়াইবার সময় দাঁত যখন খাড়া করে, তখন বিষের থলি হইতে বিষদাঁতের ঐ নল বা নালা দিয়া দাঁতের আগায় বিষ আসে এবং যাহাকে কামড়ায় তাহার শরীরে এই বিষ ঢালিয়া দেয় এবং উহা পলকের মধ্যেই রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। ধাড়ী গোখুরা সাপের স্বভাব এই যে, তাহারা দিনের বেলা বাহিরে আসিতে চাহে না। গোখুরা সাপের বাচ্চাগুলির সে বোধ টুকু নাই। তাহারা দিনও মানে না, রাতও মানে না, যখন তখন যেখানে সেখানে আসিয়া ছুটাছুটি করে। তাহাদিগকে তাড়া কর, দেখিবে, ঐ বাচ্চা সাপের মধ্যেও জাতির স্বভাবটুকু বিলক্ষণ আছে। তাহারাও ধাড়ী সাপের মত অমনি ফোঁস ফোঁস করিয়া উঠিবে।

গোখুরা সাপের স্বভাব

গোখুরা সাপ লোকালয়ে অধিক থাকে। ইঁদুর খাইবার জন্য তাহারা মানুষের বাড়ীতে আসে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাপেদের কাণ নাই—তাহারা শুনিতে পায় না। তবে মাটিতে শব্দ করিলে শরীর দিয়া তাহা অনুভব করে। তোমরা মনে কর, সাপুড়েরা যে বাঁশী বাজায় সাপেরা সেই বাঁশীর শব্দে মাথা দোলায়, তাহা নহে; উহারা সাপুড়েদের মাথা নাড়া দেখিয়া সেই তালে তালে মাথা দোলায়। কেয়া ফুলের গন্ধ পাইলে সেখানেও সাপ আসে।

তোমরা সচরাচর তুবড়ি বাজাইয়া ঝাঁপি কাঁধে করিয়া এই যে সাপুড়িয়াদের খেলা দেখাইতে দেখ, ঐ সকলের মধ্যে গোখুরা সাপই বেশি। সাপুড়িয়ারা যত সহজে গোখুরা সাপকে বশ করিতে পারে, কেউটে সাপকে তত সহজে পারে না। গোখুরা সাপকে ধরিয়াই সাপুড়িয়ারা তাহাদের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে। এজন্যই তাহাদিগকে কামড়াইলেও কিছু হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই আশ্চর্য্য সৃষ্টি এই যে, বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলেই যে তাহা একেবারে নষ্ট হইল, তাহা নহে, তাহাদের দাঁতের অঙ্কুরের জায়গা হইতে আবার নূতন বিষদাঁত গজাইয়া উঠে।

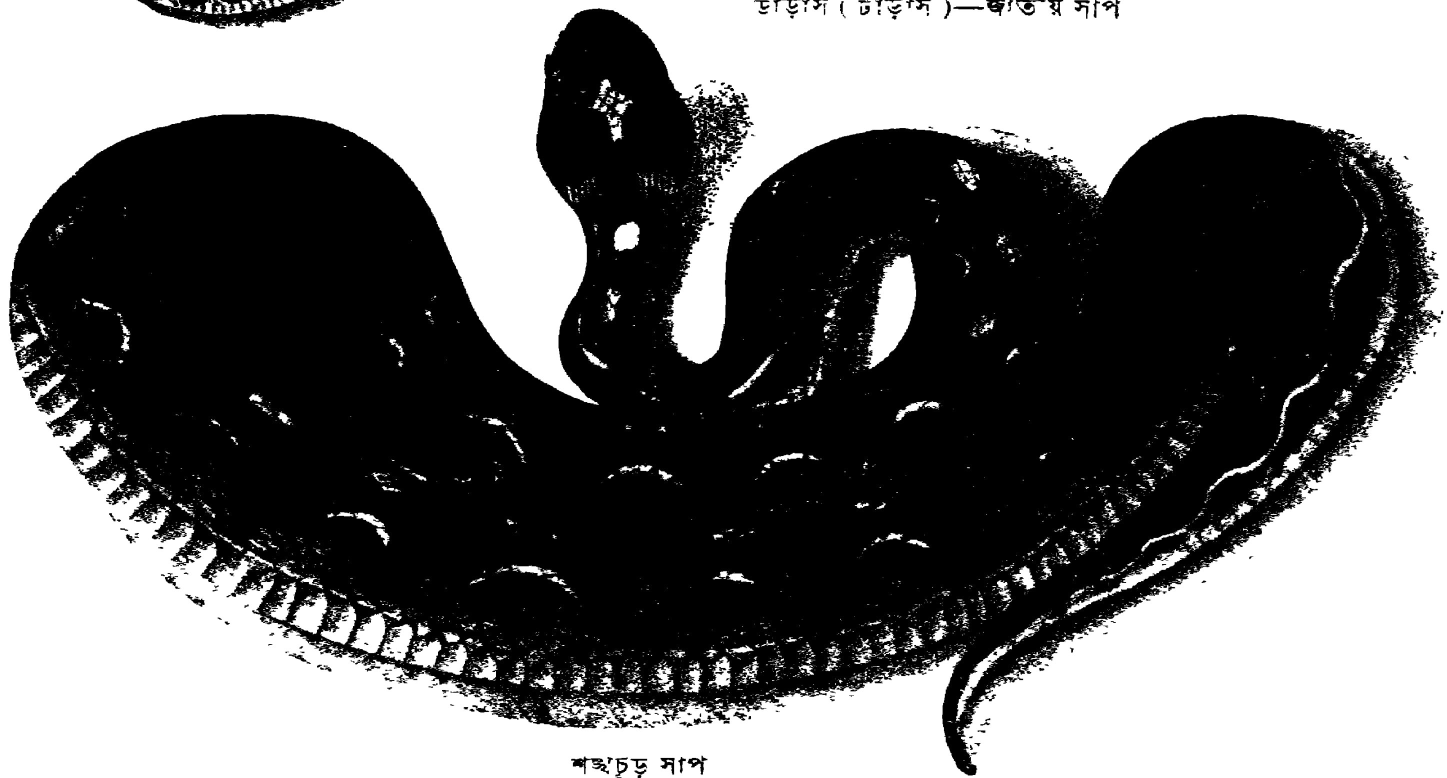
শঙ্খচূড়—(Hamadryad or King Cobra Naiabungarus)—এই জাতীয় সাপ পূর্ব্ববঙ্গে, ভারতের উত্তরাংশে, আসাম ও ব্রহ্মদেশে দেখা যায়। ইহারাও গোখুরা জাতীয় সাপ। এই সাপ ১৫ ফিট (প্রায় দশ হাত) লম্বা হয়। এই শঙ্খচূড় সাপ দেখিতে অতি ভীষণ। যখন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তখন কাহার সাধ্য কাছে আসে। ইহাদের স্বভাব এমন উগ্র যে, কোনও জন্তু-জানোয়ার দেখিলেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কামড়াইতে ছুটিয়া আসে।

শঙ্খচূড়

লোকে শঙ্খচূড় সাপকে সাপের রাজা বলে। এই সাপ যেখানে থাকে, সেখান হইতে অন্যান্য সাপেরা প্রাণের



ঢাঁড়াস (ঢাঁড়াস)—জাতীয় সাপ



শঙ্খচূড় সাপ



বড় কেউটে সাপ ও তাহার ফণা



বেদেরা সাপের খেলা দেখাইতেছে





শঙ্খচূড় ও কালনাগ সাপ ধরিয়া খেলা দেখাইতেছে

ভয়ে পলাইয়া যায়। ইহারা ছোট-বড় যেরূপ সাপ হউক না কেন, তাহাদিগকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। শঙ্খচূড় সাপ কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর। ইহার গায়ে নানা প্রকারের রঙ্ থাকে।

করেত্ (Banded Karait—Bungarus faeitrus)—ইহারা শাঁকড়ি, রাজসাপ, চন্দ্রবোড়া এই সব নানাজাতীয় হয়। ইহাদের আকার ৪।৫।৬ ফিট লম্বা হইয়া থাকে। এই যে সাপ কয়টির নাম করিলাম, ইহাদেরও বিষ দাঁত আছে। এই জাতীয় সাপ বাঙ্গালা দেশে বড় একটা দেখা যায় না। ইহাদের বেশির ভাগই বিহার ও সাওতাল পরগণায় দেখা যায়। করেতা অতি ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প। ইহাদের কামড়ে প্রতিবৎসর বিহার ও সাঁওতাল পরগণায় বহু লোকের মৃত্যু হয়। **চন্দ্রবোড়া সাপ**—দেখিতেও যেমন বিশ্রী, ইহাদের স্বভাবও তেমনি ভয়ানক। মানুষ কিংবা অন্য কোন জন্তু-জানোয়ার যদি তাহাদের কাছেও যায়, তবু উহারা নড়াচড়া করে না। ইহাদের বিষ-দাঁত, গোখুরার বিষ-দাঁত অপেক্ষাও লম্বা হইয়া থাকে।

বোড়াসাপ Russell's Viper (Vipera russellii)—ইহারা বোড়া, তিকৃলো লোঙ্গা, ডাড়া, গোলাস্ এই সব নামে পরিচিত। সচরাচর প্রায় ৫½ ফিট লম্বা হয়।

বোড়াসাপ

ফুরসা বা কাপড় সাপ—(Keelscaled viper Ecpis Cairnata)—ইহারা দুই ফিটের বেশি লম্বা হয় না। এ সকল ছাড়া বরাচিতি দুই মুখো সাপ, ঢাঁড়াস্ বা ঢেমনা জাতি সাপ (ইহাদের বিষ নাই), লাউডগা প্রভৃতি অনেক সাপ দেখা যায়। কিন্তু **গোখুরা, শঙ্খচূড়** প্রভৃতি (Cobra Hamadryad)—জাতীয় সাপের ন্যায় বিষাক্ত সাপ পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

বিষাক্ত সাপের দাঁত কি প্রকারে গঠিত হয়, সে-কথা তোমাদের বলিয়াছি। যে সকল সাপ বিষাক্ত নহে, তাহাদের দাঁত নিরেট্ থাকে।

সাপের বিষ কি তোমরা দেখিয়াছ? এইরূপ ভয়ানক জিনিস আর নাই। যদি কোন প্রকারে সাপের বিষ দেহের রক্তের সহিত মিশিয়া যায়, তাহা হইলে বাঁচিবার আশা থাকে না। সাপের বিষ যে কিরূপ ভয়ানক, সে বিষয়ে একটি সুন্দর কবিতা আছে,—

"চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কি সে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

অনেক সময় সাপুড়িয়ারা সাপ ধরিয়া তাহার দাঁত হইতে বিষ বাহির করিয়া লয়। সে কতটুকুই বা। সামান্য কয়েক ফোঁটা মাত্র, দেখিতে অনেকটা পরিষ্কার তেলের মত। আমাদের দেশের আয়ু-র্বেদীয় চিকিৎসকেরা (কবিরাজ) সাপের বিষ দিয়া এক প্রকার ঔষধ তৈয়ারী করেন। মানুষের মৃত্যুকালে ঐ বড়ি দিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করেন—যাকে বলে বিষ-প্রয়োগ।

সর্প-চিকিৎসা—সাপে কামড়াইলে সেই জায়গাটা খুব শক্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। এরূপভাবে বাঁধিবে, যেন কোন-রূপেই বিষ উপরে উঠিতে না পারে কিংবা রক্তের সহিত মিশিয়া হৃদ্‌যন্ত্রে যাইয়া না পৌঁছে। এইরূপ বাঁধিয়াই চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসকেরা দংশনের স্থানের চারিদিকটা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়া দংশন স্থানে Pefmanganet Solution লাগাইয়া দেন আর Antivenom-এর ইন্‌জেকসন দেন। এইরূপ ব্যবস্থায় রোগী প্রায়ই রক্ষা পায়। আমাদের দেশে কিন্তু সে অতি প্রাচীনকাল হইতেই সাপের ওঝারাই সর্প দংশনের চিকিৎসা করে। কেহ কেহ বলেন, তাহারা বিষ পাথরের সাহায্যে রোগীর গা হইতে বিষ টানিয়া বাহির করে, কেহ বলেন মন্ত্রের সাহায্যে। কি উপায়ে তাহারা সর্প-দষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করে, সাপের ওঝা নই বলিয়া আমি তাহা তোমাদিগকে বলিতে পারিলাম না। সাপের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিবে। রাত্রিকালে পথ হাঁটিবার সময় অনেকে হাততালি দিয়া চলে। হাততালি শুনিলে সাপ পলাইয়া যায়। কিন্তু কেউটিয়া ও বাজসাপ যদি পূর্ব্বে রাগিয়া থাকে তাহা হইলে হাততালি শুনিয়াও পলায় না, বরং তাড়া করে। সাপকে তাড়াইবার একটি প্রচলিত মন্ত্র আছে,—

চলে যেতে ঘুঙুর বাজে
নূপুর বাজে পায়।
পথ ছেড়েদে বাসুকি মা,
তোর গরুড় গোসাই যায়॥

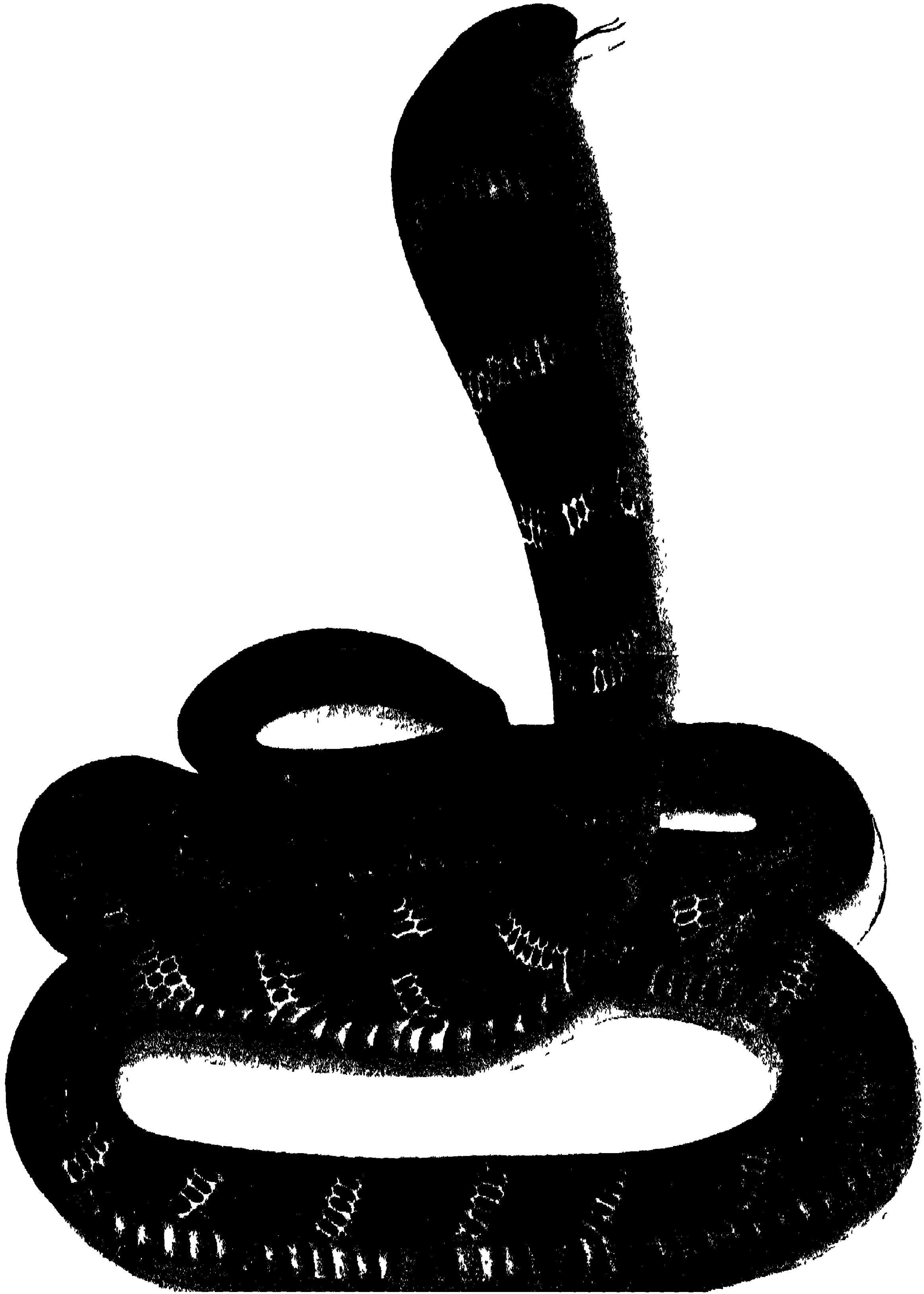
অনেকে বলেন, পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় ও বিহার অঞ্চলে লোকে রাত্রিকালে কোথাও যাইতে হইলে, উক্ত মন্ত্র পড়িয়া ও পায়ে নূপুর পরিয়া ঘরের বাহির হইতেন। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে এইরূপ উপদেশ আছে যে, রাত্রিকালে ও দিনের বেলা ছাতা ও ঝন্ ঝন্ ঝুন্ ঝুন্ শব্দ করে এমন লাঠি হাতে করিয়া পথে চলিবে। তাহা হইলে ছায়া ও শব্দে ভয় পাইয়া সাপেরা পলাইয়া যাইবে।

নাগদেবতা বা সর্প পূজা

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে নাগদেবতার পূজা প্রচলিত। তোমরা সকলেই শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি দিনে বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে যে মনসা পূজা হয়, তাহা জান।

সাগর-মন্থনের কথা নিশ্চয়ই পুরাণে পড়িয়াছ। সেই যে দেবতা ও অসুরেরা মিলিয়া শেষ নাগকে দিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। (শিশু-ভারতী—১৯৭ পৃষ্ঠা) শেষনাগের সহস্রফণার নীচে তাহার লীলায়িত দেহের উপরেই বিষ্ণু অনন্ত শয়নে শুইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমনের কথাও তোমাদের অবিদিত নাই। কি আর্য্য, কি অনার্য্যদের ধর্ম্ম—সর্ব্বত্রই এই নাগপূজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

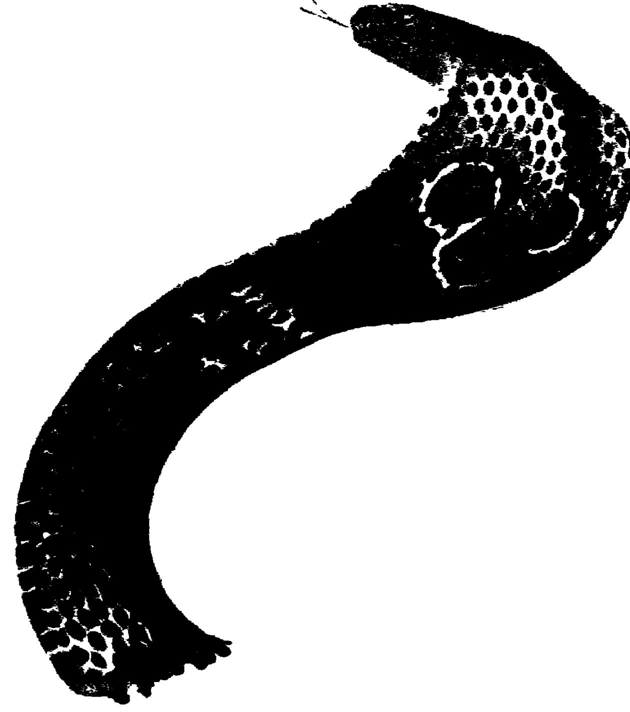
দ্রাবিড়েরাই ভারতবর্ষে সর্প পূজার প্রবর্ত্তন করে বলিয়া পণ্ডিতেরা বলেন। আর্য্যেরা তাহাদের



খইয়ে গোখুরা







গোখুরা সাপের ফণা

সহিত মিশিবার ফলেই সর্প-পূজাটিও তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কেবল যে মূর্ত্তি গড়িয়াই সাপের পূজা হয়, তাহা নহে। এমন কি, সেখানে বর্ষাকালে সাপুড়িয়াদের নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্য দিয়া জীবন্ত সাপ ক্রয় করিয়া তবে তাহার পূজা করে। আর যদি সেইরূপে জীবন্ত সাপ সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে উই ঢিপি, বনজঙ্গল, বা সাপের গর্ত্তের কাছে যাইয়া নাগ দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দিয়া আসে। এই সব পূজার নানাপ্রকার বিধানও রহিয়াছে।

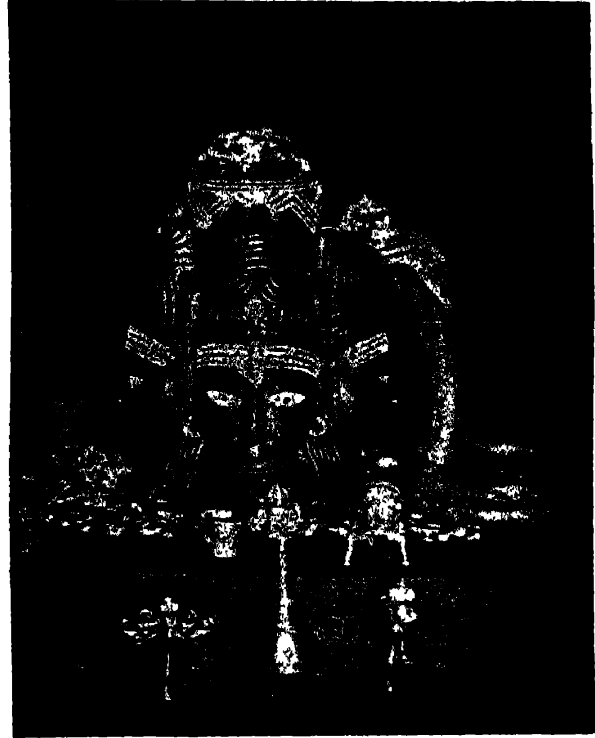
দক্ষিণ ভারতে সর্প পূজা

মহারাষ্ট্র দেশে স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলাকারে হাত ধরাধরি করিয়া সাপের গর্ত্তের চারিদিকে সঙ্গীত ও নৃত্য করে এবং পরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া নাগ দেবতার নিকট কল্যাণ কামনা করিয়া থাকে। সাপের গর্ত্তে দুধ ঢালিয়া দেয় এবং ময়দা ও চিনি দিয়া মিষ্টান্ন প্রস্তত করিয়া সেখানে রাখিয়া আসে। এইরূপে তাহাদের পূজা শেষ হয়।

মধ্য প্রদেশের বিলাসপুর, ছত্তিশগড়ের সর্প-মন্দির বিশেষ প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। প্রয়াগ ধামের (এলাহাবাদ) গঙ্গার তীরবর্ত্তী নাগবাস্থকি দেবের মন্দিরও খুব বিখ্যাত। দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরম্ নামক বিখ্যাত তীর্থস্থানে অনেক সর্প-মূর্ত্তি আছে। ঐ স্থানে নিয়মিত ভাবে নাগদেবতার পূজা হয়। হরিদ্বারের নাগদেবতার ছবিও এখানে দিলাম।

কুমারিকা অন্তরীপের অন্তর্গত নাগের কোয়ল নামক স্থানের সর্প-মন্দির বিশেষ বিখ্যাত। সেখানে প্রস্তরনির্ম্মিত বহুবিধ সর্পের মূর্ত্তি আছে। মালাবার, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীর কাছেই কতকটা জমি সাপের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। সাধারণতঃ গৃহস্থের বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশেই ঐরূপ ভূমি নির্দ্দিষ্ট হয়। সেখানকার গাছ-পালা, ঝোপ-জঙ্গল কিছুই কাটা হয় না। কাজেই, ঐ স্থানে মনের সুখে বিষাক্ত সাপেরা বিচরণ করে। সর্পের এইরূপ বাসস্থানে যাহাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এবং গরু-বাছুর প্রভৃতি যাইতে না পাবে, সেজন্য তাহার চারিদিক দেওয়াল দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়া দেয়। ঐ দেশের লোকের ধারণা এই যে, খোস, পাঁচড়া, গলিত কুষ্ঠ, চক্ষুরোগ প্রভৃতি নানা রোগ সব বাস্তুসাপের অনুগ্রহে আরোগ্য হয়। কোনরূপ মহামারী দেখা দিলে সর্পদেবতার কাছে মানত করিয়া তিল, মিষ্টান্ন, কলা এবং বিবিধ প্রকারের দ্রব্য নৈবেদ্যের আকারে সাজাইয়া নাগের পূজা দিয়া থাকে।

নাগের কোয়েলের মন্দির



হরিদ্বারের নাগদেবতা

বৌদ্ধধর্ম্মেও সাপের প্রতি অশেষ সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অজন্তা গুহার চিত্রেও নাগের ছবি দেখিতে পাইবে। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির উপর, বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তির উপর এবং অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবতার মূর্ত্তির উপরিভাগে, পাঁচটি বা সাতটি সাপ ফণা ধরিয়া রহিয়াছে, এইরূপ অনেক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। জৈন-ধর্ম্মেও সাপের প্রভাব বড় কম নয়। তাহাদের দেবমূর্ত্তিতেও সর্পাঙ্কিত থাকে। কাজেই, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই—কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি জৈন, সকলেই একপ্রকারে কিংবা অন্য প্রকারে নাগপূজা করে। ভারতবর্ষের বাহিরেও কোন কোন দেশে নাগপূজা প্রচলিত। কাম্বোডিয়ার বা কম্বোজের সর্পস্তম্ভ বিশেষ বিখ্যাত। (পর পৃষ্ঠার ছবি দেখ)।

আমাদের বাঙ্গালা দেশের কি সাহিত্যে, কি পূজা-পার্ব্বণে সর্ব্বত্রই 'মনসা' বা সর্পদেবতার প্রভাব

বিদ্যমান্ রহিয়াছে। চাঁদ সওদাগরের গল্প তোমরা শুনিয়া থাকিবে - যিনি চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়া বাণিজ্যে যাইতেন, যাঁহার পুত্র লক্ষীন্দর কালীনাগের দংশনে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। চাঁদ সওদাগর মনসাদেবীর পূজা করিতে চাহিতেন না বলিয়াই মনসার কোপে ও নানা বিপদে পড়িয়াছিলেন। লক্ষীন্দরের পত্নী



কাম্বোডিয়ার সর্প স্তম্ভ

বেহুলা, কলার মান্দাসে পতির মৃতদেহ লইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিলেন,- মৃত পতির পুনর্জ্জীবন লাভের জন্য। সে গল্প তোমরা শুনিয়া থাকিবে। বাঙ্গালাদেশে শ্রাবণ মাসে 'পদ্মাপুরাণ' অর্থাৎ মনসার ভাসান বা পাঁচালী গীত হইয়া থাকে। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবি মনসার ভাসান লিখিয়াছেন। আমরা এখানে বিজয়গুপ্তের মনসার পাঁচালী হইতে বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত কয়েকটি সাপের নাম করিলাম।

'ত্রিভুবন মোহ যায় পদ্মার প্রতাপে।
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিল পদ্মা **অজগর** সাপে॥
আডরিয়া বেঁকা নাগে করিল আসন।
পাটেশ্বরী নাগে পদ্মা করিল বসন॥
খইয়াজাতি নাগে পদ্মার হাতের বড় শোভা।
বিঘতিয়া নাগে পদ্মা মাথায় বাঁধে খোঁপা॥
কুণ্ডলিয়া নাগে পদ্মার কর্ণের কুণ্ডলী।
জাতিসর্প দিয়া বান্ধে মাথার পুটলী॥
শিশরিয়া নাগে পদ্মার ললাটে সিন্দূর।
বিঘতিয়া **বোড়া** নাগে চরণে নূপুর॥
সূর্য্যমণি নাগে পদ্মার শাড়ীর আঁচলা।
ধামু নাগেতে পদ্মার কোমরে কাঁচলী॥
কত নাগ পাছে চলে, কত চলে আগে।
লুকাইয়া ঘরেতে রাখিল অষ্টনাগে॥

ইত্যাদি -

মহাভারতে, রাজা জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞের কথা আছে। তাহাতেও শেষ, বাসুকি, ঐরাবত, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, মণি, আপূরণ, পিঞ্জরক, এলাপত্র, বামন, নীল, অনীল, কল্মাষ, শবল, আর্য্যক, উগ্রক, কলসপোতক, সুমনা, দধিমুখ, বিমলপিণ্ডক, আপ্ত, শঙ্খ, বালিশিক, নিষ্টানক, হেমগুহ, নহুষ, পিঙ্গল, বাহ্যকর্ণ, হস্তিপদ, মুদ্গরপিণ্ডক, কম্বল, অশ্বতর, কালীয়ক, বৃত্ত, সংবর্ত্তক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খমুখ, কুষ্মাণ্ডক, ক্ষেমক, পিণ্ডারক, করবীর, পুষ্পদংষ্ট্র, বিল্বক, বিল্বপাণ্ডুর, মূষকাদ, শঙ্খশিরা, পূর্ণভদ্র, হরিদ্রক, অপরাজিত, জ্যোতিক, শ্রীবহ, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খপিণ্ড, বিরজা, সুবাহু, শালিপিণ্ড, হস্তিপিণ্ড, পিঠরক, সুমুখ, কৌণপ, অশন, কুঠর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, তিত্তির, হলিক, কর্দ্দম, বহুমূলক, কর্কর, অকর্কর, কুণ্ডোদর, মহোদর প্রভৃতি অনেক সাপের নাম পাওয়া যায়।

সাপের উৎপাত যে অনেক দিন হইতেই ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে, তাহা এই সকল প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে জানা যায়।

তোমরা কলিকাতা কিংবা অন্য কোনও বড় সহরে যদি কখনও বেড়াইতে যাও, তাহা হইলে এখানকার চিড়িয়া খানায় সাপের ঘরে যাইয়া নানাজাতীয় সাপ দেখিয়া আসিতে কখনও ভুলিও না।







মুদ্রাতত্ত্ব

প্রথম কথা

বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক সভ্যদেশেই মুদ্রার প্রচলন আছে। আমরা জিনিসপত্র ক্রয়, কি বিক্রয় করিবার সময় সাধারণতঃ মুদ্রা ব্যবহার করিয়া থাকি। মুদ্রা ব্যতীত আমাদের জীবনযাত্রা চলিতে পারে না। আমাদের যাহা কিছু দরকার—যেমন খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান প্রভৃতি আমরা মুদ্রা থাকিলেই সংগ্রহ করিতে পারি। তাহার কারণ এই যে, সভ্যজগতে প্রত্যেক ব্যক্তিই মুদ্রার পরিবর্ত্তে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় অথবা বিক্রয় করিতে রাজি আছেন। কিন্তু যদি সকলেই আবশ্যক জিনিসের পরিবর্ত্তে মুদ্রা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হইতেন, তাহা হইলে ইহার কোন মূল্যই থাকিত না। এই বিষয়ে একটা সুন্দর প্রাচীন গল্প আছে। ফ্রিজিয়া দেশে মিডাস্ নামে একজন অত্যন্ত অর্থপিপাসু রাজা ছিলেন। তিনি দেবতাকে পূজা-অর্চ্চনায় সন্তুষ্ট করিয়া এই বর গ্রহণ করেন যে, তিনি যে কোনও বস্তু স্পর্শ করিবেন, তাহাই সোনায় রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। বর পাইয়া তিনি অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং চারিদিকে এটা ওটা স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বসিবার আসন, খাট প্রভৃতি গৃহের সমস্ত দ্রব্য তাঁহার স্পর্শে সোনা হইয়া গেল। মিডাসের আনন্দের আর সীমা নাই। এইরূপে কিছু-ক্ষণ অতিবাহিত হইলে তাঁহার খাবার সময়



উপস্থিত হইল। কিন্তু যখন তিনি আহার করিতে বসিলেন এবং খাদ্যদ্রব্য হাতে তুলিয়া মুখে দিতে গেলেন, তখন তাহা সমস্তই সোনা হইয়া গেল; কিছুই খাইতে পারিলেন না। পিপাসায় অস্থির হইয়া যেমন জলপাত্র মুখের নিকট নিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহা তরল সোনায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মিডাসের একটি কন্যা ছিল, তিনি তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কন্যা এক দিন খেলিতে খেলিতে আনন্দে অধীর হইয়া যেমন পিতাকে স্পর্শ



রাজকন্যা স্বর্ণনির্ম্মিত পুত্তলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

করিল, অমনি সে সোনা হইয়া গেল। ইহাতে মিডাসের প্রাণে অত্যন্ত বেদনা লাগিল। একে তিনি ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তারপর স্নেহের পুতলি কন্যার এইরূপ রূপান্তরিত হওয়ায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, এবং আবার দেবতার নিকট তাহার বর ফিরাইয়া লইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিলেন

যে, সোনা, রূপা প্রভৃতি মানুষের প্রধান অভাব মোচন করিতে পারে না। এই সকল মূল্যবান্ ধাতু এবং তদ্দ্বারা নির্ম্মিত মুদ্রাগুলির নিজের, মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান করিবার কোনও ক্ষমতা নাই। কিন্তু সভ্যজগতে সকলেই এই সমস্ত ধাতু বা তন্নির্ম্মিত মুদ্রার পরিবর্ত্তে আহার্য্য, পোষাক প্রভৃতি বিনিময় করিতে ইচ্ছুক বলিয়া আমরা মনে করি যে, মুদ্রাই আমাদের অভাব দূর করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। মুদ্রার একমাত্র কার্য্য জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের সাহায্য করা। আমি যদি একটা গরু বিক্রয় করিয়া চাউল খরিদ করিতে চাই, তবে গরুটা প্রথমতঃ বাজারে লইয়া যাইব এবং ঐটি বেচিয়া ফেলিয়া কয়েকটি টাকা পাইব। আবার অন্য একজন লোকের চাউল আছে কিন্তু অন্য জিনিসের দরকার, সে আমার নিকট হইতে ঐ কয়টি টাকা গ্রহণ করিয়া বাজার দরে

উপযুক্ত পরিমাণ চাউল দিবে। এইরূপে যদিও বাস্তবিক পক্ষে আমি গরুটা দিয়া তৎপরিবর্তে চাউল পাইতেছি, তবু ঐ টাকাগুলির সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে চাউল সংগ্রহ করা কঠিন হইতে পারিত ; কারণ যে চাউল বিক্রয় করিবে, তাহার গরুর কোনও প্রয়োজন নাও থাকিতে পারে, সুতরাং সে যদি গরুর পরিবর্তে চাউল দিতে অস্বীকার করে, তবে আমাকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে। ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার জন্যই মুদ্রার উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইহাতে বাণিজ্যের ও সভ্যজনসাধারণের জীবনযাত্রার অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মুদ্রার ব্যবহার না থাকিলে যে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইত, তাহা তাঁহারা সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তবু মুদ্রা আবিষ্কার করিতে না পারায় বাণিজ্য-ক্ষেত্রে আশানুরূপ প্রসারণ লাভ করিতে পারেন নাই।

প্রথম কিরূপে মুদ্রার প্রচলন হইল, তাহা জানিতে হইলে অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে নানা ধাতুর নানা রকমের মুদ্রা অথবা তৎপরিবর্তে কাগজের নোট প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে যেমন টাকা প্রধান মুদ্রা, সেইরূপ ইংলণ্ডে পাউণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ডলার, জাপানে ইয়েন এবং অন্যান্য দেশে পৃথক্ পৃথক্ মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সমস্ত প্রধান মুদ্রার সহায়ক অন্যান্য মুদ্রাও প্রচলিত আছে—যেমন সিকি, দুআনি, এক-



পয়সা



এক আনি

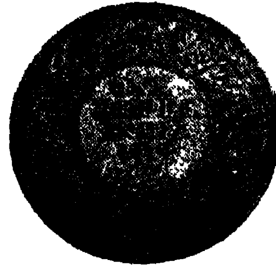


দু আনি



সিকি


আধুলি


টাকার অপর পিঠ


টাকার সম্মুখ পিঠ

বেশ বুঝিতে পারা যায় ; কিন্তু অতীতকালে কোন কোন সুসভ্য জাতি মুদ্রার ব্যবহার জানিত না, এবং তাহারা দ্রব্য বিনিময় দ্বারা নিজ নিজ অভাব পূরণ করিত। প্রাচীন মিসর, বেবিলন ও এসিরিয়ায় লোকেরা আমাদের মত মুদ্রার ব্যবহার জানিতেন না। যদিও আনি, পয়সা প্রভৃতি। টাকা রূপার তৈয়ারী কিন্তু ইহাতে অন্যান্য জিনিসেরও কিছু খাদ থাকে। আধুলি, সিকি, দুয়ানি রূপারও আছে, কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ নিকেলের তৈয়ারী হইতেছে ; পয়সা এখন তামার সহিত রঙ্গ-মিশ্রিত ধাতু বা ব্রোঞ্জে তৈয়ার হইয়া থাকে।

কিন্তু প্রত্যেক মুদ্রাকেই শক্ত করিবার জন্য কিঞ্চিৎ খাদ দিতে হয়। কোন্ মুদ্রায় কোন্ ধাতু কতটুকু এবং কি পরিমাণ খাদ আছে তাহা সব দেশের সরকারই জনসাধারণকে জানাইয়া দিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের প্রধান মুদ্রা পাউণ্ড—স্বর্ণনির্ম্মিত, কিন্তু তাঁহার সহায়ক শিলিং রৌপ্যনির্ম্মিত। এইরূপ সর্ব্বদেশেই নানা ধাতুর বিভিন্ন ওজনের মুদ্রা প্রচলিত আছে।



দশ টাকার নোট

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানবের অভাব অতি সামান্যই ছিল। শিকারলব্ধ আহার্য্য ও পর্ব্বত গুহায় বাসস্থান—ইহাতেই তাহাদের জীবন-যাত্রা চলিয়া যাইত। এমন কি, পোষাক-পরিচ্ছদেরও দরকার ছিল না। কিন্তু এই আদিম অবস্থার পর যখন ক্রমশঃ মানব সভ্যতায় উন্নতি লাভ করিতে লাগিল, তখন তাহারা নিজ নিজ সুবিধার জন্য দলবদ্ধ অবস্থায় নূতন সামাজিক গঠন সৃষ্টি করিল। এইরূপে বিভিন্ন দলের ভিতর বিনিময়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এক দলের কোনও বিশেষ জিনিস অন্য দলের আবশ্যক হইলে ঐ জিনিস পাইবার জন্য তৎপরিবর্ত্তে আর একটা জিনিস দেওয়া—ইহাকেই বিনিময় প্রথা বলে। প্রথমতঃ এইরূপভাবে পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের প্রথা আরম্ভ হয়। তারপর একদলের লোকদিগের ভিতর পরস্পরের মধ্যে পণ্যদ্রব্য বিনিময় প্রবর্ত্তিত হইল। যেমন একজন লোকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোষাক আছে, অথচ তাহার খাদ্যাভাব; অন্য একজনের তাহার দরকার অপেক্ষা অধিক খাদ্যদ্রব্য আছে কিন্তু পোষাক নাই। এই অবস্থায় যাহার যে জিনিসটার অভাব তাহা সংগ্রহ করিতে হইলে অন্য লোকের সঙ্গে বিনিময় ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই, অর্থাৎ যাহার খাদ্যের অভাব, সে পোষাকের পরিবর্ত্তে অন্য লোকটার নিকট হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিবে। এই প্রথায় কতকগুলি অসুবিধা আছে। যেমন একজন লোকের খাদ্যের অভাব কিন্তু পোষাক প্রচুর; যদি অন্য কাহারও পোষাকের দরকার না থাকে তবে সে কিছুতেই বিনিময় দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে না। এই অবস্থায় যদি সকল লোকে মিলিয়া এমন একটি জিনিস নির্দ্দিষ্ট করে যে, ক্রয় অথবা বিক্রয়ের সময় সেই জিনিসটি নিজ নিজ পণ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে অনেকটা সুবিধা হয় এবং বেচা-কেনাও সহজ হইয়া উঠে। নানা দেশে নানা প্রকার দ্রব্য বিনিময় যন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শিকারলব্ধ চামড়া, ভেড়া, গরু, তামাক, নারিকেল, বড় মাছ প্রভৃতি বিনিময়ের সহায়করূপে বিভিন্নদেশে ব্যবহৃত হইত। নানারূপ সোনারূপার বা লোহার অলঙ্কার, কড়ির মালা প্রভৃতিও কোনও কোন জাতি বিনিময়ের জন্য ব্যবহার করিত। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিনিময় যন্ত্রের পরিবর্ত্তে ধাতুদ্রব্যের প্রচলন হইল। ধাতু-দ্রব্য সোনারূপা প্রভৃতি চামড়া, তামাক, বা শস্যের ন্যায় সহজে নষ্ট হয় না; আবার ধাতু-দ্রব্য যেমন অল্প জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ক্ষুদ্রাংশে বিভাগ করা যায়, গরু বা ভেড়ার

পক্ষে তাহা অসম্ভব। সুতরাং মানুষ যতই সভ্য হইতে লাগিল, ততই পূর্ব্বতন বিনিময় যন্ত্রগুলি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িল এবং পণ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কেবল ধাতুদ্রব্যই ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল—যেমন সোনা, রূপা, তামা ইত্যাদি। সোনা দেখিতে অতি সুন্দর এবং সোনার অলঙ্কার অতি আদরের জিনিস; এই সকল কারণে মনে হয় যে, সোনাই মানুষের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করে। বাজারে জিনিস খরিদ করিতে হইলে কোন দ্রব্যের জন্য কতটুকু সোনা, রূপা অথবা তামা দিতে হইবে, তাহা ওজন করিয়া ঠিক করা হইত। এই প্রথাও কিছুদিন পরে তত সুবিধাজনক মনে হইল না; কারণ, প্রত্যেক জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সোনা, রূপা ওজন করিয়া দিতে হইত এবং সোনা, রূপা অথবা তামার ভিতর কতটুকু খাদ আছে তাহা লইয়া প্রত্যেকবার তর্ক উপস্থিত হইত। ফলে, বহু সময় নষ্ট হইত এবং সব সময়ই এক পক্ষের ঠকিবার বিশেষ আশঙ্কা থাকিত। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার জন্য ক্রমে মুদ্রা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রত্যেকটা মুদ্রার কি ওজন এবং তাহাতে কতটুকু খাদ আছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত; সুতরাং ওজন করা বা ধাতুর বিশুদ্ধতা নির্ণয় করার কোনও প্রয়োজন নাই। ইহাতে খরিদ বিক্রয়ে যে কত সুবিধা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। মুদ্রার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার হইতে থাকে এবং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জীবনযাত্রার জন্য বিশেষভাবে মুদ্রার উপর নির্ভর করিতে হয়। যাহার টাকা আছে সে তৎপরিবর্ত্তে ভোগ বিলাসের সামগ্রী অতি সহজেই সংগ্রহ করিতে পারে।

আমাদের দেশে টাকা প্রধান মুদ্রা। ইহা আকারে গোল, একদিকে রাজার মূর্ত্তি ও নাম, অন্যদিকে তাহার মূল্য লেখা আছে। সুন্দর লতাপাতার নক্সা দুই পিঠে; এবং পার্শ্বে খাঁজ কাটা আছে। টাকাটা দেখিলেই আমরা কতকগুলি বিষয় জানিতে পারি—ইহার কি ওজন, কোন দেশে প্রচলিত, কতটুকু রূপা ও খাদ আছে এবং কোন বৎসর তৈয়ার হইয়াছে, সমস্তই জানা যায়। বিশেষতঃ, চারিদিকে খাঁজ কাটা থাকায় কেহই ঘষিয়া অথবা কাটিয়া রূপা লইয়া যাইতে পারে না এবং নানা লতাপাতায় ভূষিত থাকায় জাল করা অত্যন্ত শক্ত হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক দেশের সরকার এইরূপে নিজ নিজ মুদ্রা প্রচার করিয়া ক্রয়-বিক্রয় ও বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আজকাল সভ্যজগতে অর্থনৈতিক ভিত্তি মুদ্রার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অতীতকালে এমন অনেক সভ্যজাতি ছিল যাহারা মুদ্রা ব্যতীত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়াছিল; যদিও সেইজন্য তাহাদিগকে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। ফিনিসিয়া দেশ এশিয়া মাইনরের পশ্চিমপ্রান্তে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। সেই দেশীয় লোকেরা প্রাচীনকালে অতি প্রসিদ্ধ বণিকজাতি ছিল এবং ভূমধ্যসাগরের চারিদিকের দেশগুলির বাণিজ্য তাহাদের হাতে ছিল। পরে গ্রীস-দেশীয় লোকেরা তাহাদের বাণিজ্য-প্রভুত্ব লন। এই ফিনিসিয়াদেশীয়েরা পণ্য বিনিময়ে বাণিজ্য করিত। স্পেইন (বা প্রাচীন তারশিশ) দেশে তাহারা নিজেদের তৈয়ারি বাসন, খেলনা, পোষাক প্রভৃতি জাহাজে লইয়া যাইত এবং তৎপরিবর্ত্তে রূপা, লোহা, টিন ও সীসা গ্রহণ করিত। তাহারা তখন পর্য্যন্ত কোনও পণ্য বিনিময় যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারে নাই। মিশর, এসিরিয়া এবং বেবিলন ক্রমে এক স্তর উপরে উঠিয়াছিল। তাহারা বিনিময়ের জন্য ওজন করিয়া ধাতুদ্রব্য ব্যবহার করিত। এই সকল প্রাচীন সভ্যজাতি মুদ্রা আবিষ্কার

করিতে পারে নাই। অন্যান্য বিষয়ে—যেমন স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহারা কতই উন্নতি করিয়া গিয়াছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারে নাই এবং মুদ্রার ব্যবহার তাহাদের পরিজ্ঞাত ছিল না। পাশ্চাত্য জগতে লিডিয়া-দেশীয় লোকেরাই মুদ্রার প্রথম প্রবর্ত্তক। সম্ভবতঃ লিডিয়ারাজ গিজীস ঐদেশে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রা আবিষ্কার করেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে ঈজিয়ান উপসাগরের অপর তীরে ইউরোপে এই আবিষ্কারের বার্ত্তা নীত হয় এবং গ্রীসের বিভিন্ন স্থানে মুদ্রা তৈয়ারী আরম্ভ হয়। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে সুসভ্য পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বত্র মুদ্রাঙ্কন প্রথা পবিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং অতি সুন্দর সুন্দর মুদ্রা প্রস্তুত হইতে থাকে। তন্মধ্যে গ্রীস-দেশীয় মুদ্রা সেই দেশবাসীর কলা-কৌশল জ্ঞানের পরিচায়ক এবং অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প-কার্য্যের নিদর্শন। প্রাচ্যদেশ সমূহের ভিতর ভারতবর্ষ এবং চীন পরস্পর স্বাধীন-ভাবে এই উন্নত প্রণালীটি আবিষ্কার করিয়া নিজ নিজ মুদ্রার প্রচলন করে।

ধাতুপিণ্ড বা ধাতুখণ্ডের উপর নানারূপ নক্সা মুদ্রণ করিয়া দেওয়া হইত বলিয়া ঐগুলিকে মুদ্রা বলা হয়। প্রথমে কেবলমাত্র একপিঠে নক্সা থাকিত, পরে দুই পিঠেই নক্সা এবং কোন কোন সময়ে লিপি বা লেখা (legend) থাকিত। যে পিঠে প্রধান নক্সা (device) থাকে, তাহাকে মুদ্রার সম্মুখ (obverse) ও অন্য পিঠ পশ্চাৎ (reverse) বলা হয়। মুদ্রা অর্থনৈতিক জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। ঐতিহাসিকদের নিকটও ইহার আদর কম নহে। আমরা প্রাচীন মুদ্রা হইতে তৎকালীন রাজরাজার নাম, সময় ও প্রচলিত ধর্ম্মের সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি। কারণ, অনেক সময়ে মুদ্রার উপর রাজারা তাঁহাদের উপাস্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দিতেন। এমন অনেক রাজা ছিলেন, যাঁহাদের সমস্ত কীর্ত্তি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র তাঁহাদের মুদ্রা-দ্বারা তাঁহাদের নাম এবং কোন সময়ে তাঁহারা জীবিত ছিলেন, জানিতে পারি। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের রাজাদের কার্য্যাবলী এবং তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা সেই সময়ের মুদ্রা হইতে আমরা জ্ঞাত হই। এমন অনেক রাজবংশ ছিল, যাহাদের বিবরণ প্রধানতঃ তৎকালীন মুদ্রা হইতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতীয়, গ্রীক ও পারস বংশীয় রাজাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অধিকাংশই তাঁহাদের মুদ্রা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। রাজারা কি ভাষা বা কি লিপি ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের কি ধর্ম্ম ছিল, এই সমস্ত সঠিক-ভাবে জানিতে হইলে তাঁহাদের মুদ্রার সাহায্য লওয়া দরকার। সুতরাং ঐতি-হাসিকের নিকট মুদ্রার আদর অত্যন্ত বেশী এবং যে সমস্ত তথ্য আমরা সমসাময়িক মুদ্রা হইতে সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা অত্যন্ত প্রামাণ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়। প্রাচীন ইতিহাস রচনায় মুদ্রার সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; সেইজন্য মুদ্রাতত্ত্ব ইতিহাসের একটি প্রধান ভিত্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।



বৈষ্ণব-সাহিত্য


১৫৭৯ পৃষ্ঠার পর

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস আমাদের দেশে কবিতার যে ধারা বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম বৈষ্ণব-সাহিত্য। আমাদের সাহিত্যের ইহা অতি গৌরবের বস্তু; এত অধিক গৌরবের বস্তু যে, অনেকে বলেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বলিলে বৈষ্ণব-সাহিত্যই বুঝা যায়। রাধাকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া ইহা গড়িয়া উঠে; তাঁহাদের মিলন-বিরহ, পূর্ব্বরাগ, মান-অভিমান ইত্যাদি ভাব বৈষ্ণব কবিদের অমর ভাষায় এমনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, পৃথিবীতে কোথাও তাহার তুলনা নাই। তাহার ছন্দ, তাহার কথা, তাহার ভাব—সকলই অতুলনীয়। এই বৈষ্ণব-সাহিত্য বহু সাধক, বহু বৈষ্ণব রচনা করিয়া গিয়াছেন—গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, যদুনন্দন—কত জনের নাম করিব? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম উজ্জ্বল—জগতের সাহিত্যের ইতিহাসেও বুঝি তাঁহারা ম্লান নহেন।

তাঁহাদের রচনার বিষয় যেমন এক,—রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই,—তেমনি আবার ভাষাও অনেকটা এক ছিল। তাঁহারা ব্রজবুলিতে রচনা করিতেন। এই ব্রজবুলি সাধারণ ভাষা ছিল না; আমরা এখনও এই কথা বলিয়া থাকি যে, পদ্যের ও গদ্যের ভাষা এক নহে,—গদ্যের কথা আটপৌরে, প্রয়োজনের ভাষা, আর পদ্য হইল সখের, কল্পনার বস্তু—সুতরাং তাহার ভাষা অন্য রকম হইবেই। তাই তাঁহারা এক মিশানো ভাষায় কবিতা রচনা করেন, সে ভাষার নাম ব্রজবুলি। এই ব্রজবুলির উৎপত্তি কোথায়, তাহা লইয়া সকলে যে একমত হইতে পারিয়াছেন, এমন নহে। কেহ কেহ বলেন, ইহা ব্রজের বুলি, কেহ বা বলেন, ইহা হিন্দি মেশানো বাংলা, আবার অনেকে বলেন, ইহার ভিত্তি এদেশে প্রচলিত মিথিল ও প্রাকৃতের উপর। খুব কম হইলেও চারিশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণব-কবিরা এই ভাষায়ই কবিতা রচনা করিয়া আসিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্রজবুলিরই সাহায্যে তাঁহার অল্প বয়সে কতকগুলি কবিতা লিখেন—তাহাদের নাম দেন "ভানুসিংহের পদাবলী।" "তোমার স্থানে "তুয়া" "সেবিলাম" স্থানে "সেবলুঁ" "পান করিলাম" স্থানে "পিয়লুঁ" "সন্ধ্যাবেলা" না বলিয়া "সাঁঝ বেরী" "অঙ্গে" না বলিয়া "অঙ্গহি"—

বুঝিবার পক্ষে তেমন বাধা হয় না, তবে অন্য জগতের একটা ধারণা জন্মাইয়া দেয়। অবশ্য, সব বৈষ্ণব-কবিতাই যে ব্রজবুলিতে লেখা, তাহা নয়, যেমন,—

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
মরাল-গমনে চলে।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম
দাস গোবিন্দ বলে॥

বৈষ্ণব-কবিগণ কি বিষয়ে কবিতা লিখিতেন? বলিয়াছি, রাধাকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহাদের কথা লইয়া; তাঁহাদের মিলন-বিরহের চারিদিকে বৈষ্ণব-কবিতা আপনভাবে চলিত। সোজা কথায় এত গভীর ভাব আর অতি অল্প স্থানেই দেখা যায়। কখনও তাঁহাদের গোপাল বাছুর চরাইতে যাইবেন—

আগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া,
চরণেতে পরাহ নূপুর॥
অলকা তিলকা ভালে বনমালা দেহ গলে,
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।

মাগো, আজ আমি বাছুর চরাইতে যাইব। আমাকে বিশেষভাবে কাপড় পড়াইয়া দেও। মন্ত্র পড়িয়া চূড়া বাঁধ, পায়ে নূপুর পরাও কপালে কুঙ্কুম দিয়া তিল ফুলের মত কাটিয়া দাও, গলায় বনমালা থাকুক, হাতে শিঙ্গা, বেত ও বাঁশী দিও। নন্দরাণী যশোদা গোপালের মা; তিনি গোপালকে গরু চরাইতে পাঠাইতে চান না, ভয় হয় যে; গোপালের খুব ইচ্ছা দেখিয়া তাই সঙ্গী ছেলেদের কাছে বলিতেছেন,—

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওহে বলরাম
মিনতি করি যে তো সবারে।
বন কত অতিদূর সব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া তুমি না যাইও দূরে

ওরে দাম, শ্রীদাম, সুদাম, বলরাম, শুন, তোমাদের সকলকে মিনতি করি,—বন বহুদূর, নূতন ঘাস ও কুশাঙ্কুর আছে, পায়ে বিঁধিবে। গোপালকে লইয়া বেশী দূর যাইও না। কখনও বা গোপালকে অতি শীঘ্র ফিরিতে বলিতেছেন—

সকালে আসিও গোপাল ধেনুগণ লৈয়া।
অভাগিনী রইল তোমার চাঁদমুখ চাঞা॥
থাকিহ শ্রীরামের সঙ্গে চরাইহ বাছুরী।
জোরে সিঙ্গা রব দিও পরাণে না মরি॥
এ ক্ষীর নবনী এহ খেতে তোরে দিনু
তুমি যাবে দূর বনে আমি ভাবি মৈনু॥

গোপাল ধেনু লইয়া শীঘ্র ফিরিও; অভাগিনী তোমার চাঁদমুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। শ্রীরামের সঙ্গে থাকিয়া বাছুরী চরাইও, জোরে শিঙ্গায় ফুঁ দিও, দেখিও, দুর্ভাবনায় প্রাণে যেন না মরি। তোমার খাওয়ার জন্য এই ক্ষীর-নবনী দিলাম, তুমি দূর বনে যাইবে, আমি ভাবিয়া মরি।

সঙ্গীরা গোপালকে রাখাল-রাজা করিয়া সাজাইতেছে, কালীয় নাগ ছিল ভারি দুর্দ্দান্ত,—গোপাল তাহাকে জব্দ করিয়া তাহারই ফণার উপর নাচিতে লাগিলেন। এইরূপে গোপালকে লইয়া কত পদ রহিয়াছে, তাহাদের সবগুলি যে ব্রজবুলিতে লিখা, তাহাও নয়। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের কথাই পদাবলীতে অধিক স্থান জুড়িয়া আছে। কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া রাধা পাগল হইয়াছেন, শ্যামের নাম শুনিয়া পাগল হইয়াছেন। সে নাম তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার প্রাণ আকুল করিয়াছে। রাধা কৃষ্ণকে পাইবার জন্য কত ব্যাকুল, কৃষ্ণ রাধাকে পাইবার জন্য কত ব্যাকুল—তাহা নানাভাবে অপরূপ কল্পনার সাহায্যে দেখান হইয়াছে। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কংসের অত্যাচারে মথুরা জর্জ্জরিত, তিনি মথুরায় গিয়া কংসকে বধ করিলেন, রাধা ও সখীগণ আর তাঁহার দর্শন পাইলেন না—তাঁহাদের যে কষ্ট, তাহা কবিগণ সুন্দরভাবে

লিখিয়াছেন,—সে-সব পদের নাম মাথুর। রাধা সখীকে মথুরায় কৃষ্ণের সহিত দেখা করিতে পাঠাইতেছেন, তাই এই নাম। রাধা বলিতেছেন,—

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
রোপিনু মল্লিকা নিজ করে।
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
এই তরু শাখায় রহিল সারিশুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥

সখি, কানুকে বলিও, একবার যেন সে ব্রজপুরে আসে। মল্লিকা নিজহাতে রুইয়াছি, ইহার ফুলের মালা তাহার গলায় পরাইও। আমার হৃদয়ের এই হার নিকুঞ্জে রাখিলাম, সে যেন একবার গলায় পরে। শুকসারী এই গাছের ডালে রহিল; আমার এ অবস্থা যেন প্রিয়তম ইহাদের মুখে শুনে। এই বনে আমার নৃত্যশীলা রঙ্গিণী হরিণী থাকিল,—প্রিয়তম যেন ইহাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করে।

কৃষ্ণ-বিরহে রাধা প্রাণত্যাগ করিবেন, মৃদু মলয় তাঁহার নিকটে আগুনের মত অসহ্য বোধ হইতেছে,—চারিদিক হইতে সখীরা আসিয়া ঘেরিয়া বসিল, হরিলীলা গাহিতে লাগিল। ললিতা নামে এক সখীর কোলে রাধা, অন্য এক সখী বিশাখা তাঁহাকে ধরিয়া আছে, কিন্তু কবি আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে,—

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা—
কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুর অঙ্গ বিরহানলে দহনা—
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হোই মঝু গাত॥
যো দরপণে পঁহু নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তছু মাহ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐ ছুনে মিলই যব গোকুলচন্দ’
যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তছু মাহ॥
যোই বীজনে পঁহু বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হোই মৃদু বাত॥
যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥

মলয় বায়ু অতি শীতল, মৃদু মন্দ বহিতেছে, কিন্তু কৃষ্ণ-বিরহে কাতর যে অঙ্গ তাহা উহাতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। প্রভু যেখান দিয়া অরুণ-চরণে চলিয়া যান সেখানকার মাটী আমার দেহ; যে দর্পণে প্রভু নিজের মুখ দেখেন, আমার অঙ্গের জ্যোতি তাহার মধ্যে থাকুক। সখি, বিরহ আমার আর মৃত্যুকে শত্রু মনে করে না, কারণ,মরিলে গোকুলচন্দ্রের সহিত দেখা হইবে। যে সরোবরে প্রভু নিত্য স্নান করেন, আমার অঙ্গ সলিল হইয়া সেখানে থাকুক। প্রভু যে পাখার হাওয়া খান, আমার অঙ্গ সেই পাখার মৃদু হাওয়া হইয়া থাকুক। প্রভু যেখানে শ্যামবর্ণ মেঘ হইয়া বিচরণ করেন, আমার অঙ্গ সেখানে গগন হইয়া থাকুক।

এই রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কথা নিত্য নূতন, ইহার অপূর্ব্ব ভাবের কথা বলিতে গিয়া কবি গাহিয়াছেন,—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোহি পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।

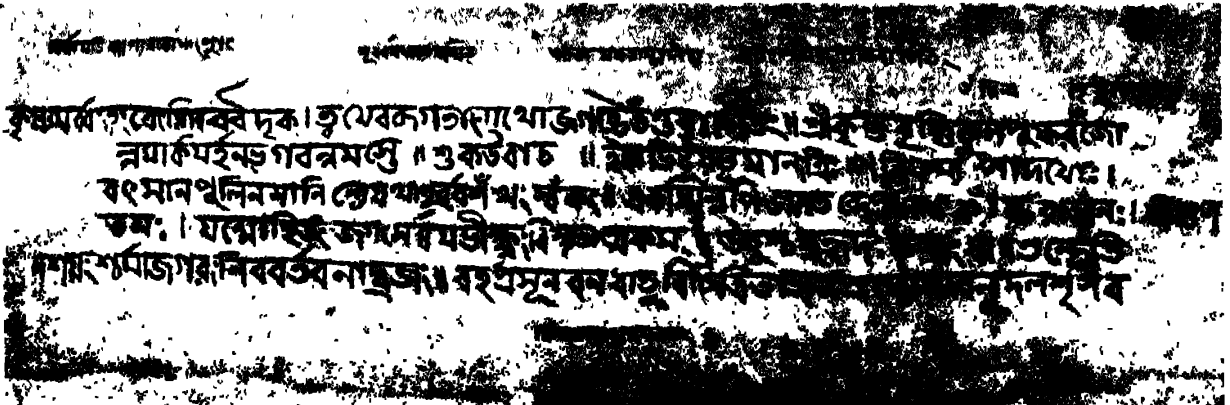
সখি, আমাকে অনুভবের কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ,—সেই প্রেম-অনুরাগ ভাষায় বলিতে গিয়াই একটু একটু করিয়া নূতন হইতেছে।

আর এই অপূর্ব্বভাব কে বুঝিবে? লেখা-পড়া করিলে পণ্ডিত হইলেই যে বুঝিতে পারিবে, তাহা নহে,—

কত বিদগধ জন রসে অনুগমন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহে কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

কত বিদ্বান্ পণ্ডিত এই রস অনুগমন করিয়াছেন, রসের নিকটে যাইতেছেন কাহারও তো অনুভব হইতে দেখিলাম না—কবিবল্লভ বলে, প্রাণ জুড়াইতে পারে এমন একজন লোক লক্ষের মধ্যেও মিলিল না।

যে সকল বৈষ্ণব-কবি এই ভাব প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, আমাদের সাহিত্য-কথায় তাঁহাদের নাম অমর। আমরা তাঁহাদের ভুলিতে পারি না। দেড় শতেরও অধিক বৈষ্ণব-কবির পদ পাওয়া গিয়াছে। গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, যদুনন্দন, জগদানন্দ, বংশীবদন, শশিশেখর, রায়শেখর,—ইঁহাদের পদ বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ। শুধু বাঙ্গালীই যে বৈষ্ণব পদ রচনা করিতেন, তাহা নহে। রায় রামানন্দ, চম্পতি রায়, গোপাল ভট, শিখি মাইতি, সদানন্দ, ইঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন না, কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীতে ইঁহাদের নাম প্রশংসা ও গৌরবের সহিত লিখিত আছে। এই সব কবির পদ একত্র করিয়া সংগ্রহ করা আছে—তাহার নাম পদ-সমুদ্র। সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ইহা একত্র করা হয়,—প্রায় ১৫,০০০ পদ লইয়া। তাহার পর পদামৃত-সমুদ্র; পদকল্পতরু, পদকল্প লতিকা, পদচিন্তামণিমালা, পদার্ণবসারাবলী—কত নাম করিব? এই সকল পদাবলী সংগ্রহে



শ্রীচৈতন্য দেবের হস্তাক্ষর

মহামূল্য সুন্দর কবিতা আছে; 'সমুদ্রে' অনেক 'রত্ন' আছে।

এই সব সুন্দর পদ বা কবিতা ছাড়া বৈষ্ণবেরা বাংলায় অনেক জীবন-কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে এরূপ জীবন-কথা লেখা বাংলায় বিশেষ প্রচলিত ছিল না। সর্ব্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বলিতে হয়। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে। তিনি ছেলেবেলায় খুব বড় পণ্ডিত হইতে পারিয়াছিলেন। বয়সে অনেক বড় এবং অশেষ খ্যাতিমান বহু পণ্ডিত তাঁহার নিকট তর্কে হার মানিয়াছিলেন। একবার এক দিগ্‌বিজয়ী বীর নবদ্বীপের পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করিতে আসেন; আর কেহ তাঁহার সঙ্গে তর্ক-বিচার করিতে সাহসী হইলেন না, শুধু নিমাই পণ্ডিত (চৈতন্যদেব এই নামেই নবদ্বীপে সুপরিচিত ছিলেন) তাঁহাকে একেবারে হারাইয়া দিলেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হন। তখন হইতে তাঁহার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি অবিরাম কৃষ্ণ নামে ডুবিয়া থাকিতেন, রাধা-কৃষ্ণের কথা তাঁহার মন জুড়িয়া বসিত, হরির চিন্তায় কাঁদিয়া পাগল হইয়া যাইতেন, কদম্ব বা তমাল দেখিলে বৃন্দাবনের ছবি তাঁহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিত। প্রেমের ঠাকুর

নদেরচাঁদ চৈতন্যদেবের ভগবানকে এই ভালবাসার তুলনা আর ইহ জগতে নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার সাধনাও কঠোর ছিল। এক ভক্ত তাঁহার জন্য তুলার বালিশ রাখিয়াছিল,—তাহা দেখিয়া তিনি সে ভক্তকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন; আর একজন তাঁহার জন্য সুগন্ধি তেল রাখিয়াছিল, সে তেল ফেলিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার শান্তি ছিল না। এক ভক্ত তাঁহাকে খাওয়ার পর মুখ-শুদ্ধির জন্য অর্দ্ধেক হরীতকী দিয়া বাকী অর্দ্ধেক পরের দিনের জন্য রাখিয়াছিল,—ইহাতে তিনি তাঁহাকে বলেন, তোমার যখন ভগবানের উপর নির্ভর নাই, যখন তুমি সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছ, তখন তুমি সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না। এক ভক্ত পূর্ব্বে খুব বড় রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি তিন টাকা দামের একখানি কম্বল গায়ে দিয়া চৈতন্যদেবের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। চৈতন্য-দেব বার বার সেই কম্বলের দিকে তাকাইতে লাগিলেন,—ভক্তকে সেই কম্বলও ছাড়িতে হইল। অন্য সন্ন্যাসীরা যেমন এক জায়গায় না বসিয়া তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ান, তিনি তেমন বাংলাদেশে আর বাস না করিয়া ভারতবর্ষের বহু স্থানে তীর্থ ভ্রমণ করেন। জীবনের ১৮ বৎসর তাঁহার উড়িষ্যায় কাটে, তখন তিনি বহুদিন পুরীতে ছিলেন, একখানি ছোট ঘরে বাস করিতেন, কাহারও সঙ্গে বৃথা কথা বলিতেন না। এখনও সেই ঘর আছে, তাহার নাম হইয়াছে 'গম্ভীরা' ঘর, আর কাঁথা ও এক জোড়া খড়ম তাঁহার ছিল বলিয়া দেখান হয়। ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার ইহ জীবনের শেষ হয়।

চৈতন্যদেবের সুন্দর, পবিত্র, কঠোর সাধনা-ময় জীবন বৈষ্ণব-সাহিত্যকে আরও উঁচু করিয়া ধরিল। তাঁহার জীবন দেখিয়া লোকে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতা বুঝিতে শিখিল, তাহার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা ধরিতে পারিল। এইজন্য পরে লোকে কীর্ত্তন করিতে গিয়া বা রাধাকৃষ্ণের পদ গাহিতে গিয়া আগে চৈতন্য-দেবের জীবনের উল্লেখ করে। চৈতন্যদেবের অন্য নাম গোরাচাঁদ বা গৌরচন্দ্র ছিল বলিয়া এইরূপ উল্লেখের নাম গৌরচন্দ্রিকা। মূল কীর্ত্তনের আগে এই গৌরচন্দ্রিকা গাহিবার কথা গোবিন্দদাস এই সম্পর্কে গাহিয়াছেন—

জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবন মণ্ডন কলিযুগ কাল—
ভুজগ ভয়-খণ্ডন রে॥
বিপুল পুলককুল আকুল কলেবর
গর গর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণী
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গাওত কত কত ভকতহি মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দ দাস তঁহি পরশ না ভেলি॥

জয়, শচীনন্দনের জয়; তিনি ত্রিভুবনকে সুন্দর করিয়াছেন, যে কলিযুগ কাল সর্পের মত ভয়ানক, তাহা হইতে ভয় দূর করিয়াছেন। প্রেমভরে তাঁহার রোমাঞ্চ হইতেছে, অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, মৃদু মন্দ হাসি, আধ আধ ভাষা, নয়নে কত গঙ্গা বহিয়া যায়। তিনি নিজের আনন্দে নাচেন, ভাবাবেগে নয়ন ঢুলাইতেছেন, কত কত ভক্ত মিলিয়া গাহিতে-ছেন, সমস্ত পৃথিবী যে রসে আত্মহারা, গোবিন্দদাস তাহা স্পর্শ করিতে পারিল না।

পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ যে গৌরচন্দ্রিকা গাহিয়াছেন, তাহা গৌরাঙ্গের এক ধ্যানের ছবি,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে।
বহে সুরধুনী বহে অরুণ নয়নে॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধূলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায়॥
মনে মলিন মুখ কিছুই না ভায়।
দিবস রজনী গোরা জাগিয়া গোঙায়॥
ক্ষণে চমকিত অঙ্গ ধরণে না যায়।
নানা ভাব গোরাচাঁদের বাসু ঘোষ গায়॥

গোরা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতেছেন; কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু লাল হইয়াছে, তাহা হইতে গঙ্গার মত কত ধারা বহিয়া যাইতেছে। গোরা সুগন্ধি চন্দন গায়ে মাখেন না, মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছেন, তাহাতে তাঁহার শরীর ধূলায় ধূসর হইয়া যাইতেছে। কৃষ্ণ আমাকে ভালবাসিলেন না এই অভিমানে তাঁহার মুখ মলিন; রাতদিন তিনি জাগিয়া কাটাইতেছেন। ভাব প্রবল হওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে চমকাইয়া উঠিতেছেন। এইরূপে গোরাচাঁদের নানা ভাবের কথা বাসু ঘোষ গাহিলেন।

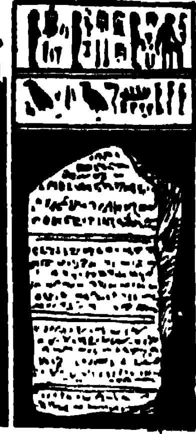
বৈষ্ণবেরা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই জীবন-কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে, জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সে সকল পুস্তকে তখনকার সাধারণ লেখকেরা কি ভাবে চলিত, কি ভাবে জীবন কাটাইত, তাহাও জানিতে পারা যায়। চৈতন্যদেবের শিষ্যদের কথাও অনেক পুস্তকে আছে,—সে সকলের নাম ভক্তিরত্নাকর, প্রেম-বিলাস, নরোত্তম-বিলাস—আরও কত কি। তাঁহার শিষ্য রূপ-সনাতনের জীবনী অপূর্ব্ব। সনাতন, রূপ ও বল্লভ তিন ভাই। সনাতন ও রূপ যেমন পণ্ডিত, তেমনই উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারা দুইজনে সন্ন্যাসী হইয়া চৈতন্যের অনুগমন করেন। বল্লভ সন্ন্যাসী হইতেন, কিন্তু তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র জীব; জীবের মা পুত্রকে পিতার ত্যাগ-বৈরাগ্য, প্রেমের কথা বলিতেন; আর বলিতেন, তোমার বাবা বাঁচিয়া থাকিলে সন্ন্যাস লইতেন। জীব একদিন গেরুয়া পরিয়া মার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন; মা বলেন, তোমাকে ঠিক সন্ন্যাসীর মত দেখাইতেছে; নেড়ামাথা থাকিলে লোকে সন্ন্যাসী বলিয়া ভুল করিত। জীব অমনি মাথা নেড়া করিয়া আসিয়া মায়ের কাছে বিদায় লইয়া সন্ন্যাসী হইলেন। মা এই কথা শুনিয়া কাঁদিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলেন; জীব ফিরিয়াও তাকাইলেন না। পরে জীব বৃন্দাবনে ছিলেন এবং খুব বড় পণ্ডিত হন। বৈষ্ণবেরা পণ্ডিত হইয়াও কিরূপ বিনয়ী ছিলেন, তাহার এক উপাখ্যান দিতেছি। এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বৃন্দাবনে আসেন এবং বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব পণ্ডিতদের কাছে গিয়া বলেন, হয় আমার সঙ্গে তর্ক বা বিচার করুন, না হয় আমার কাছে হার মানিলেন এ কথা স্বীকার করিয়া একখানি চিঠি দিন। রূপ গোস্বামীর কাছে পণ্ডিত যাওয়ামাত্র তিনি ঐরূপ জয়পত্র বা চিঠি লিখিয়া দিলেন। তখন তিনি খুব বড়াই করিতে করিতে বৃন্দাবন সহর হইতে বাহির হইলেন। বলিতে লাগিলেন রূপ গোস্বামী পর্য্যন্ত আমার নিকট হার মানিলেন, আমার চেয়ে বড় পণ্ডিত কে আছে। জীব গোস্বামী এই কথা শুনিয়া চটিয়া উঠিলেন, তাঁহাকে বিচার করিতে ডাকিলেন। সাতদিন সাতরাত্রি বিচার চলিল, শেষে পণ্ডিতকে হার মানিতে হইল। জীব গোস্বামী যে বড় পণ্ডিত, তাহার প্রমাণ হইল বটে, কিন্তু রূপগোস্বামী একথা শুনিয়া জীবকে বৃন্দাবনের বাহিরে যাইতে বলিলেন। কারণ যে বিনয়ী নহে, সে বৈষ্ণব নহে; যে বৈষ্ণব নহে, সে বৃন্দাবনে বাস করিবার উপযুক্ত নহে।

ইহা হইতে আমরা তখনকার বৈষ্ণবদের মন যে কত উঁচু ছিল তাহা, বুঝিতে পারি।

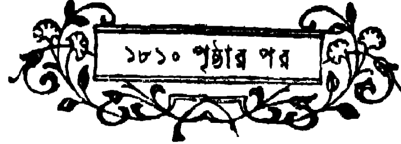
অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে সুমধুর, সুন্দর ভাবে ভরা কবিতা ও বিস্তর সাধু-মহাত্মাদের জীবন-কাহিনী দিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য বাংলাদেশের সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে। ইহা যে বাঙ্গালীর পরম গৌরবের সামগ্রী, তাহাতে সন্দেহ নাই।



বিশ্বসাহিত্য



রবিন্সন্ ক্রুসো


১৮১০ পৃষ্ঠার পর

[চার]

বর্ব্বরদের অনেকখানি পিছনে ফেলিয়া সেই পলাতক লোকটি দ্রুত দৌড়াইয়া চলিতেছিল। চলিতে চলিতে সে একটা পাহাড়ে নালার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া অপর পাড়ে গিয়া উঠিয়া আবার খুব জোরে দৌড়াইতে লাগিল। দুইজন বর্ব্বর সেই নালা পার হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল, কিন্তু তৃতীয় অনুসরণকারী সেই নালাটি আর পার না হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। তখন আমি সাহসে বুক বাঁধিয়া কাঁধের উপর আমার বন্দুক দুইটি তুলিয়া লইয়া পাহাড় হইতে নামিয়া পড়িয়াছিলাম। পাহাড় হইতে নামিয়াই আমি হাততালি দিয়া শব্দ করিয়া ঐ বর্ব্বরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। তার পর দৌড়াইয়া উহাদের একজনের কাছে আগাইয়া গিয়া বন্দুকের কোঁদা দিয়া তাহার মাথায় এমন এক ঘা দিলাম যে, সে তখনই পড়িয়া গেল। অপর বর্ব্বরটি একটু দূরে পড়িয়াছিল, কিন্তু সে তাহার সঙ্গীর সাংঘাতিকরূপে আহত হওয়া লক্ষ্য করিয়াছিল। ইহাতে সে যেন ভয় পাইয়া একটু থমকাইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু আমি তাহার দিকে একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম যে, সে তীর লইয়া ধনুক উঁচাইয়া আমাকে মারিবার জন্য লক্ষ্য করিতেছে; তখন আত্মরক্ষার জন্য আমি তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলাম।

আমার বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া সেই পলাতক বেচারী এত ভীত হইয়াছিল যে, সে না থামিয়া তখনই আবার দৌড়াইয়া পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।



হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সম্মান দেখাইল

আমি নানারূপ ইসারা করিয়া তাহাকে অভয় দিলে পর সে আমার কাছে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া

সম্মান দেখাইল। আমি তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিলাম। তার পর আমার সঙ্গে যাইবার জন্য আমি তাহাকে ইসারা করিয়া ডাকিলাম এবং সাদরে তাহাকে আমার বাসস্থানে লইয়া গেলাম। সেখানে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া আমি যখন তাহাকে শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইবার জন্য ইসারা করিলাম, তখন সেই শ্রান্ত-ক্লান্ত বেচারী ঘুমাইয়া পড়িল। প্রায় আধঘণ্টা ঘুমাইবার পরে সে গুহা কথা তাহাকে শিখাইয়াছিলাম। বেড়ার বাহিরে আমি তাহার জন্য একটি ছোট্ট কুটীর তৈয়ারি করিয়া দিলাম। রাত্রিতে সে সেখানেই বাহিরে থাকিত, আমি ভিতরে গিয়া মই টানিয়া লইতাম।

আমার কিন্তু এইরূপ সাবধানতার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তাহার মত বিশ্বাসী ও স্নেহপরায়ণ ভৃত্য সহজে কোনও মানুষের ভাগ্যে



ফ্রাইডের সাহচর্যে আমি পরম সুখে ছিলাম

হইতে বাহির হইয়া কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের আতিশয্যে দৌড়াইয়া আমার কাছে আসিয়া আমার পায়ের তলায় শুইয়া পড়িয়াছিল। তার পর সে আমার পা-দুখানি তুলিয়া মাথায় লইয়া আমাকে জানাইয়া দিল যে, আজীবন সে আমার ভৃত্যরূপে কাজ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

অল্পদিনের মধ্যেই আমি তাহার সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম এবং আমার সহিত কথা বলিবার জন্য তাহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলাম। প্রথমে আমি তাহার নামকরণ করিয়াছিলাম 'ফ্রাইডে' এবং আমাকে "প্রভু" বলিয়া ডাকিবার জোটে না। আমার কাজের সহায়তার জন্য আমি তাহাকে ক্রমশঃ অনেক কাজ শিখাইতে লাগিলাম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কথা বলাও শিক্ষা দিতে লাগিলাম। সেও খুব তৎপরতার সহিত আমার শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিল। বাস্তবিক ফ্রাইডের সাহচর্যে সেই বৎসরটিতে আমি যেমন পরম সুখে ছিলাম, তেমন আনন্দ জীবনে আর কখনও পাই নাই। এতদিন একা একা বোবার মত বাস করিতেছিলাম, কিন্তু ফ্রাইডেকে পাইয়া আমি মুখ খুলিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এই লোকটিকে পাইয়া আমি অতিশয় আনন্দিত

হইয়াছিলাম। বিশেষতঃ তাহার মহত্ত্ব এবং অকপট ও অকৃত্রিম ভালবাসা আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল।

[পাঁচ]

নির্জ্জন দ্বীপে বন্দী অবস্থায় অবস্থান

প্রায় সাতাশ বৎসর ধরিয়া আমি সেই নির্জ্জন দ্বীপটিতে বাস করিতেছিলাম। একদিন সকালে আমি ফ্রাইডেকে সমুদ্রতীরে পাঠাইয়া বলিয়া দিলাম, "দেখ তো একটা কাছিম ধরিয়া আনিতে পার কি না।" অল্পক্ষণ পরেই সে উঠি পড়ি করিয়া দৌড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাকে বলিতে লাগিল, "প্রভূ! আবার বিপদ। ভীষণ দুঃখ!"

আমি তাহার কথার কোনও অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইয়াছে, ফ্রাইডে?"

সে বলিল, "ঐ যে, দূরে দেখুন না।" এই বলিয়া সে আমাকে কতকগুলো ডিঙি নৌকা দেখাইয়া দিয়া গুণিতে আরম্ভ করিল,—"এক, দুই, তিন…।" আমি তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলাম, "ভয় কি ফ্রাইডে।"

আমি দেখিলাম, সে বেচারী অত্যন্ত ভয় পাইয়া বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। ফ্রাইডে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ঐ ডিঙি নৌকায় করিয়া অসভ্য বর্ব্বরজাতিরা তাহারই খোঁজে বাহির হইয়াছে এবং তাহাকে পাইলে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া একেবারে খাইয়া ফেলিবে। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম যে, তাহার বিপদে আমারও বিপদ। ইহা বলিয়া আমি তাড়াতাড়ি একটি ছোট পাহাড়ের উপরে উঠিয়া আমার দূরবীণের সাহায্যে দেখিলাম যে, একুশজন বর্ব্বর আনন্দে এমন হল্লা করিতেছে, যেন তাহাদের কোনও উৎসব আসন্ন। আমি পুনরায় নামিয়া আসিয়া ফ্রাইডেকে বলিলাম, "তুমি গিয়া দূর হইতে দেখিয়া আইস, উহারা কি করিতেছে।" ফ্রাইডে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, উহারা উহাদের একজন বন্দীকে হত্যা করিয়া তাহার কাঁচা মাংস খাইতেছে আর একজন দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ লোককে বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহাকেও ঐ বর্ব্বরেরা শীঘ্রই হত্যা করিবে।

ফ্রাইডের কাছে বর্ব্বরদের কথা শুনিয়া আমার মন এমনই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, আমি তখনই দৌড়াইয়া একটা উঁচু জমিতে গিয়া দাঁড়াইয়া ফ্রাইডেকে বলিলাম, "দেখ! আমি যেমন যেমনটি করি, তুমিও ঠিক সেইরূপ কর।" এই কথা বলিয়া আমি একটা বন্দুক তুলিয়া সেই অসভ্যদের প্রতি লক্ষ্য ঠিক করিলাম, ফ্রাইডেও সেইরূপ করিল; তারপর আমরা দুজনেই গুলি ছুঁড়িলাম। ইহাতে তিনটি অসভ্য লোক একেবারে মরিয়া গেল, আর পাঁচজন আহত হইল। উহারা ভয়ে যখন অত্যন্ত বিচলিত, তখন আমরা একটুও অপেক্ষা না করিয়া আবার উহাদের লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইলাম। ফ্রাইডে সেই সব পলাতক অসভ্যদের পিছন পিছন বন্দুক উঁচাইয়া এমন তাড়া করিয়াছিল যে, মৃত জন চারেক লোক ছাড়া আর সকলেই ভয়ে ডিঙি-নৌকায় চড়িয়া পলাইয়া তবে বাঁচিয়াছিল।

ফ্রাইডেকে ঐ ভাবে তাড়া করিয়া দৌড়াইতে দেখিয়া আমারও মনে পড়িয়া গেল যে, উহাদের তাড়া করিয়া খুব ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে উহারা আবার উহাদের অগণিত দলবল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাদের একেবারে সর্ব্বনাশ করিতে পারে।

দৌড়াইয়া যাইতে যাইতে একজন স্পেনদেশীয় বন্দীকে দেখিলাম। তাহাকে মুক্ত করিয়া আমি দৌড়াইতেছিলাম। ফ্রাইডে এবং সেই বন্দীটিও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া আমার কাছ হইতে একখানি তলোয়ার গ্রহণ করিয়া আমারই অনুসরণ করিতেছিল। দৌড়াইতে দৌড়াইতে একটা নৌকার পাশ দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম যে, হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় একজন লোক সেই নৌকার মধ্যে রহিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি তাহার বাঁধন কাটিয়া দিয়া ফ্রাইডেকে বলিলাম যে, "তুমি উহাকে মুক্ত কর।" সেই বন্দীটির কাছে গিয়া ফ্রাইডে যখন তাহার কথা শুনিয়া তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, তখন তাহার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখিলে যে কেহ নিশ্চয় অশ্রুপাত করিত। তাহাকে চুম্বন করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া এবং নাচিয়া কুঁদিয়া আদর করিয়া ফ্রাইডে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। আনন্দের আতিশয্যে ফ্রাইডের মুখে কথাটি ছিল না। বহু কষ্টে এবং অনেকবার প্রশ্ন করার পর আমি তাহাকে

কথা বলাইয়া জানিলাম যে, সেই মুক্ত বন্দীটি তাহার পিতা। সে তাহার বৃদ্ধ পিতার পাশে বসিয়া তাহার হাত-পায়ের দড়ির বাঁধনের দাগগুলির উপর অতি সন্তর্পণে ও যত্নের সহিত হাত বুলাইয়া দিতেছিল।

এইবার আমার সেই জনশূন্য দ্বীপে লোক-সমাগম হইয়াছিল এবং আমার কয়েকটি প্রজা হওয়াতে আমি গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলাম। ফ্রাইডের বৃদ্ধ পিতা এবং সেই স্পেনদেশীয় লোকটি প্রায় সাত মাস আমাদের কাছে বাস করিয়াছিল। উহারা আমাদের বহু কাজ-কর্ম্মে অনেক রকমে সহায়তা করিত।

সেই দ্বীপটিতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকা সত্ত্বেও এই নির্জ্জন কারাবাস হইতে মুক্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষা আমার মন হইতে কোন দিনও বিলুপ্ত হয় নাই। একদিন আমি আমার স্পেনদেশীয় সহচরের কাছ হইতে শুনিলাম যে, আমাদের সেই নির্জ্জন দ্বীপটির অনতিদূরে ঠিক আমার এই দ্বীপের মতো একটি জনশূন্য দেশ আছে। সেখানে ঐ লোকটিকে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজনকে একখানি জাহাজ হইতে জোর করিয়া নামাইয়া দেওয়া হয়। ইহা শুনিয়া আমি আমার সেই স্পেনবাসী এবং বৃদ্ধ সহচরদের সহিত যথেষ্ট খাবার দাবার দিয়া তাহাদিগকে সেখানে পাঠাইয়া দিলাম এবং তাহাদের সঙ্গে জাহাজ হইতে পরিত্যক্ত সেই সহায়শূন্য স্পেন-বাসিগণের জন্যও খাবার দিতে ভুলি নাই।

দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। প্রায় আটদিন ধরিয়া তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় আশায় কাটিয়া গেল। এমন সময় একদিন ফ্রাইডে খুব ব্যস্ত হইয়া আসিয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে চীৎকার করিয়া বলিল, "প্রভু, প্রভু! উহারা ফিরিয়া আসিয়াছে!" এই সংবাদে আমার মনও আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল। আমি তখনই কুটীর ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি নিকটেরই একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া দূরবীণ দিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া স্পষ্টই দেখিলাম যে, একখানি ইংরেজদের জাহাজ নঙ্গর করিয়াছে এবং ডাঙায় পাঠাইবার জন্য একখানি নৌকা প্রস্তুত হইয়া জলে ভাসিতেছে। জাহাজ দেখিয়া মুক্তির সম্ভাবনায় আমার মনে যে কি রকম আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম। বিশেষতঃ যখন দেখিলাম যে, উহা আমাদেরই দেশের জাহাজ, তখন আমার আর আনন্দের সীমা ছিল না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমার মনে কেমন একটু সন্দেহ জন্মিল, এবং কে যেন আমাকে সতর্কতা অবলম্বন করিবার জন্য বলিয়া দিল।

শীঘ্রই নৌকাখানি তীরে আসিয়া ভিড়িল। নৌকা হইতে সবসুদ্ধ এগার জন লোক নামিল। পোষাক দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, উহারা সকলেই নাবিক। কিন্তু তাহাদের মধ্যে তিনজনের কাছে কোনও অস্ত্র-শস্ত্র দেখিতে পাই নাই এবং উহাদের হাত-পা বাঁধা ছিল। আমি এত দূর হইতেও স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলাম যে, উহারা কেবলই মিনতি করিয়া ব্যাকুলভাবে দয়া প্রার্থনা করিতেছিল।

ঐ তিনজনকে বেলাভূমির উপর ফেলিয়া রাখিয়া বাকী সব নাবিক বনের দিকে চলিয়া গেল। আমি তখন দৌড়াইয়া তাহাদের কাছে গিয়া স্পেনদেশের ভাষায় বলিয়াছিলাম, "মহাশয়, আপনারা কে?" হঠাৎ আমার এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা চম্‌কাইয়া উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে-ছিল। তখন আমি ইংরাজীতে বলিয়াছিলাম, "মহাশয়, আপনারা আশ্চর্য্য বা ভীত হইবেন না। যেখানে কোনও সুহৃদ পাইবার আশা নাই, সেখানে সেরূপ একজনকে পাইলে কি আপনারা খুসী হন না? আমি আপনাদের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আপনারা কি আমার সাহায্য গ্রহণ করিবেন না?"

আমার কথা শুনিয়া উহাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, আমি ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন্ ছিলাম। জাহাজের সমস্ত নাবিক হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া আমাকে, আমার এক সহকারীকে এবং একজন যাত্রীকে বাঁধিয়া এই নির্জ্জন দ্বীপে ফেলিয়া গিয়াছে।"

তিনি আমাকে বলিলেন যে, বিদ্রোহীদের ভিতরে দুইজন অত্যন্ত দুষ্ট ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক আছে এবং উহারাই বিদ্রোহিদলের নেতৃত্ব করিতেছিল। সুতরাং যদি কোনরূপে ঐ দুজনকে উচিত শাস্তি দিয়া সায়েস্তা করা যায়, তাহা হইলে অপর সব নাবিক জাহাজে ফিরিয়া যাইয়া নিশ্চয়ই তাহাদের কর্ত্তব্য করিবে। জাহাজের অধ্যক্ষ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি যদি তাঁহাকে এবং সেই জাহাজটিকে উদ্ধার করি, তাহা হইলে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ জাহাজের সকল কাজই আমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাদের বাঁধন কাটিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের হাতে বন্দুক দিলাম। বিদ্রোহীরা বন হইতে সমুদ্রতীরে ফিরিয়া আসিতেই ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল এবং সেই দুইটি দুষ্ট নেতাকে অতি সহজেই মারিয়া ফেলা গেল। তখন বাকী সকলে ভয় পাইয়া বিনীতভাবে দয়া ভিক্ষা করিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইল।

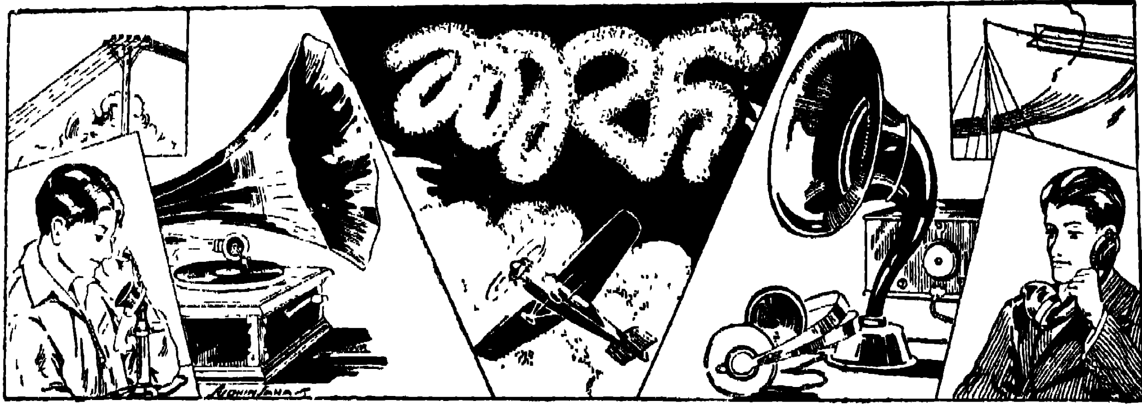
রাত্রিতে জাহাজ হইতে আবার বহু নাবিক তীরে আসিয়াছিল। তখন আমরা এমন ভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম যে, তাহারাও ভীত হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। তখন জাহাজের অধ্যক্ষের হুকুমে তাহারা তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিল। আমাকে দেখিয়া উহারা মনে করিয়াছিল যে, আমিই সেই দ্বীপের সম্রাট্!

এইবার আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, আমার মুক্তির আর দেরী নাই। আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম যে, জাহাজে উঠিয়া আমার সাহায্য করিতে পারিলে সব নাবিকই নিজেদের চরিতার্থ মনে করিবে। ইহা বুঝিয়া তাহাদের সঙ্গে লইয়া আমরা জাহাজে গিয়া উঠিলাম। বিদ্রোহী নাবিকেরা একজনকে তাহাদের ক্যাপ্টেন্ করিয়াছিল। সেই নূতন ক্যাপ্টেন্ জাহাজের মধ্যে ছিল। জাহাজে উঠিয়াই তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইল। ইহাতে বাকী যে কয়জন নাবিক জাহাজে ছিল, তাহারাও আমাদের বশ্যতা স্বীকার করিল।

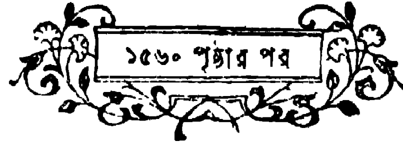
নির্জ্জনতা হইতে আমার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া আমার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল। তখন আমি কেবিনে গিয়া আমার সেই অভিনব পোষাক ছাড়িয়া ক্যাপ্টেনের পোষাক পরিয়া বাহির হইয়া আসিলাম; কিন্তু তবু সকলেই আমাকে সম্রাট্ বলিয়াই অভিনন্দন করিয়াছিল। ক্যাপ্টেন্‌কে সঙ্গে লইয়া আমি সেই জাহাজের সদ্য-পরাজিত বন্দীদের আমার সামনে ডাকাইয়া বলিলাম যে, "জলদস্যু বলিয়া কেন আমি তাহাদের মৃত্যুদণ্ড দিব না?" আমি তাহাদের আরও বলিলাম, "আমি ঐ দ্বীপটি পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছি। তোমরা আমার সঙ্গে যাইতে পার, কিন্তু বন্দিরূপে লোহার খাঁচায় যাইতে হইবে এবং দেশে ফিরিয়া তোমাদের উচিত বিচার হইবে। তবে আমি তোমাদের মুক্ত করিয়া এই দ্বীপে বাস করিবার জন্য ছাড়িয়া দিতে পারি।" আমার প্রস্তাব শুনিয়া তাহারা কৃতজ্ঞ ও চরিতার্থ হইয়া গিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া গেলে তাহাদের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চয় হইবে বুঝিয়া তাহারা সহজেই ঐ দ্বীপে বাস করিতে রাজী হইয়াছিল।

সেই দ্বীপে আমি কিরকম ভাবে বাস করিতাম, সেই সব গল্প এইবার তাহাদিগকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমি সেই দ্বীপে গিয়াছিলাম এবং কিরূপ বেড়া প্রভৃতি দিয়া সাবধানতার সহিত বাস করিতাম, তাহা দেখাইয়া দিলাম। তার পর, আমি কেমন করিয়া রুটি প্রস্তুত করিতাম, কেমন করিয়া শস্য জন্মাইতাম, সে সব বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জানাইয়া দিলাম। এক কথায় বলিতে গেলে, বহুদিন চিন্তা ও পরিশ্রমের ফলে আমি যাহা কিছু শিখিয়াছিলাম, সে সবই তাহাদিগকে শিখাইয়া, তাহাদের জীবন-ধারণ যাহাতে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে ও সহজ হইতে পারে, তাহাই করিয়াছিলাম। আমার সেই স্পেনবাসী সহচরটি যদি তাহার দেশবাসীদের খুঁজিয়া লইয়া সেই দ্বীপে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহারা যেন ভাল ব্যবহার এবং সমাদর পায়,সে অনুরোধটিও করিতে আমি ভুলি নাই।

পরদিন ফ্রাইডেকে সঙ্গে লইয়া আমি দ্বীপ হইতে জাহাজে গিয়া চড়িয়াছিলাম। প্রায় আটাশ বৎসর ঐ দ্বীপে বাস করার পর ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে সেই স্থানটি ত্যাগ করিয়াছিলাম। আমি সবশুদ্ধ প্রায় একত্রিশ বৎসর ধরিয়া গৃহছাড়া। আমাদের জাহাজখানি এবার নিরাপদে সমুদ্রের উপর পাড়ি দিয়া অবিশ্রাম গতিতে চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুন দূর হইতে যখন ইংল্যাণ্ডের পাড় দেখিতে পাইলাম, তখন মনে যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

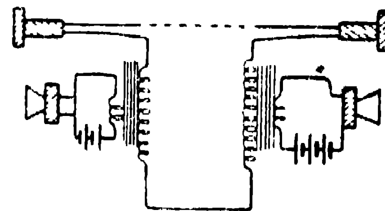


শব্দবাহী যন্ত্র


১৫৬০ পৃষ্ঠার পর

টেলিফোন—টেলিফোনের বা টেলিফোঁর কথা আজকাল আর তোমাদের বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হয় না। টেলিফোঁর প্রকৃত অর্থ হইতেছে—দূর-শ্রবণযন্ত্র। তোমরা—বড় বড় সহরের ছেলেরা প্রায় সকলেই ইহা দেখিয়াছ। আজকাল আফিস, আদালত, বাড়ি-বাড়ি, দোকানী-পশারী—সকলের কাছেই টেলিফোন বা বার্ত্তাবাহী যন্ত্র থাকে। ট্রিং ট্রিং ট্রিং ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—অমনি তুমি যন্ত্রটি তুলিয়া ধরিলে—বলিলে হ্যালো! এবং যে ডাকিল, তাহার সঙ্গে কথা বলিতে পারিলে। বল দেখি কেমন সুবিধা! গভীর রাত্রিতে ঘুমাইয়া আছ; বিছানার পাশে ছোট যন্ত্র ঐ টেলিফোনটি পড়িয়া আছে। এমন সময় খুট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। মনে হইল, পাশের ঘরে চোর ঢুকিয়াছে। অমনি পুলিশে খবর পাঠাইয়া দিলে ঐ ক্ষুদে যন্ত্রটির সাহায্যে। কোথাও আগুন লাগিয়াছে—অমনি অগ্নি-নির্ব্বাপক-বিভাগে (Fire Brigade) সংবাদ দিলে। বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ করিলে ডাক্তার, নার্স প্রভৃতিকে নিমেষ মধ্যে সংবাদ দিতে পার। অমনি সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা হইল। দিনের বেলায় দূরে অবস্থিত ভাই-বন্ধুদের সহিত কথাবার্ত্তা বলা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা, সকল কাজই টেলিফোন দ্বারা শীঘ্র সম্পন্ন করা যায়। কলিকাতা হইতে সিম্‌লা পাহাড়ে সরকারী কর্ম্মচারীরা সদা সর্ব্বদা টেলিফোনের সাহায্যে কথাবার্ত্তা বলেন। এমন কি, আজকাল কলিকাতা হইতে লণ্ডনে, আমেরিকা যুক্তরাজ্যে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান স্থানেও টেলিফোনের সাহায্যে কথা-বার্ত্তা বলিতে পার। যুদ্ধের সময় টেলিফোন দ্বারা সংবাদ প্রেরণ, শত্রুর গতিবিধি নির্ণয় ইত্যাদি সকল কাজই হইয়া থাকে। আমরা এইবার টেলিফোন যন্ত্রটি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

যাহাদের বাড়ীতে টেলিফোন আছে, তাহারা টেলিফোনের যন্ত্রটির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, কথা কহিবার এবং শুনিবার জন্য উহাতে দুইটি বিভিন্ন যন্ত্র সংলগ্ন থাকে। শুনিবার যন্ত্রটির নাম 'টেলিফোন, (Tel-e-phone) আর কথা কহিবার যন্ত্রটির নাম 'মাইক্রোফোন্ (Mi-cro-phone)। এই মাইক্রফোন্ শব্দের অর্থ হইতেছে, যে যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষীণ শব্দ উচ্চ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এক কথায় ধ্বনিবিবর্দ্ধক যন্ত্র বা সাধারণ টেলিফোনে কথা বলিবার যে যন্ত্র, তাহারই উন্নততর সংস্করণ। দুইটিই বৈদ্যুতিক তার এবং তড়িৎ-প্রবাহ ভাণ্ডার বা তাড়িতোৎপাদক যন্ত্রের (Battery) সহিত সংযুক্ত থাকে। তাহার চিত্র নিম্নে দেওয়া হইল। কিরূপে



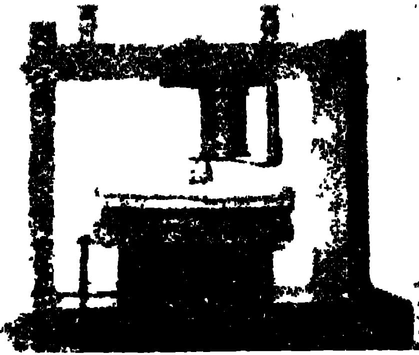
ট্রান্সফরমার বা স্বর-বিবর্দ্ধক যন্ত্র

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে কথা কহিতে হইলে সংখ্যা (Number) ঘুরাইয়া অন্য স্থানের সহিত তারের

সংযোগ আপনা আপনি বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatically) হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ একটু কঠিন। আমরা এখন সে বিষয়ে আলোচনা করিব।

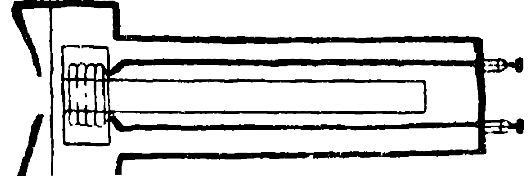
পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এখন টেলিফোনের ব্যবহার। এই যন্ত্র প্রস্তুত করিবার কারখানা, আমেরিকা, মার্কিন মুলুক, জারমেণি, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে আছে। ভারতবর্ষে 'টেলিফোন্, তৈয়ারী করিবার কোন কারখানা আজ পর্য্যন্তও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এইজন্ম আমাদের ব্যবহারের জন্ম উহা বিদেশ হইতে কিনিতে হয়। 'টেলিফোন' সম্বন্ধে সব কথা যখন জানিতে পারিবে, তখন দেখিবে যে, যন্ত্রটি অতি সামান্য এবং ইহাতে আনুষঙ্গিক অন্যান্য অধিক যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না।

এই টেলিফোন যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তার নাম আলেক-জাণ্ডার গ্র্যাহাম বেল্ (Alexander Graham Bell)। ইনি একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী সাধারণ গৃহস্থের সন্তান। প্রথম জীবনে ইনি গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের একজন সামান্য শিক্ষক ছিলেন, পরে আমেরিকায় যাইয়া বাস করেন। আমেরিকায় যাইয়াই নানা প্রকার গবেষণার দ্বারা



গ্র্যাহাম বেলের আবিষ্কৃত প্রথম টেলিফোন

টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রচার হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহার পেটেন্ট (Patent) করিয়াছিলেন। তার পর ধীরে ধীরে উহা বাজারে প্রচলিত হইতে থাকে। এখানে আধুনিক টেলিফোনের একটি চিত্র দেওয়া হইল। চিত্রে দেখ, টেলিফোনের গঠন-প্রণালী অতি সহজ। একটি পাতলা ইস্পাতের চাকৃতি, তাহার পর একটি লম্বা চুম্বক (Magnet), উহার মাথার উপর একটি চক্রাকার কাঠিম বা চরকী (Reel) বসান আছে। এই কাঠিমের উপর বৈদ্যুতিক তার জড়ান থাকে। ইহাকে তার-কুণ্ডলি কহে। তারের দুইটি কিনারা অন্য স্থানের সহিত সংযুক্ত করায় বা রাখায় বৈদ্যুতিক-প্রবাহ যে-ভাবে প্রবাহিত হয়, সেই ভাবে চাকৃতির নিকটবর্ত্তী স্থানে চুম্বক শক্তির হ্রাস ও বৃদ্ধি হওয়ায় চাকৃতির উপর আকর্ষণ শক্তিরও হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, এবং চাকতিটি সেই কারণে কম্পিত হইয়া কানের নিকট শব্দ উৎপন্ন করে এবং আমরা অন্য স্থান হইতে প্রেরিত সংবাদ শুনিতে পাই। সহজ কথায় খুব পাত্‌লা ফিন্‌ফিনে



আধুনিক টেলিফোন

দুইখণ্ড পাতই এই যন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। কি প্রকারে সংবাদ প্রেরিত হয় এবং শ্রবণ করা যায়, তাহার একটি চিত্র দেওয়া হইল।

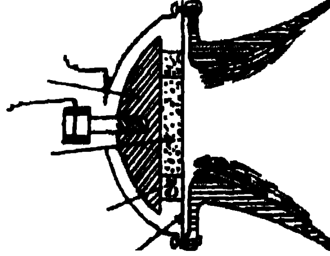
একটি কাঠিমের উপর তার জড়াইবে, এবং উহার শিরদাঁড়ার মধ্যে কতকগুলি লোহার শিক ভরিয়া দিবে। ইহাকে "সলিনয়েড" (solenoid) * বলে এবং ইহারই উপর অন্য একটি তার জড়াইলে, তাহাকে ছোটখাট ট্রান্সফরমার বলা হয়। প্রথম তারে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হইলে অন্যটিতেও বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হয়। মাইক্রোফোনে কোন প্রকার কথা কহিলে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা হ্রাস বৃদ্ধি হওয়ায় প্রধান তারে (Main line) বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া অন্য স্থানে টেলিফোনে শুনিতে পাওয়া যায়।

তোমরা হয়ত অনেকে টেলিফোনের খেলা খেলিয়া থাকিবে। একখণ্ড সূতার দুই কোণে দুইটি দিয়াশলাইয়ের বাক্স সংযুক্ত করিয়া সূতাটাকে যদি খুব টান করিয়া দিয়াশলাইয়ের বাক্সে মুখ রাখিয়া নিম্নস্বরে কথা বল, তাহা হইলে অতি দূর হইতেও তাহা বেশ সুস্পষ্টভাবে শুনিতে পাইবে। টিনের ছোট চোঙ বা ঐরূপ অন্য কোন চোঙের সাহায্যেও তোমরা টেলিফোন তৈয়ারী করিতে পার।

মাইক্রোফোনের আবিষ্কার করেন হিউগ (Hughs)। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত মাইক্রোফোনের গঠন-টেলিফোনের মতন কিন্তু ইহাতে চুম্বক (Magnet)

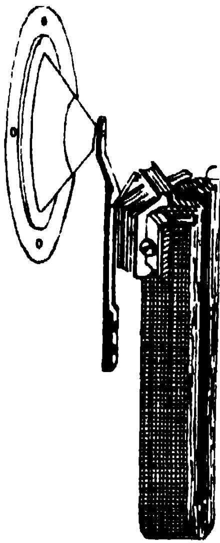
* সলিনয়েডের আকার তার-কুণ্ডলি অপেক্ষা লম্বা।

থাকে না এবং ইস্পাতের (steel) চাকতির বদলে কারবনের চাকতি থাকে। তাহার পিছনে কারবনের ছোট ছোট গুলি হালকা ভাবে গুঁজিয়া দেওয়া হয় এবং শেষের দিকে আর একটি কারবনের টুকরা বসান থাকে। প্রথম চাকতি এবং দ্বিতীয় কারবনের ব্লক হইতে দুইটি বৈদ্যুতিক তার ব্যাটারির মধ্য দিয়া ট্রান্সফরমারের সহিত সংযুক্ত থাকে। কথা কহিলে কারবন চাকতির উপর বায়ুর চাপের



মাইক্রোফোন

হ্রাস এবং বৃদ্ধি হইলে, মধ্যে অবস্থিত কারবন গুলির বৈদ্যুতিক আঘাতের হ্রাস এবং বৃদ্ধি পায়, এবং সেই কারণে বিদ্যুৎপ্রবাহ বদলাইলে, প্রবাহবিবর্তন যন্ত্রে (Transformer) অবস্থিত অন্য প্রধান তারেও বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হয়, এবং অন্য স্থানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মাইক্রোফোন — টেলিফোন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এবং সেইজন্য তাহাতে সাধারণ ভাবে কথা কহিলেও অন্য স্থান হইতে সেই কথা শুনা যায়।



লাউড স্পিকারের ভিতরের যন্ত্র

স্বরবিবর্দ্ধক যন্ত্র (Loud Speaker)—ঘরে ঘরে রেডিও যন্ত্রের প্রচলন হওয়ায়, লাউডস্পিকার সকলেই দেখিয়া থাকিবে। ইহার কার্য্যকলাপ অন্য রকমের। বাজারে অনেক রকমের লাউড স্পিকার পাওয়া যায়। কিন্তু রীড লাউড স্পিকারই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রে দেখ একটি চুম্বকের উপর তার জড়াইয়া তার কুণ্ডলি তৈয়ার করা হইয়াছে, এবং মাইক্রোফোনে সঙ্গীত, বক্তৃতা বা আবৃত্তি হইলে, লাউড স্পিকারের ভিতরের চুম্বকের উপরিভাগে বৈদ্যুতিক আকর্ষণী শক্তির হ্রাস এবং বৃদ্ধি পায় এবং এই আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে, চুম্বকের উপরিভাগে অবস্থিত লোহার 'রীড' কম্পিত হইয়া বায়ুতে শব্দ বা গান উৎপন্ন করে।

এইবার **হেড-ফোনের** (Head-phone) কথা বলিব হেডফোন হইতেছে দুইটি সংযুক্ত টেলিফোন। ইহাতে এইরূপভাবে বৈদ্যুতিক তার সংযোগ করা থাকে, যেন দুইটি একসঙ্গে কাজ করে কানে লাগাইয়া হাতে অন্য কাজ করিবার, কল ঘুরাইবার সুবিধার জন্য মাথার উপর দিয়া ইহা কানে আনিয়া শোনা চলে।



লাউড স্পিকার

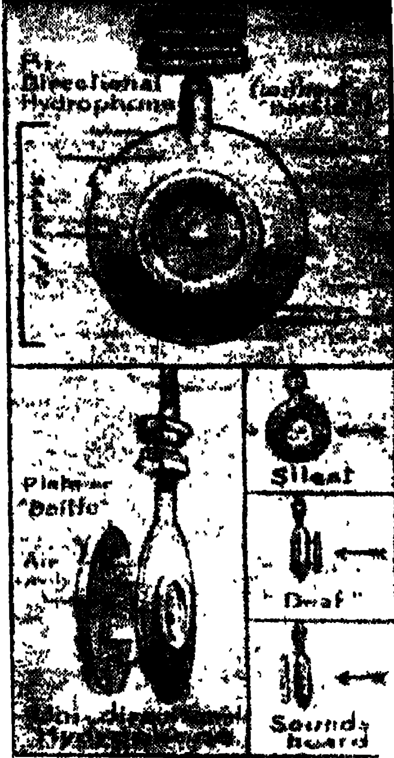


হেডফোনের সাহায্যে উড়ো জাহাজের স্থান নির্ণয় করিতেছেন

হাইড্রোফোন—এই যন্ত্রটির সাহায্যে যুদ্ধের সময় জলমধ্যে "সাবমেরিন," মৎস্য-তরী (Submarine), বা ডুবোজাহাজের গতিবিধি নির্ণয় করা হইত। জলমধ্যে শব্দ হইলে, সেই শব্দ অনুযায়ী শত্রুকারী ডুবোজাহাজ কোন্ দিকে আছে, এবং কত দূরে

আছে, তাহা জানিয়া নিজেকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উপায় করা হইত।

হাইড্রোফোন যন্ত্র জলমধ্যে ডুবাইয়া বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে শব্দ শুনা হইয়া থাকে এবং যন্ত্রটিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখা হয় কোন্ দিকে শব্দ অধিক, এইরূপে শব্দ কোন্‌দিক হইতে আসিতেছে, জানা যায়।



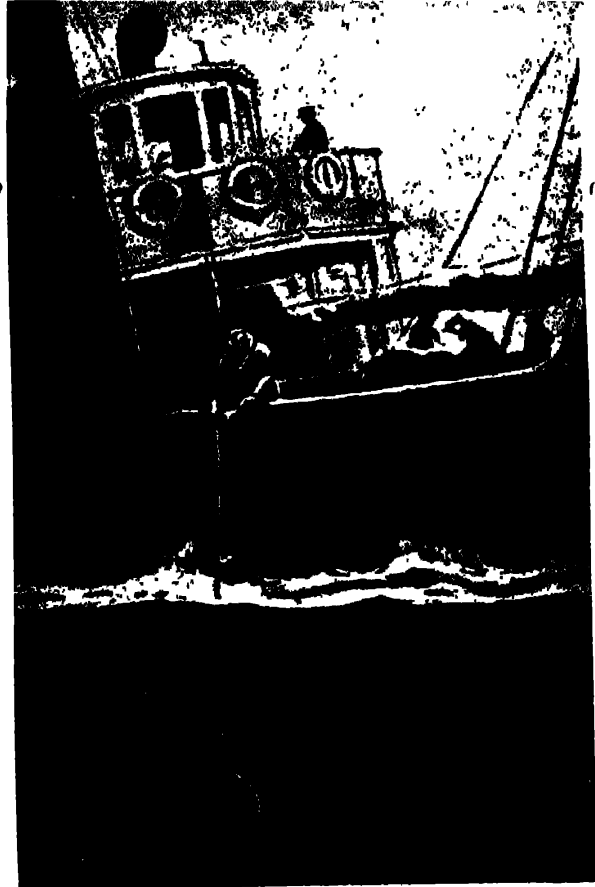
হাইড্রোফোন যন্ত্র

একটি বড় আংটির (Ring) মধ্যে একখানি পাতলা ধাতুনির্ম্মিত চাকতি বসান থাকে এবং চাকতির কেন্দ্রস্থলে একটি ছিদ্রহীন ছোট বাক্স আঁটা থাকে। এই বাক্সমধ্যে একটি ছোট কারবন গুলি মাইক্রো-ফোন-সংযুক্ত থাকে। জল মধ্যে শব্দ হইলে পাতলা ধাতুফলকটি (Diaphragm) কম্পিত হইয়া মাইক্রো-ফোন দ্বারা শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতে শব্দের দিক নির্ণয়ের সুবিধা হয়। সেইজন্য রিংএর পিছনে একটি বড় সীসকের (lead) চক্রাকার খণ্ড আংটির উপর বসান থাকে। (উপরের চিত্র দেখ)

এই ত গেল জলমধ্যে ডুবোজাহাজের গতি-বিধি-নির্ণয়কারী যন্ত্রের কথা। এখন কিরূপে শত্রুর গতি-বিধি নির্ণয় করা হয়, তাহার বিষয় উল্লেখ করিব। স্থলে গতিবিধি নির্ণয়কারী যন্ত্রের নাম "জিয়োফোন" (Geophone)। চিত্রে দেখ, একজন সামরিক কর্ম্মচারী কিভাবে শব্দ শুনিতেছেন। দুইটি জিয়োফোন



জিয়োফোনের সাহায্যে শব্দ শুনিতেছেন



সামরিক কর্ম্মচারী জলমধ্যে হাইড্রোফোন দ্বারা শব্দ শুনিতেছেন

দ্বারা শব্দের দিকও নির্ণয় করা যায়। এই চিত্রে কর্ম্মচারী শব্দ শুনিয়া দিক্ নির্ণয় করিতেছেন।

প্রত্যেক জিয়োফোন হইতে একটা রবারের নল কানে লাগান থাকে এবং জিয়োফোনের মধ্যে অবস্থিত বায়ুতে চাপের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইলে কানেও সেইরূপ চাপের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

স্থলে শত্রু-সৈন্য ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া চলিলে, কিংবা কোন স্থানে বড় গর্ত্ত করিলে (বোমা বসাইবার জন্য গর্ত্ত করা হয়। যাহাতে শত্রু তাহার উপর আসিলে বোমা ফাটিয়া যায় এবং শত্রু-সৈন্য ধ্বংস হয়) সেই শব্দ পাহাড় বা মাটির মধ্যে ঢেউয়ের আকারে বিস্তৃত হইয়া থাকে এবং একশত ফিটের মধ্যে জিয়োফোন সাহায্যে তাহা শুনা যায়।

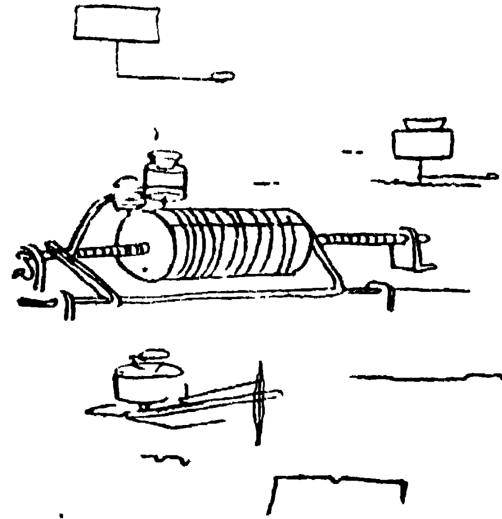
ভূমিকম্পে যেরূপে পৃথিবী কম্পিত হয়, সেইরূপ কোন এক স্থানে মাটি খুঁড়িলে বা পাহাড় কাটাইলে, সেই কম্পন পৃথিবীর উপরিভাগেও বিস্তৃত হয়। ভূমি নড়িলে, জিয়োফোন যন্ত্রটিও নড়ে, কিন্তু উহার মধ্যে অবস্থিত পারা ভূমির সঙ্গে সঙ্গে নড়িতে পারে না। কাজেই, অভ্যন্তরের বায়ুতে চাপের হ্রাস এবং বৃদ্ধি পায়।

গ্রামোফোন

গ্রামোফোন— ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বেল' সাহেব টেলিফোন আবিষ্কার করেন, এবং এডিসন তাঁহার এক বৎসর পরেই কলের গান বা ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর আবিষ্কারকদের মধ্যে তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। টমাস্ এডিসনের জীবন-কাহিনী অতি বিচিত্র। তাঁর বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন তাঁহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পড়াশুনায় তাঁহার একেবারেই মনোযোগ ছিল না। তিন মাসের ভিতরই স্কুলের পড়া তাঁহার শেষ হয়। দশ বৎসর বয়সে টমাস্ এডিসনের গবেষণার দিকে লক্ষ্য পড়ে। এ সময়ে তিনি রেলগাড়ীতে খবরের কাগজ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন এবং মালগাড়ীর ভিতর মুদ্রাযন্ত্রের আবশ্যকীয় সরঞ্জামাদি রাখিয়া একটি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন। সেই কাগজের সব কাজ তিনি একাই করিতেন। নিজেই ছিলেন তার সম্পাদক, মুদ্রাকর এবং প্রকাশক। এই সব কাজ করিয়া যে অবসরটুকু পাইতেন, সেই সময়টুকুতে নানারূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেন। ষোল বৎসর বয়সের সময় তিনি টেলিগ্রাফ কোম্পানীর যন্ত্রচালকের (operator) কাজ করিতেন। এ সময়ে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের অনেক উন্নতি করেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন গ্রাহাম বেল সাহেবের টেলিফোন যন্ত্র বাহির হইল, তখন তাঁহার মনে হইল যে, আমরা যখন কথা বলি তখন তাহা বায়ু-সমুদ্রের বুকে ঢেউ তুলিয়া দিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। যদি মানুষের বা অন্য কোনও প্রাণীর উচ্চারিত সেই ধ্বনিকে স্থায়ী উপায়ে ধরিয়া রাখিয়া পুনরায় উহা উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে ধ্বনিযন্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপ মনে করিয়া তাড়াতাড়ি একটি যন্ত্র তৈয়ারী করিয়া একদিন তাহার পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহা হইতে অতি ক্ষীণ শব্দ মাত্র বাহির হইল। এই সাফল্যের বিষয় তিনি তাঁহার স্মারক খাতায় লিখিয়া রাখিলেন। তাহার তারিখ হইতেছে ১৮ই জুলাই, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে মোটামুটি রকমের একটা নক্সা করিয়া সেই কাগজখানার নীচে লিখিলেন—"Kreusi make this" তারপর ঐ



নক্সা আঁকা কাগজখানি জন্ ক্রুসি (John Kreusi) নামক তাঁহার একজন কারিকরকে দিয়া বলিলেন—এই যন্ত্রটি তৈয়ারী করিয়া দেও—আঠারো ডলার পারিশ্রমিক পাইবে। জন্ ক্রুসি নক্সাটি দেখিয়া

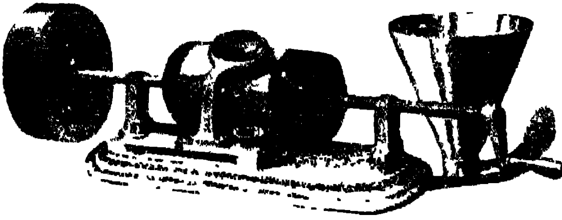
বলিল,—এই নক্সা দিয়া কি করিবে? এডিসন বলিলেন,—তুমি এই নক্সার অনুরূপ যন্ত্রটি তৈয়ারী করিয়া দেও, আমি এই যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের শব্দ স্থায়িরূপে ধরিয়া রাখিয়া আবার তোমাদের শুনাইয়া দিব!

ক্রুসি হাসিয়া বলিল—আপনি পাগল হইয়াছেন নাকি?

ক্রুসি কিন্তু একথা বলিলেও এডিসনের নক্সার আদর্শানুযায়ী যন্ত্রটি প্রস্তুত করিয়া আনিল। এডিসন তখন টিনের একখানি পাতলা পাত বেলনের (Cylinder) চারিদিকে পরাইয়া দিয়া চোঙ্গের মুখ দিয়া জোরে জোরে বলিলেন—

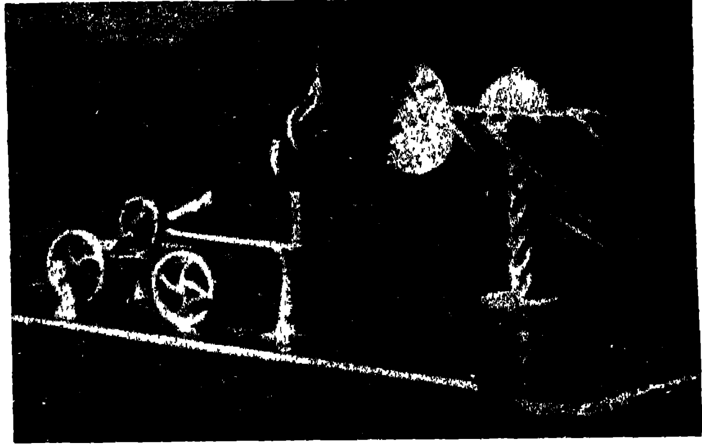
'Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow," etc

তার পর পুনরুৎপাদনকারী ধাতুফলকটি পরাইয়া যেমন আবার বেলনটি ঘুরাইয়া দিলেন,—অমনি



এডিসনের তৈয়ারী প্রথম ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের ছবি —এপ্রিল, ১৮৭৮ খৃঃ

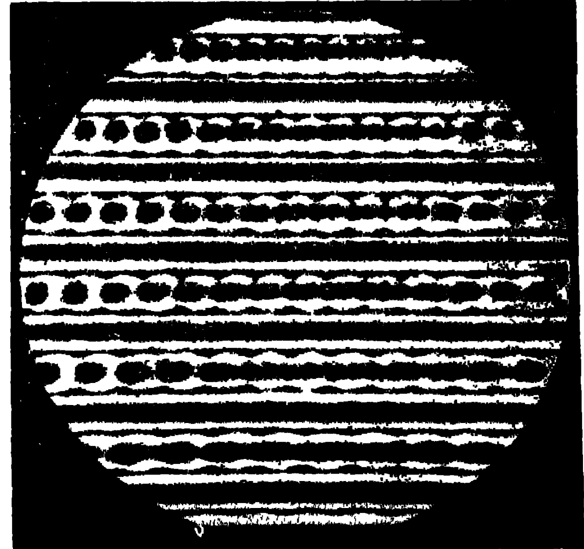
তাঁহার উচ্চারিত শব্দগুলি ধ্বনিত হইল—তবে একটু কেঁচর কেঁচর শব্দের সহিত। ক্রুসির মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল,—"(Mein Gott in Himmel!" এই হইল ফোনোগ্রাফের প্রথম আবিষ্কারের ইতিহাস। এডিসনের আগে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লিয়োন্ স্কট্ (Leon Scott) নামে একজন বৈজ্ঞানিক ফোনাটোগ্রাফ (Phonautograph) নামে একটি শব্দ-যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই আবিষ্কার তেমন কার্য্যকরী হয় নাই। সে হিসাবে এডিসনের আবিষ্কারকেই প্রথম স্থান দেওয়া যায়। এ সময়ে গ্র্যাহাম বেলও এদিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা চিকেষ্টার এবং চার্লস টেইনটারের সহায়তায় গ্রাফোফোনের (Graphophone) আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রে টিনের পাতের পরিবর্ত্তে মোম প্রভৃতি মিশ্রিত এক প্রকার কাগজের চাকতির ব্যবহার করা হইয়াছিল এবং ঘটিকা যন্ত্রের



আদিযুগের গ্রামোফোন

ন্যায় কলের ব্যবহার দ্বারা ইহার শব্দোৎপাদন সম্পর্কেও অনেকটা সুগম করা হইয়াছিল। এই হিসাবে এডিসনের ফোনোগ্রাফ হইতেও ইহাকে উন্নততর পর্য্যায়ের যন্ত্র বলা যাইতে পারে।

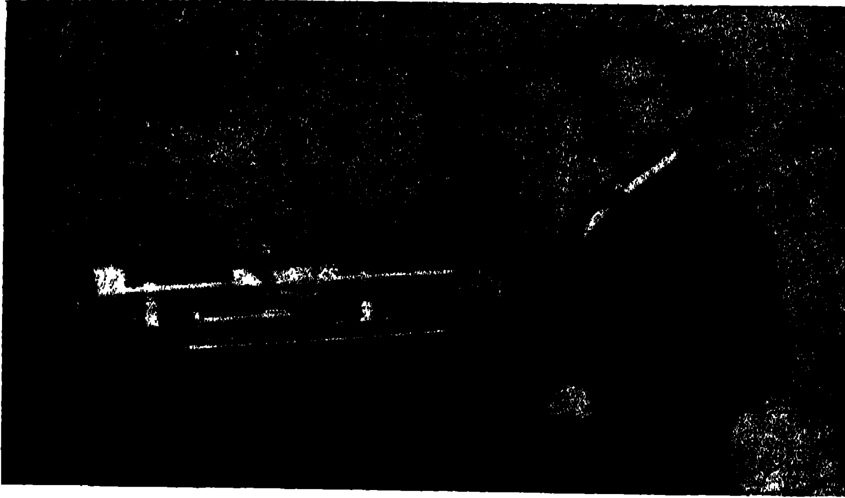
আবার এদিকে এডিসনও যখন একটু অবসর পাইলেন, তখন তিনিও তাঁহার যন্ত্রের অনেক উন্নতি করেন। এডিসনও তাঁহার যন্ত্রে মোম-মাখান



এডিসনের রেকর্ডের আণুবীক্ষণিক চিত্র

চাকতির ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। এইভাবে শব্দসংগ্রহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়েও

উন্নতি করিতে থাকেন। এইরূপে ক্রমশঃ গ্রামো-



এডিসন ও তাঁহার ফোনোগ্রাফ যন্ত্র

ফোনের যথেষ্ট উন্নতি হইতে থাকে। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় সেই আদিযুগের একটি গ্রামোফোনের চিত্র ও তাহার একটি রেকর্ডের আণুবীক্ষণিক চিত্র দেওয়া হইল।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাহাম্ বেল সাহেব, তাঁহার গ্রামোফোন্ (Gramophone) যন্ত্রের পেটেণ্ট করিয়া লন। এমিল্ বার্লিনার(Emile Berliner) নামে আর একজন আবিষ্কারকও এদিকে মনোনিবেশ করেন এবং বেল্ অপেক্ষাও উন্নততর সুস্পষ্ট শব্দ-প্রকাশক যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া তাঁহার নাম দিলেন গ্রামোফোন (Gramophone)। এখন এই নামটিই বিশেষভাবে প্রচলিত। এডিসন আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে সব কথা পরে জানিতে পারিবে।

এডিসন অত্যন্ত বধির ছিলেন। তাঁহার গান শুনিবার সখ থাকায় এমন যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছিলেন—যাহাতে তিনি অবকাশের সময়ে ইচ্ছামত গান শুনিতে পারেন। ইনি প্রথমে বৈদ্যুতিক ল্যাম্প (Electric lamp) তৈয়ার করেন। ইঁহারই আবিষ্কৃত এডিসন ব্যাটারি (Edision-cell) আজকাল খুব প্রচলিত। বর্ত্তমান সময়ে এডিসনের নির্ম্মিত গ্রামোফোনের অনেক উন্নতি হইয়াছে। প্রথমতঃ, যন্ত্রের নানা প্রকারের দোষ দূর করা হইয়াছে, এবং গান রেকর্ডে তুলিবার বৈদ্যুতিক প্রথা প্রচলিত হওয়ায়, গ্রামোফোনের গান শ্রুতিমধুর হইয়াছে। প্রধানত এই সকল কারণেই গ্রামোফোন যন্ত্র সকলের নিকট এত আদরণীয় হইয়াছে।

গ্রামোফোনের প্রধান অঙ্গ হইতেছে সাউণ্ড বক্স বা শব্দকারী যন্ত্র, দ্বিতীয়, রেকর্ড ঘুরাইবার কল, এবং তৃতীয় জিনিসটি হইতেছে চোঙ্গ বা হর্ণ। আমরা পরে রেকর্ড প্রস্তুত কথা ও গান তুলিয়া লওয়ার প্রণালী এবং গ্রামোফোন যন্ত্রের প্রয়োজনীয় কলকব্জার বিষয়-আলোচনা করিব।

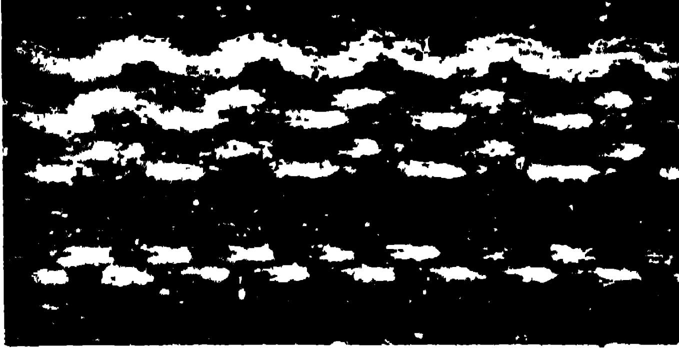


গ্রামোফোন যন্ত্রের কলকব্জা

রেকর্ডের কথা—তোমরা যখন কলের গান অর্থাৎ কি না গ্রামোফোন শোন, তখন তাহাতে রেকর্ড পরাইয়া দিয়া চাবি দিয়া দেও, আর অমনি গ্রামোফোনের স্থচ ঘুরিতে থাকে—আর

শব্দ শুনিতে পাও। কাজেই, রেকর্ড গ্রামোফোনের একটি প্রধান অঙ্গ। এই রেকর্ড কিরূপে প্রস্তুত হয় এখন সে কথা বলিতেছি।

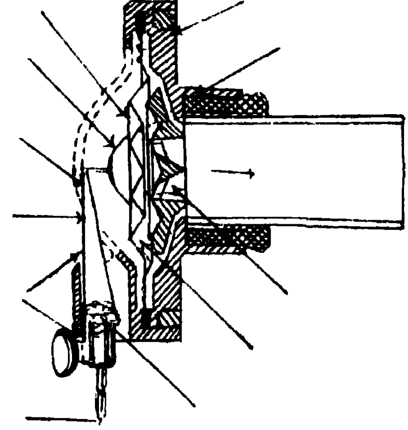
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, রেকর্ডের উপর সারি সারি চক্রাকার ঢেউ-খেলান অতি সূক্ষ্ম প্রণালী থাকে।



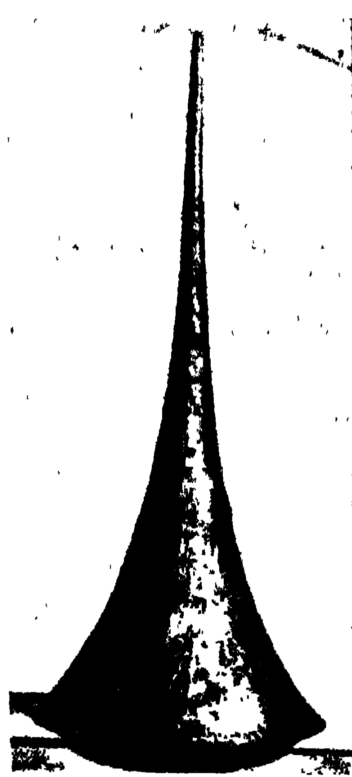
আধুনিক রেকর্ডের আণুবীক্ষণিক চিত্র

এই প্রণালীর গভীরতা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যায় এবং রেকর্ডের সর্ব্বত্রই উহা সমান থাকে। ইঞ্চিতে ১০০টি প্রণালী বর্ত্তমান থাকে এবং গ্রামোফোনের সূচ (needle) এই প্রণালীর ভিতর দিয়া ক্রমশঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া রেকর্ডের কেন্দ্রস্থলের দিকে আসে। সাদাসিদে প্রণালীতে নিডলটি কেবল ঘুরিয়া যাইত—কোনও শব্দ হইত না, কিন্তু রেকর্ডের প্রণালী আড়াআড়িভাবে ঢেউ খেলান। ঢেউয়ের অঙ্গ হইতে তাহার মাথা পর্য্যন্ত স্থান হইতেছে $\frac{১}{১০০০}$ ইঞ্চি। নিড্‌ল্ এইরূপে আড়াআড়িভাবে সেকেণ্ডে ২৫৬ বার গমনাগমন করিলে হর্ণ হইতে 'সা' সুর বাহির হইবে। প্রণালী বা ঢেউয়ের আকার গানের উপর নির্ভর করে। গান উচ্চস্বরে বাড়াইলে তাহার আড়াআড়ি দৈর্ঘ্য বাড়ে, এবং ধীরে গাহিলে কমিয়া যায়। অধিক উচ্চস্বরে গান হইলে একটি প্রণালী বা ঢেউ অন্যটির উপর গিয়া মিশিয়া যাইবার ভয় থাকে। প্রণালী বা ঢেউয়ের চিত্র দেখ।

'নিড্‌ল্ ঐরূপে আড়াআড়িভাবে প্রণালীর মধ্য দিয়া গমনাগমন করিলে কিরূপে "সাউণ্ড বক্সে" বা "শব্দ-মঞ্জুষায়" শব্দ হয়, এখন আমরা তাহারই আলোচনা করিব। পর পৃষ্ঠার চিত্রে দেখ, কিভাবে সাউণ্ড বক্সের ক্রমশঃ উন্নতি করিয়া এখন স্পাইডার আকারের সাউণ্ড বক্সের প্রচলন হইয়াছে। স্পাইডার বা মাকড়সা সাউণ্ড-বক্সে পূর্ব্বেকার দোষ অনেক কমান হইয়াছে। এখন বৈদ্যুতিক প্রথায় গান তুলিয়া লইয়া এই সাউণ্ড বক্স ব্যবহার করিলে গানের বিকৃতি হয় না, এবং গান বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নিড্‌ল্ আণুবীক্ষণিক প্রণালীর মধ্যে



শব্দ-মঞ্জুষা



অর্থ প্রকটনকারী চোঙ্

গমনাগমন করিলে, ইহার সহিত সংযুক্ত স্পাইডার 'চাকতি' ('diaphragm') কম্পিত হয়। এই চাকতি বা ধাতু-ফলক হালকা এলুমিনিয়াম মিশ্রিত ধাতুর চাদর হইতে তৈয়ার হয়। চাকতির স্পাইডার আকৃতি হইলে, কম্পিত চাকতি হইতে অধিক পরিমাণে শব্দ উত্থিত হয়। চাকতির পরেই সাউণ্ড বক্সের "সাউণ্ড চেম্বার" বা শব্দ-কোটর আছে এবং চাকতি কম্পিত হইলে এই কোটরে অবস্থিত বায়ুতে চাপের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয় এবং সেইখান হইতে শব্দ হর্ণ বা চোঙের ভিতর দিয়া বাহিরের বায়ুতে বিস্তারলাভ করে।

হর্ণ বা চোঙ্গ না থাকিলে শব্দ-মঞ্জুষা বা সাউণ্ড বক্সের শব্দ কোটরে অতি অল্প পরিমাণে বায়ুর চাপ কমে এবং বাড়ে। কিন্তু চোঙ্গ থাকিলে অধিক পরিমাণে শব্দ হয় এবং আমরা সেই শব্দ হর্ণের

শব্দ মঞ্জুষা সাউণ্ড বক্সের ক্রম-পরিণতি



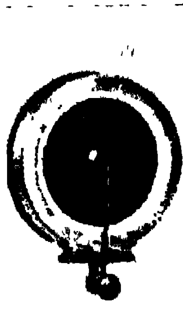
১৮৯৮ খৃঃ



১৯০১ খৃঃ



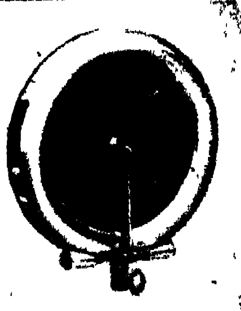
১৯০৩ খৃঃ



১৯০৯ খৃঃ



১৯২১ খৃঃ



১৯২৬ খৃঃ



১৯২৭ খৃঃ



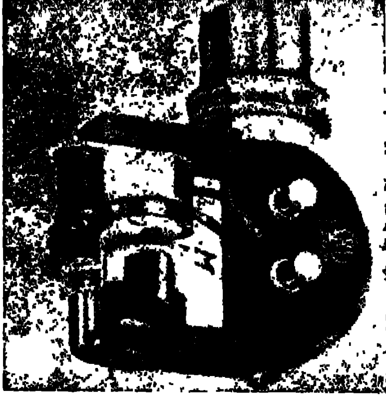
১৯২৮ খৃঃ

চতুর্দ্দিকে শুনিতে পাই। যে সকল গ্রামোফোনে হর্ণ বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাদের হর্ণ বাস্তবপক্ষে মেশিনের ভিতরকার বাক্সের ভিতরে থাকে। আজকাল এই প্রকার হর্ণের প্রচলন হওয়ায় স্থানাভাব অনেক ঘুচিয়াছে এবং গ্রামোফোন হালকা এবং আকারে ছোট হইয়াছে। সেই কারণে ইহা সুবহ (Portable)-ও হইয়াছে। এখন তোমরা বেশ বুঝিতে পারিবে যে, হর্ণবিহীন গ্রামোফোন হইতে শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে না। এইবার আমরা রেকর্ড প্রস্তুত করিবার প্রণালী এবং গান তুলিয়া লওয়ার বিষয় উল্লেখ করিব।

গ্রামোফোন রেকর্ড প্রস্তুত প্রণালী

কঠিন মোমজাতীয় যেমন রবর, প্যারাফিন্ প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য মিশাইয়া একটি গোল চাক্তি, চক্র বা ডিস্ক তৈয়ার করা হয়। এই চাক্তির উপর রেকর্ডিং যন্ত্রের টাংগষ্টেন(Tungsten) 'নিড্‌ল্' অর্থাৎ একপ্রকার গুরুভার ধাতুর মূল পদার্থ—তুঙ্গস্থক্ রাখিয়া দিয়া নিড্‌ল্ দিয়া চাকতিটিকে ঘুরাইতে থাক। নিড্‌ল্ চাক্তির চারিদিকে ঘুরিবার সময়, চাক্তির উপরে সূক্ষ্ম ঢেউ খেলান প্রণালী কাটিয়া যায়। তৎপরে এই প্রণালীর অঙ্কিত চাক্তির উপর গ্রাফাইট (graphite) বা কৃষ্ণ সীসকের গুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং পরে জলে ডুবাইয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা অতি সূক্ষ্ম তামার আবরণে Copper sulphate solutions) ঢাকা হয়। ইহাই হইল "মাষ্টার রেকর্ড" বা মূল রেকর্ড। এখন ইহা হইতে কতকগুলি "নেগেটিভ" তৈয়ার করা হয়। ছাঁচ লইয়া নেগেটিভ তৈয়ার করিতে হয় এবং পরে এই সকল নেগেটিভ হইতে বিক্রয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক পজিটিভ ছাঁচ লইয়া প্রস্তুত করা হয়। পজিটিভ করিবার জন্য গালা (Shellac) রজন (resin) এবং কতকগুলি ধাতুর গুঁড়া মিশাইয়া সহজে গলিয়া যায়, এমন একটি দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। এই মিশ্রণ দ্রব্যটি ঠাণ্ডা হইলে বেশ শক্ত হইয়া যায়। উহা চাক্তির মতন তৈয়ার করিয়া বাষ্প দ্বারা গরম করিয়া এবং উপর হইতে মেশিন দ্বারা চাপ দিয়া "নেগেটিভ" হইতে ছাঁচ লওয়া হয়। এইরূপে হাজার হাজার ছাঁচ লইয়া রেকর্ড তৈয়ার করা হইয়া থাকে।

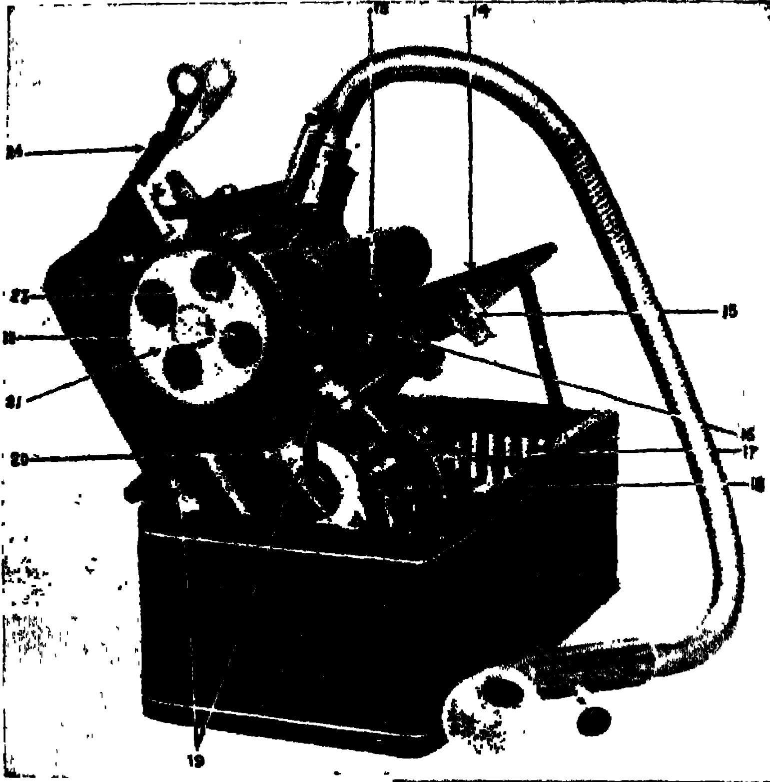
এখন যে বৈদ্যুতিক প্রথা চলিয়াছে, তাহাতে গান তুলিয়া লওয়া সহজ হইয়াছে। গান অতিশয় উচ্চ হইলে তাহাকে নিম্ন করা, বা অতিশয় ক্ষীণ হইলে তাহাকে উচ্চ করা, এ সকল কার্য্য বৈদ্যুতিক ক্রিয়া-কৌশল অনুযায়ী হইতে পারে এবং নানা প্রকার আনুষঙ্গিক বাহিরের শব্দ (noise) যাহাতে রেকর্ডে না উঠে, তাহারও ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল কারণে বৈদ্যুতিক প্রথায় রেকর্ড তুলিয়া লইলে গান স্পষ্ট হয় এবং গানের বিকৃতি হয় না। প্রথমে বৈদ্যুতিক মতে একটি মাষ্টার রেকর্ড (Master Record) তৈয়ার করা হয় এবং পরে তাহা হইতে ইচ্ছামত হাজার দুই হাজার রেকর্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই বৈদ্যুতিক প্রথা, আমেরিকার বেল টেলিফোন ল্যাবোরেটারি হইতে প্রচলিত হয়। অতি উত্তম এবং বড় মাইক্রোফোনের নিকট গান করা হয় এবং বায়ুর চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি, বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয় এবং এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ভল্‌ভ এ্যামপ্লিফায়ার (Valve-amplifier) দ্বারা বাড়ান হয়। পরে আর একটি প্রবাহ কম বেশি করিবার পর যন্ত্রের ভিতর দিয়া ইহা রেকর্ডিং যন্ত্রে প্রবেশ করে। রেকর্ডিং যন্ত্রটির কৌশল অতি সামান্য। মোটরে যেমন ফিল্ড কয়েল থাকে, সেইরূপ ইহার একটি বৈদ্যুতিক তারের কুণ্ডলী



গ্রামোফোন হইতে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া দ্বারা শব্দ বর্দ্ধিত করিয়া লাউডস্পিকারে গান করা হয়। সচরাচর মেলা বা টকি হাউসে এই প্রকারে গান হয়। এই সময় গ্রামোফোনের শব্দ মঞ্জুষার বদলে "গ্রামোফোন পিক্-আপ" বসাইয়া দেওয়া হয়। এই চিত্রটি "গ্রামোফোন পিক আপ" দেখাইতেছে।



অফিসের কর্ত্তা এডিফোনের সাহায্যে চিঠির উত্তর দিতেছেন।



এডিফোন যন্ত্র

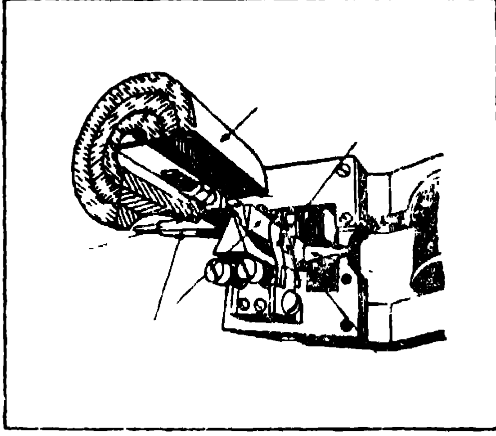
(Coil) আছে। এবং তাহার মধ্যে যোগকীলকযুক্ত আর একটি কুণ্ডলী থাকে। এই বিবর্ত্তন কীলকযুক্ত কুণ্ডলীটি ফিল্ডকয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি হইলে কম্পিত হয় এবং ইহার সহিত সংযুক্ত "টাংগষ্টননিড্‌লও" কম্পিত হইয়া মাষ্টার রেকর্ডের উপর সূক্ষ্ম প্রণালী কাটিয়া যায়। মাষ্টার রেকর্ডটিও গান তুলিবার সময় ঘুরান হয়। অতএব ইহাতেও সারি সারি সূক্ষ্ম ঢেউ-খেলান প্রণালী তৈয়ার হইয়া যায়। পর পৃষ্ঠায় রেকর্ডিং যন্ত্রের ছবি দেওয়া হইল।

এইবার তোমাদের কাছে একটি নূতন আবিষ্কৃত যন্ত্রের পরিচয় দিতেছি। আজকাল এডিফোন্ (Ediphone) বা ডিক্টাফোন্ বা শ্রুত-লিপি যন্ত্র নামে এক নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্রটি ব্যবসায়ীরা এবং আফিস ও আদালতের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাই বেশির ভাগ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে সুবিধা এই যে, সর্টহ্যাণ্ড (Short hand) লেখকের আর কোনও প্রয়োজন হয় না। তুমি যন্ত্রের কাছে প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া গেলেই হইল—টাইপিষ্ট অন্য ঘরে থাকিয়াও কানে



টাইপ রাইটার টাইপ করিয়া যাইতেছে

নল দিয়া সেই কথা শুনিয়া টাইপ করিয়া যাইতে পারে। ১৮৬৭ পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ, আফিসের কর্ত্তা, যন্ত্রের নলটির মুখে একখানা চিঠির উত্তর মুখে মুখে



রেকর্ডে গান তুলিবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র

বলিয়া যাইতেছে, আর টাইপিষ্ট মহিলাটি অন্য ঘরে বসিয়া তাহা শুনিয়া টাইপ করিয়া যাইতেছেন। ১৮৬৮ পৃঃ। যন্ত্রটির গঠন-প্রণালীও তেমন কঠিন নহে।

এখন বুঝিতে পারিলে যে, গ্রামোফোন্ যন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ বিবিধ শব্দযন্ত্রের দ্বারা আমাদের কত উপকার হইতেছে। আমরা এই যন্ত্রের সাহায্যে নানা উপায়ে আনন্দ পাই। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ গায়কদের গান শুনিতে পাই। বক্তার বক্তৃতা শুনিতে পাই, অভিনয় শুনিতে পাই। তোমরা ঘরে বসিয়া বিশ্বজগতের নানা দেশের নানা ভাষা শুনিতে পাও। স্কুল-কলেজে আজকাল বিদেশী ভাষার উচ্চারণশিক্ষা আবৃত্তি, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়েও গ্রামোফোন্ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে লওয়া হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্র-নাথের কত সুন্দর সুন্দর আবৃত্তি তোমরা আজকাল এই যন্ত্রের সাহায্যে শুনিয়া থাক।

অনেক আবিষ্কারক আজকাল নানা অজানা-দেশের অজানা অসভ্য জাতির ভাষা ইত্যাদি এই সমুদয় যন্ত্রের সাহায্যে তুলিয়া লইয়া তৎসম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। ভবিষ্যতে এই জাতীয় শব্দবাহী যন্ত্র যে আরও উন্নতির পথে আসিবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

টকি বা সবাক্ চিত্র

আমরা পূর্ব্বে যে সকল ছায়া-চিত্র দেখিতাম, তাহাদিগকে Silent Picture বা নীরব চিত্র বলা হইত। এখন আমরা যে সব চিত্র দেখিতে পাই, তাহাতে যে সুধু অভিনেতাগণের চিত্রই দেখিতে পাই তাহা নহে, কথাবার্ত্তাদিও স্বাভাবিক ভাবে শুনিতে পাই। ইহার প্রচলন আজ অল্প কয়েক বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সবাক্‌চিত্র ফিল্মের এক অংশ

আমরা এইবার কিরূপে ফিল্ম হইতে শব্দ বা গান বাহির হয়, তাহারই

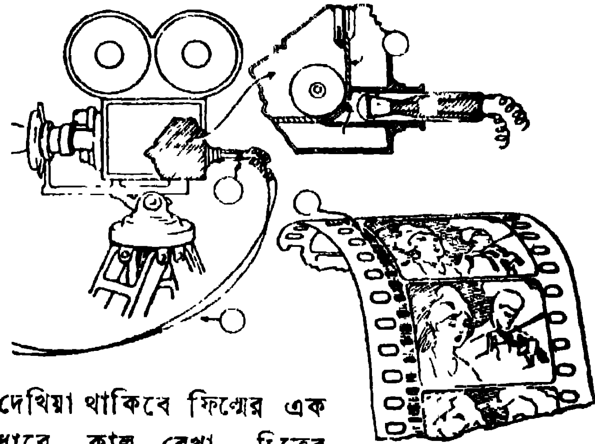


শব্দের ঢেউ



শব্দের ঢেউ—ফিল্মের উপর

বিষয় আলোচনা করিব। ফিল্ম কিরূপে তোলা হয়, এবং তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল পরে বলিব। তোমরা



দেখিয়া থাকিবে ফিল্মের এক ধারে কাল রেখা চিত্রের পাশে অঙ্কিত থাকে। এই রেখা ফিল্মের আড়াআড়িভাবে অবস্থিত থাকে। যেমন যেমন ফিল্ম সরিয়া চিত্রের পরিবর্ত্তন হয়, তৎসংলগ্ন রেখাও সেই ভাবে সরিয়া যায় এবং ছবির সহিত ইহার গতি বাঁধা থাকায় ছবিতে যেরূপ কথাবার্ত্তা হয়, সেই সব কথাই সে সময়ে যন্ত্রদ্বারা বাহির হয়। ফিল্মে শব্দ তুলিবার প্রথা দুই প্রকার। শব্দে বায়ুর চাপের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। শব্দের আলোক-চিত্রে ফিল্মের

উপর উক্ত চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী কাল কাল ছবি লওয়া হয়। বায়ুর চাপের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত এই কাল কাল ছবি, কোথাও অধিক গাঢ় কাল, কোথাও মধ্যম প্রকৃতির, কোথাও হালকা কাল, কোথাও বা শ্বেত আকার ধারণ করে (পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দেখ)। এই



Variable width sound film, রেখা-বিস্তার-বৈষম্য-প্রথাকে "আলোক-বৈষম্য" (Variable-density) প্রথা বলিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় প্রথার ইংরাজী নাম Variable width process অর্থাৎ রেখা সর্ব্বত্রই সমান ভাবে চলে, কিন্তু বায়ুর চাপের সহিত তাহার আড়াআড়ি দৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। ইহাকে আমরা বাংলায় রেখা-বিস্তার-বৈষম্য প্রথা বলিব (উপরে দেখ)।

আলোক-বৈষম্য প্রথা—দুই প্রথাতেই প্রথমে মাইক্রোফোনের নিকট কথা কহিয়া, সেই বায়ুর তরঙ্গ বৈদ্যুতিক তরঙ্গে পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত করা হয়। এবং ভাল্‌ভ এ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া ইচ্ছামত বাড়াইবার বা কমাইবার জন্য এটেনুয়েটার (attenuator) যন্ত্রের ভিতর দিয়া প্রবেশ করাইয়া আলোক-চিত্র গ্রহণকারী যন্ত্রে প্রবেশ করান হয়। এই খানেই দুই প্রথার নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন। আলোক-বৈষম্য প্রথায় উপরি উক্ত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ একটি ইউল্যাম্পের (Aeolamp) ভিতর দিয়া গমনাগমন করে এবং একটি আয়তাকার ছিদ্র (slit) ঐ ইউল্যাম্পের আলোক দ্বারা আলোকিত করা হয় এবং ঐ আয়তক্ষেত্রের আলোকচিত্র ফিল্মের উপর ছবির সহিত গ্রহণ করা হয়। যেমন যেমন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ইউল্যাম্পে গমনাগমন করে, তাহার দীপ্তি (Brightness) তাহার সহিত কমে বাড়ে, এবং ফিল্মের উপর আয়ত ক্ষেত্রের আলোক-চিত্রের উজ্জলতার বৈষম্য ঘটিয়া থাকে।

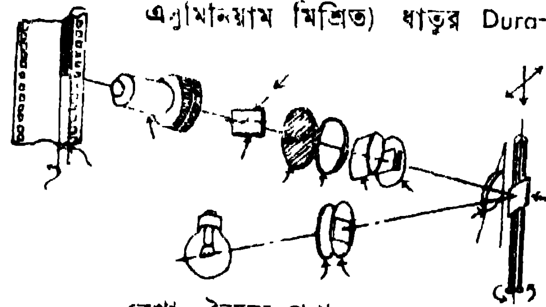
ওয়েণ্ট সাহেব (E. C. Wente) আর এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাহাতে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কোণের আলোক-চিত্রে তাহার উজ্জলতার বৈষম্য ঘটান যায়। ইনি "আলোক-কপাট" তৈয়ারী করেন। আয়তক্ষেত্র বা স্লিট অন্য একটি আলোক দ্বারা সমানভাবে আলোকিত থাকে, এবং তাহার সম্মুখে একটি আলোক-কপাট থাকে। কপাট বন্ধ হইলে স্লিটের ছবি একেবারে কাল হইয়া যাইবে। কারণ, স্লিট মোটেই আলো-



ওয়েণ্ট সাহেবের আলোক-কপাট দীপ্তির হ্রাসবৃদ্ধি করে

কিত হয় নাই। অন্ধকার কপাট কিছু খুলিলে, সামান্য আলোক প্রবেশ করায় সেইরূপে ফিল্মে আলোক-চিত্র ফিল্মে উঠিবে। যেমন যেমন কপাট খুলিবে, বন্ধ হইবে সেইরূপে স্লিটের আলোকচিত্র উজ্জল বা অন্ধকার হইবে। স্লিটে আলোকচিত্রের আকার সেই থাকিবে, কিন্তু তাহার উজ্জলতা কমিবে এবং বাড়িবে। উক্ত আলোক-কপাট প্রধান বৈদ্যুতিক-প্রবাহ দ্বারা অল্প, মধ্যম বা অধিক খুলিতে থাকে এবং ফিল্মে স্লিটের আলোক-চিত্রে উজ্জলতার বৈষম্য ঘটায়।

আলোক কপাট হইতেছে '০০১ ইঞ্চি চওড়া (এ্যালুমিনিয়াম মিশ্রিত) ধাতুর Dura-



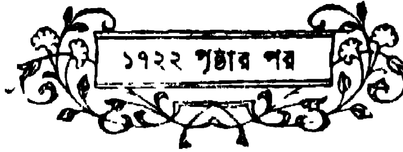
রেখা- বৈষম্য প্রথা

lunim) দুইটি ফিতা আড়াআড়ি-ভাবে পাশাপাশি এক জোড়া চুম্বকের মধ্যে টানিয়া বাঁধা থাকে। এই ফিতার মধ্য দিয়া প্রধান বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত হইলে, ফিতা দুইটির মধ্যস্থিত স্থানের দৈর্ঘ্য কমে-বাড়ে, অর্থাৎ আলোক-কপাট খোলে এবং বন্ধ হয়।



ভারতীয় দর্শন ও দার্শনিক

বেদ ও উপনিষদের যুগ—সত্যকাম জাবাল



উপনিষদের যুগে দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে সমিৎ কাষ্ঠ হাতে করিয়া শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইতে হইত এবং তিনি শিক্ষা দিতে সম্মত হইলে তাঁহার বাড়ীতে বাস করিয়া সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতে হইত।

সেই যুগের এইরূপ একটি বিদ্যার্থীর নাম ছিল সত্যকাম, আর তার মা'র নাম ছিল জবালা। গুরুর কাছে গেলেই তিনি নাম, গোত্র, বাবার নাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতেন, তাই সত্যকাম এক দিন তার মাকে কহিল, "মা, আমি দর্শনশাস্ত্র পড়িবার জন্য গুরুর নিকট যাব; তিনি ত আমার বাবার নাম ও গোত্র জানিতে চাহিবেন, সেটি আমায় বলিয়া দেও।" মাতা ছেলের প্রশ্ন শুনিয়া কহিলেন, "তোমার জন্মের পর তোমার পিতাকে আমিও আর দেখি নাই; এবং তাঁর কোনও পরিচয়ই তিনি আমায় দিয়া যান নাই। আমার নাম জবালা, তুমি সেই হিসাবে 'জাবাল' এই খ্যাতি পাইবে; আমি তোমার নাম রাখিয়াছি 'সত্যকাম'। গুরু তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিও, তুমিও সত্যকাম জাবাল।"

হারিদ্রুমত নামক ঋষির নিকট সত্যকাম বিদ্যা শিক্ষার জন্য উপস্থিত হইল। ঋষি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে মা'র শিক্ষামত উত্তর দিল। বালকের সত্যবাদিতায় ও স্পষ্টভাষিতায় গুরু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "অব্রাহ্মণ এমন স্পষ্ট কথা কহিতে পারে না, সুতরাং তুমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ হইবে। তুমি আমার এখানে থাক, আমি তোমাকে শিক্ষা দিব। আপাততঃ আমার কাজ কর্ম দেখ।" এই বলিয়া কৃশ ও দুর্বল চারি শত গাভী তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন এবং কহিলেন, "ইহাদিগকে বনে চরাইতে থাক; বাচ্চা হইয়া হইয়া ইহাদের সংখ্যা যখন এক হাজার হইবে তখন ইহাদিগকে লইয়া ঘরে ফিরিও, তার আগে নয়। তার পর আমি তোমাকে উপদেশ দিব।"

গরুগুলিকে লইয়া সত্যকাম বনে বাহির হইয়া গেল। তার পর যখন তাহাদের সংখ্যা হাজার হইল তখন একদিন সেই গরুর দলে যে একটী ষাঁড় ছিল সেটী সত্যকামকে কহিল, "এখন আমাদের সংখ্যা এক হাজার হইয়াছে, তুমি আমাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া চল। তোমার যত্নে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, সেই জন্য ভগবান সম্বন্ধে আমি তোমায় একটু উপদেশ দিব। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারিটি দিক যে আমরা দেখি, তাহাতে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন, এক একটী দিক্ তাঁহার এক একটী অংশ। আমি তোমায় এই পর্য্যন্ত বলিলাম—এর বেশী যদি জানিতে চাও, অগ্নির নিকট উপদেশ পাইবে।"

পর দিন সত্যকাম সন্ধ্যাবেলায় গরুগুলি বাঁধিয়া আগুন জ্বালিয়া একটা যজ্ঞ কাষ্ঠ হাতে করিয়া সেই আগুনের দিকে মুখ করিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পর আগুনের ভিতর হইতে কথা শোনা গেল, "সত্যকাম,

ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমি তোমায় উপদেশ দিতেছি, শোন। এই যে পৃথিবী দেখিতে পাইতেছ, ইহা ভগবানের এক অংশ; উপরে আকাশও ভগবানের এক অংশ; আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত যে অন্তরীক্ষ, তাহাও তাঁহার অংশ এবং সমুদ্রও তাঁহারই অংশ। যে বিদ্বান্ ইহা জানিয়া ভগবানের উপাসনা করে, তাহার জয় হয়। ভগবান্ সম্বন্ধে আরও উপদেশ তুমি হংসের নিকট পাইবে।"

তার পর দিন আবার সন্ধ্যায় সত্যকাম যেমন আগুনের সম্মুখে বসিয়াছে, অমনি একটা হাঁস সেখানে আসিয়া বলিতে লাগিল, "সত্যকাম, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, এবং বিদ্যুৎ ইহারাও প্রত্যেকেই ব্রহ্মের এক এক অংশ প্রকাশ করিতেছে। ইহা জানিয়া যে ব্রহ্মের উপাসনা করে, সে জয়যুক্ত হয়। এ সম্বন্ধে একটি জলচর পাখী তোমায় আরও কিছু উপদেশ দিবে।"

তার পর দিনও তেমনই আর একটি পাখী সত্যকামের সম্মুখে আসিয়া কহিতে লাগিল, "ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ আমিও তোমায় দিতেছি। মানুষের প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ ও মন—এ সকলের ভিতরও ব্রহ্মই নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন। ইহা জানিয়া যে ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহার মঙ্গল হয়।"

অতঃপর গরুগুলি লইয়া সত্যকাম গুরুগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। গুরু তাহাকে দেখিয়াই কহিলেন, "সত্যকাম, তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তুমি ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করিয়াছ। তোমাকে কে উপদেশ দিল?" সত্যকাম, কহিল, "মানুষের কাছে আমি কোন উপদেশ পাই নাই।" এই বলিয়া সে পথে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সে সমস্তই গুরুর নিকট বর্ণনা করিল এবং কহিল, "আমি শুনিয়াছি আপনার মত গুরুর নিকট যে বিদ্যা লাভ করা যায় তাহা নষ্ট হয় না, সুতরাং আপনি আমায় এখন উপদেশ দিন্।" ঋষিও সত্যকামকে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ উপদেশই দিলেন। ইহার পর দর্শন শাস্ত্রে কুশল হইয়া সত্যকাম গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া সত্যকাম জাবাল যখন গৃহী হইলেন তখন তাঁহারও বহু ছাত্র হইতে লাগিল। উপকোমল কামলায়ন নামক একটী ছাত্র বারো বছর তাঁহার গৃহে বাস করিয়া অগ্নির সেবা করিলেন, কিন্তু তথাপি গুরু তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলেন না। একদিন সত্যকামের স্ত্রী তাঁহাকে কহিলেন, "এই ছেলেটী যথেষ্ট তপস্যা করিয়াছে, এবং ব্রহ্মচারী থাকিয়া অগ্নির সেবা করিয়াছে; এখন ইহাকে শেষ উপদেশ দিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে দিন্।" কিন্তু সত্যকাম সে কথায় কান না দিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

কামলায়ন মনের কষ্টে আহার পরিত্যাগ করিলেন। গুরু-পত্নী তাঁহাকে কহিলেন, "ব্রহ্মচারী, তুমি খাওয়া ছাড়িলে কেন? কিছু খাও!" ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "মানুষের ভিতরে বহু কামনা রহিয়াছে। কিন্তু আমার দেহ ব্যাধিতে পূর্ণ, সুতরাং আমি কিছু খাইব না।" এই অবস্থায় একদা অগ্নি-সকল তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি আমাদের উত্তম সেবা করিয়াছ, এজন্য তোমায় কহিতেছি, শোন. তুমি যে ব্রহ্ম বা ভগবান্কে জানিতে চাও, প্রাণই তিনি, আকাশ ও জলও তিনিই।"

তারপর গার্হপত্য নামক অগ্নি তাঁহাকে কহিলেন, "সূর্য্যে যে পুরুষ আছেন তাহা আমি, এইরূপ জানিয়া যে ব্যক্তি উপাসনা করে, সে পাপ জয় করে।"

অতঃপর অন্নাহার্য্যপচন নামক অগ্নি কহিলেন, "চন্দ্রে যে পুরুষ আছেন তাহা আমি, এইরূপ ভাবিয়া যে উপাসনা করে, তাহার কোন অমঙ্গল হয় না।"

অতঃপর আহবনীয় নামক অগ্নি তাঁহাকে কহিলেন, "বিদ্যুতে যে পুরুষ আছেন তাহা আমি, ইহা জানিয়া যে উপাসনা করে, তাহার জয় হয়।"

অগ্নি সকল আরও কহিলেন, "এই যা বলিলাম ইহাই আত্মবিদ্যা বা দর্শন, ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা তোমার গুরু দিবেন। এমন সময় গুরু সত্যকাম আসিয়া শিষ্যের মুখের দিকে চাহিয়াই কহিলেন, "উপকোমল, তোমার মুখ দেখিয়া মনে হয়, তুমি ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করিয়াছ, তোমায় কে শিখাইল বল?"

শিষ্য উত্তর করিলেন, "কে আর শিখাইবে? আপনি কিছু বলিলেন না দেখিয়া আমি অগ্নির নিকট বিদ্যা যাচঞা করিয়াছিলাম।" গুরু কহিলেন, "তাঁরা তোমায় কি উপদেশ দিলেন?"

উত্তরে শিষ্য যথাযথ বর্ণনা করিলে গুরু কহিলেন, "অগ্নি সকলের নিকট যাহা জানিয়াছ তাহা ভুল নয়। কিন্তু আমি এখন তোমায় যাহা বলিব তাহা জানিলে পদ্মপত্রে যেমন জল লাগিয়া থাকিতে পারে না তেমনই মানুষকে কোনও পাপ স্পর্শ করিতে পারে না।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে আরও অনেক সূক্ষ্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন।



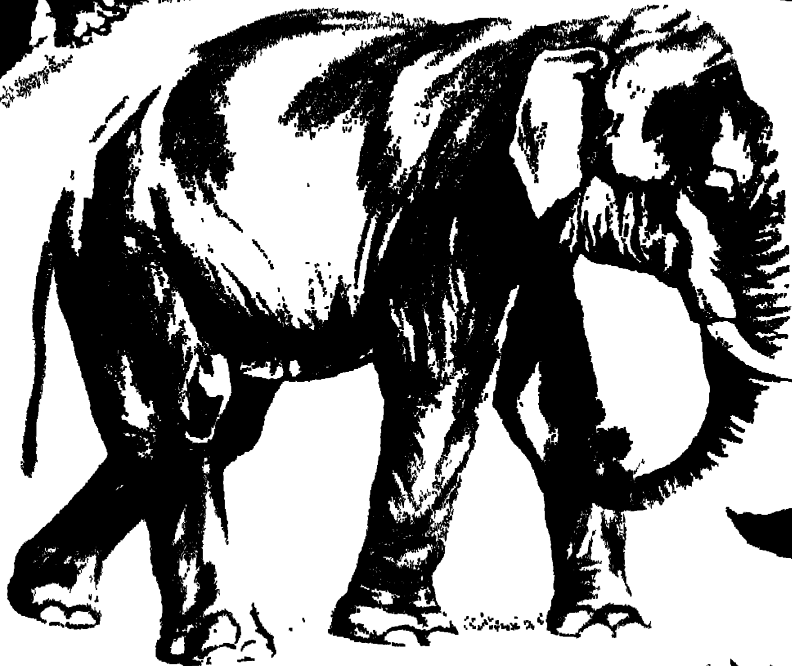








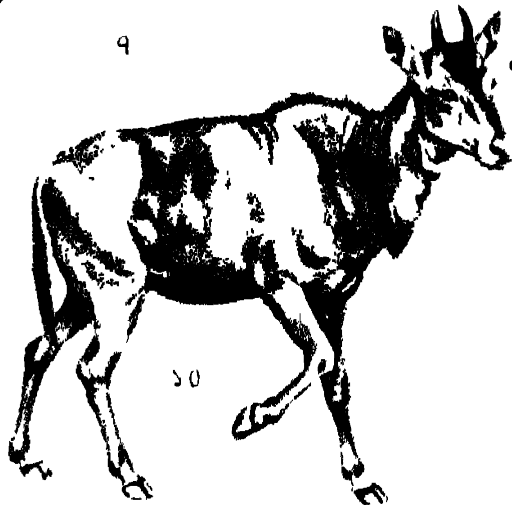














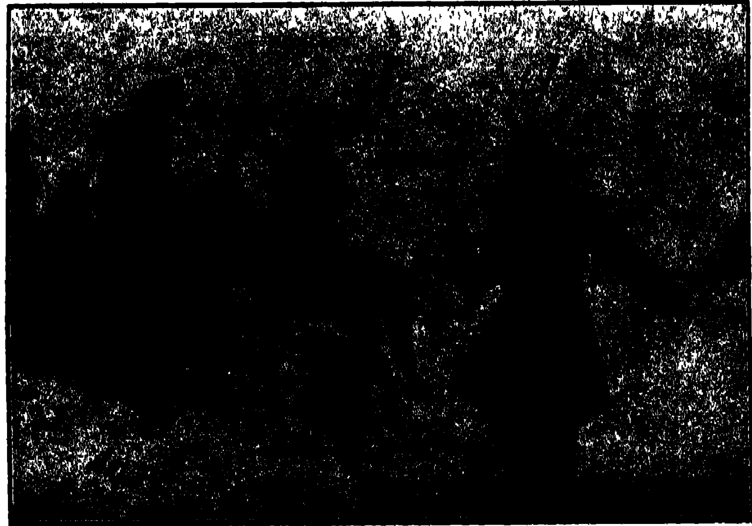


পামির বা পৃথিবীর ছাদ


১৭৩৬ পৃষ্ঠার পর

পৃথিবীর ছাদ কোথায় বল দেখি? ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশেই আমাদের 'পৃথিবীর ছাত' অবস্থিত! সেখান হইতেই হিমালয়, কিউন্‌লুন্, কারাকোরাম, সুলেমান্, হিন্দুকুশ, পারোপামিসাস্ প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণী এদিকে ওদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। পামির বা 'পৃথিবীর ছাত' পর্ব্বতশ্রেণী সাধারণতঃ ১৬,০০০ হইতে ১৮,০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। পামির অঞ্চলে সাধারণতঃ কিরঘিজদের ও হুঞ্জাদের বাস।

পামিরের কথা লোকে বড় একটা জানে না। না জানিবার কারণ, ওদিকে কেহ ত তেমন বেড়াইতে যায় না। দুই একজন ভ্রমণকারী ঐদিকে বেড়াইতে গিয়া 'পৃথিবীর ছাতের' দেশের সৌন্দর্য্যের অনেক সুখ্যাতি করিয়াছেন। এদেশে আসার পথ বড় কঠিন ও বিপৎসঙ্কুল। পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া পথ, সেই সব পর্ব্বত আবার তুষারাবৃত। এজন্য পদে পদে বিপদ ঘটে। ঐ দেখ, বরফে ঢাকা পর্ব্বতের উপর দিয়া কেমন ভয়ানক পথ! কখন্ যে আকস্মিক ভাবে তুষারস্তূপ স্খলিত হইয়া পড়িবে, তাহার কোনও ত স্থিরতা নাই। এজন্য দড়ি ধরিয়া ধরিয়া চলিতে হয়। পর পৃষ্ঠায় যে পথের ছবিটি দেখিতে পাইতেছ, সেই পার্ব্বত্যপথের উচ্চতা হইবে প্রায় ১৩,৭৭৫ ফুট। এই পথটির নাম হইতেছে বুর্জিল গিরিপথ।

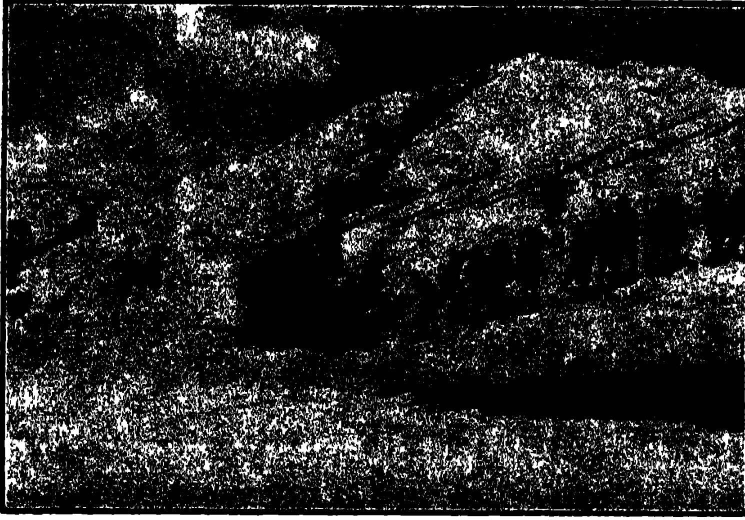


কিরঘিজ

বুর্জিল গিরিপথ দিয়া দারুণ শীত-ঋতুতেও যাতায়াত চলে,—যদি তুষারঝঞ্ঝা না হয়। তুষারের ঝড় বহিলে এপথে চলা অসম্ভব। দারুণ শীতে বরফ

জমাট অবস্থায় থাকে, গলে না বলিয়াই যাতায়াত সম্ভব হয়। গ্রীষ্মকালে এ পথে চলিতে হইলে খুব ভোরে ভোরে চলা ভাল। রৌদ্র হইলে বরফ গলিতে থাকে, তখন এ পথে আর চলা যায় না।

ভারতবর্ষ হইতে পামির বা পৃথিবীর ছাতের দেশে আসিতে হইলে শ্রীনগর-গিলগিটের পথ ধরিয়া আসিতে হয়। বুর্জিল গিরিপথ দিয়া পর্ব্বতারোহণ করিবার সময় মাঝে মাঝে বসতি দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল পল্লীতে আসিলে শ্রান্ত পথিকের প্রাণে যেন নব জীবনের সঞ্চার হয়। কিরূপ পথ ধরিয়া জীবন হাতে করিয়া এই পথে আসিতে হয়, তাহা ছবিতে দেখ। একে ত খাড়া উঁচু পাহাড়, তারপর শিলাকীর্ণ এবং শিলাগুলি আবার এমন আল্‌গাভাবে অবস্থিত যে, সামান্য একটু নড়িলেই হুম্‌-দাম্‌ করিয়া নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িতে থাকে। তখন অনেকের প্রাণনাশ হয়। কাজেই, এই পথে চলিতে হইলে ভয়ানক সতর্কতা অবলম্বন করা



বুর্জিল গিবিপথ



পামিরের মানচিত্র

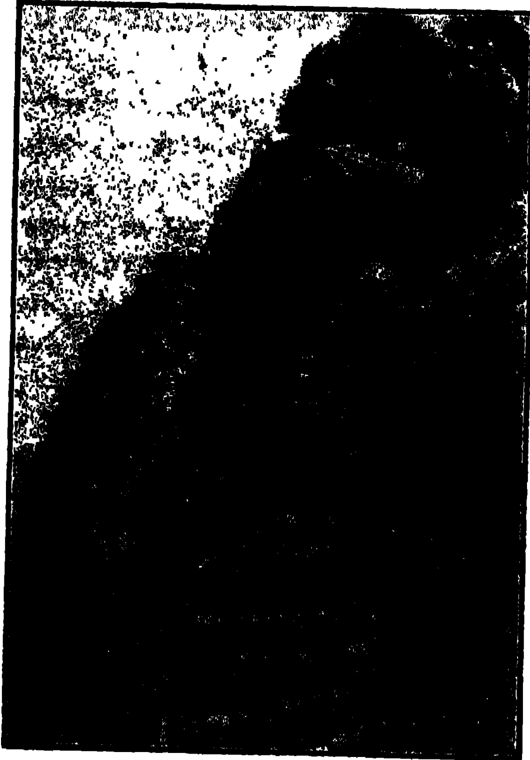
আবশ্যক। গ্রীষ্মকালে যখন বরফ গলে, তখন পার্ব্বত্য নদ-নদী ও ঝরণাগুলি বেগে নীচের দিকে বহিয়া চলে।

এই পথে সওদাগরেরা ব্যবসা করিবার জন্ত তাহাদের পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া চলে। বন্ধুর পর্ব্বত-প্রান্তে কোন কোন স্থানে সামান্ত একটি গাছপালাও দেখা যায় না। কিন্তু সেই পথেও অভিজ্ঞ এবং অভ্যস্ত সহযাত্রী বণিকদল অনায়াসে অতি সহজভাবে চলাফেরা করে। তরু-লতাবিহীন হইলেও এদিকের পর্ব্বত-সমূহের মধ্যে একটা রুক্ষ সৌন্দর্য্য আছে, তাহা যাঁহারা সর্ব্বদা পর্ব্বতা-রোহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন।

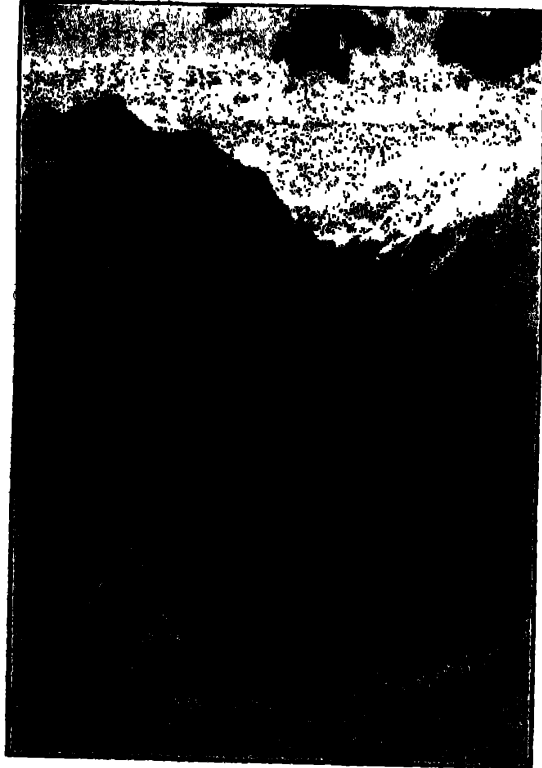
গ্রীষ্মকালে সহযাত্রী বণিকদল পরম আনন্দের সহিত পামিরের মধ্যবর্ত্তী দেশসমূহে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তখন চলিতেও যেমন সুবিধা, তেমনি ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদির পক্ষেও সুবিধাজনক। এজন্ত গ্রীষ্মকালেই বণিকেরা পামির অঞ্চলে অধিক আসিয়া থাকে। সে সময়ে বরফ গলিয়া যাইয়া পরিষ্কার মাঠ ও শুষ্কভূমি দেখা যায়।



বরফ-গলা বুর্জিল গিরিপথ



দুরারোহ গিরিপথ



হুঞ্জা জাতীয় কৃষকেরা গরু দ্বারা শস্য মাড়াইতেছে

সেখানে তাঁবু ফেলিয়া ব্যবসায়ীরা রাত্রি বাস করে। সময় সময় রাত্রিতে ঝড়-ঝঞ্ঝাও বহিয়া যায়।

বার হাজার ফিট উচ্চ পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে, সে-পথে উঠিতে বিশেষ ক্লেশ হইয়া থাকে। তারপর

অনেক সমতল ভূমির উপর দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে। বালতিৎ (Baltit) নামক গ্রামটি এখানে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক কৃষকের বাস, তাহারা হুন্জা (Hunza) জাতীয়। হুন্জা জাতীয় কৃষকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। তাহারা পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে চাষবাস করিয়া থাকে। এখানকার গরু-বাছুরগুলি বেশ শক্তিশালী, তাহাদিগকে দিয়াই ইহারা চাষবাস করে এবং বিবিধ ফসল উৎপাদন করে। এখানে ফলের বাগানও অনেক হয়। পর্ব্বতের নিভৃত ক্রোড়ে, তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের অন্তরালে বালতিৎ গ্রামটি পরম রমণীয়। সবুজ-সুন্দর তরুশ্রেণীশোভিত এই গ্রামে অনেক লোকের বাস।

এ গ্রামটিকে পুরুষের গ্রাম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানকার লোকদের মধ্যে একটি অদ্ভুত রীতি প্রচলিত আছে। গ্রামের কোনও গৃহস্থকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—"তোমার কয়টি সন্তান?" তাহা হইলে সে শুধু ছেলেদের কথাই বলিবে, মেয়েদের কথা বলিবে না। এদেশের পিতার নিকট পুত্রের ন্যায় প্রিয়তম আর কেহ নাই। এই সকল

এসব গ্রামে খাদ্যদ্রব্যাদির অভাব তেমন নাই, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অভাব হইতেছে জ্বালানি কাঠের। শীতকালে যখন চারিদিক্ বরফে ঢাকিয়া ফেলে,



জ্বালানী কাঠের কেনা বেচা

তখন গাছপালা কোথায় মিলিবে যে, তাহা হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ইয়াকের ঘুঁটে, গরুর ঘুঁটে এইমাত্র সম্বল। কাঠ এখানে যেমন দুর্ম্মূল্য, তেমনি কাঠ-বিক্রয়ের সময় বিশেষ সতর্কতার সহিত ওজন করিয়া বিক্রয় করাও হয়। কাঠ কেনা-বেচার সময় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দর লইয়া বেশ বচসাও হইতে দেখা যায়।

বুর্জিল গিরিপথের ন্যায় পামির যাইতে আর একটি গিরিপথ উত্তীর্ণ হইতে হয়। সেই গিরি-পথের নাম কিলিক গিরিপথ। বুর্জিল গিরিপথ হইতে ইহার উচ্চতা আরও ২,০০০ ফুট বেশি হইলেও এই গিরিপথটি বুর্জিল গিরিপথের ন্যায় তত দুর্গম নহে। এই গিরিপথ বেশ প্রশস্ত এবং এই পথে পশুচারণ ভূমিও অনেক মিলে। সহযাত্রী বণিকদল এই পথে যাইতে যাইতে গরু, ভেড়া, ইয়াক্ প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিয়া কিছুদিনের জন্য তাঁবু ফেলিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করে।

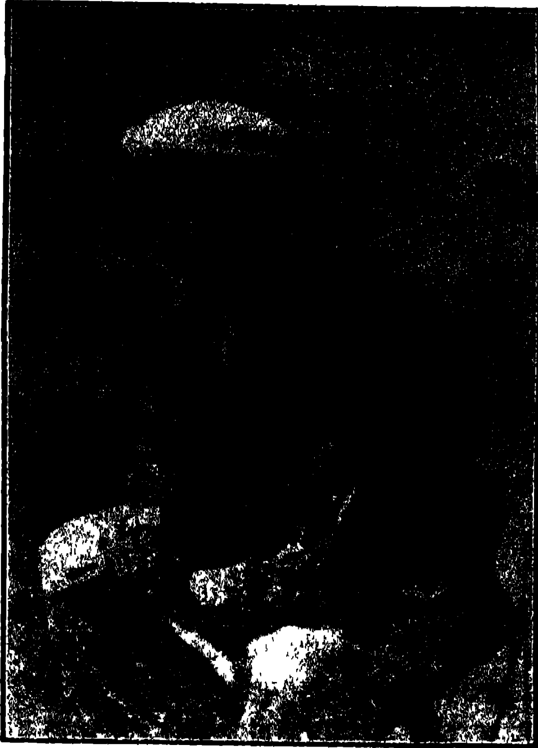


হুন্জা পিতা ও তাহার পুত্রগণ

পার্ব্বত্য প্রদেশের একটি নিয়ম অতি চমৎকার। অতিথিদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নাচগান করিয়া প্রমোদিত করিয়া থাকে। এখানকার লোকদের মধ্যে অতিথির প্রতি আদর ও যত্ন খুব বেশি। এই দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা যতদূর সাধ্য অতিথিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকে।

এদিক্‌টাতে কিরঘিজদের বাস খুব বেশি। কিরঘিজেরা বেশ খোসমেজাজি লোক। মুখে হাসিটি লাগিয়াই আছে। ইহারা হাসিমুখে কাজ করে এবং পর্য্যটকদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে

ইয়াক্ ইহাদের প্রধান সম্পদ্। ইয়াকের দুগ্ধ পান করিয়া যেমন তাহারা জীবনধারণ করে, তেমনি কৃষিকার্য্যে ও অন্যান্য বিষয়েও ইয়াক্ কিজিক অঞ্চলের লোকদের ও কিরঘিজদের অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। ইয়াকের দুগ্ধ, গরুর দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর এবং সুখাদ্য। ইয়াকের লেজ ইহাদের কাছে অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়। মন্দির প্রভৃতি দেবালয়ের চূড়ায় চূড়ায় কিরঘিজেরা ইয়াকের লেজ বাঁধিয়া রাখে। এই লেজ দিয়া তাহারা ভূত প্রেত তাড়ায়। আবার মাছি



কিরঘিজ-যুবক

তাড়াইতেও ইহারা ইয়াকের লেজের ব্যবহার করে। ইয়াকেরা খুব পোষ মানে, কিন্তু সময় সময় ইহাদিগকে ক্ষেপিয়া উঠিতে দেখা যায়।

কিরঘিজদিগকে যাযাবর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহারা তাঁবু ও পশুপাল এবং স্ত্রী-পুত্র পরিবার লইয়া পশুচারণভূমির উদ্দেশ্যে এ পাহাড়ে ও পাহাড়ে গমনাগমন করিয়া থাকে। কিরঘিজদের মত



জ্বালানী কাঠের কেনা-বেচা

অতিথিবৎসল জাতি বড় কম দেখা যায়। কেহ অতিথি হইলে, তাহাদের যাহা কিছু সামান্য খাদ্যদ্রব্য থাকে, তাহা দিয়াই আদর আপ্যায়ন করে। ইয়াকের লোম দ্বারা কিরঘিজেরা নানাপ্রকারের পশমি বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ১৭৭৯ পৃষ্ঠায় কি ভাবে ইয়াকের লোম দ্বারা পশমী বস্ত্র ইত্যাদি



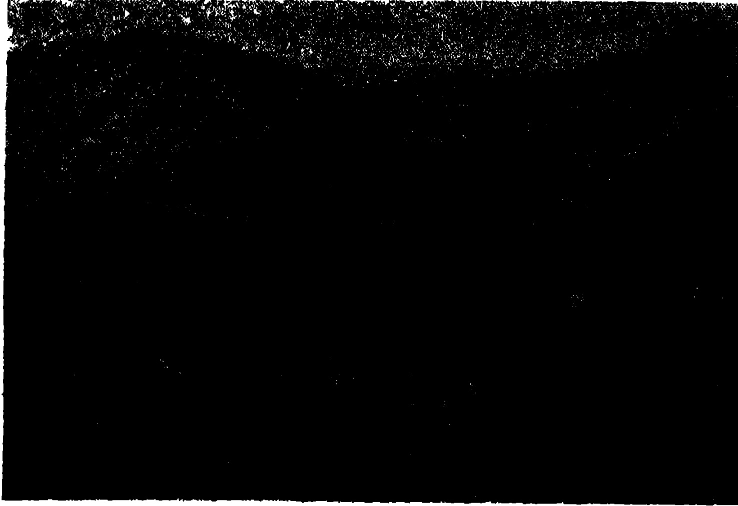
ইয়াকের দুগ্ধ দোহন করিতেছে

প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহার চিত্র দেওয়া হইল। চিত্রে দেখ, কিরূপভাবে কিরঘিজ শিল্পীরা পশম হইতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেছে। বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইলে ইহারা তাহা গোল করিয়া সাজাইয়া রাখিয়া দেয়।

দলে দলে আসিয়া নিকটে দাঁড়ায়।

কিরঘিজেরা ইয়াকের পিঠে চড়িয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। কিরঘিজ স্ত্রীলোকেরা যেমন শ্রমপটু, তেমনি গৃহকার্য্যেও সুনিপুণা। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সমানভাবে শ্রমপ্রিয়। ভেড়া চরান, ইহার প্রতিপালন, দুগ্ধদোহন, রান্না-বান্না, পরিবার বস্ত্র প্রস্তুত করা, কার্পেট বোনা—এ সমুদয় কার্য্যই করিঘিজ রমণীরা অত্যন্ত যত্নের সহিত সম্পন্ন করে।

এই বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া যাতায়াতের নিমিত্ত এখনও উট প্রধান বাহন। উট, টাটুঘোড়া এবং



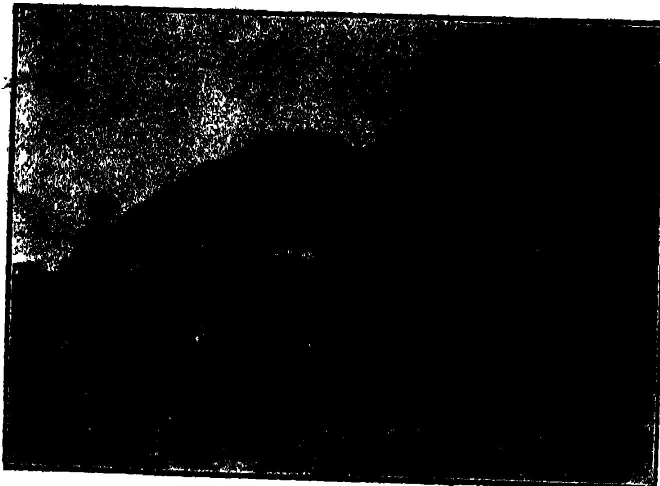
পশুচারণ ভূমির কিরঘিজ যাযাবর সম্প্রদায়

তোমরা মনে করিও না যে, ইহাদের মধ্যে খেলাধূলা বা আমোদপ্রমোদ বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু তাহা নহে—কিরঘিজেরা একরূপ খেলা করে, তাহার নাম "বৌসুকাশহিয়া!" ইহা একপ্রকার পার্ব্বত্য পোলো খেলা। একটা ভেড়ার মাথার খুলি হইতেছে ইহাদের খেলার বল। যে পক্ষ বলটি লইয়া যাইতে পারে, সেই পক্ষই হয় বিজয়ী।

কিরঘিজদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বিদেশী পর্য্যটকদের দেখিলে



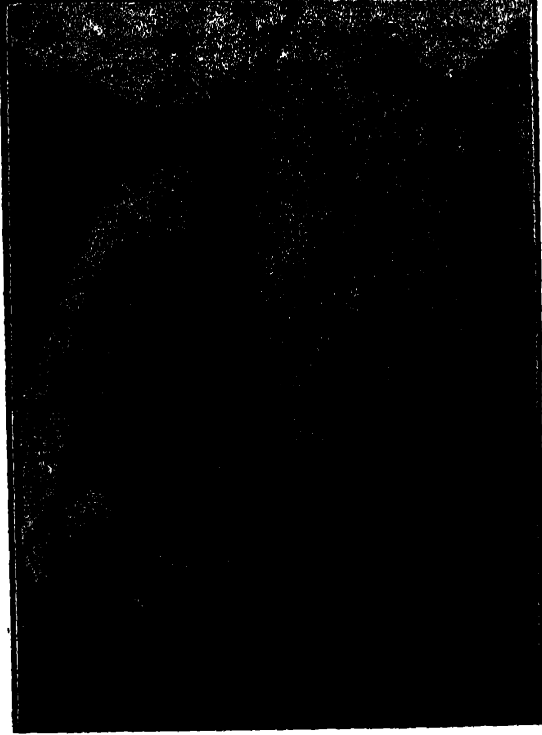
বোশকাস্‌হিয়া খেলা



ইয়াকের লোম সংগ্রহ

ইয়াকের পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্যাদি চাপাইয়া কিরঘিজ বণিগদল যাতায়াত করে। পামিরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে 'বুলুন্‌কুল্' নামে একটি হ্রদ আছে। এই হ্রদের তীরে তীরে পথ আছে। সেই পথে কিরঘিজেরা এশিয়ার নানাদেশে চলাফিরা করে। এই পথে হ্রদ, নদী এই সকলও অনেক পড়ে। বরফ-গলা নদীর মধ্য দিয়া উটের সারি সহজ গতিতে চলিয়া যায়। এই সকল উট রোমশ ও বলিষ্ঠ। ইহারা পামিরের সব চেয়ে বড় ও বরফ-গলা জলে পরিপূর্ণ গিজ নদী অনায়াসে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পার

হইয়া যায়। গিজ্ নদীর দুই দিকের দৃশ্যে বেশ বৈচিত্র্য আছে। নদীর দুইদিকে গৈরিক বর্ণের পর্ব্বতশ্রেণী। এই গৈরিক পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া



ইয়াকের লেজ

গিজ্ নদী অতি বেগে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এই সব পাহাড়ের গায়ে বানরও আছে অনেক।



বস্ত্র নির্ম্মাণের পরিসমাপ্তি

তারপর, ভোড়ার পাল, ইয়াক্, গরু ইত্যাদি নির্ভীক-ভাবে উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গেও চরিতে দেখা যায়।

পামিরে তেমন কোন বড় সহর নাই। আছে শুধু দুই চারিটি সমৃদ্ধ পল্লী, তাহাই নগর নামে পরিচিত। এইরূপ একটি সহরের কথা বলিতেছি। তাহার নাম হইতেছে তকুজাক্ (Tokuzak)। এখানকার বাজারটি বেশ বড়। তুর্কীস্থানের অনেক সহর হইতেই এই বাজারে পণ্যদ্রব্যাদি বিনিময় করিতে ব্যবসায়ীর দল আসে। বোরখা-ঢাকা মেয়েরা গাধার পিঠে চড়িয়া চারিদিকে চলাফিরা করে। যেদিন এখানে হাট বসে, সেদিন তুর্কি, পারসিক, রুশ, এমন কি ইংরাজ এবং ফরাসী ভ্রমণ-



কিরঘিজ শিল্পীরা বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে

কারীদেরও এখানে দেখা যায়। চীনদের ত কথাই নাই। অদ্ভুত কর্ম্মকুশল এবং ব্যবসায়ী এই চীনা বণিগদল কোথায় কোন্ দুর্গম গিরি-শিখরের একটি ছোট গ্রামে কেহ কার্পেট বুনিতেছে বা পশম বিক্রয় করিতেছে—সেখানেও তাহাদিগকে আনাগোনা করিতে দেখা যায়। কাশ্মীরী বণিকেরাও প্রায়ই দলে দলে এদিকে আসে। তাহারা বেশির ভাগ আসে পশম সংগ্রহ করিতে।

তাশমালিক্ও একটি সমৃদ্ধ পল্লী। এই পল্লীগ্রামটির চারিদিক বেড়িয়া মাটির দেওয়াল রহিয়াছে। মাটির এই প্রাচীরও বেশ উঁচু। প্রাচীরের চারিদিক্ বেড়িয়া কাঁটা বন। কাঁটা বন এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে, তাহা ভেদ করিয়া সেখানে দেওয়ালের কাছে যাওয়া অসম্ভব। এখানে অনেক সমতল শস্যক্ষেত্রও রহিয়াছে। সেই সব শস্যক্ষেত্রে তুলা,



কিরঘিজদের ছেলেমেয়ে

মত বটে। চারিদিকে তাহার উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। চারি পাড়ে কোথাও কোথাও দুই একটি পল্লীও রহিয়াছে। গিরিমধ্যস্থ পথ দিয়া যাইতে যাইতে সহসা যখন বুলুনকুল হ্রদের অপরূপ সৌন্দর্য্য পথিকের নয়নসমক্ষে আসিয়া প্রতিভাত হয়, তখন সেই স্বচ্ছ নীলাভ নির্ম্মল জল বুকে তাহার চারিদিকের পর্ব্বতের প্রতিবিম্ব, ছোট ছোট ঢেউয়ের দোলাদুলি, সত্য সত্যই যেন স্বপ্নের ছবি খুলিয়া দেয়। তখন পথিকের চোখে পড়ে—



বরফগলা নদী পার হইতেছে

যব, শণ, ধান এবং তরমুজের চাষ হইয়া থাকে। এই সব পার্ব্বত্য বৃক্ষলতাদির মধ্যে বেল-ই মজনুন্ বা Poplar জাতীয় গাছ এবং উইলো গাছ অনেক। পাহাড়ের নীচে, উপত্যকা প্রদেশে এবং পর্ব্বতের উপরে এ জাতীয় গাছ অসংখ্য। এই সব তরুশ্রেণীর পশ্চাতে নীল গিরি-শ্রেণী, তারও পরে তুষারাবৃত গগনচুম্বী গিরি-শিখরের শোভা বাস্তবিকই অতুলনীয়।

বুলুনকুল হ্রদের সৌন্দর্য্য দেখিবার



কিরঘিজদের ছেলেমেয়ে

চারিদিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা,
স্ফটিক নির্ম্মল স্বচ্ছ, খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিকড় আঁকড়ি, হিম-রেখা
নীলগিরি-শ্রেণী' পরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টি রোধ করি'।

—রবীন্দ্রনাথ

এই পার্ব্বত্য পথেই বনিগ্‌দল মধ্য এশিয়ার দিকে গমন করে। হ্রদের তীরের ছোট ছোট গ্রামে এমন নির্জ্জন প্রদেশে মানুষ কেমন করিয়া

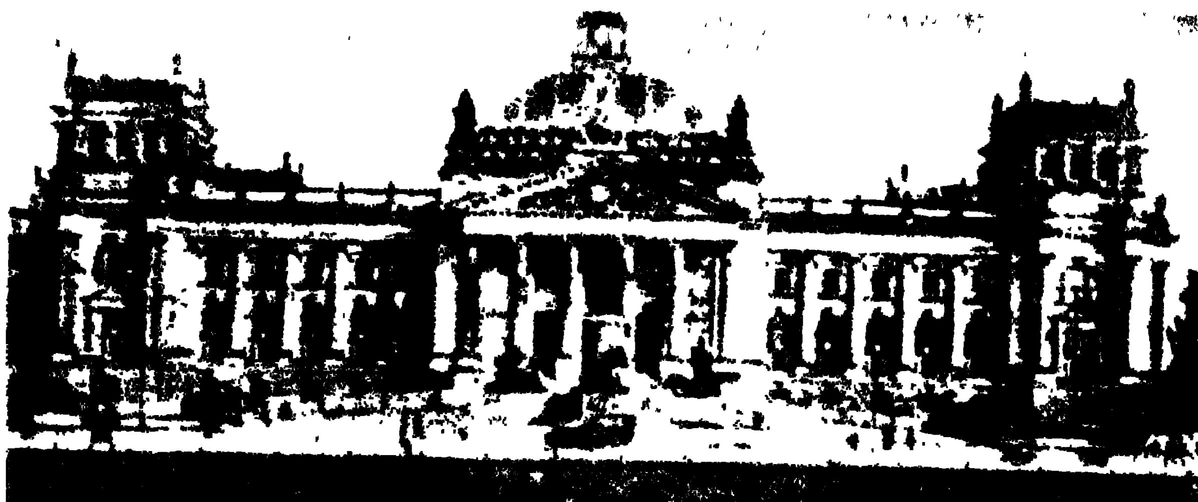
পৃথিবীর রাষ্ট্র-সভা



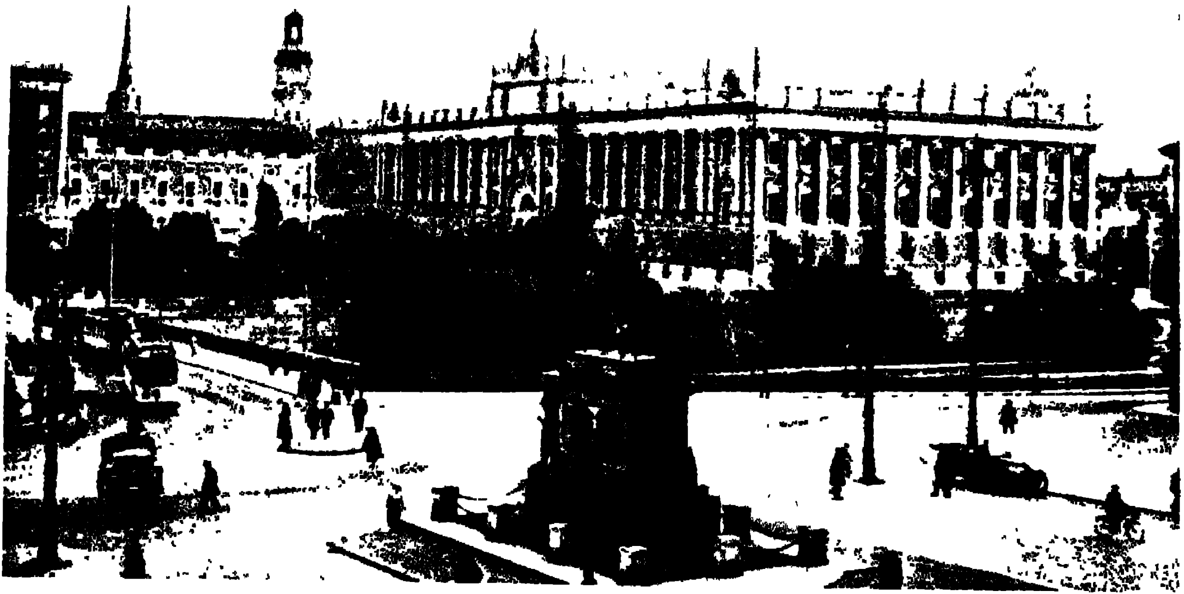
ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট হাউস্—লণ্ডন—পশ্চিম ইউরোপ



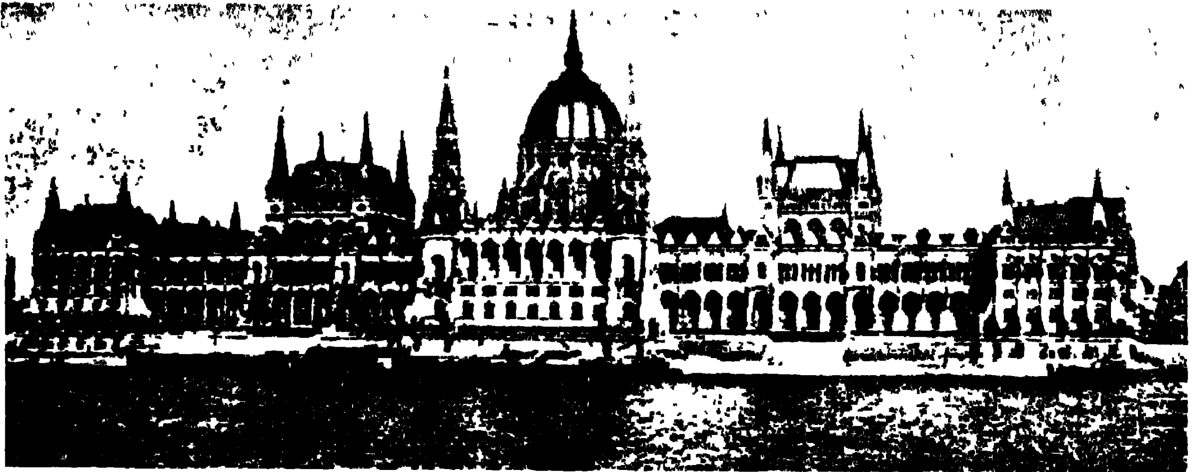
চেম্বার অফ্ ডেপুটিস্—(প্রতিনিধি-মণ্ডল) প্যারী-ফ্রান্স—পশ্চিম ইউরোপ



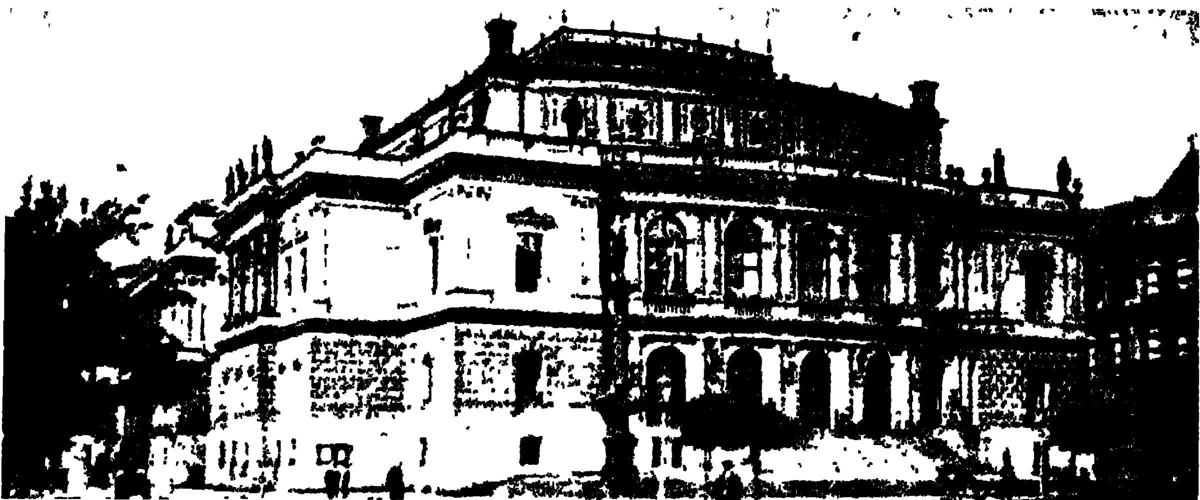
পার্লামেণ্ট—রিশ্‌ষ্টাগ্ বার্লিন—পশ্চিম ইউরোপ



পার্লামেণ্ট হাউস্—ষ্টকহলম্—পশ্চিম ইউরোপ



পার্লামেণ্ট হাউস্—বুডাপেষ্ট—পূর্ব্ব ইউরোপ



পার্লামেণ্ট হাউস্—প্রেগ—পূর্ব্ব ইউরোপ

বাস করে তাহা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই কোন্ অজানা যুগ হইতে এমনি ভাবে এই যাত্রা-পথ সুরু হইয়াছে, তাহা ত কেহ বলিতে পারে না।



কিরঘিজ রমণী

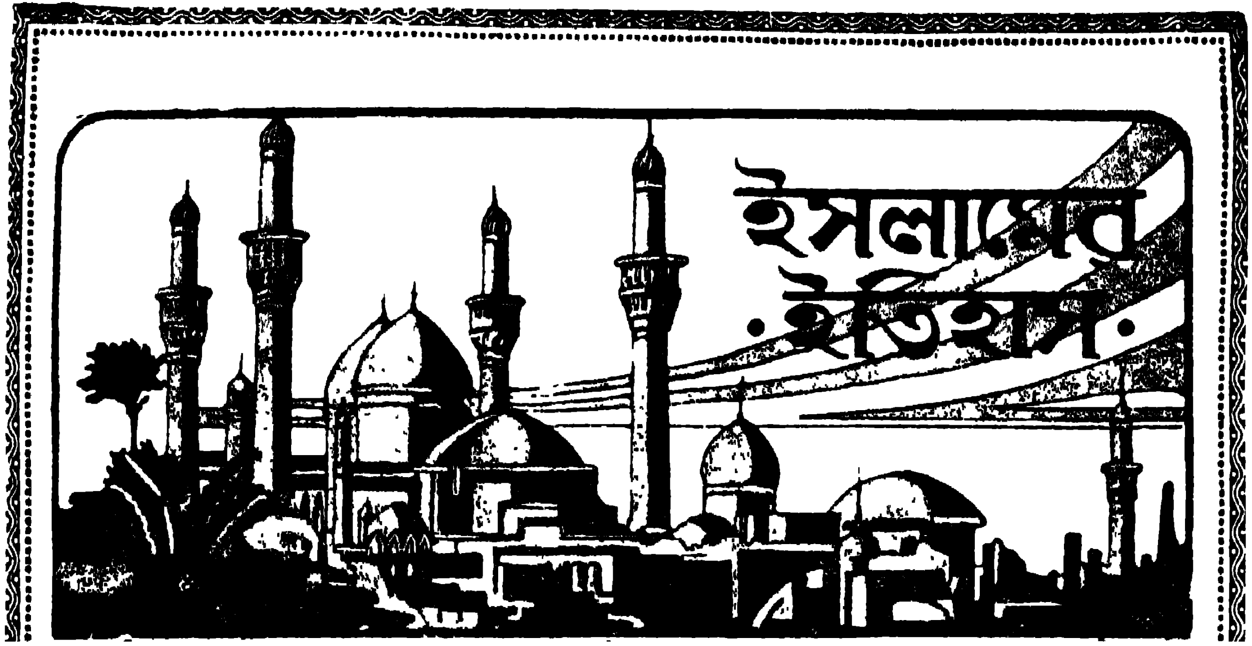
পামির মালভূমির পূর্ব্বদিকে 'তাসকুরঘান্' (Tashkurghan) নামে একটি ছোট দেশ আছে। এই দেশে বৎসরের নয়মাসই দারুণ শীত, তিন মাস মাত্র এখানে বসন্ত বা গ্রীষ্ম কাল। এখানে একজন শাসনকর্ত্তা আছেন, তাঁহাকে বারমাসই এখানে থাকিতে হয়। এখানকার লোকেরা এই দারুণ শীতের দেশে কেমন করিয়া যে বাস করে, তাহা আশ্চর্য্য বটে। দেশের আবহাওয়া তাহাদিগকে সেই দেশে বাস করিবার উপযুক্ত করিয়া দিয়াছে।



বুলুনকুল হ্রদ

পামির অঞ্চলে কিরঘিজ ও হুঞ্জাদের বাস। তা ছাড়াও অনেক জাতীয় লোক আছে, তাহাদের কথা-বার্ত্তা চাল-চলন কিরঘিজ ও হুঞ্জাদের হইতেও স্বতন্ত্র। একটি ভাষার নাম—বুরুশাস্কি (Burushaski)। সে এক বিচিত্র ভাষা।

এই বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবীর নানাস্থানের অধিবাসীদের রীতি-নীতি, ব্যবসায় বাণিজ্য, জীবন-ধারা আলোচনা করিয়া দেখিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। পৃথিবীর বুকে এমন সব দেশ রহিয়াছে—যাহাদের অধিবাসীদের জীবন-কাহিনী আমাদিগের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীদেব মানস-নেত্রের সম্মুখে বৈচিত্র্যের স্বর্ণতোরণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়।

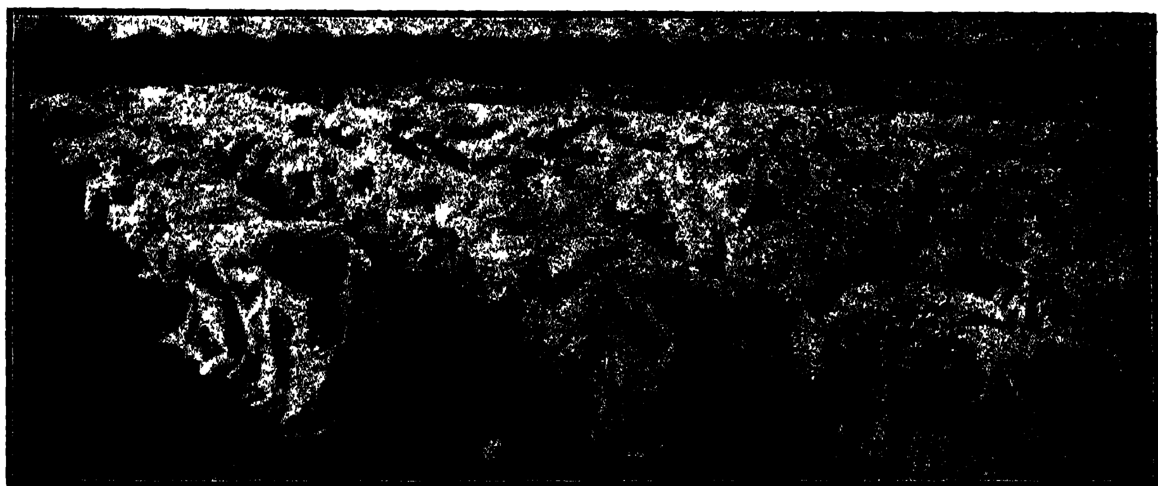


খলিফার ইতিহাস

মহাপুরুষ হজরত মুহম্মদের জীবনী তোমরা পড়িয়াছ (শিশু-ভারতী, ৭১১ পৃষ্ঠা)। তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলে পর যাঁহারা একে একে ইস্‌লামের পরিচালনভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের উপাধি ছিল খলিফা। **ইস্‌লাম** শব্দের অর্থ মুসলমান ধর্ম্ম (Muhammadanism)। এই প্রাচীন আরবী পদটির অর্থ হইতেছে—খোদার পরম সত্তার নিকট আত্মসমর্পণ। ইংরাজীতে Resignation to the Divine will বলিয়া অনুবাদ করা হইয়া থাকে। হজরত মুহম্মদ যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে—আল্লাহর একত্ব। আর এই **খলিফা** আরবী শব্দের অর্থ নায়ক বা পরিচালক; তোমরা ইংরাজীতে যাহাকে বল 'Commander.' অনেকে উত্তরাধিকারী এইরূপ অনুবাদও করেন, অর্থাৎ যাঁহারা এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহারা মুহম্মদের উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য। 'কমাণ্ডার' যেমন সৈন্য চালনা করেন, ইস্‌লামের খলিফাও তেমনি ইমানদার মুসলমানগণকে পরিচালনা করেন। এই খলিফা শব্দ হইতে বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, ইস্‌লামের ভিতর একটু সামরিক ভাব আছে। তোমরা এ বিষয়ে একটু ভাবিয়া দেখিলেই এবং একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, মুসলমানগণ যখন নমাজ পড়েন, যখন তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া একসঙ্গে দাঁড়ান, তখন এক শ্রেণীর পশ্চাতে আর এক শ্রেণী; তার পশ্চাতে এক শ্রেণী, তারপর আবার এক শ্রেণী, এমনি করিয়া দাঁড়াইয়া নমাজ পড়েন। তারপর প্রথমে যখন ইমাম নমাজের পবিত্র বাণী উচ্চারণ করেন, তখন সকলে তাঁহাকে অনুসরণ করেন। ইমাম কানে হাত দেন; উপাসনারত মুসলমানেরাও কানে হাত দেন, ইমাম জানুতে হাত দেন, উপাসনারত মুসলমানগণও জানুতে হাত দেন; ইমাম নতজানু হইয়া বসেন, মুসলমানগণও নতজানু হইয়া বসেন। সৈন্যাধ্যক্ষের নির্দেশক্রমে যেমন সৈন্যগণ উঠে, বসে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, মুসলমানগণও তেমনি তাঁহাদের পরিচালকের আদেশে উঠেন, বসেন। তাঁহাদের সকল প্রকার জীবনধারার ভিতরে একটা সামরিক সঙ্ঘবদ্ধ ভাব রহিয়াছে। সেই 'পরিচালক' অর্থে খলিফাদিগকে বুঝিতে হইবে। খলিফারা একাধারে ধর্ম্মোপদেষ্টা ও রাজা ছিলেন। কারণ, সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায় ইঁহাদিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিত এবং সমস্ত মুসলমান-রাজ্য ইঁহাদিগের শাসনাধীন ছিল।

হজরত মুহম্মদের জীবিতকালে তিনি নিজেই বিশ্বাসীদের পরিচালনা করিয়াছিলেন। দুর্দ্দান্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবজাতিকে সংযত করিবার ভিতর মহাপুরুষ মুহম্মদের অসাধারণ মহত্ত্ব, প্রীতি ও ভালবাসা ছিল।







প্রার্থনারত মুসলমানদল

খলিফা আবুবকর (৬৩২—৬৩৪ খৃষ্টাব্দ)

হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ, শ্বশুর ও শিষ্য বৃদ্ধ আবুবকর খলিফা হইয়াছিলেন। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর যথার্থভাবে ইস্‌লামের আদর্শ অনুসারে যে চারিজন খলিফা রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইস্‌লামের স্তম্ভস্বরূপ। এই চারি জনের নাম যথাক্রমে **আবুবকর, ওমর, ওস্‌মান** ও **আলী**। ইঁহারা ছিলেন হজরত মুহম্মদের প্রিয় শিষ্য। আবুবকরের বয়স আশী বৎসর উত্তীর্ণ হইলেও প্রেরিত মহাপুরুষের মহাবাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি ইস্‌লামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মহানুভব আবুবকর মক্কাবাসী সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে মহাপুরুষ মুহম্মদ প্রবর্ত্তিত ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম আবদোল্লা, কিন্তু আবুবকর নামেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। সিদ্দিক, সত্যবাদী তাঁহার উপাধি ছিল। জ্ঞানে ও ধর্ম্মে সুপণ্ডিত এবং বয়সে প্রবীণ বলিয়া, মক্কাবাসী সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। হজরত মুহম্মদের প্রিয়তমা পত্নী খদিজা বিবির পরলোক গমনের পর তিনি আবুবকরের কন্যা আয়েসা বিবিকে বিবাহ করেন। সম্পর্কে প্রেরিত মহাপুরুষের শ্বশুর হইলেও তিনি উক্ত মহাপুরুষকে সম্মান ও ভক্তি করিতেন। আবুবকর খলিফা মনোনীত হইবার পর উপস্থিত মোস্লেম নেতৃবৃন্দ ও জনগণকে সম্বোধন করিয়া যে কথা কয়টি বলিয়াছিলেন তাহা অতি সুন্দর এবং তাঁহার মহৎ হৃদয়ের পরিচায়ক। তিনি বলিয়াছিলেন— "আমি আপনাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নহি, প্রত্যেকটি কার্য্যে আমি আপনাদের আদেশ ও সাহায্য গ্রহণ করিব। আমার দোষ গুণ ক্ষমা করিয়া আমার প্রত্যেকটি কার্য্যে আপনারা সহায় হউন, ইহাই আমি চাই। আমার চক্ষে কি ধনী, কি নির্ধন, কি সবল, কি দুর্ব্বল, সকলেই তুল্য ব্যবহার লাভ করিবেন। আমি প্রেরিত মহাপুরুষের প্রদর্শিত পন্থানুসরণ করিয়া ইস্‌লামের অনুগত ভৃত্যরূপে কার্য্য করিব।

মহাত্মা আবুবকর প্রথম খলিফা পদে বৃত হইয়া যে বাণী প্রচার করেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। আবুবকরের নেতৃত্বকালে সেনাপতি ওস্‌মান ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়া জয় করেন।

আবুবকরের নেতৃত্বকালে কতিপয় প্রধান প্রধান নগর ও প্রদেশ ইস্‌লাম রাজ্যভুক্ত হয় এবং সহস্র সহস্র লোক ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

আবুবকর মাত্র দুই বৎসর [৬৩২-৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ] ইস্‌লামের খলিফা ছিলেন। তাঁহার সময়ে হজরত মুহম্মদের নির্দিষ্ট সিরিয়া অভিযান সম্পন্ন হয় এবং পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হিরা প্রদেশ বিজিত হয়।

৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট তারিখে এই মহানুভব ব্যক্তির মৃত্যু হয়। হজরত মুহম্মদের সমাধির পাশে তাঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছিল। এক সময়ে তিনি মক্কার একজন প্রধান ধনী বণিক্ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক এবং চরিত্রবান্ লোক সেকালে অতি বিরল ছিল।

ইস্‌লামের প্রচার ও যুদ্ধবিগ্রহাদিতে আবুবকর মহাপুরুষ মুহম্মদের ছায়ার ন্যায় নিয়ত সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। তিনি হজরত মুহম্মদের প্রতি একান্ত বিশ্বাসী ও ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি তাঁহার জন্য নিজ প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না।

আবুবকর ওমরকে খলিফা মনোনীত করেন। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, দূরদর্শিতায় ইস্‌লামের বীরগণের মধ্যে ওমর বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান ছিলেন।

খলিফা ওমর (৬৩৪—৬৪৪ খ্রী)

মহানুভব আবুবকর যখন তাঁহার মৃত্যুর পর ওমরকে খলিফার পদে বরণ করিতে চাহিলেন, তখন ওমর বিনীতভাবে বলিলেন—"আমার উপর এই গুরুতর কার্য্যভার দিবেন না, আমি খলিফা হইতে চাহি না।" আবুবকর বলিলেন—"তুমি গুরুভার কাঁধে লইতে না চাহিলে কি হইবে, গুরুভার যে আপনা হইতেই তোমার কাঁধে আসিতে চায়।" আলী, আয়েসা বিবি প্রভৃতি সকলেই আবুবকরের এই মনোনয়ন সমর্থন করিলেন। খলিফা ওমরের প্রভাবেই ইস্‌লাম ধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্র এত বড় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছে। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ, স্বার্থত্যাগী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও প্রজাহিতৈষী ব্যক্তি পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনেকের মত এই যে, খলিফা আবুবকরের মৃত্যুর পর ওমর যদি খলিফার পদে বৃত না হইতেন, তাহা হইলে ইস্‌লামের এত বিস্তার হইত কি না সন্দেহ। তাঁহার সময়েই আরববাসীরা পারস্য, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশ জয় করে এবং ঐ সকল দেশে ইস্‌লামের প্রচার হয়।

খলিফা ওমর নব-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা স্থাপনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ওমর যে সকল দেশ জয় করেন, সেই সকল দেশের কৃষি-কার্য্যের জন্য বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ভূমধ্যসাগর হইতে লোহিত সাগর পর্য্যন্ত একটি খালের সংস্কার করিয়া দিয়া মিশর দেশের কৃষির উন্নতি করিয়াছিলেন।

খলিফা ওমর এইরূপ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াও নিজে অতি সাধারণভাবে বাস করিতেন। ঐশ্বর্য্যের কোন আড়ম্বর তাঁহার ছিল না। প্রজাদের সুখ ও শান্তি তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

প্রজাদের অবস্থা নিজের চক্ষে দেখিবার জন্য তিনি অনেক সময় ছদ্মবেশে বাহির হইতেন। একবার তিনি এইরূপভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে মদিনা ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গেলেন এবং একটি গ্রামে একটি বৃদ্ধার কুটীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন, বৃদ্ধার দুঃখের সীমা নাই,—তাহার পরিবার কাপড় ছিন্ন, দেহ শীর্ণ এবং থাকিবার কুটীরও অত্যন্ত জীর্ণ। ওমর সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন,—"বাছা! তোমার এত কষ্ট, তুমি তোমার এই দুঃখের কথা খলিফাকে জানাও না কেন?" বৃদ্ধা কহিল—"তাহাকে জানাইলে কি ফল হইবে? সে রাজা, আপনার সুখে দিন কাটাইতেছে, আমার মত একজন অনাথা বৃদ্ধার কথায় সে কান দিবে কেন?"

খলিফা বলিলেন,—"তুমি মিছামিছি খলিফার দোষ দিতেছ। তিনি অনেক দূরে থাকেন, কাজেই এত বড় রাজ্যের সব প্রজার খবর পাওয়া কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব?" বৃদ্ধা বিরক্ত হইয়া কহিল,—"যদি রাজ্যের সমুদয় প্রজার সংবাদ লইতে না পারিবে, তবে খলিফা হইল কেন?"

বৃদ্ধার মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি সবিশেষ অনুতপ্ত হইলেন এবং রাজধানীতে ফিরিয়াই ঐ বৃদ্ধার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আর একটি গল্প শোন। সে সময়ে মদিনার অল্প দূরে সারার নামক স্থানে এক দুঃখিনী বিধবা বাস করিত। সে তিনটি শিশু লইয়া অতিকষ্টে—কখনও দাসীগিরি করিয়া, কখনও ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইত। একদিন অপরাহ্নকালে বেড়াইতে বেড়াইতে খলিফা ওমর ঐ বিধবার বাড়ীতে যাইয়া দেখিলেন যে, সে একটা হাঁড়িতে কি যেন জ্বাল দিতেছে এবং তাহার সন্তানগুলি বিষণ্ণ বদনে উহার চারিদিকে বসিয়া আছে। ওমর কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তুমি কি রাঁধিতেছ, আর তোমার ছেলেরাই বা কেন একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে?" বিধবা কহিল "মহাশয় আজ কোন কাজ পাই নাই, ভিক্ষাও মিলে নাই। বাছারা সারাদিন না খাইয়া রহিয়াছে। আমি বাড়ীতে ফিরিলে, ইহারা 'কি খাব, কি খাব' বলিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল; তাই যতক্ষণ পারি, ইহাদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য হাঁড়িতে শুধু জল পুরিয়া জ্বাল দিতেছি, বলিয়াছি, রান্না নামিলেই খাইতে পাইবি। কিন্তু ইহার পরে যে বাছাদিগকে কি বলিয়া ভুলাইয়া রাখিব, তাহাই ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছি না।"

বিধবার কথা শুনিয়া খলিফা তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে তাড়াতাড়ি মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং ভাণ্ডার হইতে আটা, চিনি, খেজুর প্রভৃতি খাদ্য লইয়া একটি থলিতে পুরিলেন এবং উহা নিজের স্কন্ধে লইয়া বিধবার কুটীরের দিকে চলিলেন। ভৃত্যেরা তাঁহার এই ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং সকলেই ঐ থলিটি বহন করিয়া লইবার জন্য আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। কিন্তু ওমর কহিলেন—"আমি নিজে যে অন্যায় করিয়াছি, সেই অন্যায়ের প্রতি-বিধান আমি নিজেই করিব। তোমরা পরলোকে কেহ কি আমার দুষ্কৃতির ভার বহন করিবার সাথী হইবে?"

একদিন অন্ধকার রাত্রিতে ওমর একাকী মদিনার পথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ একজন লোকের পায়ের উপর পা দিয়া আঘাত করিলেন। সেই লোকটি আঘাত পাইয়া কহিল—"তুমি কি অন্ধ নাকি হে?" ওমর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন,—"মহাশয়! আমি অন্ধকারে দেখিতে না পাইয়া আপনার পা মাড়াইয়া দিয়াছি।" লোকটি খলিফার স্বর শুনিয়াই চিনিতে পারিয়া কহিল—"মহাশয়, আমি অন্যায় করিয়াছি, ক্ষমা করুন।" ওমর তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"না না বন্ধু; তোমার কোন দোষ হয় নাই, সম্পূর্ণ অপরাধ আমার।"

আর একবার ওমর সিরিয়া দেশে যাইতেছিলেন, সঙ্গে ছিল একটি উট ও একজন মাত্র ভৃত্য। সামান্য যব মাত্র লইয়াছিলেন খাদ্যদ্রব্য হিসাবে। পথ চলিবার সময় খলিফা ও তাঁহার ভৃত্য পালাক্রমে উটের উপর চড়িয়া সেই মরুভূমির পথ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।—এমনি ছিল তাঁহার মহত্ব ও উদারতা।

ওমর একবার কোনও প্রদেশে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তাঁহার পরিধানে অতি সাধারণ কাপড়-চোপড় দেখিয়া সেখানকার লোকেরা তাঁহার জন্য একটি উত্তম অশ্ব আনিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত করিয়া মহা সমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া চলিল। খানিক দূর অগ্রসর হইয়া তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িয়া বলিলেন —"দেখ, তোমাদের প্রদত্ত মূল্যবান্ পোষাক আমাকে পীড়ন করিতেছে, আমার মনের মধ্যে গর্ব্বের ভাব উদয় হইতেছে; তোমরা এই পোষাক ফিরাইয়া লইয়া আমার জীর্ণ পোষাক দেও— তোমরা ত শুনিয়াছ যে, প্রেরিত মহাপুরুষ বলিতেন, যাহার মনে অহঙ্কার আছে, তাহার পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব।"

এই গল্প কয়টি পড়িয়াই বুঝিতে পারিতেছ যে, খলিফা ওমর কত বড় মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন।

খলিফা ওমরই সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধের বন্দীদিগকে ও ক্রীতদাসদিগকে মুক্তি দেওয়ার বিধি প্রচার করেন। সেকালে রোমকদিগের মধ্যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য পুত্র-কন্যা বিক্রয়ের বিধান ছিল, এবং ঐ নিন্দনীয় বিধানটি নানাদেশেই প্রচলিত ছিল। ওমর এই দুর্নীতি দমন করেন।

খলিফা ওমর, মিশর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইরাক্, মেসোপটেমিয়া এবং পারস্য জয় করেন। ঐ সকল দেশে ইস্লামধর্ম বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিরাট্ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রায় চোদ্দহাজার মস্জিদ্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। খলিফা ওমরই সর্ব্বপ্রথমে হিজ্‌রি অব্দের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার কাছে সর্ব্বশ্রেণীর প্রজাই তুল্য বিবেচিত হইত। অতি-বড় দরিদ্র ব্যক্তিও খলিফার সহিত দেখা-শুনা করিতে পারিত।

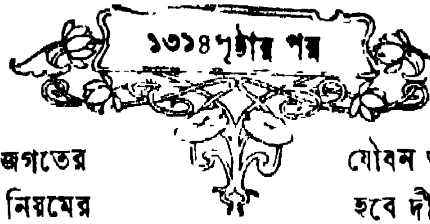
সৈন্যবিভাগের যে শুধু প্রতিষ্ঠা করিয়াই খলিফা ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে; উক্ত বিভাগের সুপরিচালনার জন্য তিনি বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। কুফা, বসরা, জর্দ্দন ও প্যালেষ্টাইনের জন্য স্বতন্ত্র সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল। অন্যান্য প্রদেশে প্রয়োজনানুসারে নূতন সৈনিকদল গঠন করা হইত। আবুবকরের সময় কেবলমাত্র মুস্লিমেরাই সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন। দূরদর্শী ওমর সর্ব্বশ্রেণীর লোক হইতেই সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। খলিফা ওমরই প্রথমে ইস্লাম-ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া একটা বিরাট্ জাতিতে উন্নীত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বহুধা-বিভক্ত আরবজাতিকে ধর্ম্মের বন্ধনে একত্রীভূত করিয়া আরবদেশকে মুসলমানের দেশরূপে পরিবর্ত্তিত করেন।

খলিফা ওমর রাজস্বের কোন অংশ নিজের জন্য ব্যয় করেন নাই। ধনী, দরিদ্রকে দান করে, তাহাই তিনি চাহিতেন। নিজে রাত্রিতে ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করিয়া যে দীন-দুঃখীর দুঃখ-কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করিতেন, সেকথা তোমাদের বলিয়াছি। তিনি রাজ্য মধ্যে অনেক চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দীন-দুঃখীর চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেন। একান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার ন্যায় এক-জন, বিচক্ষণ, ধর্ম্মপ্রাণ এবং সদাশয় মহাত্মাকেও গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এক দুর্দ্দান্ত পারস্যদেশীয় ক্রীতদাস, ওমর যখন মস্জিদে উপাসনা করিতেছিলেন, সে সময়ে সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে তাঁহাকে অস্ত্রের আঘাত করে। সেই আঘাতের ফলেই ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা মনোনয়ন না করিয়া, ওমর ছয়জন প্রধান ব্যক্তির হস্তে খলিফা নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করেন। ইহাতে খলিফা নির্ব্বাচনের ভিতরে একটা দলাদলির সূত্রপাত হয়। ওমিয়া বংশ মদিনাতে একটা দল সৃষ্টি করে। মক্কার ওমিয়াবংশ চিরকাল হজরত মুহম্মদের হাসেমী বংশের শত্রু ছিল। মক্কা বিজয়ের পূর্ব্বে ওমিয়াগণ প্রেরিত মহাপুরুষকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। এবারও ওমিয়াবংশ সুযোগ পাইয়া হাসেমী বংশের উপর শত্রুতা সাধন করিতে চেষ্টা করিল। সর্ব্ববাদিসম্মত মহত্ত্ব সত্ত্বেও বংশানুক্রমিক শত্রুতাবশতঃ মহাত্মা আলীকে নির্ব্বাচিত না করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বংশের বৃদ্ধ ওসমান্‌কে খলিফা নির্ব্বাচিত করিলেন। এই নির্ব্বাচন উপলক্ষ্য করিয়া খিলাফতে এমন তীব্র বিবাদের সূত্রপাত হয় যে, সেই কলহ প্রায় একশত বৎসর কাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ৬৪৪খ্রীষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে ওসমান্ খলিফার পদে নিযুক্ত হইলেন।



দৈহিক গতির কথা



দৈহিক উৎকর্ষ আর খেলার কথা তোমাদের আগেই কিছু বলেছি। ও দুটো বিষয়ে তোমাদের এখন যা ধারণা, তা দিয়ে মনে করতে পার যে, জগতের সব মানুষ, স্ত্রী-পুরুষ, একই দৈহিক নিয়মের অধীন, তাতে বর্ণবিভেদ, জাতিবিভেদ বা স্ত্রী-পুরুষের কোন বিভেদ নেই। সে রকম মনে করা যে কত ভুল, আমি পরে সে-কথার আলোচনা করিব। এখন কেবল এইটুকু জেনে রাখ যে, মানুষের অন্যান্য পরিবেষ্টন, যেমন যে-দেশে সে জন্মেছে সেই দেশের জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি ইত্যাদি ছাড়া দৈহিক উৎকর্ষ আবার সভ্যতার বিশেষ শাসনাধীন। আদিম বা বন্য মানুষের এবং সভ্য মানুষের দেহ উৎকর্ষে এক হয় না। দেহের এমন অংশ, দৈহিক এমন প্রক্রিয়া আছে—যার চরমোৎকর্ষ দেখা যায় সভ্য মানুষে; অসভ্যের দেহে থাকে মাত্র তার ভিত্তি। নিকোবার দ্বীপের একজন লোক আর তুমি হাত, পা, নাক, মুখ থাকার কারণে এক মানবজাতীয় হতে পার, কিন্তু সভ্যতার তারতম্যে তোমার ও তার দেহ একদম আলাদা। কারণ, তুমি গড়ে উঠছ সভ্যতার সংস্কারের ভিতর; কাজেই, তোমার দৈহিক পরিণতি হবে দেরীতে এবং তোমার দৈহিক যৌবন থাকবে দীর্ঘতর কাল। ঐ নিকোবার দ্বীপের লোকটির দৈহিক পরিণতি হবে তোমার চেয়ে অনেক আগে, যৌবন থাকবে অল্প দিন! ও যখন বুড়ো হতে আরম্ভ করবে, তোমার যৌবন তখন পূর্ণ। ও হবে অল্পায়ু, তোমার হবে দীর্ঘতর আয়ু।

স্ত্রী ও পুরুষ হিসাবে দৈহিক উৎকর্ষের অর্থাৎ দেহ গড়ে ওঠার পার্থক্যও বড় কম কথা নয়; মেয়েদের দেহ-মন যত তাড়াতাড়ি পরিণতি লাভ করে, পুরুষের তা করে না এবং মেয়েদের যৌবন অর্থাৎ পরিণত অবস্থা যতটা দীর্ঘকালব্যাপী হয় পুরুষের তা হয় না। মেয়েদের জীবনী-শক্তি, সহনশীলতা প্রভৃতি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি।

উপরি উক্ত কথাগুলি বলবার কারণ এই যে, আমাদের এখানকার আলোচ্য বিষয়, শারীরিক গতির সঙ্গে সে-কথাগুলির নিকট সম্পর্ক আছে। গতি আমাদের দেহের প্রধান ধর্ম্ম, মাংসপেশীর গঠন, অস্থির সন্ধিস্থলগুলি, অনুভূতিক ও সঞ্চালক স্নায়ুজাল আমাদের ঐ বিশেষ দৈহিক ধর্ম্মের পরিচায়ক। যদি স্ত্রী ও পুরুষে বিভেদ না থাকত, গতির বিষয়ে কোন বর্ণনা করা আমাদের দরকার হত না। ঐ বিভেদ আছে বলেই মানুষের গতি সরল না হয়ে হয়েছে জটিল, সে-কথা তোমাদের বিশেষভাবে জানা উচিত।

তুমি তোমার বোনের সঙ্গে খেলা করছ, বাড়ীর অন্যান্য মহিলাদের উঠ্‌তে, বস্‌তে, জোরে বা আস্তে চলতে, নানা রকম গতির কাজ করতে দেখছ। তোমার বোনের ও তোমার চলাফেরা, দৌড়ধাপে কোন পার্থক্য তুমি দেখছ না, কারণ তোমার বোন হয়ত বয়সে সেই রকম ছোট, যখন গতির কোন স্ত্রী-পুরুষ বিভেদ থাকে না। কিন্তু মহিলাদের দেখে হয় ত আশ্চর্য্য হও যে, তাঁরা তোমার অথবা তোমার বাবা, দাদা প্রভৃতির মত কেন দেহ সঞ্চালন করেন না। এইবার ব্যাপারগুলো তোমরা বোঝ।

স্নায়ু প্রকরণের ক্রিয়া দুটি—আনুভূতিক ও সঞ্চালক। প্রথমটির স্ত্রীপুরুষ ভেদে কোন তারতম্য আছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও সঞ্চালক ক্রিয়ার বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিছু নিম্ন-স্তরের জাতি ছাড়া সকল জাতির স্ত্রীলোকেই পুরুষের তুলনায় সঞ্চালক শক্তিতে দুর্ব্বলতা দেখায় এবং পুরুষের মত এই শক্তির ব্যবহারে আনন্দ পায় না। সভ্যজাতিদের মধ্যে এই প্রভেদ অত্যন্ত পরিস্ফুট। পুরুষের তুলনায় কোন স্ত্রীলোকেরই এক নৃত্য ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে পৈশিক শক্তি প্রকাশের আকর্ষণ নেই।

বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, যখন বালিকারা বালকদের চেয়ে সকল বিষয়ে অগ্রসর, বালিকাদের প্রাণশক্তি ও পৈশিক শক্তি বালকদের চেয়ে কম থাকে। পণ্ডিতেরা উদাহরণ স্বরূপ বলেন যে, স্ত্রীলোকের হাতের শক্তি পুরুষের হাতের শক্তির চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ কম। বালকেরা বালিকাদের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ বেশি ভার বহন করিতে পারে। পুরুষ যেখানে নিজের দৈহিক ওজনের দ্বিগুণ বোঝা বহন করিতে সমর্থ, স্ত্রীলোক সেই স্থলে নিজের ওজনের অর্দ্ধেক ভার বহন করতে পারে।

পণ্ডিতেরা পুরুষ ও রমণীর দেহের নানা অংশের শক্তির বিশ্লেষণ করেছেন। সার্জেন্টের মতে দুর্ব্বলতম বালকের প্রশ্বাসের পেশীগুলি সাধারণ বালিকার প্রশ্বাসের পেশীর চেয়ে মজবুত। যদিও পিঠ, পা, বুক ও হাতের শক্তিতে বালিকারা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, তবুও শতকরা নব্বই জন বালক শক্তির যে নিরিখ সহজেই অতিক্রম করে শতকরা পঞ্চাশটি বালিকা সেটার নিকটেও পৌঁছতে পারে না।

পৈশিক শক্তি (force) নির্ণয় করতে গিয়ে রিকাডি এই সত্য আবিষ্কার করেছিলেন যে, স্ত্রীলোক পুরুষের তুলনায় শীঘ্রতর শক্তি প্রয়োগের চরম সীমায় উপনীত হয় ও এবিষয়ে তারা পুরুষের দুর্ব্বলতার বাম হস্তের সঙ্গে সমান। এই সত্য কথাটি স্ত্রীলোকের প্রতিক্রিয়ার দুর্ব্বলতা ও তৎপরতা ও তার স্নায়ুপ্রকরণের সঞ্চালক ক্রিয়ার সাধারণ স্বভাবটা প্রকাশ করে।

স্বেচ্ছাকৃত গতির হারে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কিনা, সে বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই হারটি সাধারণতঃ অপরিবর্ত্তনশীল। পুরুষের তুলনায় রমণীর মধ্যে সেটা শ্লথতর। নিয়মিত বা সাধারণ গতি, যাতে বিশেষভাবে কিছু করবার উদ্দেশ্য বা প্রেরণা নাই, সেটা রমণীদের মধ্যে ক্ষিপ্র, কিন্তু গতি যেখানে চরম, সে প্রকার গতি পুরুষের মধ্যে ক্ষিপ্রতররূপে প্রকাশ পায়। দেহের ভিন্ন ভিন্ন গাঁটগুলির গতির তারতম্য বিশ্লেষণ করে এই সত্যটা পাওয়া গেছে যে, বালকেরা ছয় বৎসর থেকে নয় বৎসর বয়সের মধ্যে বালিকাদের চেয়ে অধিকতর গতিশীলতা লাভ করতে আরম্ভ করে এবং চৌদ্দ থেকে ষোল বৎসর বয়সের ভিতর এই পার্থক্য সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এ বিষয়ে উভয়ের কতকটা নৈকট্য সম্বন্ধ কেবল দশ থেকে বারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত থাকে। বারো থেকে তেরো বৎসর বয়সে বালকের গতিবৃদ্ধির হারটি বিলম্বিত হয়, অপরপক্ষে বালিকাদের দ্রুততর হয়ে যায়। দেহের দক্ষিণ ভাগের গতি বালিকাদের চেয়ে বালকদের বেশী, কিন্তু বালিকাদের মধ্যে দক্ষিণ ও বাম, দুই ভাগেরই কতকটা সমতা দেখা যায়। বালিকাদের বারো থেকে তেরো বৎসর বয়সে গতিবৃদ্ধির পরিণাম তেরো থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়সে বাধা পায় ও কম হতে থাকে। বালকদের ১৩।১৪ বৎসর বয়সে বাড়তে থাকে বটে কিন্তু এই সময়ের অব্যবহিত পরে, অর্থাৎ ১৪।১৫ বৎসর বয়সে বাধা পায়। বালকদের তুলনায় বালিকাদের গতির অবনতি বা উন্নতি চরম এবং গতি পূর্ণভাবে লাভ করার ব্যাপারটা শ্লথতর হয়ে থাকে। সুতরাং তেরো বৎসরের বালিকা সমবয়স্ক বালকের চেয়ে ও এ বিষয়ে উন্নতিশালিনী।

গতির সঠিকত্ব (Precision) বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বালকেরা বালিকাদের চেয়ে এ বিষয়ে

। ব্রায়ান নামে এক বিশেষজ্ঞ বলেন যে, ১২।১৩ বৎসরের বালিকা ও ১৩।১৪ বৎসরের বালকের গতিবৃদ্ধির পরিমাণ স্নায়ুকেন্দ্রের সম্প্রসারণের (tension) পরিচায়ক। পরে যে অবনতিটা দেখা যায়, তার কারণ, ঐ বয়সে দেহের নানা পরিবর্ত্তন ও দৈহিক ক্রিয়াগুলির বিক্ষেপজনিত অবসাদ। অপর পক্ষে গতি পূর্ণরূপে লাভ করাটাও এই অবসাদ থেকে মুক্তির পরিচায়ক। পণ্ডিত-প্রবর ডিলনের মতে সঞ্চাল ক্রিয়ায় স্নায়ুকেন্দ্রের অভিমুখে আকর্ষণকারী গতি (centripetal) ও স্নায়ুকেন্দ্র হইতে দূরে গমনশীল গতির (centrifugal) সংঘাতে স্নায়ুকেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে যে গতি, তাহা হীনবল হয়ে পড়লে অল্প অগ্রসর প্রাণী ও ব্যক্তির মধ্যে বেশীর ভাগ ঐরূপ দৈহিক পরিণতির অবনতি দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ জীবদেহের মধ্যে স্নায়ুকেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে এবং স্নায়ুকেন্দ্র হতে দূরে নিয়ে যায় এরূপ যে দুটি গতি আছে, তাদের মধ্যে প্রথমটির শক্তি অধিক হলে দেহের পরিণতি হয় এবং দ্বিতীয়টির শক্তি অধিক হলে দেহের পরিণতি বাধা পেয়ে থাকে। তিনি বনমানুষ, নিম্নস্তরের মানবজাতি, রমণী, শিশু ও নির্বোধ ব্যক্তিদের এই তালিকাভুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে, তাঁর মতে উত্তান ভাব প্রভৃতি স্নায়ু-কেন্দ্র হইতে দূরে গমনশীল গতি উচ্চ স্তরের মানবজাতি, পুরুষ ও অন্যান্য চতুর ব্যক্তিদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। রমণী স্বভাবতঃ স্নায়ুকেন্দ্র অভিমুখে আকর্ষণকারী গতি প্রকাশ করে। বৃত্তাকারে কোন গতি প্রকাশ করতে হলে পুরুষ ঘড়ির কাঁটার গতির মত ডান থেকে বাম দিকে করে, রমণী উল্টা দিকে করে থাকে। কোন স্ত্রীলোককে যদি পুরুষের কোট পরিয়ে বোতাম দিতে বলা যায়, সে বাম হাত দিয়ে স্নায়ুকেন্দ্রের দিকে আকর্ষণকারী ভঙ্গী করে বোতাম দেবে। এই কারণেই স্থানান্তরে যাবার সময়ে সাধারণতঃ রমণীর বাম পদ এবং পুরুষের দক্ষিণ পদ আগেই উঠে থাকে। পুরুষের আক্রমণের সাধারণ ভঙ্গী স্নায়ুকেন্দ্র হতে দূরে গমনশীল ও রমণীর স্বাভাবিক ভঙ্গী স্নায়ুকেন্দ্র অভিমুখে আকর্ষণকারী।

শক্তির ও অঙ্গভঙ্গীর ক্ষিপ্রতা ও যাথার্থ্যের (Precision) বিষয়ে রমণী পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট। আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাও এই কথা বলে। পুরুষের তুলনায় রমণীর রক্তপ্রবাহ ও পেশীতে জলের অংশটা বেশী, অবশ্য এটা অনেক সময় ব্যায়াম ও পরিবেষ্টনে পার্থক্যের কারণে হয়, দেহের গঠনের পার্থক্যের জন্য ও এটা হওয়া সম্ভব। অসভ্য জাতির রমণীদের পৈশিক শক্তির পরীক্ষা করলে জানা যায় যে, সভ্যজাতীয় রমণীদের এই পার্থক্যটা খুব বেশী উচ্চারিত নয়। সার্কাস প্রভৃতিতে রমণীর শক্তির পরিচায়ক খেলা আমরা সাধারণতঃ বেশী দেখতে পাই না; কদাচিৎ দু'একজন এ ধরণের রমণী খেলোয়াড় দেখা গেলে ও তাদের পুরুষদের মত নিপুণতা থাকে না। রমণীদের ব্যায়াম নিপুণ করে তোলা যায় কিনা সন্দেহ, কারণ তারা এত বিশেষ ধরণের ব্যায়ামে কোনকালেই পুরুষের মত নিপুণ হতে পারে না। কোবাল পেশিক ক্রিয়া পুরুষ মানুষকে আকর্ষণ করে, রমণীকে করে না। কারণ, তার বিশ্রাম করবার ও শক্তি সঞ্চয় করবার একটা প্রকৃতিগত ঝোঁক আছে।

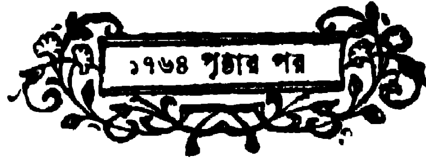
রমণীর চেয়ে পুরুষের সঞ্চালক গতির বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা মানব জীবনে একটা বিশেষ সত্য কথা। পুরুষ ও রমণীর জীবনে যা কিছু প্রধান, সে সকলের ও উভয়ের মনের গঠনের সহিত এই সঞ্চালক ক্রিয়ার প্রগাঢ় সম্বন্ধ আছে।



প্রাচীন ভারতের জনপদ

[ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িবার সময়ে তোমরা নানাদেশের কথা ও সঙ্গে সঙ্গে পড়িতেছ। কিন্তু সেই সব দেশের বিস্তৃত পরিচয় তোমরা জানিতে পার নাই। এখানে তোমরা 'শিশু-ভারতী'তে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পড়িতেছ, তাহা বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে বলিয়া তোমাদের কাছে ভারতের প্রাচীন জনপদসমূহেরও পরিচয় দিতেছি।]

বৈশালী



বৈশালীর নাম তোমাদের পরিচিত। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ ও জৈনদের ইতিহাসে বৈশালী নগরের বেশ প্রাধান্য ছিল। তোমরা যে মহাবীরের কথা পড়িয়াছ, জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বৈশালী নগরীর উপকণ্ঠে কুণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য মহাবীরকে বৈশালীক বলা হইত। মহাবীরের জননীর অপর একটি নাম ছিল বিশালা। মহাবীর বিয়াল্লিশটি বর্ষার মধ্যে অন্যূন দ্বাদশটি বর্ষা এই বৈশালী নগরীতে অতিবাহিত করেন। এই বৈশালীতে বুদ্ধদেবও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এখানকার আম্রপালীর আম্রকুঞ্জে কিংবা মহাবনের কূটাগারশালায় তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়াছিলেন। বৈশালী নগরীর শোভা-সম্পদ্ এবং লিচ্ছবিদের চরিত্র-মাধুর্য্যে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহাদের সহিত তিনি খুব ভাল ব্যবহার করিতেন এবং তাহাদিগকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। বুদ্ধদেব বৈশালীবাসীদের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া মগধের রাজা অজাতশত্রুকে তাহাদের স্বাধীনতায় উপরে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই বিশাল সমৃদ্ধিশালী নগরের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল। এখানকার লোকেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে। এবং এই দেশের লোকেরা বহুবার নতমস্তকে তাঁহার



প্রাচীন বৈশালী

... বৈশ

... তে ভিক্ষাকার্য

... করিতেছিলেন, তখন

... কে বলিয়াছিলেন,—"হে আনন্দ।

তেরিয়া

এই মারে তো সেই মারে,
কিল চড় যে পড়বে কোথায়
পড়বে যে গো কার ঘাড়ে?



তাল ঠুকে যে আগে ছোটে
পিছে হটে আবার সে,
এক দাপটে গগন ফাটে
করে দিলে কাবার যে।

ভিৎ থেকে চূণ পড়ল খসে
পড়ল ধ'সে কড়িকাঠ,
হুজুরের এই হুজুগেতে
দালানেতে ধরল ফাট!

নবাবের এই স্বভাববাগী
দেখে সবাই বদমেজাজ,
দাসী বাঁদী নফর চাকর
জবাব দিলে বরকন্দাজ।



হুঙ্কারে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়
'পি-প্‌' 'কি-সু' সর্দ্দারের,
তাই না দেখে তালমরড়া
পানে খেলে জর্দ্দা কেন।

পল্টু বলে "নবাবেরি
মতন তাহার বাগখানা,
আমরা হলেম গোলাম মানুষ
আমাদের তা নাই জানা॥"

—শ্রীঅসিতকুমার হালদার

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছুটি

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

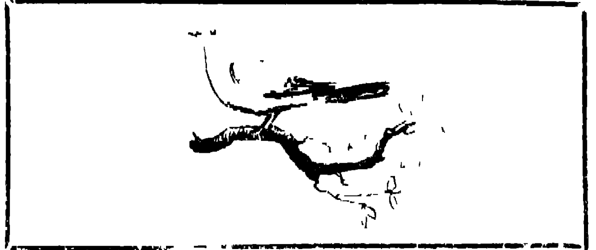


আজকে মাগো এলোমেলো বাতাস কেমন খেলে
কোন কাজই আজ লাগে না ভালো,
দেখ মা ঐ ফুলগুলো সব আরাম করে' হেলে
পিইছে কেমন নীল গগনের আলো।

দেখ মা ঐ দুষ্টু চাঁপা মুখ লুকিয়ে হাসে,
ঝিরঝিরিয়ে ঝরণা বহে অই,
প্রজাপতি গোলাপ ফুলে মধু খেতেই আসে
মধু খেতে উৎসাহ তার কই ?



ভুলো মোদের ঘুমায় রোদে দিব্যি আরাম করে'
মাছিগুলো চারধারে তার বলে,
কাছেই পুষী খুশীর নেশায় ঢুলছে ঘুমের ঘোরে
মুখটি ধোয়ার কথাই গেছে ভুলে।



আলসভরে একটি পাখী বসলো গাছে উড়ে,
পাখাও যেন লাগছে ভারী তার,
ব'সে ব'সে গাইছে পাখী এমন কোমল সুরে
গলাটিও কাঁপছে না তায় তার।



বলছ বটে "কাজে লাগো ওরে অলস ছেলে,"
শুনছ না অই ফড়িং কি কয় কাছে ?
মৃদুল মলয় বাতাস দেখ লঘু পাখায় খেলে
একটি পাতাও নড়ছে না তায় গাছে।

মাগো, ধোঁয়ার পাল মেলে যায় মেঘখানি ঐ দূরে
সাধ করে মা আমিও মেঘ হই,
তোমার মাথার পরে এসে ঘুরব উড়ে উড়ে
তখন আমি ছোঁব কি আর বই ?

শ্রীকালিদাস রায়

আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াছে। বুদ্ধদেব যখন বৈশালীর ভিতর দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ভিক্ষাকার্য্য শেষ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন তিনি আনন্দকে বলিয়াছিলেন,—"হে আনন্দ! তথাগত (বুদ্ধের অপর নাম) এই শেষবার বৈশালী নগর দেখিলেন।" বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের পর, বিলাসী ভিক্ষুগণের চরিত্রালোচনা করিবার জন্য বৈশালীতে সমগ্র বৌদ্ধসম্প্রদায় মিলিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের এইরূপ সম্মেলন, বৌদ্ধদিগের দ্বিতীয় মহাসঙ্গতি বলা হয়।

এই নগরের নাম বৈশালী কেন হইল, সে বিষয়ে অনেক মত প্রচলিত। রামায়ণের মতে ইক্ষ্বাকুর পুত্র 'বিশাল' এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে এই নগরের নাম বৈশালী হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে ইক্ষ্বাকু বংশের তৃণবিন্দুর পুত্র বিশালের নাম হইতে এই নগরের নামকরণ হইয়াছে।

রামায়ণের আদিকাণ্ডে 'বিশালা' নগরীর কথা আছে। রামায়ণে ইহার নাম 'উত্তমাপুরী এবং 'বিশালা' এই দুইই দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই নগরীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনাও রহিয়াছে। এইখানে তাহার সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিলাম। "বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে লইয়া রাক্ষস বধের জন্য যাইতেছিলেন। তখন তাঁহারা গঙ্গার উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য ঋষিদিগকে পূজা করিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন এবং বিশালানগরী দেখিতে পাইলেন। + × রাম জিজ্ঞাসা কহিলেন,—হে মহামুনে। আপনার মঙ্গল হউক। সম্প্রতি বিশালা নগরীতে কোন্ রাজবংশীয় রাজত্ব করিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কুতূহল হইতেছে, সুতরাং আমি ঐ বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাহা বর্ণন করুন। 'তখন বিশ্বামিত্র এই নগরী প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলেন যে,—হে নরব্যাঘ্র! × × ইক্ষ্বাকু নরপতির অলম্বুষা নাম্নী ভার্য্যাতে বিশাল এই নামে বিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক পুত্র হন। তিনি এই স্থানে বিশালা নামে নগরী সন্নিবেশ করেন।'" + + + রামচন্দ্র যখন বিশালা নগরীতে গমন করেন, তখন সেখানে সুমতি নামে দুর্জ্জয় নরপতি রাজত্ব করিতেন। বিশ্বামিত্র এইস্থানের কথা বলিতে গিয়া উল্লেখ করেন যে, মহামতি ইক্ষ্বাকুর কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে বৈশালীর নৃপতিরা সকলেই দীর্ঘজীবী, উন্নতমনা, দৈহিক ও মানসিক বলে বলশালী ও ধার্ম্মিক হইতেন।

চৈনিক পরিব্রাজক ইউান চুয়াং লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন বৈশালী নগর ৬০।৭০ লি (যোজন) বিস্তৃত এবং নগরের প্রাচীরবেষ্টিত অংশের পরিধি ৪।৫ লি (যোজন)। বুদ্ধদেবের সময়ে বৈশালী নগরকে বেষ্টন করিয়া পর পর তিনটী প্রাচীর ছিল। উহাদের প্রত্যেকের মধ্যে ব্যবধান ছিল এক গাবুত * মাত্র এবং তিনস্থানে গোপুর-যুক্ত তিনটী তোরণদ্বার ও বাসভবনাদি ছিল। তিব্বতীয় পুস্তকে লিখিত আছে যে, বৈশালীতে তিনটী পরগণা আছে। প্রথম পরগণায় স্বর্ণ-মিনারযুক্ত সাতসহস্র গৃহ ছিল, মধ্য পরগণায় রৌপ্য-মিনারযুক্ত চতুর্দ্দশ সহস্র গৃহ ছিল এবং তৃতীয় পরগণায় তাম্র-মিনারযুক্ত একবিংশতি সহস্র গৃহ ছিল।

বৈশালীবাসীরা মহামারীর ভয়ে ভীত হইয়া শান্তির জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিল। মৃত্যুর করাল কবল হইতে অধিবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য লিচ্ছবিরাজ তোমরের অধিনায়কত্বে মগধদেশের রাজধানী রাজগৃহে যাইয়া নগরবাসীরা বুদ্ধদেবের শরণ লয়। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাহারা তথাগতের সাহায্য প্রার্থনা করে। রাজা বিম্বিসারের অনুমতি লইতে আদেশপ্রাপ্ত হইয়া তোমর মগধরাজের নিকট গমন করেন। বিম্বিসার লিচ্ছবিদিগকে মহামারীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য বুদ্ধদেবকে বৈশালীতে যাইতে অনুরোধ করিলে তিনি তথায় যাইতে স্বীকার করেন। বুদ্ধদেব বৈশালী নগরে আসিবেন জানিয়া লিচ্ছবিরা নগরকে অত্যন্ত সুশোভিত করিয়াছিল। বুদ্ধদেব লিচ্ছবিরাজ্যে পদার্পণ করিবামাত্র মহামারী রাজ্য হইতে বিদূরিত হইল।

ভগবান্ বুদ্ধদেব রাজগৃহ হইতে বৈশালীতে আসিয়া ভিক্ষুগণকে অতিরিক্তভাবে সাজ-পোষাকে সজ্জিত দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে উপদেশ দেন, "যত অল্প বস্ত্র পরিধান করিয়া শীত নিবারণ করিতে পারা যায়, তাহা তোমরা করিবে।" তিনি ভিক্ষুদিগকে পরিস্রুত ও পরিশুদ্ধ করিয়া জল পান করিতে আদেশ দেন। কিরূপে আবাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয় সে বিষয়েও তাহাদিগকে তিনি উপদেশ দেন। যখন ভগবান্ বুদ্ধদেব বৈশালীতে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার ধাত্রী মহাপ্রজাপতি গৌতমী কপিলবস্তু হইতে কয়েকজন রমণীসহ আসিয়া রমণীগণকে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী হইবার

এক যোজনের চতুর্থাংশ।

অধিকার দিবার প্রস্তাব বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত করেন এবং ভগবানের শিষ্য আনন্দের সহায়তায় তিনি স্ত্রীলোকদিগের বৌদ্ধধর্ম্মানুসারে ভিক্ষুণীজীবন যাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হন।

বৈশালী নগর সমৃদ্ধিশালী ছিল। ইহা ধন-ধান্যে পূর্ণ ছিল এবং বহু লোক এখানে বাস করিত। আছে।" চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চুয়াং লিখিয়াছেন, "বৈশালী নগরটী খুব উর্ব্বরা, এখানে আম্র, কদলী ও অন্যান্য ফল প্রচুর পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা সৎ এবং সর্ব্বদা সাধু কার্য্যে রত। সকল রকম ধর্ম্মমতকেই ইহারা অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।"



রাজা বিশাল-কা-গড়

আহার-সামগ্রী এখানে প্রচুর পাওয়া যাইত। সুবৃহৎ অট্টালিকা, উচ্চচূড়াবিশিষ্ট গৃহ, আরাম * ও পদ্মপুষ্করিণী অনেক ছিল। এই সুন্দর সহরে নানাজাতির লোক বাস করিত। সহরটী নানা প্রকারে মনোহর গৃহাদিতে পূর্ণ ছিল। এই সহরে দ্বিতল, ত্রিতলযুক্ত বাটী, বহু রাজপ্রাসাদ এবং সুন্দর তোরণ ছিল। এখানে অসংখ্য কানন ও কুঞ্জবনে কুসুমরাজি বিরাজিত হইত।

খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান বৈশালী নগর পরিদর্শন করিতে আসেন। তিনি বলেন, "এই বিশাল নগরের উত্তরদিকে অরণ্য আছে। দুইটী অঙ্গনযুক্ত বিহারে বুদ্ধদেব বাস করিতেন। এখানে আনন্দের দেহার্দ্ধের উপর নির্ম্মিত একটী স্তূপ

তিব্বতীয় বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বৈশালী ভূ-স্বর্গ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। এই দেশে সুন্দর অট্টালিকা, বাগান ও আরামকুঞ্জ আছে। কাহারও কাহারও মতে মজঃফরপুর জেলায় বসারগ্রাম এবং পুরাতন বৈশালী অভিন্ন। কেহ কেহ বলেন, বৈশালী ত্রিহুত অঞ্চলেরই কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। সারন বা ছাপরা জেলার চেরাণ্ড নামক স্থান বৈশালী নামে পরিচিত, এরূপ মতও পাওয়া যায়। বসারই যে বৈশালী ছিল, তাহা ব্লকসাহেব "রাজা বিশাল-কা-গড়" নামক স্তূপ ও আটটি খাত খনন করাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পুরাকালে স্থানটী যে বৈশালী বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু খননলব্ধ প্রমাণনিদর্শন আর একটু অধিক না পাওয়া গেলে, কোন একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন।

* বৌদ্ধবিহার

মিথিলা

মিথিলা বিদেহের রাজধানী ছিল। নেপালের অন্তর্গত অরণ্য মধ্যে অবস্থিত জনকপুর ও মিথিলা অভিন্ন। এই মিথিলা নগরী গোবিন্দ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, রাজা মিথি (জনক) মিথিলা নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বৈশালী হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে মিথিলা অবস্থিত ছিল। জনকরাজার রাজধানী বলিয়া ইহা পরিচিত। এই সহরে অনেক হস্তী, অশ্ব, রথ, মেষ এবং অনেক প্রকার মণিমাণিক্য পাওয়া যাইত। রামায়ণ হইতে জানা যায় যে, মিথিলার রাজা জনকের কন্যা সীতাদেবীকে রামচন্দ্র বিবাহ করেন। বৎসরাজ উদয়ন বৈদেহী-পুত্র নামে খ্যাত ছিলেন, কারণ, তাঁহার মাতা বৈদেহী-রাজকন্যা ছিলেন। মগধের রাজা বিম্বিসারের পত্নী বিদেহ রাজকন্যা ছিলেন।

মিথিলার রাজগণ সুপণ্ডিত ছিলেন। রাজর্ষি জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট হইতে ব্রহ্ম-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মিথিলার অপর একটি রাজা সুমিত্র স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। মিথিলার রাজারা তক্ষশিলায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য যাইতেন। রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া অযোধ্যা হইতে মিথিলায় আসিতে বিশ্বামিত্রের চারদিন লাগিয়াছিল। তিনি বিশালাতে একটি মাত্র রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ মুনি মিথিলা নগরীতে রাজা নিমির যজ্ঞ আরম্ভ করেন। কর্ণ দিগ্বিজয় কালে মিথিলা জয় করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া মিথিলা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। জৈনগুরু মহাবীর মিথিলাবাসী ছিলেন। এখানে তিনি ছয়টী বর্ষা বাস করেন। মিথিলার রাজা মখাদেব ৮৪ হাজার বৎসর জীবিত ছিলেন। ব্রহ্মায়ু নামে একজন মিথিলার ব্রাহ্মণ ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া বেদ, ইতিহাস, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যখন বিদেহের রাজা শুনিলেন যে, গান্ধারের রাজা সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনিও নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া হিমালয়ে গিয়া গান্ধারের ভূতপূর্ব্ব রাজার সহিত জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই দুইটি রাজা ব্যতীত মিথিলার অপর একজন রাজা মখাদেব একদিন তাঁহার নাপিতকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার মাথায় কোন পক্ক কেশ দেখা যাইতেছে কিনা? নাপিত তাঁহার মাথা হইতে একটি পক্ক কেশ তুলিয়া তাঁহার হস্তে দিল। রাজা তাহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ভাবিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। সাধিন নামে মিথিলার অপর একজন ধর্ম্মভীরু রাজা পঞ্চ শীল এবং ব্রত নিয়মিতরূপে পালন করিতেন। সুরুচি নামে মিথিলার আর একজন রাজার সুমেধা নামে এক মহিষী ছিল। সুমেধার কোন পুত্র-কন্যা হয় নাই। প্রতিমাসের ১৫ তারিখে তিনি আটটি ব্রত উদ্‌যাপন করিতেন। যথা—মিথ্যা না বলা, প্রাণী হত্যা না করা ইত্যাদি। তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপনে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে একটি "পুত্র বর" প্রদান করেন। পরে তাঁহার একটি পুত্র হয়।

কপিলবস্তু

কপিলবস্তু শাক্যগণের নগর ছিল। বৌদ্ধ ইতিহাসে ইহার প্রাধান্য যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা ওক্কাকের পাঁচটী মহিষী ছিলেন। প্রধানা মহিষীর গর্ভে চারিটি পুত্র এবং পাঁচটি কন্যা জন্মে। এই মহিষীর মৃত্যুর পর রাজা আর এক বিবাহ করেন, সে এই সর্ত্তে যে, তাঁহার গর্ভে যে পুত্র হইবে তিনি তাহাকেই সিংহাসন দান করিবেন। যখন তাঁহার পুত্র হইল, রাজা তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণকে রাজ্য ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। যুবকগণ তাহাদের ভগিনীর সহিত রাজ্য ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের নিকটে কোন একটি অরণ্যে গমন করিল। কপিল মুনি নিজ বাসস্থানের নিকটে একটি নগর নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন। যুবকগণ মুনির কথামত এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহার নাম হইল কপিলবস্তু। কপিলবস্তু একটি উন্নত শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগর। অনেক লোক এখানে সুখে বাস করিত, এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। কপিলবস্তুর শাক্যদিগের সহিত কোলিয়দিগের রোহিণী নদীর জল লইয়া কলহ হয়। রোহিণী নদী শাক্য এবং কোলিয়দিগের দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। কপিলবস্তুর অপর একটি নাম কপিলপুর বা কপিলাহ্বয়পুর। এই নগরকে

কপিলস্তবস্তুও বলা হইত। সপ্তপ্রাচীর দ্বারা এই নগর পরিবেষ্টিত ছিল। কপিলবস্তু এবং প্রাচীন লুম্বিনী বাগান অভিন্ন। কাহারও কাহারও মতে শাক্য রাজধানী কপিলবস্তু এবং বস্তি জেলার উত্তর দিকে অবস্থিত পিপ্‌রাবা অভিন্ন। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান কপিলবস্তু পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এই নগরে বহু লোকের বাস ছিল না। তিনি এই নগরের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। যথা—যেখানে যুবরাজ সিদ্ধার্থ নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, যেথান হইতে তাঁহার রথ প্রাসাদে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়, যেখানে অসিত ঋষি কোষ্ঠি লিখিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

আর একজন চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান্ চুয়াং বলেন যে, শাক্যদিগের দেশ কপিলবস্তু প্রায় চার হাজার যোজন বিস্তৃত ছিল। খুব অল্পসংখ্যক গ্রাম ছিল এবং বিহারের ভগ্নাবশেষ তিনি দেখিয়াছিলেন। দুইটি দেবমন্দির ছিল এবং কতকগুলি বিহার ছিল। এই নগরের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ছিল এবং এখানে প্রচুর ফসল হইত। এই নগরে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল। শাক্যগণ কপিলবস্তুর সংস্থাগারে (Mote Hall) রাজনীতি শাস্ত্র আলোচনা করিত। কপিলবস্তুর শাক্যগণের মধ্যে এই প্রথা ছিল যে, পুত্র জন্মাইলে তাহাকে ঈশ্বর দেবের মন্দিরে লইয়া গিয়া ভগবানের নিকট দান করা হইত। শাক্য নারীগণ মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সহিত বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিয়া প্রার্থনা করেন যে, স্ত্রীলোকগণকে ভিক্ষুণী হইতে আদেশ দেওয়া হউক। বুদ্ধদেব ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন।

কপিলবস্তুর শাক্যগণের জাতি-মর্য্যাদা-জ্ঞান খুব বেশী ছিল। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ যখন একটি শাক্য বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, শাক্যগণ শাক্যকন্যার পরিবর্ত্তে বাসবক্ষত্রিয়া নামে একটি দাসীকন্যাকে প্রদান করেন। এই দাসীকন্যার গর্ভে বিড়ঢ়ভের জন্ম হয়। যখন বিড়ঢ়ভ জানিতে পারিলেন, শাক্যগণ তাঁহার পিতাকে এইভাবে প্রতারণা করিয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ শাক্যদেশ আক্রমণ করেন এবং বহু শাক্যের প্রাণনাশ করেন।

কুশীনারা ও পাবা

মল্লনামে পূর্ব্ব-ভারতে একটি বলশালী জাতি ছিল। মল্লরা দুইভাগে বিভক্ত ছিল। একদলের রাজধানী ছিল 'কুশীনারা' এবং অন্যদলের রাজধানী ছিল 'পাবা'। জৈন এবং বৌদ্ধ ইতিহাসে ইহাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। মহাভারতের সভা পর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন পূর্ব্ব-ভারত জয়কালে মল্লদিগের নেতাকে পরাস্ত করেন।

গোরখপুর জেলার পূর্ব্বদিকে কাশিয়া গ্রাম কুশীনারা নামে পরিচিত। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, কুশীনারা নেপালে অবস্থিত ছিল। পাবা এবং পাবাপুরী অভিন্ন। বুদ্ধদেব কুশীনারায় মহা পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। কুশীনারার মল্লরা চৈত্য উপাসক ছিলেন। জৈনগুরু মহাবীরের মৃত্যুর পর পাবা নগরে তাঁহার শিষ্যগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব চুন্দের গৃহে নিমন্ত্রণ খাইয়া আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া তাঁহার প্রধান শিষ্য আনন্দের নিকট লোক পাঠান। কুশীনারার সমস্ত মল্ল—আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বুদ্ধদেবের পদধূলি গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি তাঁহার শেষ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের অংশের জন্য পাবার মল্লরা দাবী করে। তাহারা বলে, "আমরাও ক্ষত্রিয়, বুদ্ধদেবও ক্ষত্রিয়। অতএব তাঁহার দেহাবশেষের অংশ পাইবার আমাদের অধিকার আছে।" কুশীনারা ও পাবার মল্লরা কিছু দিন পরে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের উপর এক সুদৃশ্য স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।



বায়ুর রঙ্গ

[১৬৬৪ পৃষ্ঠার পর]

[এখানে কয়েকটি ইংরেজী শিশু-রঞ্জন কবিতার অনুবাদ দেওয়া হইল। শিশু-সাহিত্যে এই কবিতাগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। লেখকের নাম অজানা থাকিলেও, কবিত্ব-সম্পদে সমৃদ্ধ বলিয়া এইগুলি এত আদরণীয় হইয়া রহিয়াছে।



বন্দী বাতাস মুক্তি পেয়েছে আজ,
সহসা আকাশে বাজে যেন পাখোয়াজ।
সেই তালে তালে ওড়ে কাক, ওড়ে চিল,
করে ঝন্‌ঝন্‌ সার্শী ও ঝিল্‌মিল্‌।



এক হাতে বই, খোলা-ছাতি আর হাতে,
কি বিষম ফেরে পড়ে দাদা রাস্তাতে!
পুঁথি পথে পড়ি' ছোটে হামাগুড়ি দিয়া,
মোজার মতন ছাতা গেল উলটিয়া।



মই চড়ি' চালে কাপড় পাড়িতে যাই,
দেখি ওড়ে তারা—যদিও পক্ষ নাই।
তাদেরে ধরিতে দিদি আঙ্গিনায় এসে
করে ছুটাছুটি আলুথালু কেশে-বেশে।



পালের নৌকা ভরা পালে চলে ছুটি'
বুঝি মাস্তুল ভাঙ্গিয়া পড়িবে লুটি';
"ভয় নাই" মাঝি বলে যত হাসিমুখে,
লাগে ঢেউ-দোলা দোদুল তরীর বুকে।



দুপুরে গোধূলি ঘনায় ধূলার চোটে,
পুচ্ছ তুলিয়া গাভীরা ছুটেছে গোঠে।
পথের পথিক কোথা বা আড়াল পায়,
দমকা হাওয়ায় টুপি তার উড়ে যায়।

আয় ভাই মোরা খেলার নৌকাটিরে
পাল তুলে দিয়ে ভাসাই নদীর নীরে।
বাতাসের আজ রঙ্গ জেগেছে মনে,
জানি ডুবাবে না, খেলিবে তরীর সনে।

মোদের খুকুরাণী

মোদের খুকুরাণী
আকাশ হ'তে এল কি ভাসি' কুসুম আশমানী?
দেখি সে মধু হাসি,
দীপ্তিধারা নয়ন-কোণে, অধরে ফুলরাশি।

কচি দুখানি ঠোঁটে
অস্ফুট বাণীবুদ্বুদেরা মর্ম্মরিয়া ফোটে।
একটুখানি নাক
নিটোল দুটি গালের ফাঁকে লুকিয়ে থাকে থাক্।

কচি দুখানি করে
দশটি যেন চাঁপার কলি ফুটেছে থরে থরে।
দশটি বেল-কুঁড়ি
কোমল পদপ্রান্তে দুটি পুলকে আছে জুড়ি।

রয়েছে মাথা ভরি'
কুণ্ডলিত চিকণ-কালো অলকমঞ্জরী।
রসনা অবচনে
কলস্বনা ঝরণা-পারা ঝরে যে খনে খনে।

নাই ভাবনা লেশ,
বুদ্ধিহীনা অর্ব্বাচীনা, প্রতাপ তবু বেশ।
করিছে ধুক্ ধুক্
তরঙ্গিত ওই বুকেতে অজানা সুখ-দুখ।

একটি শুধু ফুল,
ত্রিভুবনে ত নাইক কোথা এ ফুল সমতুল!
আপন মনে জানি
জীবন মোর হয়েছে আজি ফুলের রাজধানী।

একটি শুধু আশা,
চিরদিনের তরে আমার বাঁধ্‌ল বুকে বাসা।
একটি মহাদান
অমর করে বক্ষে মোর রাখুন ভগবান।

ঘুমা ওরে ঘুমা

ঘুমা ওরে ঘুমা আমার নয়নমণি!
নিশীথ আঁধারে সুখ-স্বপনের খনি
খুলে যাক্ তোর নিদ্রনিলীন চোখে,
যায় না যা' দেখা এ ধরার দিবালোকে।

খোকন আমার, হেরি ওই মুখ 'পরে
কত আশা, সুখ স্বপনে মুরতি ধরে।
আজিও তাহারা আছে উত্তরকালে,
তোমার আননে তারা অরুণিমা ঢালে।

সুকোমল গায়ে বুলাই যখন হাত,
ফোটে মুখে হাসি নেহারি অকস্মাৎ,
কচি ঠোঁট দুটি একটু কাঁপিয়া ওঠে
আধ্‌খানি দাঁতে চাঁদের কণাটি ফোটে।

কত দুষ্টামি, ফন্দী-ফিকির কত
ঘুমে হিম হ'য়ে সাধুতায় পরিণত!
ভোরের আলোয় ভাঙিবে যখন ঘুম,
দস্যিপনার তখন লাগিবে ধুম।

ওই দেখ মা

ওই দেখ মা আকাশ পানে চেয়ে,
সত্যি ও কি নীল-গগনের মেয়ে ?
ওকে দেখে কী মনে হয় জান' ?
আলোর ফানুস্ আকাশে ঝুলান ।

এক পয়সার কুম্‌ড়া-ফালির মত
কদিন আগে ছিল ও জান ত।
উঠ্‌ল ফুলে একটু একটু ক'রে
রবারের বল্ যেন ফুঁ-এর জোরে।

ওরে ও চাঁদ, ওরে মনোহর,
তোর আলোতে উজ্জল হ'ল ঘর,
মুখখানি মার হ'ল যে ধব্‌ধবে,
দিনের আলোয় এমনি শাদা র'বে ?

খেল্‌নাগুলোর হ'ল নূতন রূপ,
চাঁদে কি মা আছে রূপের কূপ ?
চাঁদের আলোয় ওঠে যে ডুব দিয়া
জ্যোস্নামাখা হয় কি মা তা'র হিয়া ?

চাঁদের পাশে ওই দেখ মা তারা,
তোমার পাশে আমি যেমনধারা।
চাঁদের খুকী হবে অনুমানি,
আমি যেমন তোমার পুঁটুরাণী।

প্রদীপ

আমি সাঁঝের দীপ,
নিশীথিনীর আধার ভালে পরায়ে দিনু টিপ্।
তোমরা এসো ছুটি,
দেউটি 'পরে দীপ্তিভরে উঠেছি দেখ ফুটি'।

বস আমার কাছে,
একটু দূরে থেকো তথাপি, আগুন লাগে পাছে।
ক'রো না হুড়াহুড়ি,
ছুঁয়োনা মোরে করি মিনতি হাতটি যাবে পুড়ি'।

হাওয়া যে দেয় দোলা,
জানালা আর দরজাগুলি সব রেখোনা খোলা।
আমারে দোলা দিলে
দেয়ালে দেখ ছায়ারা ওই নাচে সকলে মিলে।

কাজল তুলি দিয়া,
কেমন ছবি রেখেছি দেখ দেয়ালে অঙ্কিয়া!
নূতন খেলা শেখ
আঙুলগুলি জড়ায়ে খুলে তাদের ছায়া দেখ।

কুকুর ও হাঁস
দিবে আঁকিয়া শুভ্রপটে শুধু আঙুলের ফাঁস।
কালো ছায়ায় গাঁথা
উঠিবে ফুটি প্রজাপতি ও খরগোসের মাথা।

নিভে আসিবে যবে,
দিয়ো ঢালিয়া একটু তেল শিখাটি বেঁচে রবে।
সারা রজনী ধরি,
আঁধার ঘরে জ্বলিব আমি জাগ্রত প্রহরী।



দাক্ষিণাত্যের উপকথা

যার যেমন, তার তেমন

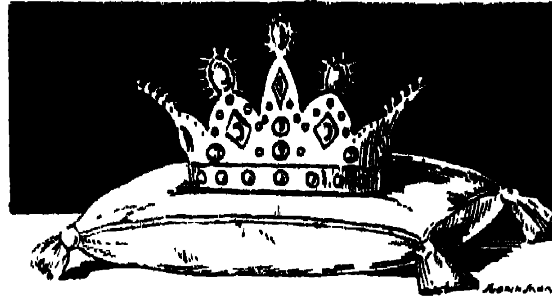
[১৭৭৬ পৃষ্ঠার পর]

এক রাজা একদিন উজীরকে জিজ্ঞাসা করলেন "আচ্ছা, বল দেখি আমার এত অসুখ করে কেন? আমার শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এত ব্যবস্থা—আমি সর্ব্বদা ভাল খাই-পরি, কত সাবধানে থাকি তবু আমার ঠাণ্ডা লাগা, জ্বর এসব নানারকম অসুখ লেগেই থাকে, এর কারণ কি?"

উজীর বল্‌লেন, "মহারাজ, অতিরিক্ত যত্ন, অযত্নের চেয়েও অপকারী।"

রাজা বল্‌লেন, "তা কি ক'রে হবে?" উজীর বল্‌লেন, "আচ্ছা, আপনাকে আমি এর প্রমাণ দেখাব।"

তার পর দিন উজীর রাজাকে নিয়ে চল্‌লেন বেড়াতে। একটু দূরে যেতেই এক মেষপালকের সঙ্গে দেখা। সারাদিন ভেড়া চরিয়ে বেড়ান এর কাজ, গায়ে একটা মোটা জামা—বর্ষায়, শীতে ঐটুকু আবরণই তার সর্ব্বস্ব। চারটী মোটা ভাত আর বনের শাক খেয়ে তার দিন কাটে। আর তার বাড়ী—মাঠের শেষ প্রান্তে, একখানা যেমন তেমন পাতায়-ছাওয়া কুঁড়ে। উজীর বল্‌লেন, "এদের কি কষ্টের জীবন, জানেন ত আপনি। একেই ধরে জিজ্ঞাসা করুন না, এই রোদ-ঝড়-বৃষ্টির উৎপাতের মধ্যে থেকে এর কোন অসুখ করে কি না।"



রাজা লোকটীকে জিজ্ঞাসা করলেন, সর্দ্দি কাসি, জ্বর, বাত এসব রোগে সে ভুগেছে কি না। সে বলল, "না মশায়, এসব কোন রোগের খবরই আমি জানি না; খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা, সবই আমি ছোটবেলা থেকে সয়ে আস্‌ছি, সেইজন্যই বোধ হয় আমার ওসবে কিছু হয় না।"

রাজা একথা শুনে ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। বল্‌লেন, "আমি সত্যই এ'কে দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছি। কিন্তু এর স্বাস্থ্য সাধারণের চেয়ে অনেক ভাল; তাইতে এর কিছু হয় না এমনও ত হতে পারে।"

উজীর বল্‌লেন, "আসুন, পরীক্ষা ক'রেই দেখা যাক না কেন।" এই বলে তিনি মেষপালকটীকে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাকে রীতিমত রাজভোগ্য আদর-যত্নে রেখে দেওয়া হ'ল। রোদ, বৃষ্টি বা হাওয়াতে তাকে আর বার হ'তে দেওয়া হ'ত না। এই রকমে ক্রমে মেষপালক একেবারে বড়মানুষী চালে অভ্যস্ত হয়ে উঠল।

কিছুকাল পরে উজীর একদিন তাকে ডেকে পাঠালেন। এক শ্বেত পাথরে বাঁধানো চাতালে জল ছিটিয়ে তার উপর দিয়ে তাকে হেঁটে যেতে বলা হ'ল। মেষপালক কিছুকাল আরামে থেকে

জল-হাওয়া সহ্য করতে একেবারে অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এখন এই সামান্য কারণেই তার খুব ঠাণ্ডা লেগে গেল। ক্রমশঃ অসুখ বেড়ে গিয়ে সে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল।

রাজার কাছে যথাসময়ে সব খবর পৌঁছাল। তিনি তাড়াতাড়ি মেষপালকের অবস্থা দেখতে গেলেন। বেচারা রোগের যাতনায় অস্থির হয়ে পড়েছিল। রাজাকে দেখেই সে বলল, "মহারাজ ছোটবেলা থেকে রোদ বৃষ্টির মধ্যেই জীবনটা কেটে গেছে কিন্তু কখনও আমার এমন অসুখ করে নি। আর এখন আপনাদের দয়াতে কত সুখে ছিলাম, এখন কেন এত কষ্ট পাচ্ছি, বুঝতে পারি না।"

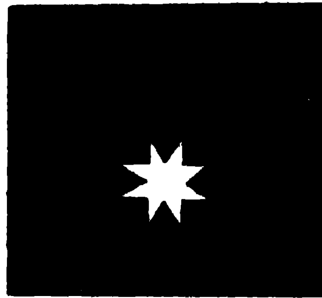
উজীর তখন রাজাকে বললেন, "এখন আপনি বুঝতে পারছেন ত অতিরিক্ত যত্ন সত্যি সত্যিই শরীরের পক্ষে কত অপকারী। এই অল্প দিনের আরামের অভ্যাসে এর এতকালের কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। এতটুকু অনিয়ম ও বেচারা সহ্য করতে পারল না।"

ঐশ্বর্য্য ও আরাম সহজেই মানুষের স্বাস্থ্য নাশ ক'রে আয়ু ক্ষয় ক'রে দেয়। সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, জীবনের অনেক আনন্দ আবার স্বচ্ছলতা ছাড়া পাওয়া যায় না। যে বিপদ ঐশ্বর্য্যবানের জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ হয়ে আছে, দরিদ্রেরা তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে, প্রকৃতি এমনি ক'রেই তার দানের সমতা রক্ষা করে চলে।"



সূর্য্য, চন্দ্র ও বায়ু

সূর্য্য, চন্দ্র ও বায়ু তিন ভাই-বোনে মিলে একদিন তাদের কাকার বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে গেল। আকাশের এক প্রান্তে ঐ যে উজ্জ্বল তারাটী উনি তাদের মা। তিনি বসে থাকলেন ছেলেমেয়ের পথের দিকে তাকিয়ে।



সূর্য্য ও বায়ু বড় লোভী ও স্বার্থপর ছিল। তারা মহা আনন্দে ভোজ খেয়ে চলল—মার কথা একবারও ভাবল না। কিন্তু চাঁদ একটু একটু ক'রে সব রকম খাবার নখের মধ্যে রেখে দিতে লাগল—মাকে বাড়ী গিয়ে দেবার জন্যে।

সারা রাত অনিমেষ দৃষ্টি মেলে পথের দিকে চেয়ে থেকে ভোর বেলা মা দেখলেন, ছেলে মেয়েরা ফিরছে। তিনি সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাছা, আমার জন্য তুমি কি এনেছ?" সূর্য্য রেগে উঠে বলল, "বাঃ, তোমার জন্য আবার কি আনব? আমরা নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম; খেয়েছি, আমোদ করেছি। বাড়ী ব'য়ে তোমার জন্য খাবার আনব বলে ত যাইনি।"

মা তখন বায়ুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কিছু এনেছ?"

সে বলল, 'এমন কথা আমার মনেই হয়নি।"

তখন চাঁদ তাড়াতাড়ি এসে বলল, "মা, একটা থালা আন, দেখ, আমি কত কি এনেছি তোমার জন্যে।" এই ব'লে যেই সে থালার উপর হাত

ঝাড়তে লাগল, অমনি নানা রকম সুখাদ্য জিনিস নখের মধ্য থেকে থালায় এসে পড়তে লাগল।

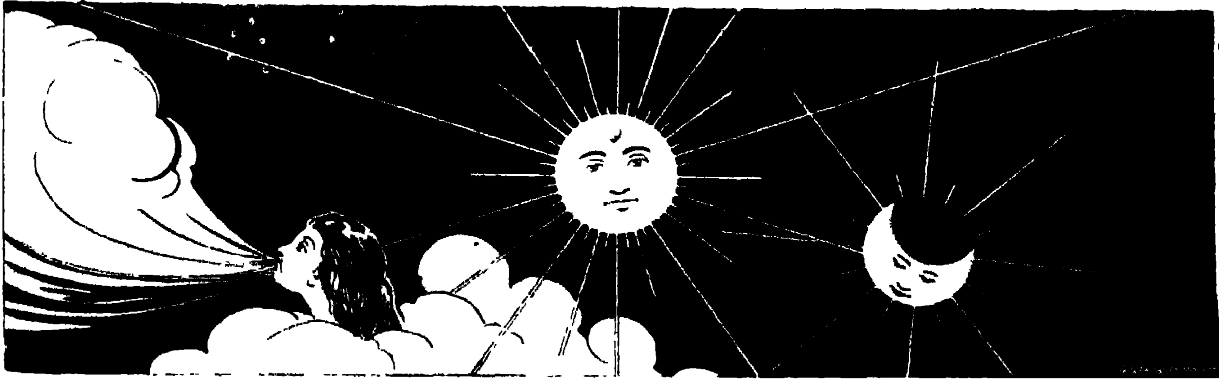
তাদের মা তখন সূর্য্যের দিকে ফিরে বললেন, "বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আমোদে মত্ত হয়ে তুমি মায়ের কথা, ঘরের কথা একেবারেই ভুলে যাও, এজন্য তোমার শাস্তি হবে। তোমার রুক্ষ স্বভাবের মত তোমার কিরণও আজ হ'তে পৃথিবীতে সকলকে জ্বালিয়ে তুলবে— কেউ আর তোমাকে ভাল বাসবে না।"

তারপর বায়ুকে বললেন, "তোমার দুর্ব্যবহারের শাস্তিও তোমায় পেতে হবে। শুকনো গরম হাওয়ার ঝড় তুলে তুমি সব জীবজন্তু, গাছপালাকে বিব্রত ক'রে তুলবে। সেজন্য লোকে আর তোমাকে আগের মত ভালবাসবে না।"

তারপর চাঁদকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "লক্ষ্মী মেয়ে আমার, মায়ের উপর তোমার যেমন ভালবাসা, তেমনি তুমি চিরকাল সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করবার যোগ্য হবে। তোমার সুশীতল জ্যোৎস্না পৃথিবী উদ্ভাসিত ক'রে সকল লোকের মনে চিরদিন আনন্দ দেবে।"

সেই হ'তে সূর্য্যের প্রখর তাপ মানুষের অপ্রিয় হয়ে গেছে, গরম হাওয়া আর কেউ সহ্য করতে পারে না কিন্তু চাঁদ সকল দেশে সকল লোকের কাছে চিরদিনই আদর পেয়ে আসছে।

(দাক্ষিণাত্যের কাহিনীতে চাঁদকে মেয়ে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।)



শেয়ানে শেয়ানে

এক উট ও শিয়ালে বড় বন্ধুত্ব। একদিন শিয়াল এসে বলল, বন্ধু, নদীর ওপারে মস্ত "এক আখের ক্ষেত দেখেছি। চল সেখানে যাই, তোমার খুব ভাল খাবার জুটবে। আমিও নূতন জায়গায় ভাল কাঁকড়া, মাছ এসব পাবই।" উট বলল, "আচ্ছা চল, কিন্তু নদী পার হবে কি করে?" শিয়াল বলল, "কেন তুমি আমায় পিঠে ক'রে নিয়ে যেও, তবেই হবে।"



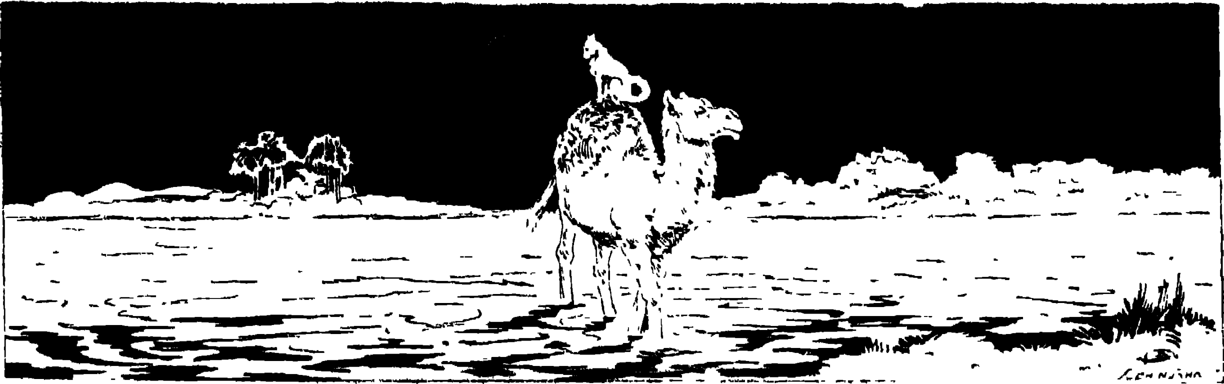
এপারে এসে উট দেখে সত্যিই চমৎকার রসাল আখে-ভরা ক্ষেত। অনেক দূর অবধি কেবলই আখ জন্মেছে—একেবারে নিরিবিলি নির্জ্জন। সে তাড়াতাড়ি ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে মনের আনন্দে আখ খেতে সুরু করল। শিয়ালও নদীর পাড়ে ছুটোছুটি করতে লাগল কাঁকড়ার খোঁজে। সে দিন ত তার যথেষ্ট খাবার জুটে গেল।

কাঁকড়া খেয়ে পেট ভরিয়ে শিয়াল এসে দেখে তার বন্ধু তখনও খুব আগ্রহে আখের গাছ ভাঙছে। সে এদিক ওদিক ছুটে খুব ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। চাষীরা দুপুর বেলা বিশ্রামের সময়ে এত চীৎকার শুনে ভাব্‌ল ব্যাপারটা কি ? দিনেদুপুরে এমন শিয়ালের ডাক কেন, দেখেই আসা যাক্‌। এই ভেবে দল বেঁধে ক্ষেতে এসে ত তাদের চক্ষুস্থির। দেখে প্রকাণ্ড এক উট অনেক আখ খেয়ে ফেলেছে আর ভেঙ্গে-চুরে নষ্টও কম করেনি। ভয়ানক রেগে তারা উটকে লাঠি দিয়ে মারতে মারতে একেবারে আধমারা ক'রে ক্ষেতের বার ক'রে দিল।

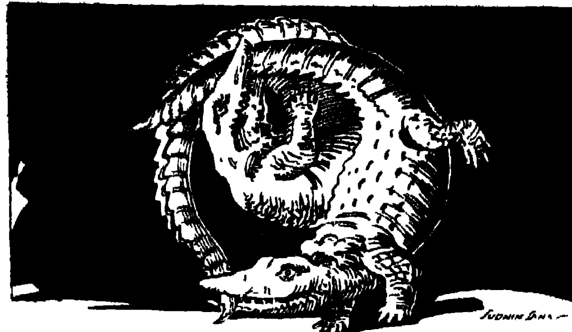
অতগুলি লোকের লাঠির ঘায়ে উটের সারা দেহ একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে সে নদীর দিকে চলল। শিয়াল এতক্ষণ লুকিয়ে মজা দেখছিল। এখন এসে কপট সহানুভূতিতে গ'লে পড়ে বল্‌ল, "আহা বন্ধু, ওরা তোমায় কি মারটাই মেরেছে! সারাগায়ে আর জায়গা রাখেনি দেখ্‌ছি।" উট বল্‌ল "সে কথায় আর কাজ কি। চল বাড়ী ফিরি।" শিয়াল একলাফে তার পিঠে উঠে বস্‌ল। উট জলে নাম্‌তে নাম্‌তে বল্‌ল, "কিন্তু তুমি অমন চেঁচামেচিটা করলে কেন বল দেখি। অত হাঁকডাক যদি না লাগাতে, তবে ত ওরা টেরই পেত না।"

শিয়াল বল্‌ল, "তা কি করব। খাওয়ার পর একটু ডাকা আমার স্বভাব, তাইতেই অমনি করেছি।"

উট ক্রমে গভীর জলে নাম্‌তে লাগ্‌ল। নদীর মাঝামাঝি খুব স্রোত, উট সাঁতার কাটতে কাটতে বল্‌ল, "এবার আমি একটু জলে গড়াগাড়ি করে নিই। জলে গড়ানই আমার স্বভাব। বিশেষ, সমস্ত গা এখন জলছে,—খুবই আরাম হবে।" শিয়াল ভয়ে চেঁচিয়ে বল্‌ল, "কি বল্‌ছ. তা হ'লে যে আমি ডুবে যাব।" উট বল্‌ল, "তাতে আর কি হয়েছে, তোমার যা স্বভাব, তুমি যখন তাই কর, তখন আমিও আমার স্বভাব মত কাজ করব না কেন।, এই ব'লে যেই সে এক ডুব দিয়েছে, অমনি দুষ্ট, শিয়াল স্রোতের জলে প'ড়ে কোথায় ভেসে গেল" আর তাকে কেউ দেখতে পেল না।



বোকা কুমীর ও দুষ্ট শিয়াল



এক দুষ্ট অনেক দিন খেতে পায় নি। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অবশেষে এক নদীর ধারে এসে উপস্থিত হয়ে সে এদিক ওদিকে কাঁকড়ার গর্ত খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌ল। সেই নদীতে এক বুড়ো কুমীর থাক্‌ত; তার অবস্থাও সঙ্গীন, খাবারের অভাবে জলের মধ্যে নল খাগড়ার ঝোপের আড়ালে কুমীর সে একেবারে অস্থির হ'য়ে উঠেছে। শিয়ালটাকে দেখে সে ভাব্‌ল, "যাক্‌ এটাকে দিয়েই আপাততঃ আমার খানিকটা আরাম হবে।"

শিয়াল ত অনেক খোঁজ ক'রেও কিছু জোটাতে পারল না। যেখানে অল্প

গা ঢাকা দিয়ে ওৎ পেতে আছে, সেই দিকটায় এসে জলের দিকে তাকিয়েই শিয়াল দেখে একটা কাঁকড়া তার আট-আটটা পা বেজায় তাড়াতাড়ি চালিয়ে পালাচ্ছে। শিয়াল পা টিপে টিপে জলে নেমে যেই থাবা বাড়িয়েছে, অমনি খপ্ করে কুমীর তার থাবা টেনে ধর্‌ল। শিয়াল খুব চালাক। কুমীরের গ্রাসে পড়েছে বুঝেও সে ভাবল, কি করা যায়। এখনই ত আমায় টেনে নিয়ে যাবে। দেখি যদি কোন মতে ওকে ঠকিয়ে উদ্ধার পেতে পারি। এই রকম ভেবে সে খুব হেসে হেসে বল্‌ল, "বাহবা। বন্ধু, তুমি ত ভারী বুদ্ধিমান্! আমার থাবাটা ধরতে গিয়ে শেষে নল-খাড়ার শিকড়ের গোছাটি ধর্‌লে? বেশ নরম নরম লাগছে ত?" কুমীর জলে ডুবে আছে, সে ভাবল, "হায় হায় এত তাক্ ক'রেও অবশেষে গাছের শিকড়ই ধরলাম। আর তাই দেখে হতভাগাটার মজা দেখ। দূর ছাই।" এই ব'লে সে শিয়ালের পা ছেড়ে দিল। ছাড়া পাওয়া মাত্র শিয়াল বল্‌ল, "এই তোমার বুদ্ধি"। অমনি কথাটা বিশ্বাস ক'রে ফেললে! বেশ। বেশ!" এই ব'লেই এক দৌড়ে সে পালাল। কুমীর নিজের নির্বুদ্ধিতায় ভারী বিরক্ত হয়ে গেল কিন্তু মুখ তুলে দেখে শিয়াল ততক্ষণ নাগালের বাইরে চ'লে গেছে।

পরদিন আবারও শিয়াল এল খাবার জোগাড়ের চেষ্টায়। কুমীরের কথা সে ভোলেনি। কিন্তু কুমীর ওখানে উপস্থিত আছে কিনা, জান্‌বার জন্য সে এক ফন্দী বার করল। হঠাৎ এক দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে সে বলতে আরম্ভ করল, যখনই আমি খাবার খুঁজি, দেখি কাঁকড়াগুলো জলের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারে। আজ সবগুলোই এক সঙ্গে লুকোল? যে ক্ষিদে পেয়েছে—একটা কাঁকড়া পেলেও বেঁচে যেতাম।" কুমীর নদীর মধ্য থেকে সব শুনতে পেল। সে ভাব্‌ল, আমার নাকের ডগাটি একটুখানি ভাসিয়ে দিই, শিয়াল কাঁকড়া ভেবে যেই ধরতে আসবে, অমনি আমি ওকে টেনে নেব।

কিন্তু শিয়াল কুমীরের নাকের ডগাটি দেখেই বল্‌ল, "ও হরি, তুমি এখানে? তবে আমার এখানে খাবার পাওয়ার আশা ছাড়তেই হ'ল দেখছি।" এই ব'লেই সে দৌড়ে পালাল। আবার এমনিভাবে শিকারটি হাত-ছাড়া হ'য়ে গেল দেখে কুমীর ভয়ানক রেগে গেল। ঠিক করল আর এমন বোকামি সে কিছুতেই করবে না।

এরপর শিয়াল আবার যেদিন নদীর ধারে এল কুমীর ধীরে ধীরে একেবারে পাড়ের কাছাকাছি এসে ওৎ পেতে রইল—যাতে কিছুতেই শিকার না ফস্কায়। শিয়ালের মনেও খুব ভয়, হয় ত এখনই কুমীর তাকে তাড়া করবে কিন্তু খাবার লোভও ত কম নয়। যা হোক অবস্থাটি কেমন, বোঝবার জন্য সে আর একটা উপায় ঠাওরাল। খানিকক্ষণ ঘোরা-ফেরা ক'রে ক'রে সে ব'লে উঠ্‌ল, "কাঁকড়াগুলো কোথায় যে সব পালিয়েছে দেখতেই পাচ্ছি না। যখন তারা জলের মধ্যেও থাকে বুদ্‌বুদ্ উঠিয়ে তাদের থাকবার জায়গাটি আমায় বেশ ব'লে দেয়, এখানে ত সে রকম দেখছি না। তবে বোধ হয় এখানে আর কাঁকড়াই নেই।

কুমীর ভাব্‌ল, আমি কাঁকড়াদের ভাণ ক'রে একটু বুদ্‌বুদ্ উঠিয়ে দিই তবে ওকে হাতে পাব। এই ভেবে জলে খুব ফুঁ দিতে লাগল। তার সেই ফুঁয়ের জোরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বুদ্‌বুদ্ ফেনা নিয়ে ভেসে উঠে জলটাকে নাচিয়ে তুল্‌ল। এসব দেখেই শিয়াল বুঝ্‌ল ব্যাপারখানা কি।

দৌড়াতে দৌড়াতে বল্‌ল, "ধন্যবাদ, কুমীর মশাই! আপনি এখানে আছেন জানলে আমি এর ত্রিসীমানায় আস্‌তাম না—

কুমীর ত রাগে নিজের হাত-পা কামড়াতে লাগ্‌ল। প্রত্যেকবারই সে বোকা ব'নে যায়— দুষ্টু শেয়ালটাকে আর বাগে আনতে পারে না। নাঃ, এবার ওটাকে মজা টের পাওয়াতেই হবে!

এমনি আশায় আশায় অনেক দিন কেটে গেল কিন্তু শিয়াল আর এদিকে আসেই না। সে এখন বনের মধ্যে গিয়ে ডুমুর গাছের ফল খায়। কুমীরের ভয়ে সে কাঁকড়ার লোভ ছেড়েছে। ক্রমে ক্রমে কুমীর ব্যাপারটা জান্‌তে পারল। সে ভাব্‌ল, জলে ত কিছু করতেই পারলাম না, এবার ডাঙ্গায় উঠেই দেখ্‌ব ওকে জব্দ করতে পারি কি না। এই রকম ঠিক ক'রে কুমীর একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে বনের মধ্যে চল্‌ল। সেই ডুমুর গাছের তলায় গিয়ে দেখে অনেক পাকা ফল পড়ে আছে। সব ফলগুলি একত্রে জড় ক'রে সেই স্তূপের নীচে প্রকাণ্ড দেহখানি লুকিয়ে সে চুপ ক'রে বসে রইল। শিয়াল এসে দেখে অদ্ভুত কাণ্ড। সব ফলগুলি গাছের তলায় এক রাশি হয়ে জমে আছে।

ব্যাপারটা কি, অনুমান করতে তার আর দেরী হ'ল না। তবু সত্যি কি না পরখ করা চাই ত! তাই শিয়াল বল্‌ল, "পাকা ফলগুলো টুপটাপ ক'রে প'ড়ে প'ড়ে গড়িয়ে বেড়ায় আর আমি মজা ক'রে ক'রে খাই। কিন্তু আজকার ফলগুলি গাছের তলায় একেবারে জমে চুপ হয়ে আছে, ও ফলগুলি তেমন ভাল বোধ হচ্ছে না ত। তবে আজ আর খাওয়া হ'ল না।" কুমীর ভাব্‌ল, বড় মুস্কিল হ'ল দেখ্‌ছি। শিয়ালটা কি সয়তান! যাক্, একটু গা নাড়া দিলেই ফলগুলি নড়ে বেড়াবে আর ওটা যখন ফল খেতে ব্যস্ত থাকবে তখনই হবে আমার সবচেয়ে সুবিধা। এই ভেবে যেই সে একটু নড়েছে, অমনি ফলগুলি এত জোরে গড়াতে আরম্ভ করল, যেন ঝড়ের বেগে দৌড়ে চলেছে।

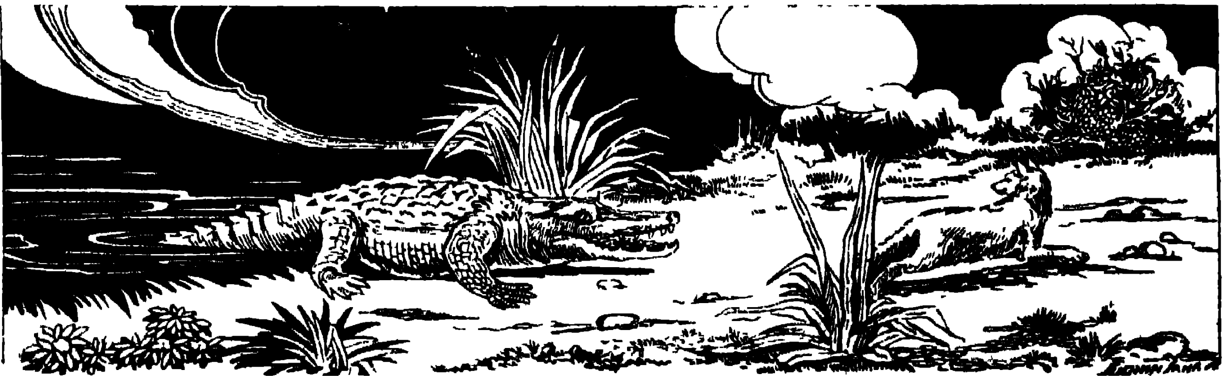
এই দেখেই শিয়াল ভীষণ ছুট দিল। যেতে যেতে ব'লে গেল, "তুমি সত্যিই আমার বন্ধু! এমন জায়গায়ও তুমি এসেছ, এ যদি তুমি না বুঝিয়ে দিতে, তবে আমার কিছুতেই সন্দেহ হ'ত না।"

কুমীর এবার একেবারে মরিয়া হয়ে উঠ্‌ল। ঠিক করল, যেমন ক'রে পারে শিয়ালকে ধরবেই। পর-দিন দুপুরে সে ধীরে ধীরে শিয়ালের গর্ত্তের কাছে গেল। শিয়াল তখন বেরিয়ে গেছে। কুমীর অতি কষ্টে সেই গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে ব'সে রইল শিয়ালের অপেক্ষায়। সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময়ে শিয়াল বাড়ীর কাছে এসে দেখে গর্ত্তের মুখের কাছে মাটি খাবলান—যেন কোন বড় জানোয়ার ভিতরে ঢোকবার জন্য চেষ্টা করেছে। ভিতরে কিছু আছে কি না পরীক্ষা না ক'রে ঢোকা ঠিক নয়, ভেবে সে বল্‌ল, "ও আমার ছোট্ট বাড়ী, সুন্দর বাড়ী, ভাল বাড়ী—বাঃ আজ তুমি কথায় জবাব দিচ্ছ না যে। সব ঠিক-ঠাক থাকলে আমি এলেই তুমি কত আদর ক'রে কথা বল, আজ তোমার হ'ল কি? তবে কি কোনও হাঙ্গামা হয়েছে?"

কুমীর দেখল মহা বিপদ। বাড়ীটা বোধ হয় তার ভয়েই চুপ ক'রে আছে। এখন কিছু না বল্‌লে আবার শিয়ালটা না চলে যায়। তাই যথাসাধ্য মিষ্টি গলায় বল্‌ল, "আমার আদরের শিয়াল, এস এস।"

শিয়াল কথা শুনেই বুঝ্‌ল, সেই ভয়ানক কুমীরটা আবার এখানেও এসে বসেছে। কি আর করে, তাড়াতাড়ি বল্‌ল, "দাঁড়াও রান্নার কাঠ-কুটো নিয়ে আমি এখনি আসছি।" এই ব'লেই সে দৌড়ে বনের মধ্য থেকে যত পারে শুকনো কাঠ-কুটো এনে গর্ত্তের মুখের কাছে জোগাড় করতে লাগ্‌ল।

এদিকে কুমীর ত কার্য্য সিদ্ধি হয়েছে ভেবে আনন্দে মেতে উঠেছে। ভাব্‌ছে আর ২।৪ মিনিটের মধ্যেই এতদিনের শত্রুকে হাতে পাব। আর তখনই ওটার ঘাড় মটকে সব দুঃখ মেটাব। শিয়াল ইতিমধ্যে কোথা হ'তে আগুন জোগাড় ক'রে এনেছে। গোছা গোছা কাঠে আগুন ধরিয়ে সে একে একে গর্ত্তের মধ্যে ঠেলে দিতে আরম্ভ করল। ধোঁয়ায় অস্থির হ'য়ে কুমীর ছটফট্ করতে লাগল; তার পর হঠাৎ ভীষণ আগুন জ্বলে উঠে তাকে পুড়িয়ে শেষ ক'রে দিল। শিয়াল তখনও আনন্দে নেচে নেচে গান করছে—"কেমন বন্ধু, আমার ঘরখানা বেশ গরম ত? বাহবা কি মজা, কুমীর স্বর্গে যাচ্ছেন—কি মজা!"



দাক্ষিণাত্যের উপকথা

সিংহ রাজা ও ধূর্ত্ত শৃগাল



এক বনের মধ্যে প্রকাণ্ড এক সিংহের বাসা। সমস্ত জীবজন্তু তার ভয়ে অস্থির। প্রত্যেক দিনসে কত যে জন্তুর প্রাণনাশ করে, তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। সবগুলিই যে খায় এমনও নয়—প্রাণিহত্যাতেই যেন তার আনন্দ। পশুরাজ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে, কি যে তারা করবে, আর ভেবে পায় না। নিজের বাসা ছেড়ে বা'র হতে পর্য্যন্ত তাদের ভয়—পাছে সাক্ষাৎ যমের সামনে পড়ে। অথচ খাওয়ার যোগাড় না করলেও ত চলে না।

এই রকম সময়ে একদিন এক শিয়াল ও শিয়ালনী ক্ষিদের অস্থির হয়ে বনের মধ্যে বেরিয়ে পড়েছে। কোথাও কোন খাবার খুঁজে পায় না। শিয়ালনী বলল, "দেখ, আজ আমাদের হয় খাবারের অভাবে, নয় সেই হতভাগা সিংহটার হাতে মরতে হবে দেখছি।" শিয়াল বল্‌ল, "সাবধানে চল, ক্ষিদের জ্বালায়ও ত আর পারি না।" এই ব'লে যেই তারা একটু এগিয়েছে অমনি সমস্ত বন কাঁপিয়ে সিংহের গর্জ্জন শোনা গেল। শিয়ালনী বলিল, "এই বারেই সব শেষ, ঐ যে সেই হতভাগাটার ভয়ানক মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে। আমার ত যেন শরীর এখনই অসাড় হয়ে আস্‌ছে!" শিয়াল বলল, "চুপ। ঠিক হয়ে দাঁড়াও, একবার শেষ চেষ্টা ত ক'রে দেখি।"

এই ব'লে সে গুটি গুটি ক'রে সিংহের সামনে এগিয়ে চল্‌ল। শিয়ালনী আর কি করে, সেও ধীরে ধীরে শিয়ালের পিছনে পিছনে যেতে লাগল। শিয়াল সিংহের সামনে গিয়ে কায়দা মাফিক দণ্ডবৎ ক'রে যেই দাঁড়িয়েছে, অমনি ভীষণ চীৎকার ক'রে সিংহ জিজ্ঞাসা করল, "কি, পালাচ্ছিলি কোথায়? কারও যে আর দেখাই পাওয়া যায় না। আজ তোদের কি দশা করি দেখ্।"

শিয়াল হাতজোড় ক'রে বল্‌ল, "মহারাজ, আপনারই দর্শনে আস্‌ছিলাম। কিন্তু পথে এক মহাবিঘ্ন।" সিংহ বল্‌ল, "বিঘ্ন আবার কি? এসব চালাকি আমার কাছে খাটবে না। আমার রাজত্বে থেকে আমাকেই ফাঁকি দিতে চাস্, এত বড় আস্পর্দ্ধা।"

শিয়াল বলল, "মহারাজ, আপনি বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু এই মাইল খানেক দূরে আর এক সিংহ এসে আস্তানা গেড়েছে। আমাকে সে ত কিছুতেই ছাড়বে না।—বলে, 'কে তোদের রাজা? আমিই এ বনের প্রভু, আবার কে কোথায় আছে?' আমি অনেক ব'লে ক'য়ে অনুমতি নিয়ে হুজুরের দর্শনে এসেছি, আবার এখনি ফিরে যাব, এই রকম ঠিক হয়েছে, না হলে সে নাকি অনর্থ ঘটাবে।"

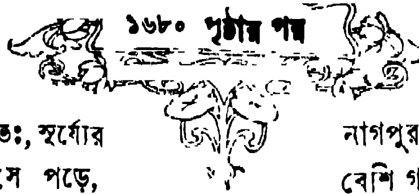
সিংহ ত একথা শুনে রেগে অস্থির। বলল, "আমাকে এত বড় অপমান! কোথাকার কে উড়ে এসে জুড়ে ব'সে বলে কি না সে-ই এখানকার রাজা! চল্ ত দেখে আসি, কত বড় তার বুকের পাটা!"

শিয়াল বনের মধ্যে দিয়ে পথ দেখিয়ে সিংহকে এক প্রকাণ্ড কূয়ার কাছে নিয়ে গেল। বলল, "মহারাজ, দেখুন আপনার আস্‌বার সাড়া পেয়ে বোধ করি সে ভয়ে এই গর্ত্তের মধ্যে লুকিয়েছে। এইখানেই তাকে আমি দেখেছিলাম।"

সিংহ এক লাফে কূয়ার পাড়ে গিয়ে ভিতরে তাকাল। পরিষ্কার জলের মধ্যে তারই মুখের ছায়াকে অন্য সিংহ মনে ক'রে সে ভীষণ গর্জ্জন ক'রে উঠল। কূয়ার মধ্য দিয়ে আরো জোরে সেই গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি উঠে তাকে রাগে অস্থির ক'রে তুল্‌ল। ভীষণ আক্রোশে অন্য সিংহকে আক্রমণ করবার জন্য লাফ দিয়ে সে কূয়ার মধ্যেই পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গেই গভীর জলের নীচে তলিয়ে গেল। শিয়াল মনের আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়ী ফিরে গেল।



পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু কি এক রকমই ঠাণ্ডা?


১৬৮০ পৃষ্ঠার পর

পৃথিবীর উপর একটা যায়গা অন্য যায়গার চেয়ে কম বা বেশি ঠাণ্ডা কেন হয়, তার কতকগুলো কারণ আছে। প্রথমতঃ, সূর্য্যের আলো যে-সব যায়গায় সোজা এসে পড়ে, স্বভাবতঃ সে যায়গাগুলো গরম হবে। যেখানে তা যত বাঁকা হ'য়ে এসে পড়ে, সে যায়গা তত কম গরম হবে। এই কারণেই পৃথিবীর বিষুবন্ রেখার নিকটের যায়গা গরম যায়গা হ'য়ে উঠেছে, আর মেরু প্রদেশে ঠাণ্ডার অবধি নেই। এই দিক দিয়ে বিচার ক'রে দেখতে গেলে এই পাওয়া যাবে যে, উত্তর আর দক্ষিণ মেরুতে প্রায় একই রকমের শীত হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয় না। দুটো দেশই ঠাণ্ডা বটে, আর ভয়ানক ঠাণ্ডা, তাতেও কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু দক্ষিণ মেরুর ঠাণ্ডা, উত্তর মেরুর ঠাণ্ডা অপেক্ষা অনেক বেশী। এর কারণ কি?

তোমরা বোধ হয় এই কথাটা জান যে, যে-সব যায়গা সমুদ্রের কাছে থাকে, সে-সব যায়গায় শীত বা গ্রীষ্ম খুব প্রখর হয় না। পুরী, বোম্বাই বা করাচী সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। খবরের কাগজে এদের দিনের বেলায় গরম হ'য়ে ওঠা আর রাত্রিতে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবার সংবাদ বেরোয়। ভারতবর্ষের মধ্যে সমুদ্রের নিকটে নয় এমন যে কোন সহরের গরম আর ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবার সঙ্গে এদের গরম বা ঠাণ্ডা হওয়ার তুলনা কর। ধর, নাগপুর বা জব্বলপুর। এলাহাবাদ, দিল্লী বা লাহোরের কথা বল্লাম না, কারণ, এ সহরগুলি পুরী বা করাচীর চেয়ে অনেক উত্তরে। পুরী বা করাচীর তুলনায় নাগপুর বা জব্বলপুর গ্রীষ্মকালে অনেক বেশি গরম আর শীতকালে অনেক বেশি ঠাণ্ডা সহর। জলের একটি গুণ আছে। জল গরম বা ঠাণ্ডা হ'তে অন্য যে কোনও জিনিসের চেয়ে অনেক বেশি তাপের প্রয়োজন হয়। তাই যে পরিমাণ তাপ দিলে জল সামান্য একটু মাত্র গরম হ'য়ে ওঠে, বা যে পরিমাণ তাপ জল থেকে ব'ার ক'রে নিলে জল অতি সামান্যই ঠাণ্ডা হয়, সেই পরিমাণ তাপ সেই জলের পরিমাণের অন্য যে কোনও জিনিসে দিলে সে জিনিস হয় ত এত উত্তপ্ত হ'য়ে উঠবে যে, তা বাষ্প হ'য়ে উড়ে যাবে। অপর পক্ষে, সেই পরিমাণ তাপ সেই জিনিস থেকে কোনও উপায়ে ব'ার ক'রে নিলে সেই জিনিসের তাপাংশ এত ক'মে যাবে যে, তার কাছে বরফের মত ঠাণ্ডা জিনিসও যথেষ্ট উত্তপ্ত বোধ হবে। এই জন্যই বিস্তীর্ণ জলভাগ আর তার সঙ্গে সঙ্গে জলভাগের কাছের যায়গাগুলি গরম বা ঠাণ্ডা হ'তে অনেকটা তাপের প্রয়োজন হয়। তাই তাপের পরিমাণ সমান হ'লেও সমুদ্র কখনও খুব বেশি ঠাণ্ডা বা খুব বেশি গরম হ'য়ে উঠতে পারে না। অপর পক্ষে, পৃথিবীর মধ্যে স্থলভাগের ভিতর এমন সব যায়গা আছে, যেখানে রাত্রে বরফ জমে আর দিনে রৌদ্রের প্রখরতায় তাপাধিক্য বশতঃ (Heat stroke) মানুষের মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়।

উত্তর মেরুটি একটি সমুদ্র আর দক্ষিণ মেরু একটি বেশ বড় স্থলভাগ। সূর্য্যের আলো দু-যায়গাতেই সমানভাবে তেরছা হ'য়ে পড়ার জন্যে দু-যায়গায় তাপের পরিমাণ সমান হওয়া সত্ত্বেও উত্তর মেরুর চেয়ে দক্ষিণ মেরুর তাপাংশ অনেক নীচে নেমে যায়; কাজেকাজেই সেখানে শীতও হয় বেশি।

এ ছাড়া দক্ষিণ মেরুর বেশি ঠাণ্ডা হওয়ার আরও কারণ আছে। সূর্য্যের আলো পৃথিবীতে এসে প'ড়ে প্রথমে পৃথিবীকে গরম করে। এই গরম পৃথিবী আস্তে আস্তে তার চতুর্দ্দিকের বায়ুমণ্ডলকে গরম ক'রে তোলে। এই কারণে বায়ুমণ্ডলের যে অংশ পৃথিবীর স্থল এবং জলভাগের সঙ্গে লেগে আছে, তা উত্তপ্ত হয় সর্ব্বপ্রথমে, আর তার যে অংশ পৃথিবীর থেকে যত উঁচুতে থাকে, তার উত্তপ্ত হ'তে তত দেরী হয়। শুধু যে দেরী হয়, তা নয়, সে ততটা উত্তপ্ত হ'তেও পারে না। এইজন্যেই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যতটা উঁচুতে ওঠা যায়, শীত তত বাড়তে থাকে। সমতল যায়গার চেয়ে পাহাড় অনেক উঁচুতে থাকে, সেই জন্যে পাহাড়ে শীতও বেশি হ'য়ে থাকে। দক্ষিণ মেরু যে খুব বড় স্থলভাগ, তাই নয়, তার উচ্চতাও উত্তর মেরুর তুলনায় অনেক বেশি। এই কারণেও দক্ষিণ মেরুতে শীতের পরিমাণ উত্তর মেরুর চেয়ে অনেক বেশি।

গ্লাসের জলে বরফ দিলে গ্লাসের গা বেয়ে জল গ'লে আসে কেন ?

গ্লাসের জলে বরফ দিলে জল যেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়, গ্লাসের গা-টা প্রথমে ভিজে ওঠে, তার পর বিন্দু বিন্দু জল দেখা যায়, অবশেষে এত জল গড়াতে থাকে—মনে হয়, যেন গ্লাসটা ফুটো হ'য়ে গিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে গ্লাসটা একটুও ফুটো হয় না। তবু এত জল যে এসে জমা হয়, তার কারণ কি ?

বাতাসের মধ্যে অনেক জলকণা বাষ্প হ'য়ে লুকিয়ে থাকে। বাতাসের কণাকে যেমন আমরা দেখতে পাই না, তেমনি এই বাষ্পাকারের জলকণাও আমাদের দৃষ্টির অগোচর থাকে। এই কারণে সাধারণতঃ বাতাসের মধ্যে জলের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বাতাসের মধ্যে জলকণা এইভাবে বাষ্পাকারে অগোচর থাকলেও যত ইচ্ছে তত থাকতে পারে না। এর থাকার একটা সীমা আছে। বাতাস কত গরম, তার উপর এই সীমা নির্ভর করে। বাতাস যত গরম হয় তার মধ্যে জলকণা থাকবার ক্ষমতা তত বেড়ে যায়। অপর পক্ষে বাতাস যত ঠাণ্ডা হয় তার মধ্যে জলকণা থাকবার ক্ষমতাও তত কমে যায়। গরম বাতাস, যার মধ্যে অনেক জলকণা বাষ্প হ'য়ে ভ'রে আছে, যদি ঠাণ্ডা হ'তে আরম্ভ হয়, তবে কিছুক্ষণ পরে বাতাসটা যথেষ্ট ঠাণ্ডা হ'লে পর সে আর তত পরিমাণ জলকণা বাষ্পভাবে নিজের মধ্যে ধ'রে রাখতে পারে না—খানিকটা নিজের থেকে বাহিরে বা'র ক'রে দেয়। এই বেরিয়ে-আসা জলের কণাগুলো যেখানে সুবিধে পায় তার ওপর জমা হ'তে থাকে।

তোমরা যখন গ্লাসে বরফ ছাড়, গ্লাসের জলটা ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসের গা-টাও ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। এই ঠাণ্ডা যায়গায় বাতাস এসে লাগে আর ক্ষণকালের জন্য এই বাতাসের তাপাংশও অনেক ক'মে যায়। বাতাসের তাপাংশ ক'মে গেলেই তা'র ভিতরের জলকণাগুলো আর বাষ্পভাবে থাকতে পারে না—বেরিয়ে পড়ে, আর গ্লাসের ঠাণ্ডা গায়ে গিয়ে জমা হ'তে থাকে। ক্রমে ক্রমে এত বেশি জমা হ'য়ে ওঠে যে, গা বেয়ে নীচে গড়িয়ে যায়।

তাই যে জল গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, তা গ্লাসের ভেতরের জল নয়। আর তা গ্লাস ফুটো হ'য়েও বেরিয়ে আসে নি। গ্লাসের ভিতরের জল যদি কোন উপায়ে বাইরে চ'লে আসত, তবে তার পরিমাণ কমে যেত। কিন্তু ভিতরের জলের পরিমাণ একটুও কমে কি ?

মেঘ কেমন ক'রে বাতাসে ভেসে থাকে ?

মেঘ জল-কণা দিয়ে তৈরী, তা বলাতে কোনই বাহাদুরী নেই। কিন্তু এখন তার অবস্থা বাষ্পের অবস্থা নয়। তাই বাতাস তাকে নিজের রাজ্য থেকে বাইরে বা'র ক'রে দেয়। এই ভাবে বাইরে বেরিয়েছে ব'লেই আমরা মেঘকে দেখতে পাই। বাতাসের মধ্যে যখন মিশে থাকে তখন তা আমাদের অগোচর থাকে, তা তোমাদের পূর্ব্বেই বলেছি।

বাতাসের মধ্যে থেকে জলকণা যখন মেঘ হ'য়ে বেরিয়ে আসে, তখন সে খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুভাবে থাকে। তোমরা কুয়াসা দেখেছ। কুয়াসার কণাগুলো যেমন অতিশয় ক্ষুদ্র কণা, এও তেমনিই। মেঘের মধ্যে গেলে কুয়াসার মধ্যে ঢোকবারই অনুভূতি হয়। অতএব মেঘ যে জলবিন্দু দিয়ে তৈরী, তা অসম্ভব রকমের ছোট। কত ছোট

শুনবে ? এই রকমের প্রায় এক কোটী জলবিন্দু এক সঙ্গে হ'লে তবে এক ফোঁটা বৃষ্টি তৈরী হয়।

এই এত ছোট আর কাজেকাজেই এত হাল্কা জলবিন্দু এও কিন্তু বাতাসে স্বাধীনভাবে ভেসে থাকতে পারে না। বাতাসের মধ্যে যদি একটুও স্রোত বা একটুও গতি না থাকে তবে এরাও নীচে পড়তে আরম্ভ করে। তাই স্থির বাতাসের মধ্যে মেঘও ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসে। এই নীচে নেমে আসবার গতি এক মিনিটে প্রায় আট ফুট।

কিন্তু বাতাসের স্থির হ'য়ে থাকা একটা অসম্ভব কথা। অস্থিরতার প্রতিযোগিতায় সে তোমাদের যে কোন ছেলেকে হার মানাতে পারে। বাতাস যখনি অস্থির হয়, মেঘ তখনি নিজের সুবিধা ক'রে নেয়। তখন সে বাতাসের কাঁধে চেপে মজা ক'রে আকাশে ভেসে বেড়ায়।

বিদ্যুৎ কত দূরে চমকাল, আন্দাজ করতে পারা যায় কি ?

যখন বিদ্যুৎ চম্‌কায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরে শব্দও হয়। নিকটে কোথাও যদি বাজ পড়ে, তবে তার আলোর চেয়ে তার শব্দটাতেই আমরা বেশি অস্থির হ'য়ে উঠি আর একটু বড় হ'লে কানে হাত চাপা দিই, আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ত মার কোলের মধ্যে গিয়ে লুকোয়। তোমরা জান যে, আলো প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলোর এই অসম্ভব গতির জন্যে যে মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎ চমকায়, প্রায় সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের চোখে তার আলো এসে লাগে। কিন্তু বিদ্যুৎ চম্‌কাবার সময় যে শব্দ তৈরী হয়, তা কিন্তু অত তাড়াতাড়ি আসতে পারে না। এই জন্যই একটু দূরে যদি বিদ্যুৎ চম্‌কায়, তার শব্দটা আমাদের কাছে আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। বর্ষাকালে কিংবা বাষ্পে ভরা বাতাসের মধ্যে দিয়ে শব্দের ঢেউ চ'লে আসবার সময় এক সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট যেতে পারে। তাই বিদ্যুৎ চমকাইবার সময় তার আলো দেখা, আর শব্দ শোনার মধ্যে সময়ের ব্যবধানটা ধরতে পারলেই ব'লে দেওয়া সম্ভব, কতদূরে বিদ্যুৎটা চম্‌কে উঠ্‌ল। অতএব কতদূরে বিদ্যুৎটা চম্‌কাল যদি জানতে চাও, তবে হাতে একটা ঘড়ি নাও। যে মুহূর্ত্তে আলোটা দেখতে পেলে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঘড়িটার সেকেণ্ডের কাঁটাটা কোথায় আছে দেখে নাও। মিনিটের কাঁটাটার থাকবার যায়গাটা দেখলে কিন্তু চলবে না, মনে রেখো। তার পর কড়াৎ ক'রে যখন ভয়ানক শব্দটা আরম্ভ হবে তখন আবার সেকেণ্ডের কাঁটাটা কোথায় আছে, ভাল ক'রে দেখে নাও। মনে কর, যখন বিদ্যুৎ চম্‌কাল তখন সেকেণ্ডের কাঁটাটা ১৮-র ঘরে ছিল, তারপর যখন আওয়াজটা হ'ল তখন সেটা ছিল ৩২এ ঘরে। অতএব শব্দ আর আলোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান হয়েছে (৩২-১৮) = ১৪ সেকেণ্ড। শব্দের গতি পূর্ব্বে বলিয়াছি এক সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট। অতএব ১৪ সেকেণ্ডে শব্দটা এসেছে ১৪ × ১১০০ = ১৫৪০০ ফুট দূর থেকে। এক মাইলে ৫২৮০ ফুট হয়। অতএব বিদ্যুৎটা কত মাইল দূরে চম্‌কেছে, যদি বলতে চাও, ১৫৪০০ ফুটকে ৫২৮০ দিয়ে ভাগ কর। দেখতে পাবে ৪৩০ ফুট কম তিন মাইল দূর থেকে শব্দটা আসছে

মাকড়সা নিজের জালে কেন নিজেই জড়িয়ে যায় না ?

মাকড়সা জাল তৈরী করবার সময় জালটার সুতোতে একরকম আঠা মাখিয়ে দেয়, তাই মাছি কিংবা ছোট ছোট পোকা এই জালে এসে লাগলে পর তাদের পায়ে তাদের পাখায় এই আঠা লেগে যায়। তখন তারা যদি ঝটপট ক'রে ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করে, তখন জালটা আরও শক্ত হ'য়ে চারিদিক দিয়ে তার গায়ে লেগে গিয়ে তাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন ক'রে তোলে। কিন্তু মাকড়সাটা যখন তার জালের এধার থেকে ওধারে যায় তখন তার গায়ে জালটা লেপ্‌টে যায় না কেন ?

মাকড়সার সর্ব্বশরীরে—তার পায়ে, তার গায়ে সব যয়গায় এক রকম চুলের মত কাঁটা থাকে। মাকড়সাটা তার শরীরের এই কাঁটাগুলোর গায়ে একরকম চর্ব্বির মত জিনিস লাগিয়ে নেয়। মানুষ যেমন ক্রীম আর পাউডার মাখে, এও তেমনি আর কি। এই তেলের মত জিনিসটাই মাকড়সাকে তার নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়া থেকে বাঁচায়।

অনেক এমন মাকড়সা আছে যারা জলে থাকে। তারা জলে থাকলেও তাদের গা একটুও ভিজে না। ডাঙ্গার মাকড়সার মত তারাও সর্ব্বাঙ্গে তেল মেখে জলে নামে বলেই তাদের শরীর জলের ভিতরেও শুকনো থাকে।

লোহা গরম হ'লে লাল হয় কেন ?

পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস কতকগুলো কণা এক সঙ্গে হ'য়ে তৈরী হয়েছে। যাকে তুমি শক্ত আর অখণ্ড দেখছ বাস্তবিক পক্ষে তা মূলত: একটা অখণ্ড জিনিস নয়। লোহার মত শক্ত আর নিরেট জিনিসও অনেকগুলো লোহার কণা একত্র হ'য়ে তবে তৈরী হয়েছে আর এই কণাগুলো আবার পরস্পরের গায়ে গায়ে লেগেও নেই।

এই যে কণাগুলোর কথা বললুম' এরা সর্ব্বদা নিজের ঘাড়ে এক টুকরো বিদ্যুৎ নিয়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়। সত্য কথা বলতে কি, এরা নিজেরাই এই বিদ্যুতের টুকরো দিয়ে তৈরী। বিদ্যুতের একটা নিয়ম আছে। সে যদি চলতে চলতে থেমে যায়, বা তার চলার বেগ পরিবর্ত্তিত হয়, তবে তার চতুর্দ্দিকে সে কতকগুলো জিনিস ছড়িয়ে দেয়। যে জিনিসটা এই রকম ক'রে ছড়িয়ে পড়ে, আগেকার বৈজ্ঞানিকেরা তাকে বলতেন ইথারের তরঙ্গ। আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা এর নাম দিয়েছেন "আলোর কণা।" অর্থাৎ বিদ্যুৎ যদি নড়ে চড়ে, তবে তা থেকে আলোর কণা ছিটকে বেরোয়। তোমাদের আগেই বলেছি, জিনিসের কণাগুলো অনবরত নড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ের বিদ্যুৎও অনবরত নড়ছে। ফলে এই দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক জিনিসই সব সময় তা থেকে অনবরত আলো ছড়াতে থাকে।

এই আলো আমরা কিন্তু দেখতে পাই না। তার একমাত্র কারণ এই যে, আমাদের চোখের তা দেখবার সাধ্য নেই। আমাদের চোখ যদি সব রকমের আলোর কণা ধ'রে তা'র অনুভূতি আমাদের গোচর করতে পারত, তবে এই বিশ্ব সংসারে কোথাও আর অন্ধকারের লেশ পাওয়া যেত না। এমন কি, চোখ বুজলেও না। আমাদের চোখ কেবল মাত্র লাল, হলদে, সবুজ, নীল ইত্যাদি রঙ্ বা এদের সংমিশ্রণে যে রঙ্ তৈরী হয়, সেই রঙ্ই দেখে। এ ছাড়াও যে কত রকমের আলো আছে, তার আর শেষ নেই।

এইবার লোহার কথা বলা যাক্। তোমরা জান যে, ঠাণ্ডা অবস্থাতেও লোহার কণাগুলো নড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে অদৃশ্য আলো বের হচ্ছে। লোহাকে সামান্য একটু গরম কর— অর্থাৎ তার কণাগুলোর নড়াচড়া একটু দ্রুততর ক'রে তোল। এইরকম করলেই লোহাটা থেকে কতকগুলো আরও নূতন রকমের আলো বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করে। লোহাটাকে যত বেশী গরম করবে, অর্থাৎ লোহার কণাগুলোর এই নড়াচড়া যত বেশী দ্রুত হ'তে থাকবে, লোহাটাও অনবরত নূতন নূতন রকমের আলো ছড়াতে ছড়াতে চল্‌বে। এর পরও যদি তা ক আরও গরম করা যায়, তবে তার কণাগুলোর বেগ এত বেড়ে যাবে যে, আমাদের চোখ যে আলোতে প্রথম সাড়া দিয়ে ওঠে, সে আলোও তারা ছড়াতে আরম্ভ করবে। এই যে আলোর কথা বল্লেম চোখ একে লাল রঙের দেখে। এই জন্যেই লোহাকে উত্তপ্ত করলে লাল বলে মনে হয়।

এর পরও যদি তাকে উত্তপ্ত করার মাত্রা আরও বাড়িয়ে চল, তবে চোখ যে-সব রঙ্ দেখতে পায় ক্রমে ক্রমে তা'র সুব কয়টাই ছড়াতে থাকবে। প্রথমে সে লাল রঙ্ ছড়িয়েছে। লালের পর সে হল্‌দে রঙ্ দেবে, তারপর সবুজ, নীল, বেগুনী সবই। আর এই অবস্থায় লাল, হলদে, সবুজ, নীল সব রঙ্ এক সঙ্গে মিশে গিয়ে লোহাটাকে একেবারে শাদা ক'রে ফেল্‌বে। তাই গরমের প্রথম অবস্থায় লোহা থাকে লাল, কিন্তু শেষে বেশী গরম হ'লে হ'য়ে ওঠে শাদা। এই অবস্থাটাকে ইংরাজীতে White hot হওয়া বলে।

গরম হ'লে শুধু লোহাই যে এইভাবে আলো ছড়ায়, তা নয়। পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসই এ অবস্থায় একই রকম আচরণ করে। সব জিনিসই তার উত্তপ্ত হবার অবস্থাটা যখন সেণ্টিগ্রেডের ৬৫০ তাপাংশে পৌঁছায়, তখন লাল হ'তে আরম্ভ হয়। তারপর এই তাপাংশ সহ্য ক'রে যদি সে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়, বাষ্প হ'য়ে উড়ে না যায়, তবে ক্রমে ক্রমে white heat অবস্থায় চলে যায়। White heat-এর সময় তাদের তাপাংশ প্রায় সেণ্টিগ্রেডের ১৫০০ দাগে গিয়ে ওঠে। সূর্য্য এত উজ্জল, তার কারণ, সূর্য্য অত্যন্ত গরম। সূর্য্যের বাইরের আবরণটারই উষ্ণতা সেণ্টিগ্রেডের ৬০০০° ছয় হাজার তাপাংশ।



প্রাচীনকালের শরীর-চর্চ্চা

ওলিম্পিয়া

[শরীর-চর্চ্চা বা ব্যায়াম ও খেলা-ধূলার ইতিহাস অতি-প্রাচীন। সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতেই ইহা নানা আকারে নানাদেশে চলিয়া আসিতেছে। আমরা এখানে পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান যুগে যে সমুদয় খেলা-ধূলা চলিয়া আসিতেছে, তাহার ইতিহাস বলিব।]

গ্রীসদেশের ওলিম্পিয়ার কথা বলিবার পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রাচীন যুগের নানাদেশের লোকের খেলা-ধূলা ও ব্যায়াম-বিধানের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

মিশর, আসিরিয়া, বেবিলন, ভারতবর্ষ ও চীন দেশের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। সে সকল দেশের অনেক কীর্ত্তি চিহ্ন মাটি খুঁড়িয়া বাহির হইতেছে। সে সকল কীর্ত্তি চিহ্নের মধ্যে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে, দেবমন্দিরের প্রাচীর আছে, সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির বাসগৃহ আছে, পাঠাগার বা লাইব্রেরী আছে, উদ্যান-বাটী আছে এবং স্তূপ ও স্তম্ভ রহিয়াছে। ঐ সকল স্তূপ ও স্তম্ভের গায়ে আমরা যেমন খোদিত লিপি দেখিতে পাই, তেমনি দেখিতে পাই সেকালের লোকের সামাজিক চিত্র, যুদ্ধের চিত্র, শিকারের চিত্র, খেলা ধূলার চিত্র, নৃত্যের চিত্র, বল খেলার চিত্র এবং ব্যায়াম ও কুস্তীর চিত্র।



কুস্তীর চিত্র—প্রাচীন মিসর

প্রাচীন মিসরের সমাধি-প্রাচীরে সেকালের মিসর-বাসীর অনেক কুস্তীর খোদিত চিত্র রহিয়াছে।

চীন

এসিয়া মহাদেশের চীন অতি-প্রাচীন দেশ। দেশ যেমন প্রাচীন, ইহার সভ্যতাও তেমনিই প্রাচীন। কিন্তু চীনদেশে শারীরিক শিক্ষাবিধানের বিশেষ কোনও ব্যবস্থা ছিল না। তাহার কারণ, সেকালে বিদেশীয় আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল অতি-কম তার পর চীনদেশে কোনও সরকারী বিদ্যালয়ও সে যুগে ছিল না। উচ্চশ্রেণীর বালকেরা বেসরকারী

বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিত। বালিকাদের মধ্যে পড়াশুনার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ঐ সব বিদ্যালয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কনফুসিয়াসের ধর্ম্মনীতি পড়ান। যে সব ছেলে স্মৃতি হইতে আগাগোড়া তাহা পুনরায় যথাযথ লিখিতে পারিত, তাহারাই পরম পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইত। প্রতিযোগী পরীক্ষায় চীনদেশের সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। চীন জনগণের মধ্যে শারীরিক শিক্ষাবিধানের কোনও সাধারণ ব্যবস্থাই ছিল না।

২৬০০ খৃঃ পূঃ অব্দে একজন চীনধর্ম্মযাজক কোং ফু (Cong Fu) নামে এক প্রকার ব্যায়ামের বিধান করিয়াছিলেন। উহা কতকটা হস্ত, পদ ইত্যাদি সঞ্চালন করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া—কতকটা আমাদের দেশের প্রাণায়ামের মত। চীনদেশের সৈনিকেরা অবশ্য যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিবার সময়ে সামরিক বিধানমত শরীর-চর্চ্চা করিত। কোন প্রকার ব্যায়ামজনিত জাতীয় খেলাধূলা চীনদেশে ছিল না। একমাত্র ঘুড়ি উড়ানই ছিল চীনাদের প্রধান আমোদজনক ক্রীড়া। তাহা এখনও আছে।

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসও অতি-প্রাচীন। ভারতবাসী সাধারণতঃ ধর্ম্মানুরাগী। ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষকে অলস করিয়া তুলিলেও ভারতবর্ষে নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক, খেলাধূলা ও শারীরিক ব্যায়াম বিধানের সবিশেষ প্রচলন ছিল। বিদেশী পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতবর্ষে নিয়মিত ভাবে শরীর-চর্চ্চা বা ব্যায়াম শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বেদে প্রাচীন ভারতের ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম সম্বন্ধে অনেক কথার উল্লেখ আছে। "রামায়ণ" ও "মহাভারত" পড়িলে এ বিষয়ে অনেক কথা জানা যায়। শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ প্রভৃতি অতি অল্প বয়সেই শারীরিক ব্যায়ামপটুতায় এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় অসাধারণ কৃতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহাভারতে অর্জ্জুনের অস্ত্রশিক্ষার কথা তোমরা হয়ত পড়িয়াছ। সেকালে এই সব ব্যায়াম-বিধি ও অস্ত্রবিদ্যার কৌশল প্রভৃতি দেখিবার জন্য লোকের কিরূপ আগ্রহ ছিল, তাহা "মহাভারত" হইতে নিম্নে যে অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারিবে।

—"কুমারগণ সত্বরবাহী অশ্বারোহণে নামাঙ্কশোভিত বিবিধ বাণসকল লঘুতা পূর্ব্বক ক্ষেপণ করত লক্ষ্য ভেদ করিতে লাগিলেন। তখন দর্শকগণ, ধনুর্ব্বাণধারী কুমারগণের গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় সেইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কুমারগণ **শরাসনে, রথচালনে, গজপৃষ্ঠে, অশ্বপৃষ্ঠে, বাহুযুদ্ধে** নানা প্রকার পন্থা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে খড়্গচর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় প্রহারে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্দেশ্যানুযায়ী বিবিধ প্রকার অসি-সঞ্চালন প্রদর্শন করত সমস্ত রঙ্গভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ সেই কুমার বীরগণের অসিচর্ম্ম প্রয়োগ বিষয়ে দ্রুতহস্তত্ব চতুরতা স্থিরতা, মুষ্টির দৃঢ়ত্ব ও অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

তারপর একলব্যের গুরু দক্ষিণা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সেকালে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই শারীরিক শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমান সময়ের কুস্তী ছিল সেকালে বাহুযুদ্ধ। ভীম ও জরাসন্ধের পরস্পরে বাহুযুদ্ধ হইয়াছিল। ভীম বহুবিধ বন্ধকৌশল দ্বারা জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন।

ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন যুগের গদাযুদ্ধ অর্থাৎ মুগুর ভাঁজা, তীর ছোঁড়া, দৌড়াদৌড়ি এইরূপ নানারূপ ব্যায়াম বিধান এখনও প্রচলিত আছে।

জাতকের অনেক গল্পেই ভারতবর্ষের নানা ক্রীড়া কৌতুকের ইতিহাস আছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থে সেকালের খেলা ধূলা ও ব্যায়াম শিক্ষার অতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা রহিয়াছে।

পারস্য

পারস্য দেশে কুরুস্ (Cyrus) যখন পারস্যের সম্রাট্ ছিলেন, তখন সেদেশে শারীরিক শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের অত্যন্ত লক্ষ্য ছিল। তখন বিদ্যা শিক্ষা অপেক্ষা শরীর চর্চ্চার দিকেই সাধারণ লোকের আগ্রহ ছিল। পারস্য দেশের বালকেরা তীরধনু ছুঁড়িতে, অশ্বারোহণে দক্ষতালাভ করিতে এবং সত্য কথা বলিতে শিক্ষালাভ করিত। সেকালের পারসিক বালক, কেবলমাত্র ছয় বৎসর বয়স হইতেই শারীরিক ব্যায়াম এবং যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য রাজসরকার হইতে শিক্ষা লাভ করিত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পারসিক বালকেরা ব্যায়াম শিক্ষার জন্য সহরের বাহিরের বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে যাইয়া সমবেত হইত। সেখানে তাহারা দৌড়াদৌড়ি করিত, ভার উত্তোলন করিত, তীর ছুঁড়িত এবং বল্লম নিক্ষেপ করিতে শিক্ষা লাভ করিত। সাতবৎসর বয়স হইতে তাহাদিগকে ঘোড়ায় চড়িতে শিক্ষা দেওয়া হইত। অশ্বারোহণে বিশেষ পটুতা লাভ

করিলে পর তাহাদিগকে লইয়া বনে ও জঙ্গলে শিকার শিক্ষা দেওয়া হইত। রাজসরকারের কোনও যোগ্য কর্মচারীরা এই শিশু-শিকার-বাহিনী পরিচালনা করিতেন। কখনও তাহারা সিংহ শিকার করিত, কখনও বা চিতাবাঘ, কখনও বা বন্যশূকর কখনও বা মৃগ শিকার করিয়া তাহাদের শিকার-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিত।

শিকার শেষে তাহারা যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিত, তখন আবার ধনুর্বিদ্যা, অশ্বারোহণ বিদ্যা এবং নানা প্রকার শারীরিক উন্নতিমূলক ব্যায়াম-প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়া সময় অতিবাহিত করিত। এইরূপ শিক্ষাকালে সময় সময় তাহাদের অস্ত্রনির্ম্মাণ সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হইত। এইভাবে পাঁচ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত ইহাদের শিক্ষা-কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল। তারপর পনের বৎসর বয়স হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক পারসিককে সৈন্যদলভুক্ত থাকিতে হইত।

এইভাবে পারসিক জাতি ব্যায়ামচর্চ্চার দ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্য করিবার শক্তিলাভ করিয়াছিল। সেকালের পারসিক নৃপতিদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—দেশ জয় করা এবং বিজিত দেশের লোকদিগকে দমন রাখা। এইজন্যই তাহারা সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে—এক কথায় সংস্কৃতির (Culture) দিকে লক্ষ্য করিতেন না। মিসর, ফিনিশীয়, বেবিলন এবং অন্যান্য বিজিত দেশের লোকেরা এইজন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়া পারসিকদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। এজন্যই পারসিক সম্রাটদের প্রভুত্বশক্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে পারসিকদের বিশেষ অবনতি হইয়াছিল এবং এইজন্যই দিগ্বিজয়ী বীর আলেকসন্দর অতি সহজে পারস্য সম্রাজ্য জয় করিতে পারিয়াছিলেন।



জিউস্‌দেবের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

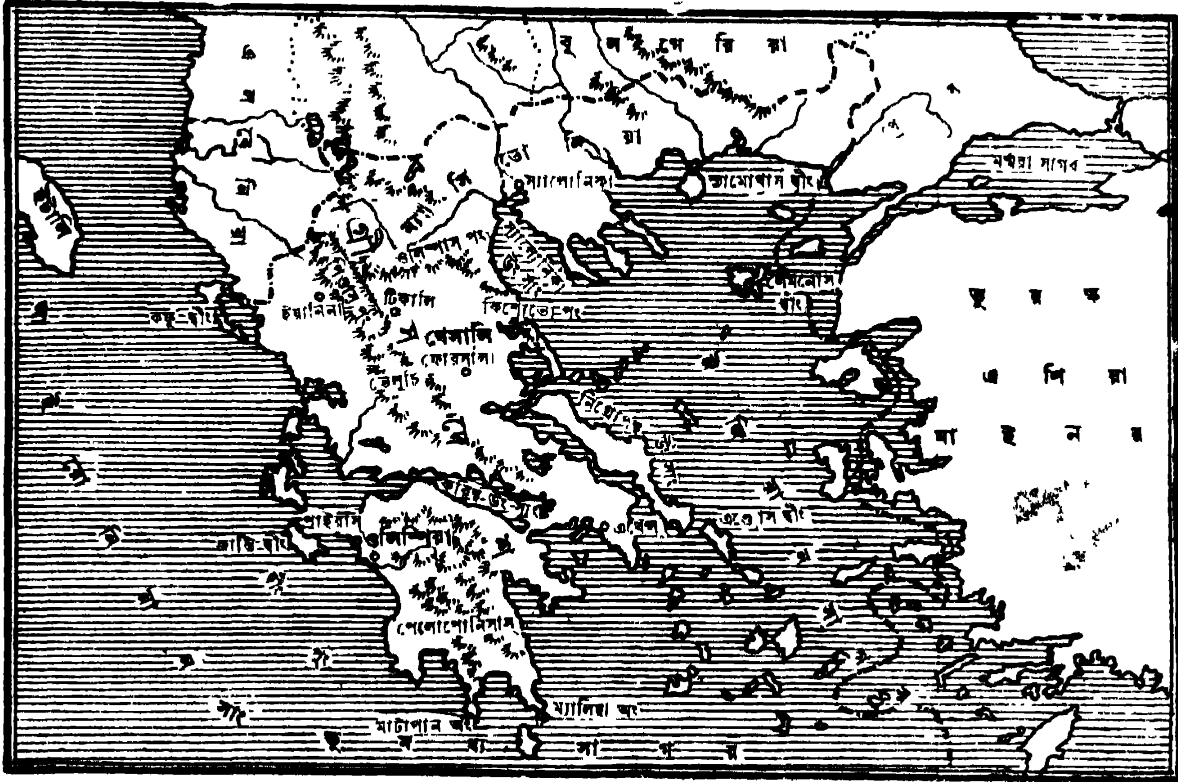
গ্রীস দেশ

সেকালে গ্রীস্ দেশে ওলিম্পিয়া (Olympia) নামে একটি ক্রীড়া ক্ষেত্র ছিল। সে সময়ে গ্রীকেরা ঐ স্থানটিকে পবিত্র তীর্থস্থানের ন্যায় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। তোমরা গ্রীসের মানচিত্রখানি খুলিলে আইয়োনিয়ান (Ionian) সাগর দেখিতে পাইবে, এই সাগরের তীর হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে পেলোপোনিসাস্ (Peloponesus) নামক পর্ব্বতের পশ্চিম প্রান্তে আলফিয়াস্ নদীর তীরে এলিস্ (Elis) নামক একটি নগর ছিল। এই নগরের মধ্যস্থিত

পর্ব্বত-উপত্যকার ছিল ওলিম্পিয়ার পবিত্র ক্রীড়া-ক্ষেত্র। সেকালে এই ওলিম্পিয়ার শোভা ও সৌন্দর্য্য ছিল অনুপম।

শ্যামল উপত্যকার গায়ে ছিল সুন্দর সুন্দর ফলবান্ তরু ও মনোরম পুষ্পোদ্যান। আর সেই সব উদ্যানের ভিতর বিখ্যাত জিউস্ (Zeus) দেবতার মন্দির। জিউস্ দেবতার মন্দির যেমন ছিল স্থাপত্য গুণে শ্রেষ্ঠ, তেমনি ছিল দেবতার মূর্ত্তিটি অপরূপ এইটিও ছিল একটি। ডিও ক্রিসোস্টোম্ (Dio Chrysostom) নামক একজন বিখ্যাত বক্তা এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এই মূর্ত্তির প্রশান্ত সৌন্দর্য্য দেখিলে মানুষের সুখ-দুঃখ সব দূর হয়।"

ওলিম্পিয়ার ক্রীড়াকৌতুক দেখিবার জন্য যে সকল দর্শক আসিতেন, তাঁহাদের থাকিবার জন্যও ওলিম্পিয়াতে বিশেষ সুব্যবস্থা ছিল। ওলিম্পিক খেলায় যে সকল ব্যায়াম-বীর বিজয় লাভ করিতেন,



গ্রীসের মানচিত্র

শিল্পের নিদর্শন। জিউস্ দেবের এবং হেরা মন্দিরের চারিদিক বেড়িয়া ছিল মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত সহস্র সহস্র দেবদেবীর মন্দির।

ওলিম্পিয়ার এই জিউস্ দেবতার মূর্ত্তি এথেন্স-নিবাসী ফিডিয়াস্ নামক এক ব্যক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এজন্য এই মূর্ত্তি সেকালে ও একালে ফিডিয়াসের জিউস্ জুপিটার দেবতার মূর্ত্তি —(The Zeus of Phedias) নামে পরিচিত। এলিস নগরের ওলিম্পিয়ার মন্দিরে এই মূর্ত্তি শোভা পাইত। পৃথিবীর প্রাচীন সপ্ত আশ্চর্য্য দ্রব্যের মধ্যে তাঁহারা যে বাড়ীতে আসিয়া ভোজ খাইতেন, সেই বাড়ীটির নাম ছিল প্রিতানিয়াম (Prytaneum)। সেকালে ক্রীড়া-ক্ষেত্রের চারিদিক বেড়িয়া প্রাচীর ছিল। উহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে আনুমানিক ১৮০০ ফিট ও ১৫০০ ফিট হইবে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে ওলিম্পিয়ার প্রাচীন যুগের ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের অনেকটা উদ্ধার হইয়াছিল। পরে ১৮৭৫ খ্রীঃ অঃ ও ১৮৮১ খ্রীঃ অঃ খননের ফলে এখানকার অনেক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও দেবতাদের মূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। যদি

তোমাদের মধ্যে কেহ কখনও প্রাচীন গ্রীসের ওলিম্পিক ক্রীড়া-ক্ষেত্র দেখিতে যাও, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, সেকালের ওলিম্পিক ক্রীড়া-ক্ষেত্র কেমন ছিল। এখন ত আর গ্রীসের সেই পূর্ব্ব গৌরব নাই—সেই ওলিম্পিয়াও নাই, তবু ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে প্রাচীন ওলিম্পিয়ার অনেকটা আভাস পাইবে।

লেখকেরা বলেন যে, রাজা হেরাক্লেস্ (Heracles) একটা যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া ১২২২ খ্রীঃ পূঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম এই খেলার প্রবর্ত্তন করেন। ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো (Strabo) কিন্তু একথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, যদি সে সময়ে ইহার প্রচলন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হোমার তাঁহার কাব্যের কোথাও না কোথাও এ বিষয়ের উল্লেখ করিতেন।

আমরা ওলিম্পিক ক্রীড়ার প্রকৃত প্রামাণিক ইতিহাস পাই—৭৭৬ খৃঃ পূঃ অব্দ হইতে। সে সময় হইতে প্রতি চারি বৎসর পর পর গ্রীষ্ম



ব্রোঞ্জধাতুনির্ম্মিত প্রাচীন গ্রীসের কুস্তীগীর



হেরাক্লেস্

গ্রীসদেশের লোকদের কাছে ওলিম্পিক-ক্রীড়া ছিল তাহাদের জাতীয় ক্রীড়া। ওলিম্পিয়াতে এই সব ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হইত বলিয়া ঐ স্থানের নামানুসারে এই খেলার নামও ওলিম্পিক খেলা বা Olympic games নামেপরিচিত ছিল। কবে সে কোন্ যুগে সর্ব্বপ্রথম এই খেলা আরম্ভ হইয়াছিল, সে কথা বলা বড় কঠিন। তবে সাধারণতঃ ইতিহাস-

ঋতুর শেষভাগে এই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা চলিত। সম্ভবতঃ প্রথম অবস্থায় এই ক্রীড়া শুধু পেলোপোনিসিয়ার অধিবাসীদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ক্রমশঃ এই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি গ্রীসদেশের নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তাহারই ফলে ক্রমশঃ উহা সমগ্র গ্রীসের (Pan-Hellenic) ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে

পরিণত হয়। রোমকেরা যখন গ্রীসদেশ জয় করেন, তখন তাঁহারা বিজেতারাও এই ক্রীড়ায় উৎসাহ প্রদান করিয়া তাহাতে যোগদান করিতেন। রোম-সম্রাট্ টিবেরিয়াস্ (Tiberius) এবং নিরো (Nero) ইহাতে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় স্ত্রীলোকদিগের যোগ দিবার অধিকার ছিল না। এমন কি, তাঁহারা ক্রীড়া দেখিবার জন্য দর্শকরূপেও থাকিতে পারিতেন না। সম্ভবতঃ নানারূপ দুর্ঘটনা ঘটিত বলিয়াই স্ত্রীজাতির প্রতি এইরূপ নিষেধ বিধান ছিল। পরে কিন্তু এই নিয়মের ততটা কড়াকড়ি ছিল না। কেননা, পরে দেখা যায় যে, স্ত্রীলোকেরাও ক্রমশঃ এই ক্রীড়াক্ষেত্রে যোগদান করিয়াছিলেন।

ওলিম্পিক ক্রীড়া

এই ওলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠানে দৌড়াদৌড়িই ছিল, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানজনক খেলা। যে দৌড়ের বাজী জিতিতে পারিত, তাহার সম্মানের অবধি ছিল না, দর্শকগণ তাহার বিজয়-ধ্বনিতে চারিদিক একেবারে মুখরিত করিয়া ফেলিত। এই দৌড়ের খেলায় বালক, যুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তিরাও যোগদান করিতে পারিত এবং এইরূপ যোগদান করাকে সকলেই একান্ত গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিত। সেকালের মন্দিরের গায়ে, ধাতব পাত্রের গায়ে ওলিম্পিক দৌড়-প্রতিযোগিতার অনেক চিত্র আছে। এইখানে



খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর চিত্র

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর দুইখানি দৌড়ের ছবি দেওয়া হইল। বালকদের প্রতিযোগিতায় পূর্ণবয়স্কদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সীমার অর্দ্ধাংশ মাত্র দৌড়াইতে হইত। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ম্ম পরিধান করিয়া দৌড়ানোর রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পারস্য যুদ্ধের পর এই খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল।



দৌড়ের চিত্র

পাঁচটা খেলার বিষয় লইয়া যে প্রতিযোগিতা হইত, তাহাকে পেণ্টাথ্লন্ (pentathlon) বলিত। এই পেণ্টাথ্লন্ খেলার বিষয় ছিল—দৌড়ান, লাফান, বর্শ নিক্ষেপ, চাকৃতি নিক্ষেপ ও কুস্তী। চাকৃতি নিক্ষেপ করা ও বর্শা নিক্ষেপ করা এবং লম্ফন এই তিনটি ক্রীড়া ছিল ওলিম্পিয়ার অত্যন্ত জনপ্রিয়। চাকৃতি নিক্ষেপের একটি চিত্র হয়ত তোমরা অনেক স্থানে দেখিয়া থাকিবে। এই ব্রোঞ্জধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তিটি হইতে দেখিতে পাইতেছ, কি সুন্দর সুগঠিত দেহ—প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতরই যেন একটা সজীবতা রহিয়াছে; এতটুকু বাহুল্য মাংস নাই। কি সুন্দর ভঙ্গিমা। মূর্ত্তিটির মধ্য দিয়া ব্যায়াম-বীরের দৃঢ়তাব্যঞ্জক অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ওলিম্পিয়ায় অন্যান্য জাতীয় ক্রীড়া পেণ্টাথ্লনের অংশ ছিল মাত্র।

প্রতিযোগিতায় লম্ফের মধ্যে দীর্ঘ লম্ফ এবং একত্রে এক পায়ে লাফান, পদবিক্ষেপ ও দীর্ঘলম্ফ (Hop, Step and Jump) হইত। পূর্ব্বোক্ত-প্রকারের লম্ফই বেশি হইত। লম্ফপ্রদানকারী লম্ফ দিবার সময় সাধারণতঃ পাথরের কিংবা কোন

ধাতুর টুক্‌রা হাতে লইয়া লম্ফ প্রদান করিত। কতটা লাফান হইল, তাহা লৌহদণ্ড দিয়া মাপা হইত।



লম্ফনের চিত্র



ব্রোঞ্জধাতুনির্ম্মিত প্রাচীন গ্রীসের চাকতি নিক্ষেপের চিত্র

যুদ্ধের সময় ও শিকার করিবার সময় বর্শা নিক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হইত বলিয়া এই খেলা গ্রীসদেশে অতি জনপ্রিয় ছিল। বলিতে কি, গ্রীসের প্রত্যেক বালকই ইহা শিক্ষা করিত। প্রতিযোগিতার সময় যে বর্শা লইয়া নিক্ষেপ করা হইত, তাহার পরিমাপ ৮ হইতে ১০ ফুট লম্বা হইত। এই বর্শার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ হইত না। এই বর্শার প্রায় মধ্যভাগে দড়িদ্বারা ফাঁস জড়ান থাকিত। এই স্থান ধরিয়াই বর্শা নিক্ষেপ করিবার নিয়ম ছিল।

পূর্ব্বে নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় পাথরের কিংবা ধাতুর টুক্‌রার ন্যায় ভারী বস্তু ব্যবহৃত হইত। তাহার পর ইহার ক্রমোন্নতি হইয়া এখন কাষ্ঠনির্ম্মিত সুগঠিত আকারে পরিণত হইয়াছে। লম্ফ প্রদান, চাকৃতি নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ প্রভৃতির সময় প্রতিযোগীদিগকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে বাদ্য-যন্ত্র বাজাইবার ব্যবস্থা ছিল।

কুস্তীর দ্বারা শরীরের সমস্ত অঙ্গের পুষ্টিসাধন হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে কুস্তী পদ্ধতিও খুব প্রিয় ছিল। এই কুস্তী দুই রকম পদ্ধতি অনুসারে হইত। এক—দাঁড়াইয়া কুস্তী, দুই—জমিতে শুইয়া কুস্তী। তখন প্রথমোক্ত পদ্ধতিরই বেশি প্রচলন ছিল। কুস্তী করিবার প্যাঁচের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না এবং এক জন পরাজয় স্বীকার না করিলে কেহ কাহাকে ছাড়িয়া দিত না।

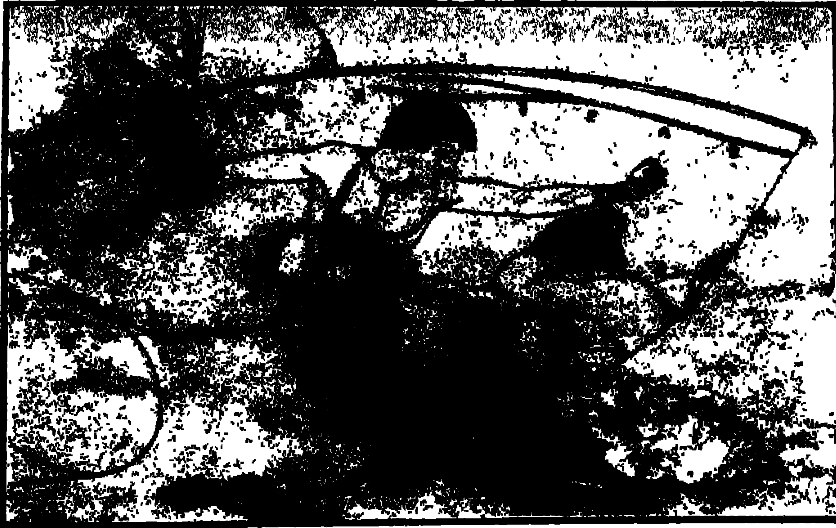
মুষ্টিযুদ্ধের সময় এখনকার মত তাহারা হাতে দস্তানা পরিত না। কেবল হাত বাঁচাইবার জন্য কাঁচা চামড়ার পাতলা ফালি দিয়া অঙ্গুলি এবং কনুই হইতে কব্জি পর্য্যন্ত সমস্ত অংশটা জড়াইয়া রাখিত। এখন যেমন মুষ্টিযুদ্ধের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, তখন তাহা থাকিত না, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ও থাকিত না। প্রতিযোগীরা সমান ওজনের হইবে, এখনকার মত তখন এইরূপ কোন বাঁধা নিয়ম ছিল না। একজন আর একজনকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ভূমিসাৎ করিতে পারিত কিংবা বিশ্রাম লইবার

জন উভয়েই সম্মতি না জানাইত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত খেলা চলিতে থাকিত।

১৭০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তী একত্রে মিশ্রিত এক রকম খেলা হইত। এই খেলায় তখন প্রতিযোগীরা নানারূপ কৌশল প্রয়োগ করিতে পারিত। যথা—আঘাত দেওয়া, ধাক্কা দেওয়া, অঙ্গ মোচড়ান, ধস্তাধস্তি করা ইত্যাদি; কেবল কামড়ান নিষেধ ছিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একজন প্রতিযোগী পরাজয় স্বীকার করিত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত খেলা চলিতে থাকিত। এই খেলা ওলিম্পিয়ায় প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৭০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে রথসহ ঘোড়সোয়ারের



কুস্তী করিতে উদ্যত



মুষ্টিযুদ্ধের চিত্র

প্রতিযোগিতা ওলিম্পিয়ায় প্রচলিত ছিল। আবার বালকদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা চলিত। এই সমস্ত খেলার এক দিনেই পরিসমাপ্তি হইত।

সেকালের গ্রীকেরা হকি খেলাও খেলিত। হকি খেলার অনেক চিত্র প্রাচীন গ্রীক্ মূর্ত্তির পাদপীঠে অঙ্কিত দেখা যায়। এইরূপ বিবিধ খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদের চিত্র প্রাচীন গ্রীকের বিবিধ মূর্ত্তির পাদপীঠ, তৈজস পত্র ও বাড়ীঘরের প্রাচীরের গায়ে খোদিত রহিয়াছে। গ্রীক্‌দের লাফালাফি, ওঠা-নামা, এই সকলের অনুকরণ করিয়া অনেক পরে অন্যান্য দেশেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তুলনামূলকভাবে তাহা বুঝাইবার জন্য ১৭৫৯-৮৫ খ্রীষ্টাব্দের (Jumping and Climbing) আরোহণ ও অবরোহণের ছবি দেওয়া গেল (১৯১৯ পৃঃ)। এইরূপ ব্যায়ামের প্রচলন প্রাচীন গ্রীক্‌দেশের আদর্শেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

প্রতিযোগীদের ক্রীড়াভ্যাস

অতিপূর্ব্বে খেলোয়াড়দিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ক্রীড়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল না। স্পার্টানগণ কঠোর সামরিক বিদ্যা শিক্ষা লাভ করিয়া, যথেষ্ট পরিমাণে পারিতোষিক লাভ করিত। গ্রীসদেশের খেলোয়াড়গণকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে দেখিয়াও স্পার্টার অধিবাসীরা তাহাদের অনুকরণ করে নাই। তাহাদের নিকট সামরিক শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এথেনিয়ান বালকগণ ব্যায়ামাগারে প্রণালী অনুযায়ী সকল রকম ক্রীড়া অভ্যাস করিত। যাহারা প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে পারিত, তাহারাই ব্যায়াম-শিক্ষকের কার্য্য করিত। বালুপূর্ণ ব্যাগে ঘুঁসি মারা, কল্পিত প্রতিযোগীর সঙ্গে ঘুঁসির লড়াই করা, নৃত্য করা, মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষার্থীর নিকট মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা করিবার ইহাই বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রাথমিক অবস্থায় কুস্তীগীরদের নিকট মাটী খনন করা, লম্ফ দেওয়া প্রভৃতি কুস্তী শিক্ষার আদর্শ প্রণালী বলিয়া বিবেচিত হইত। লম্ফ দিবার সময় তাহারা হাতে কোন ভারী বস্তু, কিংবা ডাম্বেল লইয়া লম্ফ প্রদান করিত। দৌড়বাজরা বালুর উপরে দৌড়ান অভ্যাস করিত। খাবার সম্বন্ধেও খেলোয়াড়দিগকে কিছু কিছু উপদেশ দেওয়া হইত। ওলিম্পিয়ার খেলায় বিজেতাগণকে পবিত্র কুঞ্জবন হইতে সংগৃহীত ওলিভ পত্র-নির্ম্মিত মুকুট পারিতোষিক দেওয়া হইত। বিজেতার সম্মানের জন্য তাহার নামে ঘটা করিয়া ওলিম্পিয়ায় মহাভোজ দেওয়া হইত এবং বাদ্যযন্ত্র সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া তাহাকে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত।



হকি খেলা—প্রাচীন গ্রীসের এথেন্সের চিত্রশালা

ওলিম্পিক ক্রীড়ার বর্ত্তমান কথা

আনুমানিক ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশের Baron Pierre de Couberten নামে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রচেষ্টায় পুনরায় এই ক্রীড়ার প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার আন্দোলনের ফলে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারী নগরীতে উহার একটা আনুষ্ঠানিক সভা হইয়াছিল। সেই সভায় পৃথিবীর নানা দেশ হইতে প্রায় ৭৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।



ওলিম্পিয়ার সাধারণ দৃশ্য

তাহার পর প্রতি চতুর্থ বৎসরে যথাক্রমে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারী নগরীতে, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্টলুইয়ে, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টকহলমে এই ওলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের জন্য তাহা বন্ধ ছিল। ইহার পরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এ্যাণ্টওয়ার্পে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্যারীতে, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আমষ্টার্ডামে, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে লস্এঞ্জলসে এই জগদ্বিখ্যাত ক্রীড়ার প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল। প্রত্যেক বারেই প্রতিযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে এক সপ্তাহের মধ্যেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিত, কিন্তু এখন তিন মাস ধরিয়া ইহা চলিয়া থাকে। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত লস্এঞ্জেলসে যেবার ওলিম্পিক ক্রীড়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সে বৎসর ভারতবর্ষ হইতেও একদল খেলোয়াড় যাইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। বিশ্ববাসী সকল জাতির মধ্যে ক্রীড়াদির প্রতি অনুরাগ ও মনোযোগ আকর্ষণ করাই এই ওলিম্পিক ক্রীড়ার প্রধান উদ্দেশ্য।



অষ্টাদশ শতাব্দীর লাফান ও ওঠা-নামার চিত্র

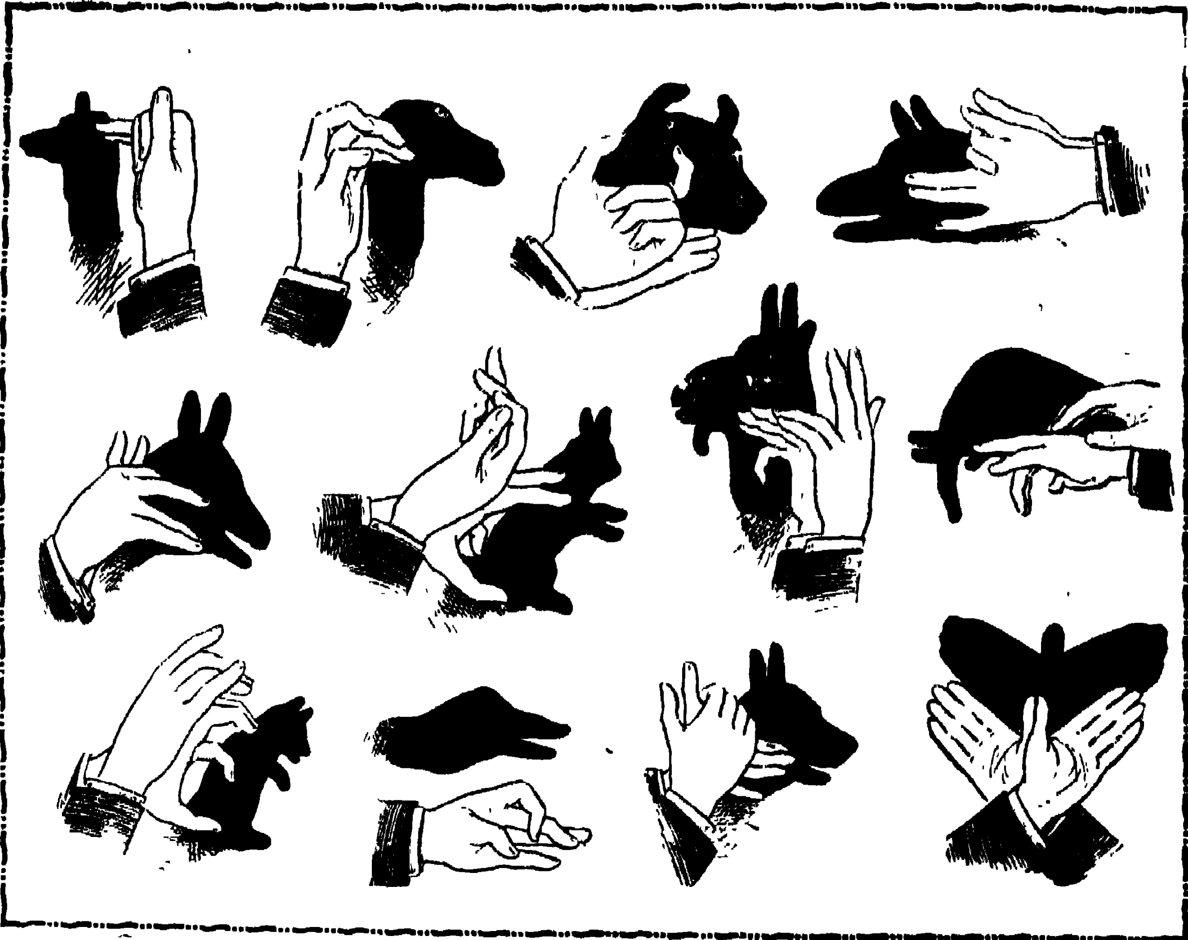
ওলিম্পিক ক্রীড়ার একাদশ প্রতিযোগিতা ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে হইয়াছিল এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান-টোকিয়োতে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের জন্য তাহা বন্ধ ছিল। ১৯৫২ সালের জুন মাসে হেলসিঙ্কিতে ওলিম্পিক ক্রীড়ার অনুষ্ঠান হইবে।

প্রত্যেক জাতীয় অনুষ্ঠান উপযুক্ত প্রতিযোগীদিগের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে বিশ্বজনীন ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় প্রেরণ করিয়া থাকে।



ছায়াবাজী

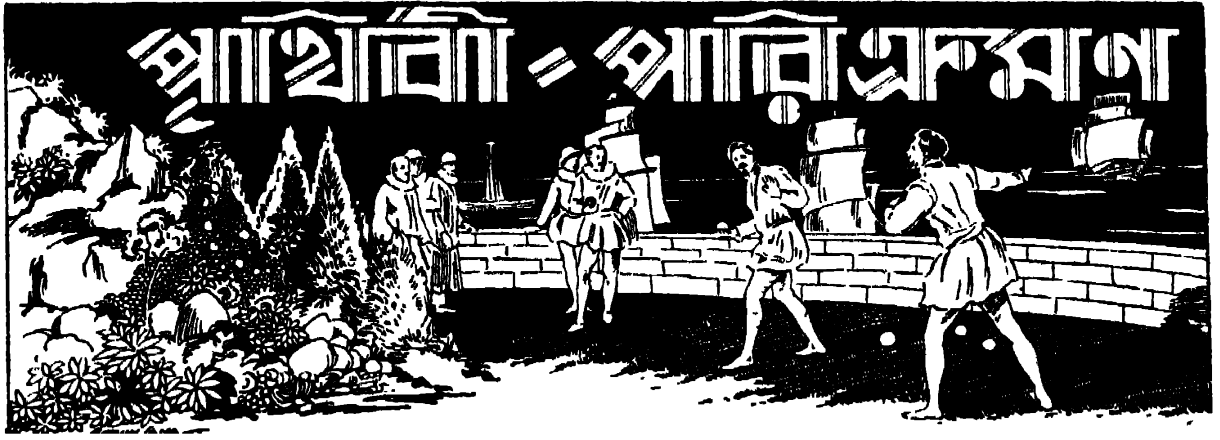
তোমরা যে কোন সময়ে উৎসব বা পর্ব্ব উপলক্ষে নিজেরাই ইচ্ছানুরূপ নিম্নের ছবিখানার মত ছায়াবাজীর ব্যবস্থা করিতে পার। একখানি কাপড় (পর্দ্দা) টাঙ্গাইয়া লও। তারপর আলোর সম্মুখে



হাত দিয়া ছবিতে যেরূপভাবে ভিন্ন ভিন্ন জন্তু-জানোয়ার দেখাইবার জন্য হাতের ও আঙ্গুলের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী করা হইয়াছে, সেইরূপ কর। তাহা হইলেই কাপড়ের উপর ঐ সব জন্তু-জানোয়ারের অতি স্বাভাবিক চিত্র ফুটিয়া উঠিবে। তোমরা এ বিষয়ে যদি বরাবর সপ্তাহে দুই একদিন করিয়া অভ্যাস কর, তাহা হইলে তোমাদের হাত ও আঙ্গুল চালাইবার কৌশল এমনভাবে আয়ত্ত হইয়া যাইবে যে, তখন প্রত্যেকটি চিত্র জীবন্তভাবে দেখাইতে পারিবে।

নানা দেশের জাতীয়-পতাকা

(১) গ্রেট ব্রিটেন—ইউনিয়ান জ্যাক
(২) গ্রেট ব্রিটেন—রাজকীয় নৌ বহর
(৩) কানাডা
(৪) অষ্ট্রেলিয়া
(৫) ভারতবর্ষ
(৬) যুক্তরাজ্য আমেরিকা
(৭) আইরিশ ফ্রি ষ্টেট
(৮) নিউজিল্যাণ্ড
(৯) জার্ম্মেণি
(১০) ফরাসী
(১১) ইউনিয়ান—দক্ষিণ আফ্রিকা
(১২) ইটালী
(১৩) জাপান
(১৪) বেলজিয়াম
(১৫) রুশিয়া (ইউনিয়ান অব্ সোসিয়ালিষ্ট-সোবাইট গণতন্ত্র)
(১৬) নরওয়ে
(১৭) নেদারল্যাণ্ডস
(১৮) স্পেন
(১৯) অষ্ট্রিয়া
(২০) চীন
(২১) সুইডেন
(২২) পোল্যাণ্ড



জন্ হকিন্স্ ও ড্রেকের আদি সমুদ্র-যাত্রা


১৬৮৯ পৃষ্ঠার পর

স্পেনিয়ার্ডগণের নূতন জগৎ আবিষ্কারের পর হইতে স্পেনের ঐশ্বর্য্য এবং প্রতি-পত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমেরিকা হইতে বহু জাহাজ স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু এবং মূল্যবান বাণিজ্য-দ্রব্যাদিতে বোঝাই হইয়া স্পেনের তীরে আসিয়া ভিড়িত। বলা বাহুল্য, আমেরিকার বাণিজ্য স্পেনিয়ার্ডগণের একচেটিয়া ছিল। নূতন মহাদেশ হইতে যে সমস্ত বাণিজ্য-দ্রব্য স্পেনে আসিত, তাহার ক্রয়-বিক্রয় শুধু স্পেন দেশেই আবদ্ধ ছিল। স্পেনিয়ার্ডগণের ইচ্ছা ছিল যে, নূতন মহাদেশের বাণিজ্য-ব্যাপারে অন্য কোন ইউরোপীয় জাতি হস্তক্ষেপ না করে। সেইজন্য স্পেনের তদানীন্তন রাজা এক আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, স্পেনিয়ার্ডগণ নূতন জগৎ হইতে আনীত বাণিজ্যদ্রব্যাদি স্পেনের অধিবাসী ভিন্ন অন্য কোন দেশের লোকের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে না। এই সময় ইংরেজ বণিকেরা ভূমধ্যসাগরের উপকূল-ভাগ দিয়া বাণিজ্য করিতেছিল। স্পেনিয়ার্ডগণ কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের সংবাদ তাহারা জ্ঞাত থাকিলেও আমেরিকায় যাইয়া তথাকার অধিবাসিগণের সঙ্গে বাণিজ্য করা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ তাহাদের ছিল না। তাহার কারণ, ইংলণ্ড ও স্পেনের মধ্যে উপরি উপরি তখন একটু সদ্ভাব ছিল এবং পাছে নূতন মহাদেশে বাণিজ্য করিতে গেলে স্পেনিয়ার্ডগণের সহিত কোনরূপ সংঘর্ষ বাধে, এই আশঙ্কায় তাহারা আমেরিকা যাওয়ার চেষ্টা হইতে বিরত ছিল। কিন্তু কালক্রমে যখন নূতন জগতে স্পেনের অত্যধিক সাফল্যের কথা শুনিতে লাগিল, তখন তাহাদের মনেও আমেরিকায় যাইয়া বাণিজ্য করা সম্বন্ধে এক প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিল। ইংরাজ-বণিকেরা ঠিক করিল—সুযোগ এবং উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য পাইলেই তাহারা একবার আমেরিকায় বাণিজ্য করিতে যাইবে।

রাণী এলিজাবেথের সময়ে (১৫৫৮-১৬০৩) হকিন্স্ নামক একজন ইংরাজ বণিক আমেরিকা হইতে আগত কোনও একজন বিশ্বাসযোগ্য লোকের নিকট শুনিতে পাইলেন যে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইক্ষুচাষের জন্য স্পেনিয়ার্ড-গণের বহুসংখ্যক মজুর দরকার, এবং মজুরী কাজের জন্য আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা মোটেই উপযুক্ত নয়। হকিন্স্ সুযোগ বুঝিয়া ঠিক করিলেন যে, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলস্থ গিনি অঞ্চল হইতে কৃষ্ণকায় নিগ্রোদিগকে কৌশলে ধৃত করিয়া তাহাদিগকে নূতন জগতে

লইয়া গিয়া হিস্প্যানিওয়া দ্বীপে স্পেনিয়ার্ড-দিগের নিকট বিক্রয় করিবেন। হকিন্‌স্ স্থির করিলেন, এখন হইতে তিনি কেবল দাস-ব্যবসায়ই চালাইবেন ; কারণ ইহাতে ভবিষ্যতে অনেক লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

১৫৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম আমেরিকা যাত্রা করেন। এই বারে তিনি জাহাজ বোঝাই করিয়া বহুসংখ্যক নিগ্রো দাস সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

তিনি নিগ্রোদিগকে স্পেনিয়ার্ডদিগের নিকট ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিয়া তদ্বিনিময়ে বহু দাসে জাহাজ ভর্ত্তি করিয়াছিলেন। হকিন্‌স্ ক্যারিবিয়েন সাগরের (Caribbean sea) উপকূল ভাগ এবং জ্যামেকা, কিউবা (Cuba) প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া নিগ্রোদিগকে বিক্রেয় করেন। তারপর তিনি ফ্লোরিডার উপকূল ভাগ দিয়া এবং উত্তর আমেরিকার উপকূল ভাগ দিয়া অগ্রসর হইয়া নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপে পৌঁছেন। ভবিষ্যৎ যুক্তরাজ্যের উপকূল ভাগ দিয়া ইংরেজগণ এই সর্ব্বপ্রথম জাহাজ চালনা করেন। হকিন্‌স্ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড হইতে ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।



ড্রেকের ভ্রমণ পথ [*পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে] (১৫৭৭—১৫৮০)

চামড়া, চিনি এবং মূল্যবান্ বাণিজ্যদ্রব্যাদি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে লব্ধ বাণিজ্য-দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য তাহার কিছু কিছু স্পেনে পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু স্পেনের তৎকালের আইনানুযায়ী স্পেনিয়ার্ডগণ তাঁহার প্রেরিত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সাহসী হয় নাই।

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে হকিন্‌স্ দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রা করেন। এই বারেও তিনি বহুসংখ্যক নিগ্রো হকিন্‌সের তৃতীয় যাত্রা ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইবারে তিনি যখন দাস বিক্রয় শেষ করিয়া দেশের দিকে ফিরিতে-ছিলেন, তখন মেক্সিকোর উপকূলে তাঁহার জাহাজগুলি এক ঝটিকার আবর্ত্তে পড়িয়া দিশাহারা হইবার উপক্রম হইয়া উঠে। হকিন্‌স্ উপায়ান্তর না দেখিয়া নিকটস্থ স্পেনীয়দের অধিকৃত একটি বন্দরে অনেক কষ্টে

যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই বন্দরের নাম সেণ্টজুয়ান ডে ওলোয়া (St. Juan de Ullua)। হকিন্‌স্ স্পেনিয়ার্ডদিগকে বলিলেন যে, তাঁহার এখানে আসিবার কোনরূপ মন্দ অভিসন্ধি নাই; অধিকন্তু তাহারা যদি তাঁহাকে খাদ্যদ্রব্যাদি দ্বারা সাহায্য করে, তাহা হইলে তিনি বিশেষ উপকৃত হইবেন। হকিন্‌স্ বন্দরে আশ্রয় লইবার অনতিকাল পরেই স্পেন হইতে একটি জাহাজ আসিয়া বন্দরে প্রবেশ করিল। তিনি নবাগত স্পেনিয়ার্ডগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্পেনিয়ার্ডগণ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার জাহাজ আক্রমণ করে। এই সময় হকিন্‌সের সহিত ফ্রান্সিস্ ড্রেক নামক একজন অসমসাহসী ইংরেজ নাবিক ছিলেন। হকিন্‌স্ যখন পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে বাণিজ্য করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত ফ্রান্সিস্ ড্রেকের পরিচয় হয়। তাঁহার তৃতীয় সমুদ্র-যাত্রায় ফ্রান্সিস্ ড্রেক তাঁহার স্বীয় জাহাজ 'জুডিথ' (Judith) লইয়া হকিন্‌সের সহগামী হইয়াছিলেন। স্পেনিয়ার্ডগণের আক্রমণে ইংরেজগণ বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। কতক জাহাজ স্পেনিয়ার্ডদিগের হাতে পড়িল, কতক সমুদ্রে নিমজ্জিত হইল এবং কতক বা গোলাবারুদের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। এই প্রলয় কাণ্ডের ভিতর কেবল ড্রেকের 'জুডিথ' এবং আর একটি ছোট জাহাজ পলায়নের সুযোগে রক্ষা পাইল। অন্য জাহাজটির নাম 'মিনিয়ন' (Minion)। ড্রেক্ ফ্লোরিডার উপকূল হইতে জাহাজ ছাড়িয়া বহুবিধ দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া ছয় সপ্তাহ পরে স্পেনের উপকূলে আসিয়া উপনীত হন এবং ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কর্ণওয়ালের মডিণ্ট উপসাগরে পৌঁছেন। এই যাত্রায় আমেরিকা হইতে ফিরিবার পথে ইংরেজ নাবিকদিগকে কিরূপ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে হকিন্‌স্ বলিয়াছেন—"আমাদের এই যাত্রার সমুদয় দুঃখ ও বিপদের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিতে হইলে লেখককে আত্মোৎসর্গকারী মহাপুরুষদিগের কার্য্যকলাপ বর্ণনা করিবার ধৈর্য্য এবং দুঃখীর দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করিবার অনুভূতি লইয়া লেখনী ধারণ করিতে হইবে।"

ইংরেজেরা এত কষ্ট সহ্য করিলেও তাঁহাদের এই বাণিজ্য-যাত্রা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। কারণ, এখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, নূতন জগতের বাণিজ্য-ব্যাপারে স্পেনিয়ার্ডগণ সহজে তাঁহাদিগকে আমল দিবে না। কাজেই, তাঁহাদিগকে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ড্রেকের বর্ণিত কাহিনী শ্রবণ করিয়া ইংরেজদিগের মনে স্পেনিয়ার্ডদিগের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু প্রবলপরাক্রান্ত স্পেনের বিপক্ষতা করা ক্ষুদ্র ইংল্যাণ্ডের সাধ্য ছিল না, সেইজন্য ড্রেক জলদস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন। ড্রেক নূতন জগতে স্পেনাধিকৃত রাজ্যগুলি এবং তথায় স্পেনিয়ার্ডদিগের প্রভাব ও আধিপত্য সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত হইবার জন্য ইহার পর দুইবার আমেরিকা যাত্রা করেন। তারপর ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি ডারিয়েন যোজকের (Isthmus of Darien) সন্নিহিত উপকূলভাগে স্পেনিয়ার্ডদিগকে আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ইংলণ্ড হইতে দুইটি বড় জাহাজ এবং ছোট ছোট কতকগুলি ডিঙ্গী লইয়া রওনা হইলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া তিনি একটি ছোট এবং সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহারা ডিঙ্গীগুলিকে ভাবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ড্রেক শুনিয়াছিলেন যে, পেরুর ধনরত্নাদি বড় বড় জাহাজে (Galleon) করিয়া ডারিয়েন যোজকের পশ্চিম উপকূলে আনীত হয় এবং সেখান হইতে খচ্চর-পৃষ্ঠে যোজকের উপর দিয়া

আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে কোন একটি বন্দরে নীত হয়। এই বন্দরের নাম Nombre de Dios। এই বন্দর হইতে ঐ সমস্ত ধনরত্ন স্পেনে চালান দেওয়া হয়। কাজেই, এই বন্দরেই ড্রেক স্পেনিয়ার্ডদিগের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ড্রেক বন্দরে উপস্থিত হইয়া অধিকাংশ স্পেনিয়ার্ডকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন এবং তথাকার সমুদয় ধনরত্নের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া তাহা জাহাজে লইয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে অলক্ষ্যে একটি গুলি আসিয়া ড্রেকের শরীরে বিদ্ধ হয়। তিনি আহত হইয়া ভূপতিত হন। তাঁহার লোকজন তাঁহাকে বহন করিয়া



স্যার ফ্রান্সিস্ ড্রেক (একখানা প্রাচীন চিত্র হইতে)

জাহাজে লইয়া যায়। কারণ, তাহাদের কাছে মূল্যবান ধন-রত্ন অপেক্ষা তাহাদের অধ্যক্ষের জীবন আরও অধিক মূল্যবান ছিল। ইহার পর কয়েক সপ্তাহের ভিতর ইংরেজ নাবিকগণ স্পেনিয়ার্ডদিগের বহু বাণিজ্যপোত লুণ্ঠন করে। স্পেনিয়ার্ডগণ বহুবিধ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও ইংরেজদিগের এই পুনঃ-পুনঃ অতর্কিত বাণিজ্যপোত আক্রমণে বাধা দিয়া বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। এই সময় আমেরিকার অন্তর্ভাগে Cimarrous-নামক এক জাতীয় অর্দ্ধ সভ্য লোক বাস করিত। তাহাদের সহিত স্পেনিয়ার্ডদিগের প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ হইত। কারণ, স্পেনিয়ার্ডরা তাহাদিগের সহিত খুব খারাপ ব্যবহার করিত। ড্রেক স্পেনিয়ার্ডদিগের উপর অসন্তুষ্ট এই সমস্ত আদিম অধিবাসীদের সহিত যোগদান করেন এবং তাহারাও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়।

বহুদিন নীরব অপেক্ষার পর আদিম অধিবাসিগণ সংবাদ পাইল যে, পেরুর ধন-রত্ন শীঘ্রই ডারিয়েন যোজকের উপর দিয়া Nombre de Dios বন্দরের দিকে রওনা হইবে। ড্রেক তাঁহার লোকজন লইয়া এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাত্র পনের জন সঙ্গী এবং ত্রিশ জন আদিম অধিবাসী লইয়া ড্রেক এই বিপৎসকুল অভিযানে অগ্রসর হইলেন। সমুদ্রের উপকূল ভাগে বন্দরের নিকটবর্ত্তী একটি ঢালু প্রান্তরে একটি বনের মধ্যে তিনি আপনার লোকজন স্থাপন করিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যপরিপূর্ণ সেই শ্যামল বনানীর এক বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া ড্রেক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে তিনি অনন্ত জলরাশি দেখিতে পাইলেন। পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের দিগন্তবিস্তৃত নীল জলরাশি তাঁহার দৃষ্টি মুগ্ধ করিয়া দিল। বারিধিবক্ষে সতত সঞ্চরমাণ-উর্ম্মিমালার কল্লোলগীতি যেন তাঁহাকে কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য আহ্বান করিল। তাঁহার মনে ঐ সমুদ্রে যাত্রা করিবার জন্য এক প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিল। প্রতিজ্ঞা করিলেন, কোন একদিন তিনি ঐ সমুদ্রে যাত্রা করিবেন।

অল্পকাল পরেই স্পেনিয়ার্ডদিগের পূর্ব্বোক্ত খচ্চরবাহিনী তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু ড্রেকের দলের কোন লোকের অসাবধানতা-বশতঃ স্পেনিয়ার্ডগণ ড্রেকের এই অতর্কিত আক্রমণের কথা জানিতে পারিয়া স্বর্ণের পরিবর্ত্তে খচ্চর-পৃষ্ঠে কেবল কতকগুলি ইট-পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছিল। কাজেই, ড্রেক এবং তাঁহার লোকজনের ষড়্যন্ত্র এবারে ব্যর্থ হইল। তথাপি তাঁহারা নিরুৎসাহ না হইয়া Nombre de Dios বন্দরের অনতি-দূরে আরও একটি অশ্বতর-বাহিত ধন-রত্নের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেইবার তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল।

তারপর ড্রেক যখন দেখিলেন যে, তাঁহারা যথেষ্ট ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন, তখন তিনি লোকজন লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার প্রয়াসী হইলেন। ড্রেক অবশিষ্ট দুইখানা জাহাজ লইয়া রওনা হইলেন এবং ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট দেশে পৌঁছিলেন। ইংলণ্ডে পৌঁছিলে দেশের লোকেরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল এবং উচ্চকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। রাণী এলিজাবেথ ড্রেকের জলদস্যুতার এই নূতন সাফল্যে বিশেষ প্রীতা হইলেন না; কারণ তিনি দেখিলেন যে, এই ড্রেকের জলদস্যুতার জন্যই স্পেনের সঙ্গে ইংলণ্ডের সদ্ভাব বজায় রাখা দিন দিন কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে।

চারি বৎসর পরে যখন স্পেন পর পর ইংলণ্ডের অনেকগুলি বাণিজ্যতরী লুণ্ঠন করিল, তখন রাণী এলিজাবেথ ড্রেকের প্রস্তাবিত কার্য্যাবলীই ইহার যথাযথ প্রতিকার-স্বরূপ মনে করিলেন। ড্রেক বলিলেন যে, তিনি এক রণতরীর বহর লইয়া গিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে স্পেনাধিকৃত বন্দর এবং জাহাজ-সকল আক্রমণ করিবেন। রাণীর মন্ত্রী এবং পারিষদ্‌বর্গ রাজনৈতিক কারণে মৌখিক এই প্রস্তাবে অসম্মতি দেখাইলেন, কিন্তু রাণী গোপনে ড্রেককে সাহায্য করিতে রাজী হইলেন। কাজেই, যে সমুদ্র-যাত্রার জন্য একদিন ডারিয়েন যোজকের বৃক্ষোপরি তাঁহার মনে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল, অতি সহজেই তাঁহার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হইবার সুযোগ মিলিল; আয়োজন চলিতে লাগিল।

ড্রেকের পৃথিবী পরিভ্রমণ

ড্রেক ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর প্লিমাউথ বন্দর হইতে রওনা হইলেন। সঙ্গে পেলিকান (The Pelican) এলিজাবেথ (The Elizabeth), মেরিগোল্ড (The Marigold), এবং সোয়ান (The Swan) নামক চারিটি জাহাজ লইলেন। তিনি একটি ছোট ডিঙ্গিও সঙ্গে লইয়াছিলেন। জাহাজ বন্দরেব বাহির হইয়া ইংলিশ প্রণালীতে পৌঁছিলে এক প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। ড্রেক্ এবং তাঁহার লোকজন জাহাজ লইয়া বন্দরে ফিরিয়া আসিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর আবার তাঁহারা ইংলণ্ডের নিকট বিদায় লইয়া সমুদ্রে জাহাজ ভাসাইলেন।

বার দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে জাহাজ চালাইয়া তাঁহারা মরোক্কোর উপকূলে পৌঁছিলেন। এস্থানের অধিবাসিগণকে প্রথমতঃ ইংরেজগণ বন্ধুভাবাপন্ন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা একজন ইংরেজ-নাবিককে কৌশলে ধৃত করিয়া রাখিয়াছিল। এখান হইতে তাঁহারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া ভার্ড অন্তরীপে (Cape Verde) উপস্থিত হন। ভৌগোলিক অবস্থানানুযায়ী শীতকাল হইলেও তাঁহারা সেই অন্তরীপে তখন বিবিধ সুমিষ্ট ফল-আস্বাদন করিয়াছিলেন। তারপর সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা দক্ষিণ দিকে চলিতে চলিতে বিষুবন্ রেখার অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থান হইতে ড্রেক ক্রমাগত পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাইয়া থাকেন। আট সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঝড়-বাদল এবং নানা দুর্য্যোগের ভিতর

দিয়া জাহাজ চালাইয়া অবশেষে তাঁহারা ব্রেজিলের উপকূলে পৌঁছেন। এই দেশের আদিম অধিবাসিগণ ড্রেকের জাহাজের ধ্বংসের জন্য নানা দেবদেবীর মূর্ত্তির নিকট অর্ঘ্য দান করিয়াছিল।

দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা প্লাটা নদীতে (River Plata) প্রবেশ করিলেন। এখানে তাঁহারা স্বচ্ছ পানীয় জল প্রাপ্ত হইলেন। কিছু দূরে তাঁহারা একটা সুন্দর বন্দর দেখিতে পাইলেন। এই নদীতে তাঁহারা বহু সীলমৎস্য শিকার করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহারা পাটাগোনিযাদেশের উপকূল দিয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন। এই দেশের লোকেরা ড্রেক এবং তাঁহার লোকজনের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহাব করিয়াছিল। এমন কি, তাহারা ড্রেকের সহিত বাণিজ্যাদিতেও লিপ্ত হইযাছিল। সেণ্ট জুলিয়ান বন্দরে উপস্থিত হইয়া ড্রেক জানিতে পারিলেন যে, ক্যাপ্টেন ডাউটি (CaptainDoughty)-নামক, তাঁহার একজন প্রধান সঙ্গী তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাউটির সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হইয়া তাঁহাকে ইংলণ্ডের তদানীন্তন আইনানুসারে অভিযুক্ত করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের বিধান করিলেন।

এই সেণ্ট জুলিয়ান বন্দরেই ম্যাগেলান শীতকালটা কাটাইয়াছিলেন। সেণ্ট জুলিয়ান বন্দরে দুই মাস অবস্থান করিয়া ড্রেক ম্যাগেলান প্রণালীব উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া তিন দিবস পরে সেখানে পৌঁছেন। এই প্রণালীতে ড্রেক্ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন। কারণ, স্থানে স্থানে প্রণালীর গতি এত বক্র যে, ইহার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাওয়া খুব কষ্টকর। এই প্রণালী এত গভীর যে, ইহাতে সব স্থানে নোঙ্গর করা যাইত না। প্রণালীর উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতের উচ্চতা দর্শনে তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। এই স্থানে একটি দ্বীপে তাঁহারা প্রায় ৩০০০ পাখী শিকার করিয়াছিলেন। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ড্রেক্ ম্যাগেলান প্রণালী হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রে পতিত হইলেন। এই সমুদ্রকে ম্যাগেলান প্রশান্ত মহাসাগর নাম দিয়াছিলেন। ড্রেক্ কিন্তু এই মহাসাগরে বিন্দুমাত্রও শান্তভাব দেখিতে পাইলেন না। তিনি ম্যাগেলান প্রণালী হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইবামাত্রই এক ভীষণ বাত্যা বহিতে আরম্ভ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র ভৈরব রবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তারপর এক প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। এই ঝটিকার সময় 'মেরিগোল্ড' জাহাজখানি তাহার সমস্ত আরোহী সমভিব্যাহারে 'ম্যাগেলানবর্ণিত প্রশান্ত মহাসাগরে' নিমজ্জিত হয়। ড্রেক্ অনন্যগতি হইয়া টেয়ারাডেল ফিওগো (Tirra del Fuego) দ্বীপপুঞ্জে ফিরিয়া আসেন। এই দ্বীপপুঞ্জে আসিবার সময় পথে এলিজাবেথ The Elizabeth) জাহাজখানি ড্রেকের নিজস্ব পেলিকান জাহাজ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। এলিজাবেথের ক্যাপ্টেন, ড্রেকের দর্শন না পাইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় হইতে ড্রেকের পেলিকান জাহাজকে Golden Hind নামে অভিহিত করা হয়।

যদিও এখন ড্রেকের মাত্র একটি জাহাজ অবশিষ্ট ছিল, তথাপি তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইতে ভয় পাইলেন না। চিলি দেশের উপকূল ভাগ দিয়া তিনি উত্তর দিকে অগ্রসর-হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূরে গিয়া তিনি কোনও প্রয়োজন বশতঃ সেখানকার উপকূলে জাহাজ ভিড়াইলেন। এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ স্পেনিয়ার্ডগণের অযথা অত্যাচারে তাহাদের উপর সবিশেষ অসন্তুষ্ট ছিল। কাজেই, তাহারা স্বভাবতঃ ড্রেক্কে স্পেনিয়ার্ডগণের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে রাজী হইল। ড্রেক্ ইহাদের নিকট হইতে শুনিতে

পাইলেন যে, নিকটবর্ত্তী ভ্যালপারেসো (Valparaiso) বন্দরে একটা টাকা-পয়সা এবং মালপত্র বোঝাই স্পেনিস্ জাহাজ নোঙ্গর করিয়া আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ জাহাজ এবং লোকজন লইয়া উক্ত স্পেনিস্ জাহাজ অধিকার করিতে চলিলেন। তিনি বন্দরে যাইয়া দেখিলেন যে, মুষ্টিমেয় কযেকজন স্পেনিয়ার্ড ঐ জাহাজে অবস্থান করিতেছে এবং বন্দরেও বেশি লোকজন নাই। ড্রেকের অতর্কিত আক্রমণে স্পেনিয়ার্ডগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ড্রেক সহজেই জাহাজ এবং বন্দর দখল কবিয়া সমস্ত টাকা পয়সা এবং বাণিজ্য-দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিলেন। ইহার পর একজন বিশ্বস্ত গ্রীক্ নাবিকের সাহায্যে তাহার আরও উত্তরে লিমা (Lima) বন্দরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে তাঁহারা স্থানে স্থানে অবতরণ করিয়া স্পেনিয়ার্ডদিগের বহু টাকা পয়সা লুঠতরাজ করেন। একস্থানে একটি মৃত ব্যক্তির আচ্ছাদন হইতে তাঁহারা তেরটি রৌপ্য-মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর এক স্থানে তাঁহারা আটটি পেরুদেশের মেষ (Llamas) প্রাপ্ত হন।

লিমা বন্দবে বারটি জাহাজ অবস্থান করিতেছিল। ড্রেক সমস্তগুলিই লুণ্ঠন করিলেন। এই সমস্ত জাহাজ হইতে ড্রেক অনেক রেশম এবং সূতার কাপড় সংগ্রহ করিলেন। তারপর ড্রেক শুনিতে পাইলেন যে, অল্প কিছু সময় পূর্ব্বে একটা স্পেনিস্ জাহাজ (Galleon) অনেক মূল্যবান্ মালপত্র বোঝাই হইয়া উত্তরে পানামা যোজকের অভিমুখে রওনা হইয়াছে। তিনি ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া উহার পশ্চাতে ছুটিয়া তাহাকে ধৃত করিলেন। এবং ইহার সমস্ত মালপত্র লুঠ করিলেন। এইরূপে অনেক জাহাজ লুঠ করিয়া এবং অনেক টাকা-পয়সা এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ড্রেকের প্রতিহিংসার আগুন নিবিল। তিনি ভাবিলেন, স্পেনিয়ার্ডগণের অন্যায়ের প্রতিশোধের জন্য তিনি অনেক কিছু করিয়াছেন। কাজেই, এখন তাঁহার দেশে ফিরিয়া যাওযাই বাঞ্ছনীয়।

ড্রেক ভাবিলেন, পুনরায় ম্যাগেলান প্রণালীর দিকে গমন করা তাঁহার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইবে না। তিনি স্পেনিয়ার্ডদিগের যে-সমস্ত জাহাজ এবং বন্দর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য হয়ত তাহারা সর্ব্বদাই সচকিত রহিয়াছে। তারপর ম্যাগেলান প্রণালীর সম্মুখে সমুদ্র-বক্ষের ঝটিকার প্রচণ্ডতায় হয়ত তাঁহার জাহাজের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। কাজেই নানাদিক্ ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, তিনি পশ্চিমদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া ক্রমাগত জাহাজ চালাইয়া মশলা দ্বীপে (Spice Islands) পৌঁছিবেন এবং সেখান হইতে আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া দেশে ফিরিবেন।

জাহাজের পক্ষে অনুকূল বায়ু পাইবাব জন্য ড্রেক এবং তাঁহার সঙ্গিগণ ক্রমশঃ উত্তর দিকে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন। ছয় সপ্তাহ যাবৎ The Golden Hind ক্রমাগত এইভাবে চলিলে তাঁহারা এক বরফের শীতল দেশে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তাঁহারা একটি সুন্দর উপসাগর (Bay) দেখিতে পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সান্‌ফ্রান্‌সিসকো (San Francisco) সহর এই উপসাগরের উপরেই অবস্থিত। এই স্থানের অধিবাসিগণ ড্রেকের সহিত খুবই সদ্ব্যবহার করিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল, আগন্তুক ইংরেজগণ হয়ত কোনও দেবতা হইবেন। সেজন্য তাহারা নানারূপ পূজার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। তাহাদের রাজা ড্রেককে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। ড্রেক রাণী এলিজাবেথের নামে এই দেশ গ্রহণ করিলেন এবং ইহার নাম রাখিলেন New Albion। ড্রেক্ এই স্থান

পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের সেস্থানে অবস্থানের চিহ্ন রাখিবার জন্য কয়েকটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত স্তম্ভে তিনি রাণী এলিজাবেথের নাম খোদিত করাইয়াছিলেন।

এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া ড্রেক পুনরায় উন্মুক্ত বারিধিবক্ষে জাহাজ ভাসাইলেন। সত্তরদিন ধরিয়া The Golden Hind সোজা পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিল। তারপর ড্রেক ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানেই ম্যাগেলান, দ্বীপবাসীদিগের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এখান হইতে ড্রেক মশলা দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন।

মশলা দ্বীপের অধিবাসিগণ ড্রেকের খুব সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। তাহাদের রাজা স্বয়ং আসিয়া ড্রেককে জাহাজ হইতে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যায়। ড্রেক এই দ্বীপে কয়েকদিন খুব শান্তিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রমণে বাহির হইয়া একস্থানে বেশীদিন থাকা তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। এই দ্বীপ পরিত্যাগ করিবার সময় অধিবাসিগণ তাঁহাকে অনেক তণ্ডুল, চিনি, কলা ও মশলা উপহার দিয়াছিল।

মশলাদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পথে ড্রেক এবং তাঁহার লোকজন এক দ্বীপে একটি আশ্চর্য্যকর দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। কতকগুলি বৃক্ষের ভিতরে প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায় এক ঝাঁক জ্বলন্ত পোকা উড়িয়া বেড়াইতেছিল। (ভারতবর্ষে ইহাদিগকে 'জোনাকী পোকা' বলা হয়)। দূর হইতে তাঁহাদের নিকট মনে হইয়াছিল যেন সমস্ত বৃক্ষগুলিই অগ্নিতে জ্বলিতেছে।

মশলা দ্বীপপুঞ্জের বহু দ্বীপের ভিতর দিয়া পথ খুঁজিয়া পাওয়া বিশেষ কষ্টকর হইয়াছিল। একস্থানে জাহাজ একটি নিমজ্জিত পাহাড়ের উপর উঠিয়া যায় এবং সেখানে কয়েক ঘণ্টা আবদ্ধ থাকার পর পুনরায় জলে ভাসে। তারপর জাভাদ্বীপ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে চলিতে থাকেন। উত্তমাশা অন্তরীপে পৌছিলে তাঁহাদের মন আনন্দে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহারা এই অন্তরীপে



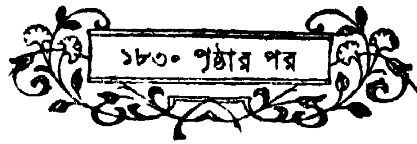
স্যার ফ্র্যান্সিস্ ড্রেকের প্রস্তর-গঠিত মূর্ত্তি

জাহাজ ভিড়াইলেন না—অন্তরীপ ঘুরিয়া উত্তর দিকে চলিতে লাগিলেন এবং প্রায় একমাস পরে গিনি উপকূলের সিয়েরালিয়োন বন্দরে উপস্থিত হইলেন।

১৫৮০ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর, The Golden Hind তিন বৎসর সমুদ্র-যাত্রার পর প্লিমাউথ বন্দরে প্রবেশ করিল। রাণী এলিজাবেথ ড্রেককে তাঁহার অসমসাহসিক বীরত্ব-ব্যঞ্জক কার্য্যের জন্য 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ইংরেজদিগের মধ্যে ড্রেকই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। ইংরেজদের মতে ড্রেক মস্ত বীর, কিন্তু স্পেনের ইতিহাসে তাঁহাকে "নিষ্ঠুর জলদস্যু" বলিয়া বর্ণনা করা হয়।



রিচার্ড ফ্রান্সিস্ বার্টন


১৮৩০ পৃষ্ঠার পর

মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ মক্কা নগরীতে সেদিন হাজার হাজার পুণ্যার্থীর ভীড়। তাহাদের মধ্যে ধনী আরব ব্যবসায়ী হইতে আরম্ভ করিয়া দীনতম ভৃত্যও আছে। পরম ভক্তিভবে, নগ্নপদে তাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছে ; মাথার উপরে প্রখর সূর্য্য-কিরণ, সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। কেহবা অনুতপ্ত, বিক্ষুব্ধচিত্তে সহসা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেছে।



রিচার্ড ফ্রান্সিস্ বার্টন

মুসলমানদের সেই পরম পুণ্যতীর্থ কাবাতে (Ka·abah) সহস্র যাত্রীর ভিড়ে মিশিয়াছিলেন এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি—বলিষ্ঠ,, পেশল দেহ, তীক্ষ্ণ চক্ষু, ঝাঁপালো একজোড়া গোঁফ, গাত্রবর্ণ রৌদ্রদগ্ধ তামাটে। সকলের সঙ্গে মিশিয়া সেই দীর্ঘদেহ লোকটিও গেব্রিয়েল এব্রাহিমকে যে কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড দিয়াছিলেন, তাহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ভক্তিভরে চুম্বন করিলেন।



লেডি ইসাবেল বার্টন

তারপর প্রার্থনার শেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ চাহিয়া আবার ভীড়ে মিশিয়া গেলেন।

কাহারও তাঁহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নাই। কারণ, তাঁহাকে বেশে ও কথাবার্ত্তায় প্রাচ্যদেশীয়

বলিয়াই বোধ হইতেছিল। মুসলমান ধর্ম্মানুষ্ঠান সমুদয় যথারীতি সম্পন্ন করিবার পর পবিত্র কূয়াটি দেখা, ইসমাইলের মসজিদে নমাজ পড়া—সমস্তই তাঁহার শেষ হইয়া গেল। আচারে, ব্যবহারে, ভাষায়, ভাবে-ভঙ্গীতে কাহারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে নাই যে, এ লোকটি মুসলমান নহেন। তাহারা জানিত ইহার নাম মীর্জ্জা আবদুল্লা এল বুশিরি (Mirza Abdullah el Bushiri) আসলে ইনি হইতেছেন রিচার্ড ফ্রান্সিস্ বার্টন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বিধর্ম্মী (মুসলমানদের নিকট) খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, ইউরোপীয় পবিত্র মক্কাতীর্থে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

বার্টনের অসাধারণ আত্মবিশ্বাস, দুর্দ্দম সাহস, ও অদম্য মানসিক শক্তির পরিচয় ইহাতেই পাওয়া যায়। জীবন বিপন্ন করিয়া বার্টন দিনের পর দিন কাটাইয়াছেন। কোন প্রকারে ধরা পড়িলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ বার্টন এতটুকু ভুলও করেন নাই—কাজেই, সেযাত্রা নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন।

মক্কাতীর্থে যাওয়ার সঙ্কল্প বার্টন একদিনে করেন নাই। বার্টন চিরদিনই দুঃসাহসী ছিলেন। এরূপ বিপজ্জনক কোন কিছু করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বহুকাল হইতেই ছিল এবং সেজন্য তিনি বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

ভারতীয় সৈন্যবিভাগে কাজ করিবার সময়ই তিনি বহু প্রাচ্য ভাষা শিখিয়াছিলেন। বার্টন সম্বন্ধে একথাটি বলা খাটে যে, তিনি জীবনে একটি মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করেন নাই। অবসর সময় তিনি সর্ব্বদা জ্ঞানানুশীলন ও ভাষা শিক্ষায় ব্যয় করিতেন। বার্টন প্রায় ত্রিশটি বিভিন্ন ভাষা জানিতেন।

এছাড়া বার্টনের আর একটি বিশিষ্ট গুণ ছিল, তিনি চমৎকার ছদ্মবেশ পরিয়া আত্মগোপন করিতে পারিতেন। বার্টন দেখিতেও অনেকটা প্রাচ্যদেশীয়দের মতন ছিলেন। মক্কা যাইবার সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি বহুবার প্রাচ্যদেশীয়দের মতন বেশভূষা করিয়া বাজারের লোকের ভীড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন— যাহাতে সাধারণ লোকের আচার-ব্যবহার কথাবার্ত্তা ভাল করিয়া শিখিতে পারেন। তাছাড়া বার্টনের প্রকৃতিদত্ত গুণ ছিল—অসাধারণ আত্মগোপন করিবার ক্ষমতা।

এইরূপে যথোচিত সুসজ্জিত হইয়া তিনি সেনা-বাহিনী হইতে এক বছরের ছুটি লইলেন এবং ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে পারসিকের ছদ্মবেশে লণ্ডন ত্যাগ করিয়া আলেকজান্দ্রিয়া আসিয়া পৌঁছিলেন। ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে জানিয়া তিনি চিকিৎসা বিদ্যাও অল্পস্বল্প শিখিয়াছিলেন। সুয়েজে পৌঁছিয়া



বার্টন—আরবদেশীয় লোকের ছদ্মবেশে

তিনি একদল তীর্থ-যাত্রীর সঙ্গে মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। প্রথম হইতেই তাঁহাকে নানা কষ্ট সহিতে হইয়াছিল। প্রখর সূর্য্যের তাপে দগ্ধ হইয়া যাত্রীর ভীড়ে মিশিয়া নৌকায় চড়িয়া প্রথমে বারদিন কাটিল। তারপর তিনি সেই বিপজ্জনক যাত্রাপথের নানা বিপদ এড়াইয়া মদিনা পৌঁছিলেন। সেইখানে লুকাইয়া মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদের সমাধি ও মদিনা সহরের একটি ছবি আঁকেন।

মদিনা হইতে মক্কা দশদিনের পথ। পথে নানা-দেশীয় লোকের সহিত তীর্থযাত্রীদের ছোটখাট লড়াই হয়। তবে উষ্ট্র লুণ্ঠন ব্যতীত বিশেষ কোন ক্ষতি হয়

না। মক্কায় পবিত্র তীর্থের একটি ছবি আঁকিবার লোভ বার্টনের বহুবার হয় কিন্তু সঙ্গীদের মনে সন্দেহ জাগিবার ভয়ে কয়েকটি রেখায় মাত্র, মোটামুটি আঁকিয়া রাখিয়াই তাঁহাকে নিরস্ত



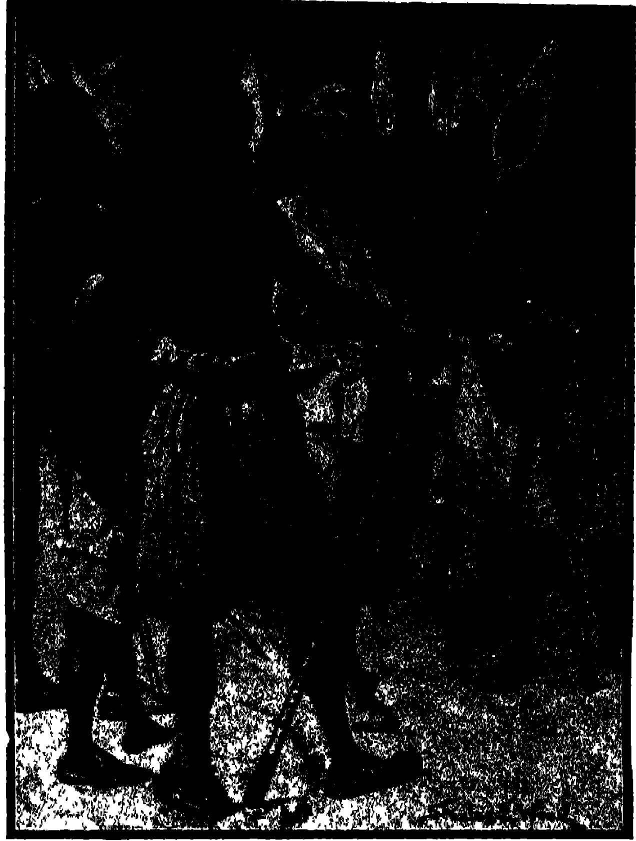
ধার্ম্মিক মুসলমান দম্পতি

হইতে হয়। অসাধারণ স্মরণশক্তির বলে মন হইতে পরে আবার আঁকিয়াছিলেন।

মদিনা ও মক্কা তীর্থ ভ্রমণ (Pilgrimage to El Medineh & Mecca) নামক গ্রন্থে তাঁহাব অসাধারণ তীক্ষ্ণদর্শন শক্তির বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তীর্থভ্রমণ শেষ হইয়া গেলে বার্টনের প্রধান চিন্তা হইল কেমন করিয়া নিজের পবিচয় গোপন রাখিয়া নিরাপদে দেশে ফিরিয়া যাইবেন। ফিরিবার পথে তাঁহার বহুবার আশঙ্কা হইয়াছে এই বুঝি ধরা পড়িয়া যান। সৌভাগ্যক্রমে পথে বিশেষ কোন বিপদ ঘটে নাই; তিনি নিরাপদে জেড্ডা (Jeddah) ফিরিয়া আসেন।

বার্টনের মক্কাতীর্থ ভ্রমণের খবর ইউরোপে পৌছিলে চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল ও বিলাতের জনসাধারণ সমস্ত বিবরণ জানিবার জন্ত



বার্টন ও দস্যুদল

নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠিল। মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে বার্টন জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ



ধনী বণিক্‌গণের মক্কা যাত্রা

করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার দিকে সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

১৮২১ খৃঃ অব্দের ১৯শে মার্চ্চ তারিখে হার্টফোর্ড সায়ারের বারহাম্ হাউস নামক গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। শৃঙ্খলা নিতান্ত অপছন্দ না করিলেও তিনি অল্পবয়সে বহুবার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া শাস্তি পান। সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত অন্যান্য বালকদের মারামারি লাগিয়াই থাকিত। তাহার নিজের ভাষায় বলিতে গেলে তিনি ছেলেবেলায় একটি 'আস্ত সয়তান' ছিলেন এবং যাহাদের সহিত তাঁহার ভাব অধিক থাকিত, তিনি তাহাদের উত্যক্ত করিয়া তুলিতেন।



মক্কায় একটি মস্‌জিদ—মুসল্লা আইনবি

মাত্র চার বৎসর বয়সেই তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতা কিন্তু পুত্রের পাঠে অনুরাগের অভাব দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত ছিলেন।

বার্টনের বাল্যকাল প্রধানতঃ ফ্রান্স ও ইটালীতেই কাটে। কাজেই, ফরাসী ও ইটালীয়ান ভাষা তিনি খুবই ভাল জানিতেন। তিনি বহু বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার একজন গৃহশিক্ষকও ছিলেন। কিন্তু এই গৃহশিক্ষক বার্টনকে নূতন কিছুই শিখাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রধান ঝোঁক ছিল ভাষা শিক্ষার দিকে। ভাষা শিখিতে বার্টনকে জীবনে কোনদিন ক্লান্ত হইতে দেখা যায় নাই।

বার্টন কিছুকাল অক্সফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজেও পড়িয়াছিলেন। কলেজে পড়া তাঁহার কিন্তু মোটেই ভাল লাগিত না। ক্লাশে বসিয়া বসিয়া দীর্ঘ নীরস বক্তৃতা শোনা বার্টনের বিরক্তিকর লাগিত। তাছাড়া কলেজের অত খুঁটিনাটি নিয়ম-কানুন মানিয়া চলাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কাজেই, তিনি একদিন কলেজ ছাড়িয়া পলাইয়া আসেন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন করিতে গিয়া বার্টনের অর্থ ও সময়ের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় নাই। তবে তিনি আরবীয় ভাষা ও অসিবিদ্যাটিও এখানে ভালই শিখিয়াছিলেন।

রিচার্ড বার্টনের এখন প্রধান চিন্তা হইল জীবনে কোন্ পথ অবলম্বন করিলে তাঁহার অদম্য ভ্রমণ-পিপাসা মিটিতে পারে। অবশেষে তিনি ভারতীয় সৈন্যবিভাগেই চাকুরী লওয়া স্থির করিলেন এবং ১৮৪২ খৃঃ অব্দে ভারতের উদ্দেশে রওনা হইলেন। বার্টনের জীবনে এই প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। যদি বার্টন সৈন্যবিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া ভারতবর্ষে না আসিয়া ইংলণ্ডের কোন ব্যবসায়ীর কাজ লইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে আবিষ্কারের ইতিহাসে বার্টনের নাম আজ অমর হইয়া থাকিত না এবং তাঁহার অসাধারণ ভ্রমণ-পিপাসা ও প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টিও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইত।

বিবিধ ভাষায় অসাধারণ জ্ঞানের জন্য তাঁহার কাজ জুটিল ভালই, কিন্তু বেশীদিন বার্টনের একাজে মন টিঁকিল না। একঘেয়ে নিয়ম মানিয়া চলা বার্টনের প্রকৃতিতে ছিল না। কাজেই, তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন।

ভারতে বাস করিবার সময়ই বার্টন বিবিধ ভারতীয় ভাষা ও ধর্ম্ম-রীতিনীতি মন দিয়া শিখিয়াছিলেন। দেশীয় ভাষা পরীক্ষায় বার্টন সর্ব্বদা উচ্চ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইতেন। এসময় বার্টন ভারতের বহুস্থানে সুবিধা পাইলেই ভ্রমণ করিতেন এবং ভ্রমণ-কাহিনীও লিখিয়াছিলেন।

বার্টনের এসময় কঠিন চক্ষুপীড়া হওয়াতে তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরিতে বাধ্য হইলেন।

দেশে ফিরিয়া সুস্থ দেহ লাভ করিয়াই তিনি মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বার্টনের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল—তিনি সম্মান, খ্যাতি প্রভৃতির বাহ্যিক আড়ম্বর প্রকাশ আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। মক্কা ভ্রমণের কাহিনী দেশে প্রচারিত হইবার পরে যখন ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ বার্টনকে দেখিবার জন্য ও সম্মান প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, তখন সে সমাদর লাভ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া বার্টন ভারতে ফিরিয়া গেলেন। জীবনে চিরদিনই বার্টন অসাধারণ আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। যশের লোভ তাঁহার এতটুকুও ছিল না।

ভারতে ফিরিয়া সৈনিক জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ম-কানুন মানিয়া চলা বার্টনের মোটেই ভাল লাগিল না। পুনরায় দুর্গম পথে যাত্রা করিবার জন্ত তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এসময়ে হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল পূর্ব্ব আফ্রিকার সোমালী দেশের উপর। সেই রহস্যময় দেশের সন্ধানে লেফ্‌টেনেণ্ট স্পেক্ ও অপর দুইজন সঙ্গীকে লইয়া তিনি যাত্রা করিলেন। সঙ্গীদ্বয়কে বারবারাতে (Berbera) মিলিতে বলিয়া বার্টন হারার নামক সহরে প্রবেশ করিবেন মনস্থ করিলেন। হারার পৌছিতে বার্টনকে পথে বহু বিপদের মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছিল। কিন্তু বিপদকে ভয় করিবার লোক তিনি ছিলেন না। অদম্য সাহসে ভর করিয়া সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, অসামান্ত আত্মবিশ্বাসের সহিত বার্টন সেই বিপৎসঙ্কুল পথে বাহির হইলেন।

বার্টন কখনও বিপদে ধৈর্য্য হারাইতেন না। দেশীয়দের মধ্যে ষড়্‌যন্ত্রের সূত্রপাত দেখিলেই পিস্তলটি বাহির করিয়া বহু উচ্চে উড্ডীয়মান কোন শকুনপাখীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িতেন। বার্টনের অসাধারণ লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা দেখিয়া দেশীয় লোকেরা ভীত হইয়া পড়িত এবং বার্টনের সহিত শত্রুতা করিতে আর ভরসা করিত না। একবার বার্টন একজন দুর্দ্দান্ত লোকের হাতে একটা লাঠি দিয়া বলিলেন, আমাকে যত খুসী মার, পরে আমিও তোমাকে মারিব। লোকটা বার্টনকে মারিতে লাগিল কিন্তু বার্টনের কোন ক্ষতিই করিতে পারিল না। এর পর বার্টনের পালা। বার্টন সজোরে একটি আঘাত করিতেই লোকটা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পলায়ন করিল।

বার্টন সোমালী দেশ সম্বন্ধে অনেক মজার গল্প করিতেন। চায়ের কেট্‌লীতে জল টগবগ করিয়া ফুটিতে দেখিয়া সেখানকার লোকেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া ভাবিল, এ আবার কি ব্যাপার! আর এক জায়গায় লোকেরা তাঁহাকে পবিত্র জলে স্নান করাইয়া সর্ব্বাঙ্গে গাছের পাতা জড়াইয়া নিজেদের রাজা বলিয়া অভিষিক্ত করিয়াছিল।

হারার (Harar)-এর কাছাকাছি পৌছিতেই বার্টনকে গুপ্তচর বলিয়া তাঁহার যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়া গেল। বার্টন কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া সেখানকার লোকদের দিয়া একটা চিঠি পাঠাইয়া দিলেন যে, তিনি একজন শ্বেতাঙ্গ, এখানকার আমিরের সঙ্গে দেখা করিতে চান। বার্টনের এই অসীম সাহসিক কার্য্যের আশ্চর্য্য ফল ফলিল। আমির বা রাজা বাহিরে বার্টনের সহিত কোন অসদ্ব্যবহার করিলেন না। কাজেই, তিনি হারারে নিরাপদে দশদিন বাস করিলেন। ফিরিবার পথে প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা কাল জল না খাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে একটি ঝরণা আবিষ্কার করিয়া সে যাত্রা তাঁহারা রক্ষা পান। বারবারা (Berbera) পৌছিবার আগেই খাদ্যসামগ্রী সমুদয় ফুরাইয়া যায়; অতি কষ্টে, ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সকলে আসিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিলেন।

এবারে কিন্তু বার্টনকে বারবারা পৌছিয়াই যাত্রা স্থগিত করিতে হইল। প্রায় তিনশত সোমালী যোদ্ধা অতর্কিতে শিবির আক্রমণ করে। তাহাতে একজনই নিহত হয় এবং বার্টন ও স্পেক গুরুতর ভাবে আহত হন। বার্টনের চোয়ালে বিষম আঘাত লাগে। তিনি অতি আশ্চর্য্যভাবে প্রাণে বাঁচিয়া যান। অগত্যা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার আশা ত্যাগ করিয়া বার্টন ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দেশে ফিরিয়া বেশী দিন বার্টনকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় নাই। এই সময় ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধে। তিনি একটা বিশৃঙ্খল সেনানীর অধ্যক্ষরূপে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ সহযোগীদের ঈর্ষার ফলে যথোচিত সমাদর লাভ করিতে পারেন নাই।

যুদ্ধের শেষে বার্টন রাজকীয় ভৌগোলিক সমিতির নিকট মধ্য আফ্রিকার হ্রদগুলি আবিষ্কারের জন্ত অভিযান প্রেরণ করা হউক এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নীলনদের উৎসমুখ আবিষ্কার করিবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার মনে ছিল। সমিতি এ প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তাঁহাকে একহাজার পাউণ্ড অর্থ মঞ্জুর করেন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে স্পেককে সঙ্গে লইয়া বার্টন সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাহসিকতম অভিযানে বাহির হইলেন।

মধ্যআফ্রিকার বিপৎসঙ্কুল দুর্গম বনপথে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বহু আয়োজনের দরকার। কাজেই, যাত্রায় একটু দেরী হইয়া গেল। সেই বছরেরই জুন মাসে বার্টন তাঁহার সাহসী ক্ষুদ্র দলকে সঙ্গে লইয়া জান্‌জিবার পরিত্যাগ করিলেন।

প্রথমতঃ তাঁহারা প্রতিদিন সাত মাইল করিয়া হাঁটিতেন। আমাদের নিকট এ নিতান্ত সামান্ত পথ চলা বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে বার্টনের যাত্রাপথ অত সহজ, সুগম

ছিল না। বন বন ত ছিলই, তা ছাড়া ছিল ভীষণ রোগের আক্রমণের ভয় ও দেশীয়দের বিষম শত্রুতা। কতদিন যে তাঁহাদের অনাহারে পথ চলিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

দীর্ঘ আট মাসকাল অসামান্য ধৈর্য্যের সহিত নানাবিধ বিপদ ও কষ্ট সহ্য করিবার পর তাঁহারা অবশেষে একটা বিশাল হ্রদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই হ্রদেরই নাম ট্যাঙ্গানিকা হ্রদ (Lake Tanganyika)। বার্টনের মনে যে অত্যন্ত আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। বার্টনের মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিল, নীলনদ এই হ্রদ হইতেই বাহির হইয়াছে। বার্টন একদিন অসুস্থ হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছেন এমন সময় স্পেক একাকী বাহির হইয়া ভিক্টোরিয়া নায়নজাপ্রপাত বাহির করিয়া আসিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, ইহাই নীলনদের প্রকৃত উৎসস্থল।

বেশীর ভাগ বড়লোকদের মত বার্টনেরও শত্রু ও বিরুদ্ধ সমালোচকের অভাব ছিল না। তাহাদের মতে বার্টন তাঁহার সঙ্গী স্পেকের সফলতায় ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। যদিও স্পেক ও বার্টনের মধ্যে এবিষয় লইয়া মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, তথাপি এ কথাও সত্য—বার্টনের চরিত্রে পরশ্রীকাতরতা ছিল না।

আফ্রিকার দারুণ জ্বরে অসুস্থ হইয়া পড়ায় বার্টনের স্বদেশে ফিরিতে দেরী হইয়া গেল। ইতিমধ্যে স্পেক বার্টনের পূর্ব্বে লণ্ডনে পৌঁছিয়া সমুদয় সম্মান এমন কি বার্টনের প্রাপ্য সম্মান একাকীই লাভ করিলেন। অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় তিন বৎসর কাল ক্রমান্বয়ে বাস করিবার ফলে বার্টনের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। নিতান্ত ভগ্নদেহে তিনি ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই সময়েই তাঁহার, ইসাবেল আরানডেলের (Isabel Arundell) সহিত বিবাহ হয়। বার্টন যখন ইসাবেলকে প্রথম দেখেন, তখন সে নিতান্ত বালিকা—বুলোনের স্কুলে পড়িত। প্রথম দর্শনেই তাঁহারা পরস্পরের উপর আকৃষ্ট হন। মায়ের শাসন এড়াইয়াও ইসাবেল বার্টনের আফ্রিকা অভিযানের পূর্ব্বে কয়েকবার দেখা করেন।

বহু বৎসরের অদর্শনেও উভয়ের ভালবাসা একটুও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। বহুদিন পরে যখন আফ্রিকা হইতে বার্টন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার দেহ নিতান্ত ভগ্ন, একটি চক্ষু অর্দ্ধ দৃষ্টিহীন ও দেহের একভাগ পক্ষাঘাতে পঙ্গু অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। তবুও ইসাবেলের ভালবাসা বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই, উভয়ের মধ্যে এগার বৎসর বয়সের ব্যবধান ছিল; তা ছাড়া ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও প্রভেদ ছিল। এত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও বার্টন ও ইসাবেলের ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিবাহ হইয়া গেল।

জীবনের অবশিষ্ট ভাগ বার্টন কনসালের (Consul) কার্য্য করিয়া কাটান। প্রথমতঃ তিনি পশ্চিম আফ্রিকার ফারনাণ্ডোপো নামক স্থানে যান। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য তিনি সে যাত্রা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই। পরে যখন ব্রেজিলের সাণ্টোস (Santos) নামক স্থানে বদলী হন তখন ইসাবেলকে সঙ্গে লইয়া যান। ইসাবেল আপনাকে সমগ্রভাবে পতিসেবায়, পতির হিতকামনায় নিয়োজিত করেন।

শত্রুদের বিরুদ্ধাচরণের ফলে বার্টনকে যখন দামাস্কাসের কনসালের কার্য্য হইতে ডাকিয়া লওয়া হয়, তখন ইসাবেল প্রাণপণ চেষ্টায় স্বামীর সম্মান পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। ইহার পর ট্রিষ্টিতে তিনি পুনরায় কনসালের কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার পরে তিনি আরও অনেকবার অভিযান যাত্রা করেন এবং প্রতিবারেই এক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। বার্টনের রচিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় আশি খানা। তাঁহার রচিত একখানা কবিতার পুস্তকও আছে—নাম "কাসিদা"। ইহার কবিতাগুলি ওমর খৈয়ামের রোবায়েতের মতই প্রায় মধুর। এতদ্ব্যতীত তিনি আরব্যোপন্যাসের অনুবাদ করেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। ইহার চারি বৎসর পরে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর ট্রিষ্টিতে (Triste) তাঁহার মৃত্যু হয়।

আজ পর্য্যন্তও বার্টনের কার্য্যের যথোচিত সমাদর হয় নাই। বিরুদ্ধ সমালোচকদের নিন্দা বার্টনের যশোগরিমা অনেকাংশে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এসব ঈর্ষাপ্রসূত সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া যখন আমরা বার্টনের গুণাবলী, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও যশঃনিস্পৃহতা দেখি, তখন মনে হয়, বার্টনের স্থান অনেক উচ্চে। প্রাচ্যদেশসম্বন্ধে এমন অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টি অন্য কোন ইউরোপীয় ভ্রমণকারীর মধ্যে ছিল না। আবিষ্কারক হিসাবেও তিনি লিভিংষ্টোনের ন্যায়ই সম্মানের যোগ্য।



ভারতীয় মুদ্রার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ


১৮৪৬ পৃষ্ঠার পর

পূর্ব্বে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ হইত। কিন্তু পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও বেলুচিস্তানে বৈদিক যুগের পূর্ববর্ত্তী তাম্রযুগের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও নালে—তিনটি অতি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল এবং এই সকল স্থানের লোকেরা নানা বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল ও তাহার নিদর্শনস্বরূপ বহু তৈজস-পত্র, অলঙ্কার, অস্ত্রাদি এবং সভ্যজাতির প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্য ভূমধ্য হইতে উত্তোলিত হইয়া একটা অতি প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। তৎকালে বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। এই সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণ সোনা, রূপা, তামা, টিন ও সীসা পাওয়া গিয়াছে কিন্তু লৌহসামগ্রী একেবারেই পাওয়া যায় নাই। সোনার তুলনায় রূপার পরিমাণ অতি অল্প; ইহাতে মনে হয়, সেই সময়ে যত সোনা পাওয়া যাইত, রূপা তদনুরূপ পাওয়া যাইত না এবং সোনা রূপার তুলনায় সুলভ ছিল। সম্ভবতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ওজনদরে ধাতুদ্রব্যের ব্যবহার হইত কিন্তু মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এমন কি, তৎপরবর্ত্তী বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে মুদ্রা প্রচলিত হয় নাই।



হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ

ঋগ্বেদের সময়ে আর্য্যেরা তাঁহাদের যাযাবর-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল, তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব; তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, চার বা সাড়ে চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক



মহেন্জোদারোতে প্রাপ্ত অলঙ্কার

সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। যদিও সেই সময়ে প্রধানতঃ পরস্পর দ্রব্যাদির বিনিময় দ্বারাই ক্রয়বিক্রয় চলিত, তবু ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, ক্রমশঃ গো বিনিময় যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে থাকে। ঋগ্বেদের এক জায়গায় এইরূপ উল্লেখ আছে যে, একটা ইন্দ্র দেবতার মূর্ত্তির দাম দশ গাভী। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ সেই সময়ে গো-ই আর্য্যদের প্রধান ধন ছিল; গরুই তাঁহাদের সমস্ত অভাব দূর করিত এবং এমন কি কৃষিকার্য্যের সহায়কও ছিল। পুরোহিতকে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ গরু দেওয়া হইত এবং যাঁহার যত বেশী গরু থাকিত তিনি তত ধনী বলিয়া গণ্য হইতেন। বৈদিকসংহিতাযুগের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণযুগেও সেই রীতি প্রচলিত দেখিতে পাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞকালে বলি দেওয়ার জন্য ব্রাহ্মণপুত্র শুনঃশেফকে এক শত গাভী দাম দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন। তখন পর্য্যন্ত মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই, ইহা স্পষ্টই মনে হয়।



মহেন্জোদারোতে প্রাপ্ত একটি সিলমোহর

ঠিক কোন্ সময়ে ভারতে প্রথম মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা বড় শক্ত। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে যখন গ্রীসীয় রাজা আলেক্জাণ্ডার এদেশ আক্রমণ করেন, তখন এদেশে রৌপ্য-মুদ্রা প্রচলিত ছিল ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারণ, গ্রীসদেশীয় কুইন্টাস্ কার্টিয়াস্ (Quintus Curtius) লিখিয়া গিয়াছেন যে, পাঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশিলার রাজা জাণ্ডারকে অঙ্কচিহ্নিত বহু রৌপ্যখণ্ড উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ রৌপ্যখণ্ডগুলির বর্ণনা এদেশীয় প্রাচীন মুদ্রার সহিত মিলিয়া যায়। মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থে রৌপ্য এবং তাম্র উভয় ধাতুর নানাজাতীয় মুদ্রার উল্লেখ



কুইন্টাস কার্টিয়াস

এশিয়ার পাখি





দেখা যায়। তৎপূর্ব্বকালীন গ্রন্থ পাণিনির ব্যাকরণেও মুদ্রার উল্লেখ আছে। সুতরাং ভারতে অন্ততঃ খৃষ্টজন্মের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ক্যানিংহাম সাহেব খৃঃ পূঃ ১০০০ এক হাজার অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। অল্প দুই এক শত বৎসর এদিক ওদিক হইলেও তাঁহার মতমোটামুটি প্রামাণিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক সংহিতাযুগের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণযুগে প্রথম মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়।

প্রাচীনকালে লিডিয়া, ভারতবর্ষ ও চীন দেশে পরস্পর স্বাধীনভাবে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ভারতীয় মুদ্রাগুলির আকার ও নির্ম্মাণ-কৌশল অন্য দেশের মুদ্রা হইতে বিভিন্ন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেরূপ মুদ্রা প্রচলিত আছে, তাহাদের সঙ্গে তুলনা করিলে ঐ প্রাচীন মুদ্রাগুলিকে মুদ্রা বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। অনেকেই চিনিতে না পারিয়া ঐ সকলের বহু মুদ্রা গলাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এই প্রাচীন মুদ্রাগুলিকে **অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রা** (punch-marked) বলে। ইহাদের দুই পিঠে কিছুই লিখা নাই এবং এইগুলির কোনও নির্দ্দিষ্ট আকারও নাই; কেবল মাত্র ওজন ঠিক আছে এবং ঐগুলি যে মুদ্রা, তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য একপিঠে অথবা সাধারণতঃ দুই পিঠে নানারূপ অঙ্ক-চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইত। তৎকালে বহু অঙ্কচিহ্ন প্রচলিত ছিল। যেমন সূর্য্য, চক্র, পর্ব্বত, নদী, বিন্দু, ত্রিভুজ, নানারূপ পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতি। এই সকল নানা চিহ্নে ভূষিত হইয়া মুদ্রাগুলি টাকশাল হইতে বাহির হইয়া আসিত, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই মুদ্রাগুলির কোনও নির্দ্দিষ্ট আকার ছিল না; কেবল মাত্র ওজন ঠিক করিয়া দেওয়া হইত। অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রা বহুদিন এদেশে প্রচলিত ছিল।

ভারতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রার ব্যবহার ছিল এবং দক্ষিণ ভারতে আরও প্রায় তিনশত বৎসর এই সকল মুদ্রার প্রচলন ছিল। অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রাই আমাদের দেশের প্রাচীনতম মুদ্রা এবং এখনও বহু স্থানে ভূগর্ভে এই সকল মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জিলার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে কতকগুলি অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে নানাস্থানে এই মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলেও বিশেষ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বিহার অঞ্চলেই অধিকসংখ্যক অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে এবং প্রাচীনকালে এই সকল প্রদেশ সভ্যতার কেন্দ্রস্থান ছিল সুতরাং বহুল পরিমাণে অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রা ব্যবহার করিত। এই মুদ্রাগুলি তাম্র অথবা রৌপ্য ধাতুদ্বারা নির্ম্মিত হইত। যদিও তৎকালে অলঙ্কার প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য স্বর্ণের ব্যবহার প্রচলন ছিল, তবু মুদ্রার জন্য স্বর্ণ ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয় না। এই পর্য্যন্ত একটি অঙ্কচিহ্নিত সুবর্ণ মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয় নাই। রৌপ্য মুদ্রার সংখ্যাই অধিক; কিন্তু নানাকারণে মনে হয় যে, তাম্র মুদ্রাই প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। তখনকার দিনে রৌপ্যের তুলনায় তাম্রের মূল্য অত্যন্ত অধিক ছিল। সুতরাং ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজ তাম্র মুদ্রাদ্বারাই চলিয়া যাইত। কিন্তু যখন সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত জনসাধারণের অধিক মূল্যের মুদ্রার প্রয়োজন হইয়া উঠিল, তখন তাহারা রৌপ্য মুদ্রা তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোনও প্রদেশে তাম্র এবং রৌপ্য উভয়বিধ মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। মগধে মৌর্য্যবংশীয় রাজাদের সময়ে তাম্র এবং রৌপ্য দুই রকমের মুদ্রাই ব্যবহৃত হইত। আবার কোনও প্রদেশ এত দরিদ্র ছিল যে, কেবল তাম্রমুদ্রাদ্বারাই তাহাদের বিনিময় কার্য্য চলিয়া যাইত। প্রাচীন মালবজাতির ভিতর রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহৃত হইত

বলিয়া মনে হয় না ; তাহারা কেবল তাম্র-মুদ্রাই তৈয়ার করিত। যাহাহউক, ধাতুহিসাবে রৌপ্যের ন্যায় তাম্র টেঁকসই নহে বলিয়া বোধ হয় পরে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন হয় এবং সেই জন্যই রৌপ্য মুদ্রাই অধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হইতেছে। অঙ্কচিহ্নিত রৌপ্যমুদ্রাকে পুরাণ বা ধরণ বলিত এবং তাম্রমুদ্রার নাম ছিল কার্ষাপণ। এই উভয়বিধ মুদ্রারই অর্দ্ধ, এক-চতুর্থ প্রভৃতি নানারূপ বিভাগ ছিল। পুরাণ নামধেয় মুদ্রার ওজন সাধারণতঃ ৩২রতি বা প্রায় ৫৬ গ্রেণ ধরা হইত এবং কার্ষাপণের ওজন ছিল ৮০রতি বা আনুমানিক ১৪৬ গ্রেণ। বাস্তবিক পক্ষে ওজন প্রায়ই নানাকারণে কম-বেশী হইত, তবে মোটামুটি পুরাণের ওজন ৩২ রতি ও কার্ষাপণের ওজন ৮০ রতি। বর্ত্তমান সময়ে ৬ রতিতে এক আনি এবং ১৬ আনিতে এক তোলা ধরা হয়। সুতরাং পুরাণের ওজন ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ আনি এবং কার্ষাপণের ওজন সাড়ে তের আনি।

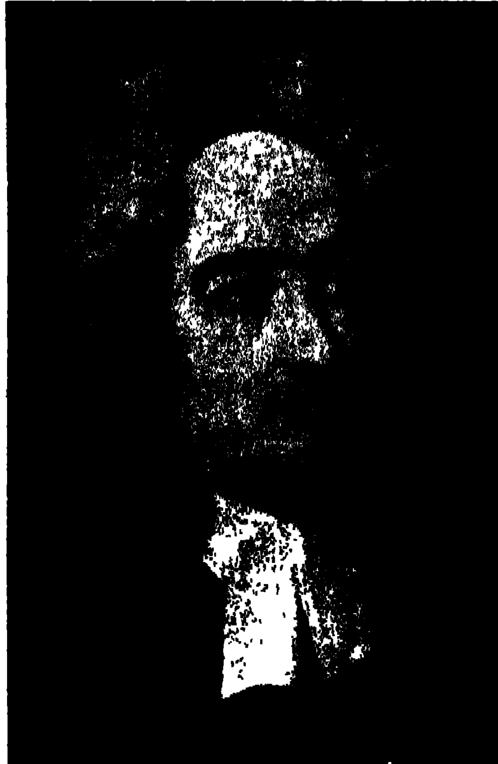
এই সকল প্রাচীন অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রায় রাজার নাম, সন প্রভৃতি লেখা থাকিত না। কেবল কতকগুলি জীবজন্তু, গাছ, অস্ত্র, নদী, চক্র, সূর্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন নক্সার ছবি মুদ্রিত আছে। সাধারণতঃ দুই পিঠেই অঙ্কচিহ্ন থাকিত, তবে কোন কোন মুদ্রার কেবল এক পিঠেই পাওয়া গিযাছে। মুদ্রার প্রধান পিঠে (obverse) গড়পড়তায় পাঁচটা অঙ্কচিহ্ন থাকিত ; কোন কোনও সময়ে এমন কি ১৪টিও দেখা গিযাছে। বিপরীত দিকে (reverse) প্রায়ই শূন্য থাকিত সাধারণতঃ দুই একটি অঙ্কচিহ্নও পাওয়া যায়। এই সমস্ত অঙ্কচিহ্নের তাৎপর্য্য এখন পর্য্যন্ত সঠিক নির্দ্ধারণ করা যায নাই। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এক এক রাজা এক একটা অঙ্কচিহ্ন নিজের আভিজাতিক (heraldic) চিহ্নরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; বিভিন্ন প্রদেশে বা বণিক্‌সঙ্ঘেরও এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ অঙ্কচিহ্ন ছিল। কোন্ রাজবংশ বা রাজা কোন্ অঙ্কচিহ্ন ব্যবহার করিতেন বা কোন্ প্রদেশে কোন্ চিহ্নটা প্রচলিত ছিল, তাহা যদি আমাদের জানা থাকিত, তবে এই সকল মুদ্রার শ্রেণীবিভাগ করা অত্যন্ত সুবিধা হইত। ঐতিহাসিকেরা বর্ত্তমান সময়ে অঙ্কচিহ্নগুলি চিনিয়া লইবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতেছেন।

অনেকে মনে করেন যে [চিহ্ন] এই চিহ্নটি মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের চিহ্ন এবং এই অঙ্কচিহ্ন (অর্থাৎ একটা পাহাড়ের উপর অর্দ্ধচন্দ্র) যে সকল মুদ্রায় পাওয়া যায়, তাহার কতক-গুলিকে নিঃসন্দেহে চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা বলা যাইতে পারে। আবার একটা পাহাড়ের উপর ময়ূর এই চিহ্নটি অশোকের অঙ্কচিহ্ন বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। কতকগুলি অঙ্কচিহ্ন এখন পর্য্যন্তও প্রচলিত আছে। এইগুলিকে বর্ত্তমান সময়ে শুভচিহ্ন বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে 卐 এই চিহ্নটির নাম স্বস্তিক। ইহা অতি-প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং পৃথিবীর নানা দেশে অতীতকালে ইহার ব্যবহার পাওয়া যায়। হিন্দুরা শুভকার্য্যের সময়ে স্বস্তিকচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া থাকেন। আর একটি অঙ্কচিহ্নের নাম নন্দিপাদ [চিহ্ন] ইহার সহজ আকার [চিহ্ন] ইহাও শুভচিহ্ন এবং অতি-প্রাচীন কাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে। বহু জীবজন্তু—যেমন মাছ, গরু, কুমীর, হাতী প্রভৃতিও মুদ্রার উপরে অঙ্কিত পাওয়া যায়। এই পর্য্যন্ত প্রায় ৪।৫ শত বিভিন্ন অঙ্কচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে এবং ঐতিহাসিকেরা এই সমস্ত অঙ্কচিহ্নের বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এই চিহ্নগুলি হইতে প্রাচীনকালের ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি নানা বিষয়ের খবর পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।



গলিভারের ভ্রমণ-কাহিনী

[গলিভারের ভ্রমণ-কাহিনী (Gulliver's Travels) ইংরাজী সাহিত্যে একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের লেখক জোনাথন্ সুইফ্‌ট্ ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে, ডাব্‌লিন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সুইফ্‌ট্ ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। নানারূপ কার্য্যের ভিতর থাকিলেও তিনি বরাবরই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রচিত "Dissensions in Athens and Rome" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে বাহির হয় "Tale of a Tub" "Battle of the Books" প্রভৃতি। কিন্তু এসকল ছোটবড় গ্রন্থ প্রকাশে তাঁহার তেমন যশঃ লাভ হয় নাই। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন "Gulliver's Travels" প্রকাশিত হইল, তখন তিনি একজন সুবিখ্যাত লেখকরূপে সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বেই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। এ বইখানা দেশের ধনী, দরিদ্র, ছোট, বড়, বালক, যুবক ও বৃদ্ধ সকলের নিকটেই অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল। এই গলিভারের ভ্রমণ-কাহিনী রচনা করিয়াই সুইফ্‌ট্ অমর হইয়া গিয়াছেন। সমালোচকেরা বলেন—"Through this work he is known to all ages, all conditions all over the world—and he was more than fifty when he wrote it." গলিভারের ভ্রমণ-কাহিনীটি রূপক হইলেও ইহা বালক-বালিকাদের অতিশয় প্রিয়। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর ডাব্‌লিন নগরে সুইফ্‌টের (Jonathan Swift) মৃত্যু হয়। বাঙ্গালা ভাষায়ও গলিভারের কয়েকটি সংস্করণ আছে।]



জোনাথন্ সুইফ্‌ট্

লিলিপুটদের দেশে



নটিংহাম্ শায়ারে আমার বাবার ছোট্ট একটি জমিদারী ছিল। তা থেকে এত অল্প আয় হ'ত যে, তা দিয়ে সংসার চালিয়ে তারপর কেম্‌ব্রিজে আমার লেখাপড়ার খরচ চালানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠেছিল। সেইজন্য বছর তিনেক পরে আমি পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে লণ্ডনের এক বিখ্যাত চিকিৎসকের কাছে ডাক্তারি শিক্ষা আরম্ভ ক'রেছিলাম।

লেডেন শহরে দুই বৎসর পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করবার পর আমি সোয়ালো নামক শহরে চিকিৎসক হ'য়ে বসেছিলাম। চিকিৎসক হওয়ার পর মাঝে মাঝে আমাকে জাহাজের ডাক্তার হ'য়ে সমুদ্রযাত্রা করতে হ'ত।

১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে আমি একবার সমুদ্র-যাত্রায় বেরিয়েছিলাম। সেবার একটা জলমগ্ন পাহাড়ের সঙ্গে আমাদের জাহাজখানার হঠাৎ এমনি ধাক্কা লাগ্‌ল যে, জাহাজখানা চুরমার হ'য়ে ভেঙ্গে গেল। জলে প'ড়ে আমি সাঁতার কাটতে লাগ্‌লাম। চারদিকে চেয়ে দেখ্‌লাম যে, কূল-কিনারা কিছুই দেখা যায় না—কেবল নীলজল আর জল; আর তার উপরে রাশি-রাশি ফেনা আর বড় বড় ঢেউ। আমি ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে নিজেকে কোনও রকমে ভাসিয়ে রেখেছিলাম। বাতাস এবং স্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ পরে আমি ভেসে ভেসে গিয়ে এক ডাঙায় পৌঁছেছিলাম এবং এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম যে, কোনও রকমে জল থেকে উঠে সমুদ্রতীরেই এক জায়গায় শুয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, তা ঠিক জানি না, তবে যখন ঘুম ভেঙেছিল তখন দেখলাম যে, সূর্য্য মাথার উপরে উঠেছে। আমি ওঠবার চেষ্টা ক'রে দেখলাম যে, কারা যেন খুব শক্ত ক'রে আমাকে মাটিতে বেঁধে ফেলেছে। আমি আমার মাথাটি পর্য্যন্ত ঘোরাতে পার্‌লাম না। আমি অনুভব করলাম যে, আমার পা ও বুকের উপর কারা যেন পিঁপড়ের মত সুড়্‌সুড়্ ক'রে চলাচল ক'রে বেড়াচ্ছে। তখন আমি আমার চোখদুটো নীচের দিকে নামিয়ে দেখতে পেলাম যে, ঠিক ছয় ইঞ্চি উঁচু, অর্থাৎ প্রায় হাতের চেটোর মত লম্বা একটি ছোট্ট মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তার তীর-ধনুক এবং তার পিছনে পিছনে পিঁপড়ের সারের মত বহু মানুষ সুড়্‌সুড়্ ক'রে আমার গা-হাত-পা বেয়ে বেয়ে বুকের উপর উঠ্‌ছে। পরে জান্‌তে পেরেছিলাম যে, ঐ ক্ষুদে মানুষগুলোর নাম লিলিপুট। ব্যাপার দেখে আমি বাঁধন ছেঁড়বার জন্য টানাটানি কর্‌তে লাগলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বাঁ হাতের বাঁধন ছিঁড়ে



বহু মানুষ আমার বুকের উপর উঠ্‌ছে

ফেল্‌লাম। কিন্তু আমি তাদের ধ'রে ফেলবার পূর্ব্বেই সেই ক্ষুদে মানুষগুলো দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পালিয়ে গিয়েই তারা তাদের ছোট ছোট ধনুক দিয়ে প্রায় শ খানেক তীর আমার বাঁ হাত লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়্‌লে। প্রত্যেক তীরের আঘাতটি ঠিক ছুঁচ বিঁধে যাওয়ার বেদনার মত মনে হচ্ছিল। যখন আমি স্থির হ'য়ে শুয়ে শুয়ে বেদনায় আর্ত্তনাদ করছিলাম তখন একদল লোক এগিয়ে এসে আমার মাথার বাঁধনগুলি কেটে দিলে। মাথাটা একটু ঘুরিয়ে আমি দেখতে পেলাম যে, সেই লিলিপুট দলের সাম্‌নে একজন বেশ হোমরা-চোম্‌রা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই লোকটি আমাকে শোনাবার জন্য মস্ত এক বক্তৃতা দিল, আমি কিন্তু তার বিন্দু-বিসর্গও বুঝ্‌তে পারি নি।

আমি তখন খুব বিনীতভাবে কয়েকটা কথা বলেছিলাম। কিন্তু তারা কিছুই বুঝ্‌তে পারে নি। আমার অত্যন্ত ক্ষিদে পেয়েছিল সেইজন্য আমি আমার মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে ইসারা ক'রে জানালাম যে, আমার ক্ষিদে পেয়েছে এবং খাবারের প্রয়োজন। সেই লোকটি আমার ইসারা বুঝ্‌তে পেয়ে তার সঙ্গীদের কি যেন আদেশ করলে।

অমনি সকলে মিলে দৌড়ে গিয়ে অনেকগুলো মই ব'য়ে এনে হাজির করলে। মইগুলো আমার দেহের চার পাশে লাগিয়ে প্রায় শ খানেক ঐরকম ক্ষুদে লোক খাবার ও পানীয় নিয়ে আমার দেহের উপর উঠে পড়ল এবং আমার মুখের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি ক'রে খাবার ঢেলে ঢেলে দিতে লাগল।

আমাকে আবিষ্কার ক'রে ঐ ক্ষুদে লোকগুলো তাদের রাজার কাছে পর্য্যন্ত খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল। রাজামশায় আমাকে বন্দী করবার হুকুম দিয়ে ব'লে দিয়েছিলেন যে, আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে তখনি যেন রাজধানীতে উপস্থিত করা হয়।

সেই লোকগুলো আমার পানীয়ের সঙ্গে ঘুমের কি একটা ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল, সেইজন্য আমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঐ দেশের লোকেরা এত রকম কলকব্জার নির্ম্মাণ কৌশল আয়ত্ত ক'রেছিল, যা অন্য কোনও দেশের লোকেরা তখনও জানত না। আমার শরীরটা তাদের কাছে বিরাট্ একটা পাহাড়ের বোঝার মত। কিন্তু হ'লে হবে কি! তারা বুদ্ধির জোরে প্রথমে আমাকে বেশ ক'রে বাঁধলে। তারপর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই আমাকে কপিকলে ক'রে শূন্যে তুলে ফেললে এবং মস্ত একটা গাড়ীর উপর শুইয়ে দিলে। বড় বড় গাছ-পাথর বইবার জন্য ঐ দেশের লোকেরা সেই গাড়ীখানা ব্যবহার করত। আমাকে রাজধানীতে ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্য তারা বাছাই-করা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পনের শ ঘোড়া এনে হাজির করলে—প্রত্যেকটা ঘোড়া প্রায় সাড়ে চার ইঞ্চি উঁচু। ঐ মাপের ঘোড়াই তাদের দেশের সব চেয়ে বড় ঘোড়া। তারা যেমন ক্ষুদে মানুষ, তাদের ঘোড়াও ত তেমনি হবে?

আমাকে ব'য়ে নিয়ে তারা যখন রাজধানীতে পৌঁছাল, তখন লিলিপুটদের রাজা তাঁর পারিষদদের সঙ্গে নিয়ে আমাকে দেখবার জন্যে রাজবাড়ী থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেই দেশের সব চেয়ে বড় একটা ভাঙ্গা এবং পুরানো মন্দিরে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কি একটা কারণে যেন ঐ মন্দিরটা অপবিত্র হ'য়ে গিয়েছিল এবং সেইজন্য সেখানে কোনও রকম পূজা-অর্চ্চনা হ'ত না। সেই মন্দিরটার মধ্যে কোনও রকমে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে একটা ঘরের মধ্যে অতিকষ্টে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়েছিলাম। আমি যাতে পালাতে না পারি সেজন্য ঐ ক্ষুদে লোকগুলো অসংখ্য লোহার শিকল যোগাড় ক'রে নিয়ে এল এবং আমার হাত-পা বেঁধে আমাকে বন্দী ক'রে ফেলে রাখলে। রাজামশায় সেই মন্দিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন।

রাজামশায় তাঁর অন্যান্য পারিষদদের চেয়ে অবশ্য একটু লম্বা। তবে বেশী নয়। আমার আঙুলের একটা নখ যতটুকু, অন্যান্য পারিষদদের চেয়ে তিনি মাত্র ততটুকু বেশী ঢেঙ্গা। সেই রাজার চেহারার মধ্যে বেশ একটা পৌরুষ ও অসাধারণ শক্তিশালী ভাব ছিল এবং তাঁর আচরণে ছিল মহত্ত্ব ও উদারতা। সে-দেশে তিনি প্রায় সাত বৎসর ধ'রে খুব আনন্দের সহিত রাজত্ব করছিলেন এবং বহু যুদ্ধেই বিজয়ী হয়েছিলেন।

রাজামশায় প্রায়ই আমাকে দেখতে আসতেন। তাঁকে ভাল ক'রে দেখবার জন্য আমাকে পাশ ফিরে শুতে হ'ত। তিনি যখনই আমার কাছে আসতেন, তখনই আত্মরক্ষার জন্য তিনি খাপ থেকে তলোয়ার বার ক'রে সর্ব্বদা হাতে রাখতেন। কারণ, সর্ব্বদাই তাঁর এই আতঙ্ক হ'ত যে, আমি হয়ত হঠাৎ আমার সকল বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে তাঁকে ধ'রে ফেলব। রাজামশায় আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তাও বলতেন, আমিও বলতাম—কিন্তু কেউ কারুর কথা বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারতাম না।

আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায়, তা স্থির করবার জন্য রাজামশায় প্রায়ই তাঁর পারিষদদের নিয়ে মন্ত্রণাসভায় বসতেন। কারণ, তাঁদের সর্ব্বদাই ভয় হ'ত যে, আমি হয়ত কখনও বন্দিদশা থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে ফেলব এবং নানারূপ অত্যাচার ক'রে দেশে দুর্ভিক্ষ আনব। কিন্তু আমার আচরণে ক্রমশঃ তাঁদের সে ভয় কেটে গিয়েছিল। মুক্তি পেয়ে আমি পথে-ঘাটে চলাফেরা করতাম। আমি যখন পথ দিয়ে চলতাম কিংবা দাঁড়িয়ে থাকতাম তখন লিলিপুটের লোকেরা নির্ভয়ে আমার পায়ের তলা দিয়ে চলে যেত। রাজামশায় আমার উপর এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর নিজের রাজভাণ্ডার থেকে আমার খাবার পাঠিয়ে দিতেন। রাজামশায়ের সঙ্গে বার বার সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার সকল সঙ্কোচ কেটে গিয়েছিল এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমি তাদের ভাষাও বুঝতে শিখলাম। তখন একদিন আমি আমার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রাজাকে জানিয়েছিলাম। রাজামশায় আমাকে মুক্তি দিলেন, কিন্তু তার কতকগুলি সর্ত্ত ছিল।

লিলিপুটদের দেশ ও সে-দেশের ক্ষুদে লোকদের দেখে প্রথমে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, তারা

বেশ সমৃদ্ধিশালী ও সুখী। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর লিলিপুটদের রাজার কাছ থেকে জেনেছিলাম যে, দুটি কারণে সে-দেশটিতে মাঝে মাঝে বড় অশান্তি উপস্থিত হ'ত। প্রথমতঃ, সেদেশে প্রায়ই প্রবল বিদ্রোহ হ'ত। কারণ, তাদের রাজ্যে দুটি দল ছিল। একদলের লোকেরা খুব গোড়ালি উঁচু জুতো পরত এবং অপর দল নীচু গোড়ালি-ওয়ালা জুতো পরত। যারা উঁচু গোড়ালি-ওয়ালা জুতো পরত, তারা রাজনীতিতে ও শাসন-পদ্ধতিতে প্রাচীনপন্থী, কিন্তু শাসনপদ্ধতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে তখনকার সেই রাজার মত ছিল অত্যন্ত আধুনিক। সেইজন্য তিনি নীচু-গোড়ালি-ওয়ালা লোকদের পরামর্শ অনুসারে রাজকার্য্য করতেন। অথচ সেই



লিলিপুটের লোকেরা নির্ভয়ে আমার পায়ের তলা দিয়ে চলে যেত

রাজ্যের উত্তরাধিকারী উঁচু গোড়ালি-ওয়ালা লোকদের মত সমর্থন করতেন। এতে রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহ উপস্থিত হ'ত।

দ্বিতীয় এবং প্রধান অশান্তির কারণ ছিল বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ। লিলিপুটদের দেশের কাছেই বেলফুসকো নামে একটি দ্বীপ ছিল। সেই দ্বীপের লোকেরা প্রায়ই এই লিলিপুটদের রাজ্য আক্রমণ করত এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাদের জ্বালাতন ক'রে মারত। লিলিপুটদের রাজা আমাকে জানালেন যে, বেলফুসকোর লোকেরা বহু যুদ্ধজাহাজ তৈরী করেছে। তারা শীঘ্রই সেই সব জাহাজে সৈন্য বোঝাই ক'রে তাঁদের দেশ আক্রমণ করবে। আমার শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে রাজামশায়ের বেশ ভাল ধারণা হয়েছিল। সুতরাং তিনি আমার উপর ঐ যুদ্ধ-চালনা করবার ভার দিয়েছিলেন।

বেলফুসকো থেকে আমার প্রস্থান

বেলফুসকো-দ্বীপের অধিবাসীরাও লিলিপুট্। আমি যে-দেশে ছিলাম, সেখান থেকে বেলফুসকো দ্বীপটির দূরত্ব খুব বেশী নয়। ঐ দুইটি দেশের মধ্যে কেবলমাত্র একটি সমুদ্র ব্যবধান। সমুদ্রের তীরে গিয়ে আমি একটা দূরবীণ দিয়ে দেখতে লাগলাম। দেখলাম যে, বেলফুসকো দ্বীপটি এবং তার তীরে সেই দেশের যুদ্ধজাহাজগুলিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তারপর সমুদ্রটির গভীরতা নিরূপণ ক'রে দেখলাম যে, সে সমুদ্রটিও মোটেই গভীর নয়। এই না দেখে আমি স্থির করেছিলাম যে, সাঁতার কেটেই আমি ঐ দ্বীপে গিয়ে পৌঁছাব। তখন আমি খুব লম্বা লম্বা কিছু কাছি আর অনেক লোহার শিক জোগাড় করেছিলাম। তারপর ঐ লোহার শিকগুলো বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে অনেকগুলো বড় বড় বঁড়শির মত তৈরী করেছিলাম আর প্রত্যেকটা বঁড়শির পিছনে একটা ক'রে দড়ি বেঁধে ফেলেছিলাম। তারপর ঐ দড়িবাঁধা বঁড়শীগুলো নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে আরম্ভ করলাম। প্রায় আধ ঘণ্টার ভিতরেই আমি সেই দ্বীপটির তীরে যেখানে যুদ্ধজাহাজগুলি সাজান ছিল, সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলাম।

শত্রুপক্ষের লিলিপুটেরা ত আমাকে দেখে ভয়ে একেবারে অস্থির। তাদের কাছে আমি একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত—সেইজন্য তারা ভয় পেয়ে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে এদিকে ওদিকে ছুটে পালাতে লাগল। জাহাজের মধ্যে যারা ছিল, তারা ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে প্রথমে জলে ঝাঁপিয়েই পড়ল, তারপরে সাঁতরে গিয়ে ডাঙায় উঠে পালিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। ওদিকে আমি তখন করলাম কি, প্রত্যেকটা জাহাজে একটা ক'রে দড়ি বাঁধা বঁড়শি আট্‌কে দিয়েছিলাম। কিন্তু টেনে দেখেছিলাম যে, একখানা জাহাজও জায়গা থেকে একটুও নড়্‌ল না। কারণ, প্রত্যেকটা জাহাজই খুব শক্ত ক'রে নঙ্গর করা ছিল। সেই

অবসরে শত্রুপক্ষের লিলিপুটেরা দূরে গিয়ে আমাকে লক্ষ্য ক'রে অনবরত তীর ছুঁড়তে লাগ্‌ল। তাদের শরাঘাতে আমি অস্থির হ'য়ে উঠলাম। ছুঁচ বিঁধে যাওয়ার মত সামান্য বেদনা হ'লেও, কে কতক্ষণ আর ঐ রকম শত শত তীরের আঘাত সহ্য করতে পারে? সেইজন্য আমি তাড়াতাড়ি ক'রে গোটাকতক নঙ্গরের দড়ি কেটে ফেলেছিলাম এবং অতি সহজেই সেই বঁড়্‌শি-লাগানো দড়িগুলো হাতে ক'রে টেনে প্রায় পঞ্চাশখানা সব চেয়ে বড় বড় যুদ্ধজাহাজ টেনে নিয়ে সাঁত্‌রে চল্‌লাম। সমুদ্রের অনুকূল স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি রাজবন্দরে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। রাজামশায় সেখানে আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি আমাকে জল থেকে তুলে নিয়ে খুব সমাদর করেছিলেন।

রাজ-রাজড়ার আশা-আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই। তাঁরা কখনও অল্পে সন্তুষ্ট হন না—তাঁরা যত পান তত চান। আমার আশ্রয়দাতা সেই রাজা-মশায়েরও এইরকম আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমার পরাক্রমের পরিচয় পেয়ে বেল্‌ফুস্‌কোর লোকেরা এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, ভবিষ্যতে তারা আর কখনও হয়ত কোনও রকম শত্রুতা করত না। কিন্তু রাজামশায় তাতে সন্তুষ্ট হননি। একবার সফল হ'য়ে রাজামশায়ের ইচ্ছা হ'ল যে, তিনি বেল্‌ফুস্‌কো দ্বীপটি দখল করবেন। রাজামশায়ের এই সঙ্কল্পে আমি আমার অমত জানিয়ে বলেছিলাম যে, একটা স্বাধীন জাতিকে দাসত্বে পরিণত করাতে আমি সহায়তা করতে পার্‌ব না। রাজসভার সব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ সভ্যেরা আমার এই মতটির সমর্থন করেছিলেন। প্রতিবাদ করেছিলাম ব'লে রাজা-মশায় ত আমার উপর রেগে একেবারে আগুন! আমার বিরুদ্ধে তিনি এত রকম ষড়যন্ত্র আরম্ভ ক'রে দিলেন যে, তার ফলে হয়ত আমার সর্ব্বনাশ হত। কিন্তু আমার শুভাকাঙ্ক্ষী কয়েকজন রাজসভাসদ্ সেই ষড়যন্ত্রের কথা আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আমি দেখ্‌লাম যে, সেখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। সেইজন্য স্থির কর্‌লাম যে, বেল্‌ফুস্‌কো দ্বীপে গিয়েই আশ্রয় নেওয়া যাক্। বেল্‌ফুস্‌কো দ্বীপের রাজা আমাকে রাজার মতই সমাদর ক'রে আশ্রয় দিলেন।

তখন থেকে আমি বেল্‌ফুস্‌কো দ্বীপেই বাস করতে লাগলাম। এখানে পথ চলবার সময় আমাকে পথঘাটের বাড়িগুলো ডিঙ্গিয়ে চলাফেরা করতে হ'ত। দিন তিনেক সেখানে বাস করার পর একদিন সমুদ্রতীরে গিয়ে দেখ্‌লাম যে একটা মস্ত বড় নৌকো উল্‌টে জলের উপর ভাসছে। নৌকোখানা লিলিপুটদেশের মোচার খোলার মতো ছোট্ট নৌকো নয়। সেখানায় ব'সে আমার মত দু-চারজন মানুষ বেশ ভেসে যেতে পাবে। নৌকো-খানা দেখে আমার মন আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। জল থেকে নৌকোখানা তুলে নিয়ে বেল্‌ফুস্‌কোর রাজবন্দরে রেখেছিলাম। তারপর সেখানকার



এখানে পথ চলবার সময় আমাকে পথঘাটের বাড়ী-গুলো ডিঙ্গিয়ে চলাফেরা করতে হ'ত

রাজামশায়কে বলেছিলাম যে, আমার ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন যে, ভগবান্ আমাকে ঐ নৌকোখানা পাইয়ে দিয়েছেন। ঐ নৌকোয় চ'ড়ে আমি আমার জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়া স্থির ক'রে রাজামশায়ের মত চেয়েছিলাম। রাজামশায় প্রথমে অনেক ওজর-আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু শেষে রাজী হ'লেন। রাজার সম্মতি পেয়ে সমুদ্রযাত্রায় যে-সব জিনিসের দরকার হ'তে পারে, সেই সব জিনিষপত্র নৌকোয় বোঝাই করতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলাম। দু এক-দিনের মধ্যে আমার নৌকো সাজান হ'য়ে গেল।

আমি হয়ত বেল্‌ফুসকো দ্বীপে আরও দু-চার দিন থাকৃতাম। কারণ, বেলফুসকোর রাজার ভালবাসা ও আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ ক'রে তুলেছিল এবং আমি বুঝেছিলাম যে, আমাকে ছেড়ে দিতে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল—যার ফলে আমি অতি শীঘ্র সেখান-থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিলাম। কারণ, পূর্ব্বে আমি যে লিলিপুট্‌রাজার কাছে ছিলাম, তিনি বেল্‌ফুসকোর রাজার কাছে ব'লে পাঠালেন যে, আমাকে যেন বন্দী ক'রে তাদের রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা আমার চোখদুটি উপ্‌ড়ে ফেলে আমাকে দণ্ড দেবেন। কারণ, আমাকে সেই রাজা বিশ্বাসঘাতকতার দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। আমি আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁদের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম, এই ছিল আমার অপরাধ। বেল্‌ফুসকোর রাজা অবশ্য এই অনুরোধ রাখেন নি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে, যদি কখনও ঐ দুই রাজ্যের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় তাহ'লে তখন হয়ত আমার জীবন নিয়ে সংশয় হইবে। সেইজন্য বেল্‌ফুসকো দ্বীপে থাকার চেয়ে সমুদ্রবক্ষে ভেসে পড়াও আমার কাছে নিরাপদ ব'লে মনে হয়েছিল।

মাংস, রুটি, পানীয় প্রভৃতি নানান্ খাবার নিয়ে প্রথমে আমার নৌকো বোঝাই করেছিলাম। লিলিপুটদের তৈরী এক একখানা রুটির মাপ আঙুলের এক পাবের বেশী নয়। সুতরাং আমাকে হাজার হাজার রুটি নিতে হয়েছিল। অত রুটি থাকৃলে বোধ হয় ওদের দেশের দু'চারজন লোকের সারা-বছরের খোরাক হ'ত। সেই সঙ্গে সঙ্গে লিলিপুট দেশের কতকগুলো ক্ষুদে, গরু, ষাঁড়, শুওর আর হরিণও নিয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল, দেশে ফিরে গিয়ে ওগুলোকে পুষব এবং ঐ আশ্চর্য্য জীবজন্তুগুলোর বাচ্ছা হবে আর সংখ্যায় বাড়বে। আমাদের দেশে ত আর ওরকম জীবজন্তু নেই, সুতরাং সবাই খুব আশ্চর্য্যও হবে। ইচ্ছা ছিল যে, গণ্ডা পাঁচ ছয়েক লিলিপুট্ লোকও সঙ্গে নেবো। কিন্তু বেল্‌ফুস্‌কোর রাজা তাতে অনুমতি দিলেন না পাছে কোনও লিলিপুট্ লোক স্বেচ্ছায় আমার পকেটের মধ্যে লুকিয়ে পালায়, সেজন্য যাবার সময়ে রাজা ও রাজ-কর্ম্মচারীরা ভাল ক'রে আমার পকেট খুঁজে দেখেশুনে তবে যাবার হুকুম দিয়েছিলেন।

রাজামশায় ও পরিচিত সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নৌকো ভাসিয়ে রওনা হয়েছিলাম। দাঁড় বাইতে লাগলাম। নৌকোখানি ক্রমশঃ ক্রমশঃ বেল্‌ফুস্‌কো থেকে দূরে চলেছিল, শেষকালে সেই দ্বীপটি রেখার মত মনে হচ্ছিল। আরও খানিকক্ষণ পরে সেই রেখাটিও মিলিয়ে গিয়েছিল, আর তখন আমি অকূল সমুদ্রে নৌকো চালিয়ে নিয়ে চল্‌লাম। তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার, আর সেজন্য সমুদ্রও ছিল শান্ত। মাঝে মাঝে দু-একটা ছোট ছোট ঢেউ এসে নৌকোটাকে এক একবার নাচিয়ে দিয়ে উঁকি মেরে দেখে দেখে যাচ্ছিল যে, নৌকোর ভিতরে কি কি আছে; আর সেই ঢেউয়ের উপর সাদা সাদা ফেনাগুলো বড় সুন্দর দেখাচ্ছিলো। নীল জলের উপর দিনের বেলাকার সূর্য্যের আলোর ঝিকিমিকি, আর রাত্রে চাঁদ ও তারার আলোর সোণালী আভা দেখ্‌তে আমার বড় ভাল লাগত।

তিন দিন সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার পর দূরে একখানা মস্ত পালতোলা জাহাজ দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। খুব জোরে জোরে দাঁড় চালিয়ে, আর একখানা পাল তুলে দিয়ে আমার নৌকোখানা জাহাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে চল্‌লাম। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরেই আমার নৌকোখান জাহাজের লোকেদের নজরে পড়েছিল। সমুদ্রের উপর ঐ ভাবে নৌকোয় ভাস্‌তে দেখে তারা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিল যে, আমি নিশ্চয়ই বিপদগ্রস্থ। জাহাজখানা স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। জাহাজখানার পতাকা দেখে যখন বুঝেছিলাম যে, সেটা ইংরেজদের জাহাজ, তখন আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলাম। ধীরে ধীরে নৌকোখানাকে জাহাজের গায়ে নিয়ে গিয়ে ভেড়ালাম, আর সেই সমস্ত গরুভেড়া প্রভৃতির কতকগুলো বা পকেটের মধ্যে পুরে, কতকগুলো বা রুমালে বেঁধে নিয়ে টপ ক'রে জাহাজে গিয়ে উঠেছিলাম।

জাহাজের কাপ্তেন বড় ভদ্র এবং খুব দক্ষ নাবিক ছিলেন। তাঁর অনুগ্রহে আমি খুব আরামেই সেই জাহাজে রয়ে গেলাম এবং বেশ নিরাপদেই ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। তবে জাহাজে আমার একটা জিনিস হারিয়েছিল। জাহাজে অনেক ইঁদুর ছিল, একদিন একটা ইঁদুর আমার একটা ভেড়া নিয়ে কোথায় যে পালিয়েছিল, তার কোনও খোঁজখবরই পাই নি। জাহাজ থেকে

নামবার সময় বাদ বাকী আমার আর সব জিনিষই আমি ঠিকমত পেয়েছিলাম।

লিলিপুটদের দেশের যে-সব ক্ষুদে ক্ষুদে অদ্ভুত জীব-জন্তু আমি নিয়ে এসেছিলাম, দেশের সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোকদের সেগুলো দেখিয়ে বেশ দু-পয়সা রোজগার করতে লাগ্‌লাম। কিছুদিনের মধ্যেই আবার সমুদ্রযাত্রার জন্য আমার মন আকুল হ'য়ে উঠেছিল। যাত্রা করবার আগে ঐ-সব জীবজন্তু-গুলো বেচে ফেলে আমি প্রায় ছ হাজার টাকা পেয়েছিলাম।

মাস দুয়েক আমি আমার স্ত্রী-পরিবারের সঙ্গে বাড়ীতে বাস করেছিলাম। কিন্তু নূতন নূতন দেশ দেখার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে সর্ব্বদা এত প্রবল ছিল যে, কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ীতে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। সমুদ্রযাত্রা করবার জন্য সব যোগাড়-যন্ত্র ক'রে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তারা কাঁদতে লাগ্‌ল। তাদের সান্ত্বনা দিয়ে আমি "অ্যাড্‌ভেঞ্চার্" নামক একখানা জাহাজে চড়্‌লাম—জাহাজখানা সুরাটে যাবে।

আবার সমুদ্র যাত্রা

অনুকূল বাতাস ও শান্ত সমুদ্র পেয়ে সেবারে আমাদের জাহাজখানা বেশ নিরাপদে ম্যাডাগাস্কার দ্বীপ পর্য্যন্ত চলে গিয়েছিল। কিন্তু তার পর থেকেই এমনি ভীষণ ঝড়-জল আরম্ভ হ'ল যে, দিক ভুল হ'য়ে জাহাজখানা অকূল সমুদ্রে পড়্‌ল। আমাদের জাহাজে খাবার-জল একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছিল - সবাই যখন তৃষ্ণায় আকুল, তখন কিছু দূরেই একটা ডাঙা চোখে পড়্‌ল। তখন জাহাজখানাকে নঙ্গর করা হয়েছিল। তার পর, জাহাজের মধ্যে যে কয়েকখানা নৌকা ছিল, তারই দু একখানা নিয়ে আমরা কয়েকজনে মিলে জল আন্‌তে বেরিয়ে পড়লাম। ডাঙায় নেমে অন্য সবাই জল আনতে গেল, আমি ভাবলাম যে, এই অবসরে দেশটা একটু দেখে নেওয়া যাক না কেন। সমুদ্রতীর থেকে প্রায় মাইল খানেক হেঁটে গিয়েও যখন কোনও জনপ্রাণী দেখ্‌তে পেলাম না, তখন মনে মনে একটু ভয় হ'ল, সেইজন্য আবার তাড়াতাড়ি সমুদ্রতীরের দিকেই ফিরতে লাগ্‌লাম। সমুদ্রতীরের দিকে চেয়ে দেখে-ছিলাম যে, প্রকাণ্ড একটা দৈত্যের মত লম্বাচওড়া মানুষ আমার সঙ্গীদের তাড়া করেছে; আর প্রাণ-ভয়ে তারা সবাই আমাকে ফেলেই নৌকায় গিয়ে উঠেছে আর প্রাণপণে নৌকো বেয়ে পালাচ্ছে।

আমিও এত ভয় পেয়েছিলাম যে, সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও দেরী না ক'রে দৌড়ে পালালাম। সামনে একটা ছোট পাহাড় ছিল, দেখলাম যে, বেশ চাওড়া আর লম্বা একটা পথ সেই পাহাড়টার গা বেয়ে উপরে উঠে গেছে। সেই পথ ধ'রে আমি পাহাড়ের উপর উঠ্‌তে লাগ্‌লাম। পথের দুপাশে খুব ঘন শস্যক্ষেত—প্রত্যেকটা শস্যের গাছ প্রায় তের চৌদ্দ হাত লম্বা হবে। দৌড়ে যেতে যেতে আমি আবার একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত লোক



দৌড়ে যেতে যেতে আমি আবার একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত লোক দেখতে পেয়েছিলাম

দেখতে পেয়েছিলাম। লোকটা অবশ্য বেশ খানিকটা দূরেই ছিল। তাই না দেখে আমি

তাড়াতাড়ি ক'রে সেই শস্যক্ষেতের একটা ফাঁক খুঁজে নিয়ে তারই মধ্যে লুকিয়ে রইলাম। উঁকি মেরে দেখেছিলাম যে, সেই লোকটা আমার দিকেই আসছিল—লোকটা লম্বা হবে প্রায় গির্জ্জা বা মন্দিরের চূড়ার মত, আর প্রত্যেকবার পা ফেলে সে অগ্রসর হচ্ছিলো প্রায় বিশ হাত। খানিক দূর এগিয়ে সে কাকে যেন চেঁচিয়ে ডেকেছিল। তার হাঁক শুনে চমকে উঠেছিলাম, মনে হ'ল যেন আকাশ থেকে কড়্ কড়্ ক'রে বাজ পড়ল। ঝোপের মধ্যে জড়সড় হ'য়ে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগ্ লাম—এ আবার কোন্ আজব দেশে এলাম!

তার ডাক শুনে সেইরকম আরও সাতজন বিকটাকার দৈত্যের মত মানুষ এল। যে ক্ষেতে আমি লুকিয়ে ছিলাম তারা সবাই মিলে সেই ক্ষেতটাই নিড়োতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বুঝ্ লাম যে, তারা ঐ দেশের চাষা। ক্ষেত নিড়োতে নিড়োতে সেই বিকটাকার চাষাগুলো কেবলই আমার দিকেই এগিয়ে আসছিল। আমিও ক্রমশঃ ক্রমশঃ পিছিয়ে গিয়ে তাদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখ্ ছিলাম। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে আমি একেবারে পাহাড়ের ধারে এসে পড়েছিলাম। নীচের দিকে চেয়ে দেখ্ লাম যে, ভীষণ খাদ—সেখানে পড়লে মৃত্যু নিশ্চয়। বাঁচ্ বার আশা নেই বুঝ্ তে পেরে ভগবানের নাম স্মরণ করলাম এবং আমার ছেলেমেয়েও স্ত্রীর কথা মনে হওয়াতে বার বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়তে লাগ্ ল। ইতিমধ্যে একজন চাষা প্রায় আমার ঘাড়ের উপর এসে পড়্ ল আর কি! পাছে তার পায়ের নীচে প'ড়ে একেবারে ছাতু হ'য়ে যাই, সেই ভয়ে আমি যত জোরে পারলাম চীৎকার ক'রে উঠ্ লাম। চাষাটা একবার চারি দিকে চেয়ে দেখ্ লে, তার পর আমার উপরে তার নজর পড়্ ল। তার পর, আমরা যেভাবে একটা বেড়ালছানা বা কুকুরছানা তুলে দেখি, ঠিক তেমনি সহজভাবে ও অবলীলায় সে দু-আঙুলে ক'রে আমাকে তার চোখের সামনে তুলে ধ'রে দেখ্ তে লাগ্ ল।

আমি স্থির করলাম যে, কোন রকম বিরোধ করব না। আর তা ক'রেই বা ফল কি? তার হাত থেকে মুক্ত হ'য়ে পালাবার চেষ্টা করা বৃথা। ইচ্ছা করলে সে আমাকে পিঁপড়ের মত দু-আঙুলে চেপেই মেরে ফেল্ তে পারত। বাস্তবিকই তার দু-আঙুলের সেইটুকু চাপেই আমার প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত হয়েছিল। ব্যাপার দেখে কৃষকটি তার ছেলের হাত থেকে আমাকে কেড়ে নিয়ে নিয়ে বাঁচালো এবং তাকে শুধু এইটুকু বোঝাবার চেষ্টা ক'রেছিলাম যে, তার সেই দু-আঙুলের স্পর্শে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। সে বোধ হয় আমার ইঙ্গিত বুঝ্ তে পারলে, সেইজন্য সে তার পরণের কোটের একটুখানি কোঁচড় করলে, তারপর সেই কোঁচড়ের মধ্যে অতি সন্তর্পণে আমাকে রাখলে। তারপর সে তাড়াতাড়ি আমাকে নিয়ে গেল তাদের সর্দ্দার কৃষকের কাছে। মাঠের পথে যে প্রকাণ্ড লোকটাকে আমি সর্ব্বপ্রথম দেখেছিলাম সেই তাদের সর্দ্দার।

সর্দ্দারের কাছে নিয়ে গিয়ে সে আমাকে কোঁচড় থেকে বার ক'রে মাটিতে ছেড়ে দিয়েছিল। আমি প্রথমে খানিকটা পেছিয়ে গিয়েছিলাম, পরে আবার এগিয়ে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে, আমার পালাবার ইচ্ছা মোটেই নেই। সব চাষারা আমাকে দেখে এমন কৌতুক বোধ করলে যে, তারা সবাই আমাকে ঘিরে গোল হ'য়ে বস্ ল। কিন্তু তারা আমার কথা কিছুই বুঝ্ তে পারে নি, আমিও তাদের কথা কিছুই বুঝ্ তে পারি নি। সর্দ্দার কৃষকটি তার রুমালের চারটে খুঁট বেঁধে একটা থলি তৈরি করেছিল এবং আমাকে তার মধ্যে ভ'রে তার স্ত্রীকে দেখাবার জন্যে নিয়ে চল্ ল। স্ত্রীর কাছে নিয়ে গিয়ে সে যখন আমাকে তার সাম্ নে মাটিতে ছেড়ে দিয়েছিল, তখন সে আঁৎকে উঠে চীৎকার ক'রে উঠেছিল কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার সে-ভাব কেটে গিয়াছিল। সে সেদিন থেকে আমাকে খুব আদর-যত্ন করতে লাগল।

রাত্রিবেলা চাকর এসে টেবিলের উপর খাবার দিয়ে গেল আমি দেখ্ লাম যে টেবিলটা একটা মস্তবড় গাছের মত উঁচু। আমার আশ্রয়দাতা সেই কৃষকটি আমাকে ধ'রে টেবিলের উপর ছেড়ে দিলে। কৃষকের স্ত্রীটি আমার সাম্ নে এক রাশি মাংস আর রুটি এগিয়ে দিল। এত খাবার খেয়ে বোধ হয় আমি এক মাসেও শেষ করতে পারতাম না। আমার খাওয়া দেখে ওরা খুব কৌতুক বোধ করতে লাগ্ ল।

সেই কৃষকটির একটি দশ বছরের ছেলে ছিল। সে ত আমাকে দেখে এম্ নি কৌতুক বোধ করলে যে, আমার পা দুটো ধ'রে শূন্যে ঝুলিয়ে দোল্ দিতে লাগ্ ল। এতে আমি ত একেবারে কেঁপে

অস্থির! ব্যাপার দেখে কৃষকটি তার ছেলের হাত থেকে আমাকে কেড়ে নিয়ে বাঁচালো এবং ছেলেটির ঐরকম অশিষ্ট আচরণে রেগে গিয়ে খুব কষে তার কাণ ঘুঁষে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিয়েছিল। ওঃ, সে কি ভীষণ ঘুঁষি! তেমন একটি ঘুষির চোট খেলে আমাদের দেশের একদল ঘোড়সওয়ার সৈন্য বাতাসে একেবারে উড়ে গিয়ে ছত্রাকার হ'য়ে যেত।

ছেলেটির শাস্তি দেখে আমার বড় দয়া হয়েছিল। আমি তখন তার হ'য়ে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চেয়েছিলাম। কৃষক তার ছেলেকে ক্ষমা করলে, ছেলেটিও কৃতজ্ঞ হ'য়ে আমাকে আদর করেছিল।

আমাদের খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, এমন সময় কৃষকের এক বছরের আর একটি ছেলেকে কোলে ক'রে ঝি সেই ঘরে এল। ছেলেটা যেই আমাকে দেখলে অমনি আমাকে নিয়ে খেলবার জন্য বারবার হাত বাড়াতে লাগল। মজা দেখবার জন্য খোকার মা আমাকে তুলে নিয়ে তার ছেলের হাতে দিলে। ছেলেটা আমাকে তার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে ভাবলে, আমি বুঝি একটা খেলনাই হব। এই ভেবে কাঠের পুতুল মুখে পুরে দেওয়ার মত ক'রে সে আমার মাথাটা তার মুখের মধ্যে ভ'রে দিয়েছিল। ভয় পেয়ে আমি এমনি ভীষণ চীৎকার ক'রে উঠেছিলাম যে, সেই খোকাটিও আঁৎকে উঠে তার মুঠো থেকে আমাকে ফেলে দিয়েছিল। আমি আর একটু হ'লেই মাটিতে পড়ে ঘাড় ভাঙতাম, কিন্তু খোকার মা চট্ ক'রে ধ'রে ফেলে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন।

আমার চেহারা দেখে চাষার স্ত্রী বুঝেছিল যে, আমি বড় ক্লান্ত। সেইজন্য তাড়াতাড়ি সে আমাকে একটা বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, আমি যেন আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কাছে ফিরে গিয়েছি। কিন্তু ঘুম ভেঙে যখন দেখলাম যে, সেই অজানা অচেনা ও অদ্ভুত জায়গাতেই আমি রয়েছি, তখন মনটা আবার দুঃখে ভ'রে উঠল। সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম যে, মশারির ভিতরে কেমন ক'রে যেন দুটো ইঁদুর ঢুকেছে। এক একটা ইঁদুর যেন এক একটা ছোটখাটো কুকুরের মত। আমাকে দেখে ইঁদুর দুটো ভয় ত পায়নি মোটেই, বরং যখন দেখলে যে, আমি জেগেছি, তখন তারা তেড়ে আমাকে কামড়াতে এসেছিল। তখন তাড়াতাড়ি ক'রে মশারি খাটাবার একটা ডাণ্ডা খুলে নিয়ে তারই এক ঘায়ে একটা ইঁদুরকে সাবাড় করেছিলাম। কিন্তু আর একটা ইঁদুর দু-একবার আঁচড় দিয়েই পালিয়ে গিয়েছিল। সেটাকে মারতে পারি নি।

আমার আশ্রয়দাত্রী সেই কৃষকের স্ত্রী ইঁদুরের উৎপাত দেখে খুব লজ্জিতা হ'ল, সেজন্য সেদিন রাত্রিথেকে খোকার সঙ্গে তার দোলনায় আমার শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

সেই কৃষকের একটি ন বছরের মেয়েও ছিল। কিন্তু ন বছরের হলে হবে কি! সে ছিল প্রায় দশ বারো হাত ঢেঙা। তবে মেয়েটি খুব শান্ত-শিষ্ট। সে আমার শিক্ষয়িত্রী হ'য়ে আমাকে তাদের দেশের কায়দা-কানুন, ভাষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষা দিত। বাস্তবিক তার কাছে যেরকম উপকার পেয়েছিলাম সেজন্য আমি আজও কৃতজ্ঞ। সে না থাকলে আর কেউ যে সেখানে আমাকে পদে পদে রক্ষা ক'রে বেড়াত, তা ত মনে হয় না। আমি তাকে গ্রামড্যালক্লিচ্ ব'লে ডাকতাম। তার স্নেহ-যত্ন ও ভালবাসা পেয়ে সেই অদ্ভুত বিদেশে আমার সকল ভয় দূর হ'য়ে গিয়েছিল।

সেই আজব দেশের লোকদের কাছে আমি একটা কৌতূহলের জীব হ'য়ে র'য়ে গেলাম। আমার আশ্রয়দাতা কৃষকটির আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে দেখে খুবই আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। তাঁরা সেই কৃষককে যুক্তি দিলেন যে, কাছাকাছি যত সব শহর আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাকে দেখানো হোক। তাঁদের যুক্তি অনুসারে কৃষকটি আমাকে একটা বাক্সে ভ'রে শহরে নিয়ে গিয়েছিল। গ্রামড্যালক্লিচ্ও আমাদের সঙ্গে শহরে গিয়েছিল। শহরে গিয়ে আমরা একটা সরাইখানায় উঠেছিলাম। আমাকে দেখতে আসবার জন্য শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঢেঁড়া দেওয়া হয়ে গেল যে, "সরাইখানায় অতি ছোট একটা মানুষ আনা হয়েছে। সে কথা বলতে পারে আর নানারকম খেলা দেখাতে পারে।"

আমাকে দেখবার জন্য সরাইখানাতে দিনরাত ধ'রে রথ-দোলের ভীড় জমতে লাগল এবং সেই কৃষকের ইঙ্গিতমত আমাকে নানারকম খেলা দেখাতে হ'ত। অসময়ে খাওয়া-দাওয়া আর রীতিমত বিশ্রামের অভাবে আমি প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম, তবু আমার মনিবটি আমাকে নিয়ে এ-শহর ও-শহর ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কারণ, এতে তার বেশ দু-পয়সা রোজগার হচ্ছিলো। কিন্তু ওদিকে আমার প্রাণ একেবারে যায়-যায়। আমি রোগা হয়ে যখন একেবারে কঙ্কালসার হ'য়ে পড়লাম, তখন আমার কৃষক মনিবটি ভাব্‌লে যে, আমার মৃত্যু আসন্ন। সেইজন্য কৃষকটি আমাকে সে দেশের রাণীর কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রায় বেচে ফেলেছিল।

রাণী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি রাজ-বাড়ীতে থাক্‌তে পারবে ত।" আমি উত্তর দিয়েছিলাম, খুব পারব। রাজবাড়ীতে থেকে আপনার কাজকর্ম্ম করতে পেলে আমি গৌরব বোধ কর্‌ব।" এই কথা ব'লে রাণীর কাছে আমি অনুরোধ করেছিলাম, যে আমার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যদি গ্রাম্‌ডাল্‌ক্লিচ্‌কে কোনও একটি কাজ দেন, তবে বড় ভাল হয়। কারণ, সে কাছে না থাক্‌লে এ-দেশের রীতি-নীতি ও আদব-কায়দা আমাকে সেখাবে কে? রাণী আমার কথায় রাজি হয়েছিলেন। কৃষকও রাণীর কাছে তার মেয়েকে রাখতে রাজি হ'ল এবং মেয়েটি রাণীর কাছে থাক্‌তে পারবে জেনে এত আনন্দিত হয়েছিল যে, তার মুখে-চোখে হাসি ফুটে উঠেছিল।

বেশ কয়েক বছরের জন্য সেই আজব দেশেই র'য়ে গেলাম আর কি!

আজব দেশের রাজবাড়ীতে অতিথি

চাষার মেয়ের প্রতি আমার ব্যবহার, দেখে রাণী আমার বুদ্ধি ও বিবেচনায় যে পরিচয় পেয়েছিলেন, তাতে তিনি এত আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তখনই আমাকে রাজার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাজামশায় খুব বুদ্ধিমান্ কিন্তু আমাকে দেখে তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন যে, আমি বুঝি কলের পুতুল হব। কিন্তু যখন তিনি আমাকে কথা বলতে শুনেছিলেন, তখন তাঁর সে ভুল ধারণা দূর হয়েছিল।

আমি কি রকম জীব, তা পরীক্ষা করবার জন্য রাজামশায় তিনজন নামজাদা পণ্ডিত ডেকে আনিয়েছিলেন। অনেক বিচার-বিতর্কের পর তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, প্রকৃতির খেয়ালের দ্বারা আমি সৃষ্ট হয়েছি। তাঁদের সিদ্ধান্ত শুনে আমি ত একেবারে অবাক্! কিন্তু একটু ভেবে দেখলাম যে, আশ্চর্য্য হ'য়েই বা লাভ কি? চিরকালই ত পণ্ডিতেরা কোনও একটা সমস্যার সমাধান করতে না পেরে ঐ রকম একটা না একটা অদ্ভুত দোহাই দিয়েই এসেছেন।

যাই হোক, তাঁদের সেই সিদ্ধান্ত যে কত ভুল, তা বোঝাবার জন্য আমি বিনীতভাবে বলেছিলাম যে, আমি যে-দেশ থেকে এসেছি, সেখানকার সব লোকই ঠিক আমার মত; আমিই সেখানকার স্বাভাবিক মানুষ, বরঞ্চ তাঁরা সেখানে গেলে তাঁরাই অস্বাভাবিক বলে প্রমাণিত হবেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে? আমার মন্তব্য তাঁরা কানে তোলেন নি। অবজ্ঞার হাসি হেসে তারা বলেছিলেন, "বা: চাষাটা তোমাকে বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিল ত!" তাদের বিদ্রূপ শুনে আমার গা জলে গেল। রাজামশায় বোধ হয় আমার কথা কিছু কিছু বিশ্বাস করেছিলেন। সেইজন্য তিনি পণ্ডিতদের বিদায় দিলেন, আর রাজবাড়ীতে আমার ও গ্রাম্‌ডাল্‌ক্লিচের থাক্‌বার জন্য চমৎকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। রাজার হালেই আমাদের দিন কাটতে লাগল।

অল্পদিনের মধ্যেই আমি রাজামশায়ের খুব প্রিয় হ'য়ে উঠেছিলাম। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই আমি তাঁর কাছে কাছে থাক্‌তাম, তিনিও আমার সঙ্গে অনেক রকম গল্পগুজব করতেন। ইউরোপের —অর্থাৎ সাধারণ দেশের আইন-কানুন শাসনরীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে তিনি বড়ই ভাল-বাস্‌তেন। রাজামশায় মাঝে মাঝে আমাদের আইন-কানুন, শাসনরীতি ও শিক্ষাসম্বন্ধে এমন সুচিন্তিত মন্তব্য করতেন যাতে প্রায়ই তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় পেতাম।

অষ্টপ্রহর সেই দেশের বিশাল বিশাল লোকজন দেখে দেখে নিজের ক্ষুদ্রতা আমাকে এত পীড়া দিত যে, আমার মনে হ'ত, আমি যেন ক্রমশ: ক্রমশ: আরও ছোট হয়ে যাচ্ছি। তাদের দেহের বিশালতা এবং অতি কঠিন কঠিন কাজ করার নিপুণতা দেখে আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও মনমরা হ'য়ে থাকতাম। আমার নিরানন্দ ভাব ও সঙ্কোচের ফলে মাঝে মাঝে আমার আচরণ বড়ই উপহাসাস্পদ হ'ত। হাস্যাস্পদ হ'য়ে দু-একবার যে বিপদে পড়ি নি, তাও নয়। আমার সেইরকম অবস্থা দেখে গ্রাম্‌ডাল্‌ক্লিচের খুব দয়া হ'ত। কখন্ কোন্ বিপদে পড়ি সেই ভয়ে সে সাধারণত: আমাকে আগ্‌লে আগ্‌লে রাখ্‌ত—চোখের আড়াল করত না। রাজামশায় ও রাণী এবং

রাজবাড়ী ও রাজসভার সকলেই অবশ্য আমাকে খুব ভালবাস্তেন। কিন্তু জল-ছাড়া মাছের মত আমার আর সেদেশে থাকৃতে ভাল লাগ্ছিল না। যে-সব বন্ধু-বান্ধব ও লোকজনের সঙ্গে আমি সমান-ভাবে মেলামেশা করতে অভ্যস্ত, তাদের কাছে ফিরে যাবার জন্ত আমার মন আকুল হ'য়ে উঠেছিল।

দেখ্তে দেখ্তে সেদেশে প্রায় তিনটি বছর কেটে গেল, কিন্তু আমার মুক্তি পাবার বা দেশে ফিরে যাবার কোনও উপায়ই ভেবে পাই নি।

সমুদ্রতীরে রাজামশায়ের একটা প্রকাণ্ড :বাড়ী ছিল। রাজা ও রাণী একবার সেখানে হাওয়া খেতে গিয়েছিলেন এবং আমাকে ও গ্রাম্ড্যাল্-ক্লিচ্কেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। আমার জন্য রাজা-মশায় একটা চাকাওয়ালা কাঠের বাক্স তৈরি করিয়েছিলেন। সেই বাক্সটায় আমি গাড়ী চড়ার মত ক'রে বস্তাম, আর একটা চাকর ঠেলে ঠেলে আমা কে সমুদ্র তীরে পৌছে দিত। সমুদ্রতীরে পৌছে আমি রোজই উৎসুক চোখে অসীম জলরাশির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্তাম যে, কোনও জাহাজ দেখা যায় কি না। গ্রাম্ড্যাল্ক্লিচ্ একদিন আমাকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করেছিল যে, কেন আমি ঐ ভাবে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকি? উত্তরে আমি বলে-ছিলাম যে, সেই সমুদ্রের দিকে চেয়ে জাহাজের খোজ করতে কব্তেই হয়ত আমাব মুক্তির একটা উপায় মিল্বে। এতে গ্রাম্ড্যাল্ক্লিচ্ খুব দুঃখিত হয়েছিল, কিন্তু সে সত্য সত্যই আমার দুঃখ বুঝ্ত, সেইজন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার সেই সঙ্কল্পে মত দিয়েছিল—রাজামশায়কেও কোনও কথা জানায় নি।

একদিন ঐভাবে উৎসুক চোখে সমুদ্রতীরে গাড়ীতে ব'সেছিলাম। কাছাকাছি কোনও জন-প্রাণী ছিল না। যে বালক চাকরটা গাড়ী ঠেলে আমাকে নিয়ে এসেছিল সেও পাখীর ছানা পাড়্বার জন্য কিছুক্ষণের জন্য চ'লে গিয়েছিল। সেদিন আমার বড় ঘুম পেয়েছিল, সেজন্য একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ কানে যেতেই জেগে উঠে দেখ্লাম যে, বাক্সটা শুদ্ধ আমি আকাশে উড়ছি এবং হু হু ক'রে বেগে আকাশপথে এগিয়ে চ'লেছি। ভয় পেয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখেছিলাম। কিন্তু কেহই সাড়া দেয়নি। মাথার উপরে খানিকটা জায়গায় মেঘের মত অন্ধকার দেখ্লাম আর তার ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু আকাশও দেখা যাচ্ছিল। তারপর ডানার ছটুপটানি শব্দ শুন্তে পেয়েছিলাম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছিলাম যে, বাক্সশুদ্ধ আমি যেন একবার শোঁ শোঁ ক'রে নীচে নাম্ছি আর উঠ্ছি। খুব চেষ্টা ক'রে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখ্তে পেলাম যে, একটা প্রকাণ্ড একটা ঈগলপাখী পায়ে ক'রে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে আর তার পিছনে পিছনে আরও চার পাঁচটা ঈগল তাড়া ক'রেছে। তার ফলে পাখীতে পাখীতে ভীষণ ঝটাপটি যুদ্ধ বেধে গেছে। যে ঈগলটা আমাকে বইছিল সেটা অতগুলো পাখীর আক্রমণে অস্থির হ'য়ে একটুখানি পরেই বাক্সশুদ্ধ আমাকে ঝপ্ ক'রে ছেড়ে দিয়েছিল। আর যাবে কোথায়! বাক্সটা ঝপাং ক'রে গিয়ে পড়ল সমুদ্রে। ধাক্কার চোটে চারিদিকে অন্ধকার দেখ্তে লাগ্লাম এবং জলের ছিটে এসে আমার গা-হাত—পা একেবারে ভিজে গিয়েছিল। তারপব যখন বড় বড় তালগাছের সমান সমুদ্রের ঢেউগুলো একবার করে আমার বাক্সটা শূন্যে ছুঁড়ে দিচ্ছিল আর পরমুহূর্তে আবার যখন সেটা ঝপাং ক'রে গিয়ে সমুদ্রে পড়্ছিল তখন প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল যে, এইবার বুঝি আমার ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

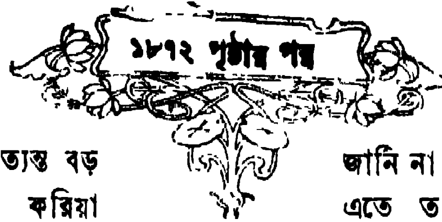
ঘণ্টা চার পাঁচেক এইভাবে আড়ষ্ট হ'য়ে অজ্ঞানের মত প'ড়েছিলাম। তারপর আর একবার হঠাৎ চেয়ে দেখ্ছিলাম যে, কারা যেন একটা লম্বা আঁকশি দিয়ে আমার বাক্সটা টান্ছে। এতে আশান্বিত হ'য়ে চোখ চেয়ে দেখলাম যে, একখানা সমুদ্রগামী জাহাজ আমাকে দেখ্তে পেয়ে তুলে নিচ্ছে।

সে জাহাজখানাও ইংল্যাণ্ড অভিমুখে ফিরছিল। সুতরাং আমি কাপ্তেনের অনুগ্রহে সেখানেই রয়ে গেলাম এবং কিছুদিনের মধ্যেই দেশে পৌছে-ছিলাম।

যখন বাড়ী ফিরে গেলাম, তখন আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা বল্লে যে, আর কখনও তারা আমাকে সমুদ্রযাত্রা কর্তে দেবে না।



দেমাকী বালাকি



কাশীতে যখন অজাত শত্রু নামক রাজা রাজত্ব করিতে-ছিলেন সেই সময়ে বালাকি নামক এক ব্রাহ্মণ নিজেকে অত্যন্ত বড় দার্শনিক মনে করিয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেন। লোকে সেইজন্য তাঁহাকে 'দেমাকী বালাকি' বলিয়া ডাকিত। একদিন এই ব্রাহ্মণ অজাতশত্রুর রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার এখানে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে চাই।" রাজা কহিলেন, "সে ত অতি উত্তম কথা। লোকে ব্রহ্মবিদ্যার আলাপন শুনিবার জন্য বিদেহ-রাজ জনকের সভায়ই কেবল গমন করে; আপনি যদি আমার গৃহে দর্শনশাস্ত্রের একটি কেন্দ্র গঠন করিয়া তুলিতে পারেন, তবে আমি আপনাকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিব। কিন্তু আপনি কি উপদেশ দিবেন, সংক্ষেপে শুনিতে পারি কি?"

বালাকি কহিলেন, "সূর্য্যে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, জলে, মানুষের প্রতিবিম্বে, ছায়ায় এবং দেহে যে পুরুষ আছেন আমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।"

অজাতশত্রু কহিলেন, "তাহা ঠিক নয়; ইঁহারা সকলেই এক হিসাবে উপাস্য এবং ইঁহাদের উপাসনারও ফল ভাল; কিন্তু ব্রহ্ম যাঁহাকে কহে আপনি ত তাহা ঠিক বুঝাইতে পারেন নাই। আপনার আর কিছু বক্তব্য আছে কি?"

বালাকি চুপ করিয়া রহিলেন। অজাতশত্রু আবার কহিলেন, "আপনার বক্তব্য কি এইখানেই শেষ হইল?" বালাকি কহিলেন, "হাঁ, এই পর্য্যন্ত, এর বেশী ত আর আমি জানি না।" অজাতশত্রু কহিলেন, "কিন্তু এতে ত ব্রহ্ম জানা হইল না।" তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন "তা হইলে আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করি।" রাজা কহিলেন, "সে কি কথা? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের শিষ্য হইবে, ইহা ত ঠিক শাস্ত্রসম্মত নয়। যাহা হউক, শিষ্য হইতে হইবে না, আমি আপনাকে এমনি উপদেশ করিব।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণের হাত ধরিয়া রাজা উঠিয়া পড়িলেন।

অতঃপর উভয়ে একটি সুপ্ত ব্যক্তির নিকট গিয়া তাহাকে নানা নামে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে সেই ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিল না, কারণ যে সকল নামে তাহাকে ডাকা হইয়াছিল তার একটাও তার নাম নয়। তখন তাহাকে এক ধাক্কা দেওয়া হইলে সে জাগিয়া উঠিয়া বসিল।

তখন রাজা কহিলেন, "এই যে লোকটা ঘুমাইয়াছিল, ডাকিলাম, সাড়া দিল না, অথচ এখন উঠিয়া বসিল,—এই ব্যক্তি যখন ঘুমে ছিল তখন কোথায় ছিল এবং কোথা হইতে আবার আসিল, তাহা জানেন কি?"

বালাকি তাহা জানিতেন না। কাজেই, রাজা আবার কহিতে লাগিলেন, "মানুষের হৃৎপিণ্ডের ভিতর একটি ক্ষুদ্র ফাঁকা জায়গা আছে; মানুষ যখন ঘুমায় তখন তার আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি লইয়া এই জায়গায় শয়ন করিয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ

ইত্যাদির শক্তি আত্মার সঙ্গে চলিয়া যায় বলিয়াই ঘুমন্ত মানুষ কিছু দেখেও না, শোনেও না। তখনই আমরা বলি 'লোকটা কি ভীষণ ঘুমাইতেছে'। যেমন কোন রাজা-মহারাজ যখন কোথাও যান, তখন তাঁদের সঙ্গে অধীন বড় বড় কর্ম্মচারীরাও যায়, তেমনি আত্মা যখন হৃৎপিণ্ডের ভিতর লুকাইয়া পড়ে, তখন ছোটরা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। আবার, মাকড়সা যেমন নিজের জালের সুতা ধরিয়া চারিদিকে চলিতে পারে, তেমনি এই আত্মাও নিজের চারিদিকে ইন্দ্রিয় সকল বিস্তৃত করিয়া দেয় এবং এক বিরাট্ জগৎ সৃষ্টি করে! আগুন হইতে চারিদিকে যেমন স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি এই আত্মার চারিদিকে এই জগৎ ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই জগতের মূল সেই আত্মা। সেই জন্যই তাহাকে 'সত্যের সত্য' এই আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এই আত্মার চেয়ে বড় আর কিছু নাই। এই জগতে নানাভাবে আত্মাই প্রকাশ লাভ করিয়াছে।"

বেদ ও উপনিষদের যুগের দার্শনিক

বেদ ও উপনিষদের যুগের যে কয়জন দার্শনিকের পরিচয় আমরা এ যাবৎ পাইয়াছি তাঁহারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ। মধ্যে মধ্যে ক্ষত্রিয় রাজারাও দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী হইতেন, যেমন পঞ্চাল দেশের রাজা প্রবাহণ জৈবলি, কাশীর রাজা অজাতশত্রু আর সর্ব্বোপরি বিদেহ-রাজ জনক। মধ্যে মধ্যে এমনও হইত যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট বিদ্যা শিক্ষাও করিতেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে শিক্ষা-কার্য্যটি ব্রাহ্মণেরই করণীয় ছিল; এবং অজাতশত্রু বালাকিকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে মনে হয় যে, কোন ক্ষত্রিয় যদিও কোন কোন বিদ্যা কোন ব্রাহ্মণের চেয়ে বেশী জানিতেন, আর, যদিও কখনও কখনও ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ের নিকট উপদেশ লইতেন, তথাপি আচার্য্য-পদবীটিতে ব্রাহ্মণদেরই একাধিপত্য ছিল। রাজারা সমস্ত বিদ্যারই এবং বিশেষভাবে দর্শনশাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ইহা বোধ হয় জোর করিয়াই বলা যায় যে, জনক-রাজার মত বদান্য ও উদার সহায়ক না পাইলে যাজ্ঞবল্ক্যের দার্শনিক চিন্তা স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিত না।

সে সময়ে নানা প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। ধনী রাজারা অশ্বমেধ বাজপেয়, রাজসূয় প্রভৃতি নানাবিধ বহুব্যয়সাধ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, সম্পন্ন ব্রাহ্মণেরাও অনেক রকম যজ্ঞ করিতেন। যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণই হউন আর ক্ষত্রিয়ই হউন, সব যজ্ঞেতেই বহু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সমাহূত হইতেন। যজ্ঞান্তে তাঁহারা একত্র বসিয়া নানা প্রকার শাস্ত্র বিচার করিতেন। ভারতে প্রথম দার্শনিক চিন্তার বিকাশ এই ভাবেই হইয়াছিল। এই সব বিচারে যিনি জয়ী হইতেন তাঁর যশঃ চারিদিকে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িত এবং বহু জিজ্ঞাসু ক্রমে তাঁহার উপদেশ শ্রবণের জন্য সমবেত হইত। জনক রাজার সভায় বিজয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের পদগৌরবের কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

তা ছাড়া শাস্ত্রের পঠন-পাঠনও প্রচুর চলিতেছিল, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। এক দিকে যজ্ঞের বিধির সূক্ষ্ম আলোচনা লইয়া যেমন এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতেন, তেমনি আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যা বা দর্শন শাস্ত্র লইয়াই দিন কাটাইতেন। 'প্রশ্ন'-উপনিষদে বর্ণিত পিপ্পলাদ ঋষি এইরূপ একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহারাই ছিলেন ভারতের আদিম দার্শনিক।

উপনিষদের যুগের দার্শনিকেরা কেহই একেবারে নির্ধনও ছিলেন না এবং কেহই বোধ হয় সন্ন্যাসীও ছিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রচুর সম্পত্তির কথা আমরা আগেই জানিয়াছি। তিনি গৃহী ছিলেন এবং তাঁহার দুই স্ত্রী ছিলেন। আরও অনেক দার্শনিকের কথা আমরা শুনি—যাঁদের বড় বড় ঘর-বাড়ী ছিল এবং ইঁহারা যে অনেক সময় বড় বড় যজ্ঞ করিতেন তাতেও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইত। সত্যকাম জাবাল একজন বড় দার্শনিক ছিলেন; তিনিও গৃহী ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীর কথাও আমরা জানিয়াছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উপনিষদের যুগে দার্শনিকেরা গৃহত্যাগী, বনবাসী সন্ন্যাসী ছিলেন না; তবে তাঁরা আধুনিক সহরের বড় বড় কোঠা-বাড়ীর মত বাড়ীতে বাস করিতেন বলিয়াও মনে হয় না। সাধারণতঃ তাঁরা গ্রাম-বাসী সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন; মেয়েরাও সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন।

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসী হওয়ার ব্যবস্থা নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের চারিটি আশ্রমের বিধি আছে। এই বিধি অনুসারে প্রথম বয়সে ব্রহ্মচারী থাকিয়া গুরুগৃহে

বাস করিয়া লেখাপড়া শিখিতে হইত। তারপর বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে হইত এবং তারপর কিছু কাল বনে বাস করিয়া সর্ব্বশেষে চতুর্থ আশ্রম বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইত। বনে বাস করিবার সময়ই উপনিষদাদি বিদ্যার বিস্তারিত আলোচনা অভিপ্রেত ছিল। প্রথম বয়সে বিদ্যা অর্জ্জনের সময় বেদের অন্যান্য অংশের সঙ্গে উপনিষদ্‌ও পড়িতে হইত; কিন্তু ইহার বিস্তারিত বিচার ও ইহার অর্থ সম্বন্ধে গবেষণা করা হইত বানপ্রস্থ অবস্থায় অর্থাৎ তৃতীয় আশ্রমে বনে বাস করিবার সময়। তারপর সন্ন্যাস আশ্রমে ধর্ম্মচিন্তা ও মৃত্যুর প্রতীক্ষা ছাড়া আর বিশেষ কিছু কর্ত্তব্য ছিল না। এই ছিল প্রাচীন যুগের হিন্দুর জীবন-ধারা। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষির জীবনে আমরা এই ধারাই অনুসৃত হইতে দেখি। যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে যখন আমাদের প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি গৃহী; বহু ছাত্র তাঁহার গৃহে বাস করিয়া বিদ্যা অধ্যায়ন করিতেছে এবং যখন তিনি কোথাও যজ্ঞাদিতে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইতেন, তখন ইহারাও সঙ্গে যাইত।

গৃহী যাজ্ঞবল্ক্য শেষ বয়সে স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া বনে যাইতেছেন, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। তারপর আর তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। কারণ তারপর নিশ্চয়ই লোকালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল এবং যে ব্রহ্মের কথা সারাজীবন তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাতে লীন না হওয়া পর্য্যন্ত শেষ সময়টুকু তিনি তাঁর চিন্তা করিয়াই কাটাইয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের জীবন যতটুকু আমরা জানিয়াছি, তাতে চারিটি আশ্রমই তিনি পর্য্যায়ক্রমে অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। উপনিষদের অন্যান্য ঋষিদের জীবনেও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

বুদ্ধের আবির্ভাবের পর দার্শনিকদের এই জীবন-ধারা ক্রমশঃ অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বুদ্ধ নিজে বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়ার আগেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তিনি আবাল্য সন্ন্যাসীদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। মঠের প্রতিষ্ঠাও তাঁর সময় হইতেই আরম্ভ হয়। দেখাদেখি ক্রমশঃ গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যেও অনেকেই লেখাপড়া শেষ করিয়াই আর বিবাহাদি না করিয়া একেবারে সন্ন্যাসী হইয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁদেরও মঠ ও আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল এবং দর্শনের পঠন-পাঠনও ক্রমে এই সব মঠবাসীদের মধ্যেই আশ্রয় পাইতে লাগিল। উপনিষদের ঋষিরা যজ্ঞ করিতে করিতে এবং যজ্ঞের অর্থ আলোচনা করিতে করিতেই দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্কার করেন; কিন্তু ক্রমে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার উৎপত্তি হয় এবং অনেকেই এই সব কর্ম্ম অনাবশ্যক বলিয়া ঘোষণা করেন। বুদ্ধের প্রভাব ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। এই পরিবর্ত্তনের কথা পরেও আমরা আলোচনা করিব।

বেদের ঋষিরা জল, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করিতেন। কিন্তু তাঁদের অনুভূতিতে প্রথমতঃ ইহাদের প্রত্যেকটিতে পৃথক্ পৃথক্ দেবতারই প্রতীতি হইত। পরে ক্রমশঃ সর্ব্বত্র একই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁরা অনুভব করিতে লাগিলেন। এই এক ঈশ্বরের অনুভূতির পরিচয় আমরা উপনিষদে পাই। উপনিষদে আমরা ক্রমশঃ ইহাও দেখিতে পাই যে, শুধু বাইরের সব বস্তুতেই যে ভগবান্ রহিয়াছেন, তাহা নয়; আমাদের প্রত্যেকের ভিতরও তিনি রহিয়াছেন; প্রকৃত পক্ষে আমরাও তাঁহারই অংশ। সুতরাং উপনিষদের শিক্ষার সারাংশ এই যে, জগতের সর্ব্বত্রই ভগবান রহিয়াছেন; চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি বিশাল বস্তুতে তিনি যেমন আছেন, তেমনই আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশেও তিনি রহিয়াছেন। এই জগতের মূল তিনিই। শুধু তাই নয়; এই জগৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই চলিতেছে; আর যখন ইহার ধ্বংস হইবে তখন আবার উহা তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যাইবে। যে জিনিস নষ্ট হয় তাহা তাঁহাতেই লয় পায়; মানুষ মরিয়া তাঁহারই মধ্যে আশ্রয় পায়।

কি ভাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও উপনিষদে আমরা জানিতে পারি। প্রথমে আকাশ, তারপর বায়ু, তারপর অগ্নি বা তেজ, তারপর জল এবং সর্ব্বশেষে পৃথিবী তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষের আত্মা ঠিক সৃষ্ট নয়, কেননা উহা তাঁহারই অংশ।

উপনিষদে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা লাভ করিলে এবং যথাবিধি উহার চর্চ্চা করিলে সংসারের দুঃখ-কষ্ট মানুষকে স্পর্শ করে না এবং মৃত্যুর পর মানুষ অনন্ত কাল ভগবানের সান্নিধ্যে বাস করে; আর তাহার কোন কষ্ট থাকে না।

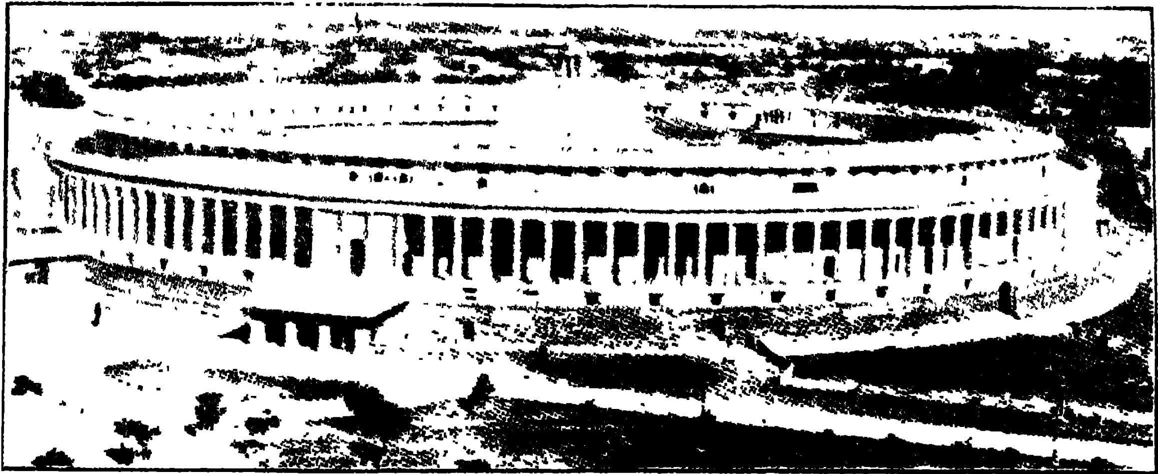
পৃথিবীর রাষ্ট্র-সভা



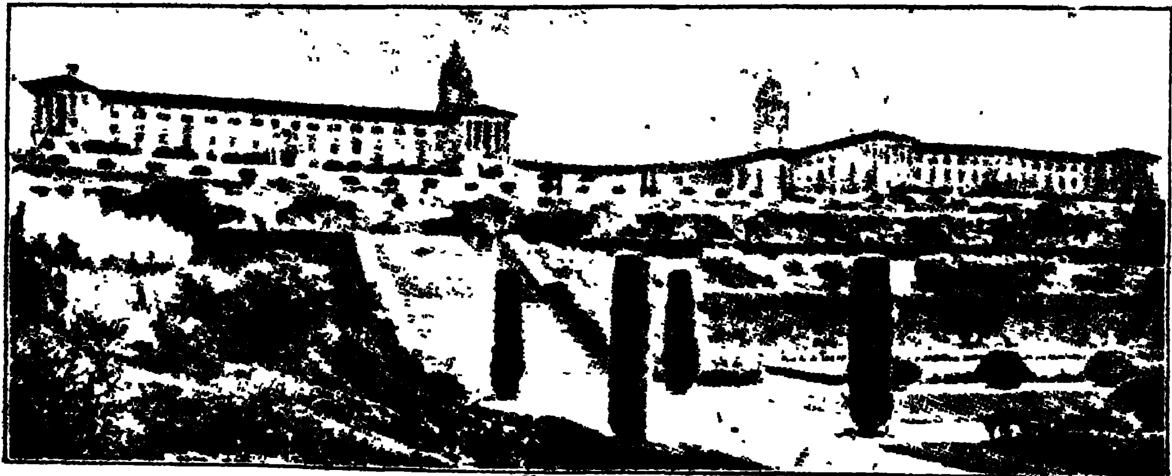
পার্লামেণ্ট হাউস—বেলগ্রেড—পশ্চিম ইউরোপ



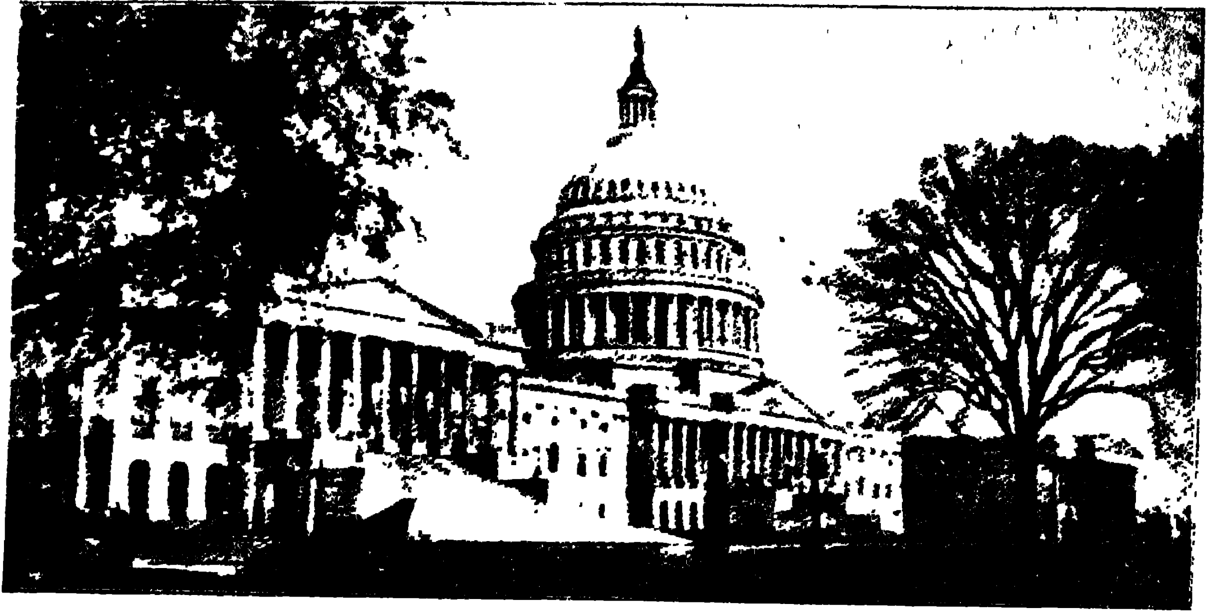
পার্লামেণ্ট হাউস্—ভিয়েনা—পূর্ব্ব ইউরোপ



কাউন্সিল চেম্বার—নূতন দিল্লী—এসিয়া



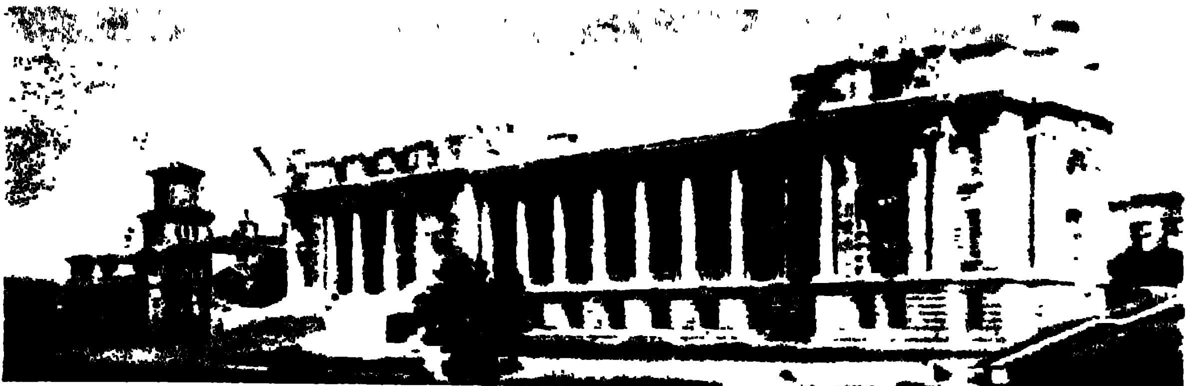
ইউনিয়ান বিল্ডিং—প্রিটোরিয়া—আফ্রিকা



কেপিটল—ওয়াসিংটন—আমেরিকা



পালামেণ্ট হাউস্—কানবেরা—অষ্ট্রেলিয়া



পার্লামেণ্ট হাউস্—ওয়েলিংটন—নিউজিল্যাণ্ড



ডিমস্থিনিস্

১৭৯২ পৃষ্ঠার পর

যে সকল গুণে মানুষ মহত্ত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে, অধ্যবসায় তাহাদের মধ্যে প্রধান। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে ডিমস্থিনিসের নাম অধ্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বক্তা হিসাবেও তাঁহার নাম পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল হীরকাক্ষরে লিখিত হইয়া আছে।

আনুমানিক ৩৮৩ ৩২২ খৃঃ পূঃ অব্দে ডিমস্থিনিস্ জীবিত ছিলেন। তাঁহার পিতা এথেন্স নগরের অধিবাসী ছিলেন এবং তরবারি নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ডিমস্থিনিসের পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র সাত বৎসর। সাত বৎসরের বালক ডিমস্থিনিস একেবারেই সুস্থ ও সবল ছিলেন না—ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বল ছিলেন। এই জন্য কোনদিন বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে পড়া দিতে পারিতেন না; আর যাহাও জানিতেন, তাহাও জিহ্বার জড়তার জন্য উচ্চারণ করিতে বহুক্ষণ লাগিত। অস্পষ্ট উচ্চারণ এবং ভাল ভাবে পড়াশুনা দিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার সহপাঠি সমবয়সী বালকেরা সর্ব্বদা তাঁহাকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিত। আবার এদিকে তাঁহার পিতা যে সকল লোকের উপর মৃত্যুকালে তদীয় সম্পত্তি রক্ষার ভার দিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই ছিল ধূর্ত্ত, অর্থলোলুপ এবং ধর্ম্মবিহীন। তাহাদের চতুরতা ও প্রবঞ্চনার জন্য অতি অল্প দিনের মধ্যেই ডিমস্থিনিস্ সর্ব্বহারা হইয়া পড়িলেন। ডিমস্থিনিস্ ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখেন, এমন ইচ্ছাও তাঁহার অভিভাবকদের ছিল না; কাজেই, ডিমস্থিনিস্ মূর্খই রহিয়া গেলেন।

ডিমস্থিনিস্ যখন এইরূপ নিঃস্ব অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে এথেন্স নগরে এক বৃহৎ সরকারী মোকদ্দমা হয়। সেই মোকদ্দমা উপলক্ষে দুই পক্ষেই বিস্তর উকীল নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার দিন এথেন্সের প্রায় সকলেই সেই বক্তৃতা শুনিতে যাইতেছিলেন। ডিমস্থিনিসেরও বক্তৃতা শুনিতে যাইতে ইচ্ছা হইল, কোন মতেই তাঁহাকে কেহ নিরস্ত করিতে পারিল না। অবশেষে একজন বাড়ীর চাকর তথাকার রক্ষী পুরুষের সাহায্যে ডিমস্থিনিস্কে আদালতের এককোণে বসাইয়া দিয়া আসিল।

এই একটি দিন ডিমস্থিনিসের জীবনে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। তিনি সেই বিখ্যাত বক্তার মুখে যে অপূর্ব্ব বক্তৃতা শুনিলেন, তাহা আর ভুলিতে পারিলেন না। সে দিন সেই বক্তার বক্তৃতা শেষ হইলে পর, যাহারা বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিল সেই শ্রোতারা সকলে মিলিয়া বক্তাকে সম্বর্দ্ধনা করিল। তাহা দেখিয়া ডিমস্থিনিস্ও মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, যেমন করিয়াই হউক তিনিও ঐরূপ বাগ্মিতা লাভ করিয়া দেশের সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইবেন এবং সমাদর লাভ করিবেন। যে বালকের মুখ দিয়া ভাল করিয়া কথা বাহির হয় না, যাহার কণ্ঠস্বর

অতি ক্ষীণ, যে ভালভাবে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত পায় নাই, সেই বালক হইবে কিনা বাগ্মী? ডিমস্থিনিসের এই সঙ্কল্প ও এই প্রতিজ্ঞার কথা যখন সকলে জানিতে পারিল, তখন তাঁহার সমপাঠিরা এবং পরিচিত লোকেরা নানারূপে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু ডিমস্থিনিস্ ছিলেন সেই জাতীয় মানুষ—যাঁহারা বরাবর প্রতিজ্ঞায় অটল এবং সঙ্কল্পে অবিচল থাকেন। তাঁহার সঙ্কল্পানুরূপ কার্য্য করিবার জন্য তিনি নগর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রের তীরে যাইয়া এক পর্ব্বতের গুহায় বা পাতালপুরীতে যাইয়া নিভৃতে বসিয়া আপনার মনে অধ্যয়নে রত হইলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তাঁহার অধ্যয়ন স্পৃহা নিবৃত্ত হইল না। কাব্য, ইতিহাস, অলঙ্কার ইত্যাদি কত কি পড়িতে লাগিলেন। এ সময়ে তিনি তাঁহার মাথার অর্দ্ধেকখানি কামাইয়া ফেলিয়াছিলেন, সুতরাং ইচ্ছা হইলেও লোকসমাজে আসিতে পারিতেন না। যাহাতে জিহ্বার জড়তা দূর হয় সেজন্য মুখের মধ্যে মুড়ী রাখিয়া সমুদ্রের তীরে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতেন। যাহাতে কণ্ঠস্বর সবল ও অনর্গল বলিবার ক্ষমতা হয়, সেই অভ্যাসের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বক্তার বক্তৃতা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে পাহাড়ের উপর উঠিতেন। তিনি তাঁহার বিকৃত অঙ্গভঙ্গী দূর করিবার জন্য দুইপাশে দুইখানি তীক্ষ্ণ তরবারি ঝুলাইয়া দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা পাঠ করিতেন।

একদিন এই সাধনার ফল ফলিল। যে বালক একদিন মূর্খ, ক্ষীণকণ্ঠ, বিকৃতস্বর ও তোতলা বলিয়া সকলের উপহাস ও বিদ্রূপের পাত্র হইয়াছিল, সে-ই একদিন গ্রীসের অদ্বিতীয় বক্তা হইল।

ডিমস্থিনিস্ এথেন্সের একজন স্বদেশপ্রেমিক মহাপুরুষ ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা ও দেশের কল্যাণের জন্য তিনি তাঁহার বাগ্মিতার সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; এথেন্সের লোক ডিমস্থিনিসের বক্তৃতায় একেবারে উন্মত্তের প্রায় হইয়া যাইত। তাঁহার ওজস্বিনী উদ্দীপনাতে এথেন্সবাসীরা কখনও আনন্দ, কখনও বিষাদ, কখনও ক্রোধ, কখনও ঘৃণাতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত। সমগ্র গ্রীসদেশ তাঁহার নামে কাঁপিত।

ডিমস্থিনিসের বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য ত আর আমাদের নাই, আমরা তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারি যে, তাঁহার বাগ্মিতা কিরূপ অসাধারণ ছিল। একদিকে যেমন ছিল তাঁহার বাগ্মিতা, তেমনি ছিল যুক্তি ও তর্কের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য,—যুক্তিহীন কোন কথা তিনি বলিতেন না। তাঁহার বিপক্ষীয়দের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে যাইয়া ডিমস্থিনিস্ কখনও সংযম হারান নাই, শুধু তর্ক ও যুক্তির সাহায্যে তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন।



ডিমস্থিনিস বক্তৃতা করিতেছেন

ডিমস্থিনিস সর্ব্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন। মহাবীর আলেকসন্দরের (আলেক্জেণ্ডার) পিতা ফিলিপকে তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, একজন রাজ্যলোভী, পরপীড়ক, দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিরূপে। ম্যাকিদোনের এই রাজা ফিলিপ, এথেন্সবাসীদিগকে তাঁহার পদানত ক্রীতদাসরূপে গণ্য করিতে চাহিয়াছিলেন। দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইয়া যে দুর্দ্দান্ত দস্যু এথেন্সবাসীদিগকে পীড়ন করিতে চাহে, সে কি কখনও শ্রদ্ধার যোগ্য হইতে পারে?

ফিলিপের বিরুদ্ধে দেশবাসীদিগকে উত্তেজিত করিয়া ডিমস্থিনিস্ যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন সে সমুদয় বক্তৃতা 'Philippics' নামে পরবর্ত্তী যুগের গ্রীক্ ঐতিহাসিকেরা অভিহিত করিয়াছেন। ডিমস্থিনিসের বিখ্যাত বক্তৃতাটির নাম—"On the Crown," এই বক্তৃতাতে তিনি এথেন্সবাসীদিগের পক্ষে কোন্ পথ অবলম্বন করিলে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ হইতে পারে, সেই পন্থাই দেখাইয়াছিলেন।

কোন বিষয়ে পন্থা বা উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই এমন কথা বলা যায় না যে, তাহাতে বিজয় লাভ সম্ভবপর। ডিমস্থিনিসের নির্দ্ধারিত পন্থাবলম্বন করিয়া এথেন্সবাসী বীরগণ ম্যারাথনের (Marathon) এবং স্যালামির (Salami) রণক্ষেত্রে পরাজিত হইলেও, তাহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে। ম্যাকালের বীরত্বকাহিনী কত কবি, কত ঐতিহাসিক যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ডিমস্থিনিস্ সেই কবে কোন্ যুগে মৃত্যুর কবলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু আজও মুক্তিকামী মহাপুরুষ হিসাবে, অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ী এবং বিখ্যাত বাগ্মীরূপে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

ডিমস্থিনিসের বাণী

দেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা পৃথিবীতে বড় জিনিষ আর নাই। ন্যায় ও ধর্ম্মপথে থাকিয়া দেশের কল্যাণ চিন্তা করিবে।

একতাবদ্ধ হও, একমত হও, এক পথে চল, যোগ্য নেতার নিয়োজিত পথে অগ্রসর হও—ভয় কোথায়? জয় অবশ্যম্ভাবী।

পরপীড়ক নৃপতি পৃথিবীর পাপস্বরূপ।

কোন মানুষকে কোন কাজের ভার দিয়া অবিশ্বাস করিও না। ভার দিবার পূর্ব্বে তাহার বিষয়ে সন্ধান করা কি উচিত নয়?

সদ্‌গুণের সমাদর করিবে। তাহা স্বপক্ষীয়েরই হউক, অথবা বিপক্ষীয়েরই হউক।

দেশের স্বাধীনতাপহারী পরপীড়ক দস্যু শ্রদ্ধার পাত্র নয়।



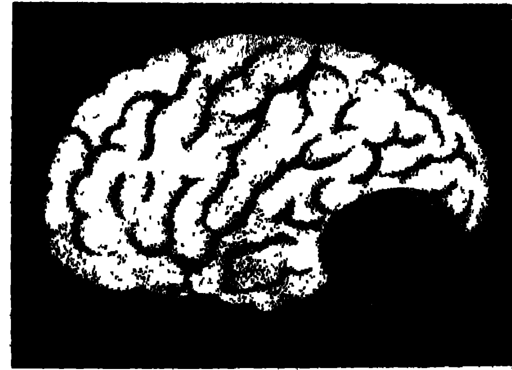
মস্তিষ্ক


১২৬৯ পৃষ্ঠার পর

তোমরা টেলিগ্রাফের তার নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই সব তারগুলি টেলিগ্রাফ অফিসে যাইয়া সম্মিলিত হইয়াছে। সেই প্রধান আফিস হইতে যখন তড়িৎবার্ত্তা প্রেরণ করা হয়, তখন যে দেশে ইচ্ছা সে দেশেই পাঠান চলে। পর পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ,—মস্তিষ্ক হইতে টেলিগ্রাফের তারের মত কেমন শরীরের চারিদিকে স্নায়ুগুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই স্নায়ুগুলির মূল প্রেরণা আসে মস্তিষ্ক হইতে। মস্তিষ্ক টেলিগ্রাফ আফিসের মত চারিদিকে সংবাদ পাঠাইয়া

সুদৃঢ় করোটি (মস্তিষ্কের আধার)

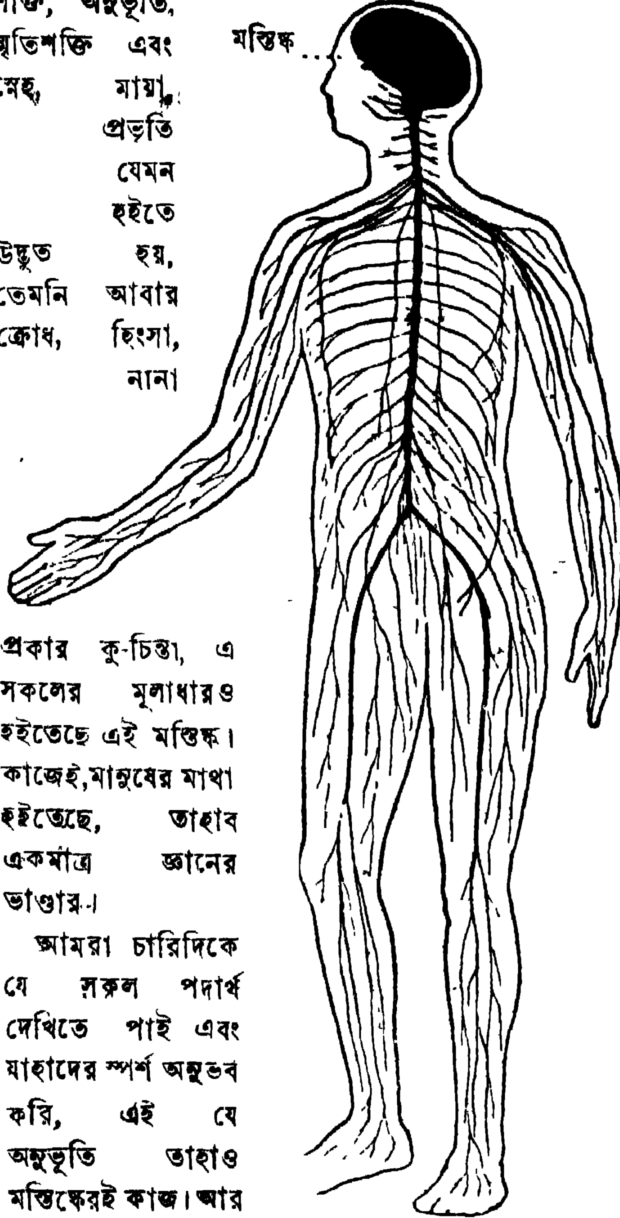
দেয়। তোমার ক্ষুধা লাগিয়াছে, অমনি সংবাদ গেল,—তোমার ইচ্ছা হইল বই পড়িবে, অমনি মস্তিষ্ক হইতে সে প্রবৃত্তির প্রেরণা জাগিল, তোমার ভ্রমণের ইচ্ছা, তোমার চিন্তার প্রবৃত্তি, যাহা কিছু ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি বল, এ সকলের মূল হইতেছে—মস্তিষ্ক। কাজেই, সব দিক্ দিয়াই আমাদের দেহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে মস্তিষ্ক। মাথাটি যেন একটি বাক্স, উহার মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে তরল এক-প্রকার পদার্থ, যাহাকে সহজ চল্তি ভাষায় বলে 'মগজ' বা মাথার 'ঘিলু'। মস্তিষ্কের আধারটিকে বিশুদ্ধ ভাষায় বলে করোটি। এই একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রটি অত্যন্ত কোমল। 'ঘিলু' জিনিসটা এত কোমল যে, উহা যে সুদৃঢ় বাক্সটিতে অবস্থিত, তাহাতে আঘাত করিলে সময় সময় নানা বিপদ



মগজ বা মাথার ঘিলু

ঘটে। মস্তিষ্ক বা ঘিলু, করোটি-গহ্বর একেবারে পূর্ণ করিয়া আছে। এই ঘিলু জিনিসটাই হইতেছে পৃথিবীর চালনার মূল উৎস। এই ঘিলুর সাহায্যেই পৃথিবীর রাজত্ব বল, শাসন বল, শিক্ষা ও সাহিত্য

বল, সমাজ বল—সবই চালিত হইতেছে। আমরা একজন হাবা-গবা লোককে উপহাস করিয়া বলি, উহার মাথায় ঘিলু নাই। আবার বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতদের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বলি, কি চমৎকার মাথা! আমাদের চিন্তা-শক্তি, অনুভূতি, স্মৃতিশক্তি এবং স্নেহ, মায়া, প্রভৃতি যেমন হইতে উদ্ভূত হয়, তেমনি আবার ক্রোধ, হিংসা, নানা



প্রকার কু-চিন্তা, এ সকলের মূলাধারও হইতেছে এই মস্তিষ্ক। কাজেই, মানুষের মাথা হইতেছে, তাহার একমাত্র জ্ঞানের ভাণ্ডার।

আমরা চারিদিকে যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই এবং যাহাদের স্পর্শ অনুভব করি, এই যে অনুভূতি তাহাও মস্তিষ্কেরই কাজ। আর এই অনুভূতি শক্তিকে বলা যায় Sensation।

মানব-দেহ—স্নায়ুজাল

তার পর আমরা কোন কাজ করিবার জন্য যে একটা প্রেরণা বা ক্রিয়াশক্তি লাভ করি, তাহাকে ইচ্ছাশক্তি বা Will বলা যায়। আর আমাদের মনের মধ্যে যে সকল ভাবের উদ্রেক হয়, যাহাকে আমরা বলি হৃদয়বৃত্তি বা Emotion, তাহার মূল কেন্দ্রও হইতেছে আমাদের মস্তিষ্ক। কাজেই, আমরা দেখিতে পাইতেছি; পৃথিবীর যা কিছু উন্নতি, এই যে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কার হইতেছে, এই যে আমরা সাহিত্য শিল্প ও বাণিজ্য



মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত রক্তবহা প্রণালী

প্রভৃতিতে উন্নতি লাভ করিতেছি, তাহার মূলে কি রহিয়াছে?—মস্তিষ্ক।

মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালীর কথা শোন। বহুসংখ্যক স্নায়ুপিণ্ডের (Nerve matter) সাহায্যে মস্তিষ্ক নির্মিত হইয়াছে। এই যে স্নায়ুপিণ্ডগুলি, তাহা

রক্তবহা নালী দ্বারা পূর্ণ। ইহার এক একটি পিণ্ড হইতে চারিদিকে ঐ নালীগুলি বহিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটি পিণ্ড এক একটি বিভাগের কেন্দ্রস্থান। চারিটি-প্রধান স্নায়ুপিণ্ডের দ্বারা মস্তিষ্ক গঠিত। যথা—(১) মূল মস্তিষ্কভাগ (Cerebrum) সেরিব্রাম, (২) ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (Cerebellum) সেরিবেলাম, (৩) আয়ত-মজ্জা (Medulla oblongata) মেডিউলা অবলঙ্গেটা, (৪) পন্‌স্ ভেরলিয়াই (Pons varslii) মস্তিষ্কের বিভিন্ন বিভাগের কেন্দ্রের সহিত রক্তবহা নালীগুলির কিরূপ ভাবে সংযোগ রহিয়াছে এবং কিরূপে উহা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় সেই রক্তবহা নালীগুলি চিত্র দেওয়া গেল।



করোটির ভিতরকার মগজের একটি অংশ

এই মস্তিষ্কের ওজন পুরুষের, হইতেছে—৫০,৫২ ও ৫৬ আউন্স (দেড় সের কি পৌনে দুই সের) এবং স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক হইতেছে ওজনে তিন পোয়া হইতে পাঁচ পোয়া—৪৪ হইতে ৪৭ আউন্স এইরূপ। যে সকল ব্যক্তি অত্যধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন, তাহাদের মস্তিষ্কের ওজন সাধারণ মানুষের মাথার ওজন হইতে বেশি হইয়া থাকে। আমরা অনেক সময় মাথা দেখিয়াও মানুষের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি অনুভব করিতে পারি। তোমরা সচরাচর দেখিতে পাইবে, যাহাদের মস্তিষ্ক বৃহৎ, তাহাদের মানসিক শক্তি খুবই বেশী। যাহাদের মাথা ছোট, তাহারা সাধারণতঃ জড়বুদ্ধির হয়। আবাব পাগলের মস্তিষ্ক দেখিতে পাইবে, অদ্ভুত প্রকারের।

মানুষের মস্তিষ্ক অপেক্ষা বৃহদাকার জন্তুদের মস্তিষ্ক ওজনে অনেক কম। ঘোড়ার মাথার ওজন মাত্র ১৯ আউন্স বা আধ সের, অতি বৃহৎ তিমির প্রায় আড়াই সের, হস্তীর প্রায় সাড়ে চারি সের (১৫০ আউন্স)। কাজেই, ইতর প্রাণীরা আকারে বড় হইলেও বুদ্ধির দিক্ দিয়া অর্থাৎ মাথার দিক্ দিয়া কত ছোট। পশুদের মধ্যে হস্তী বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু সেই হস্তীর মস্তিকও মানুষের মস্তিষ্কের তুলনায় ক্ষুদ্র নহে কি?

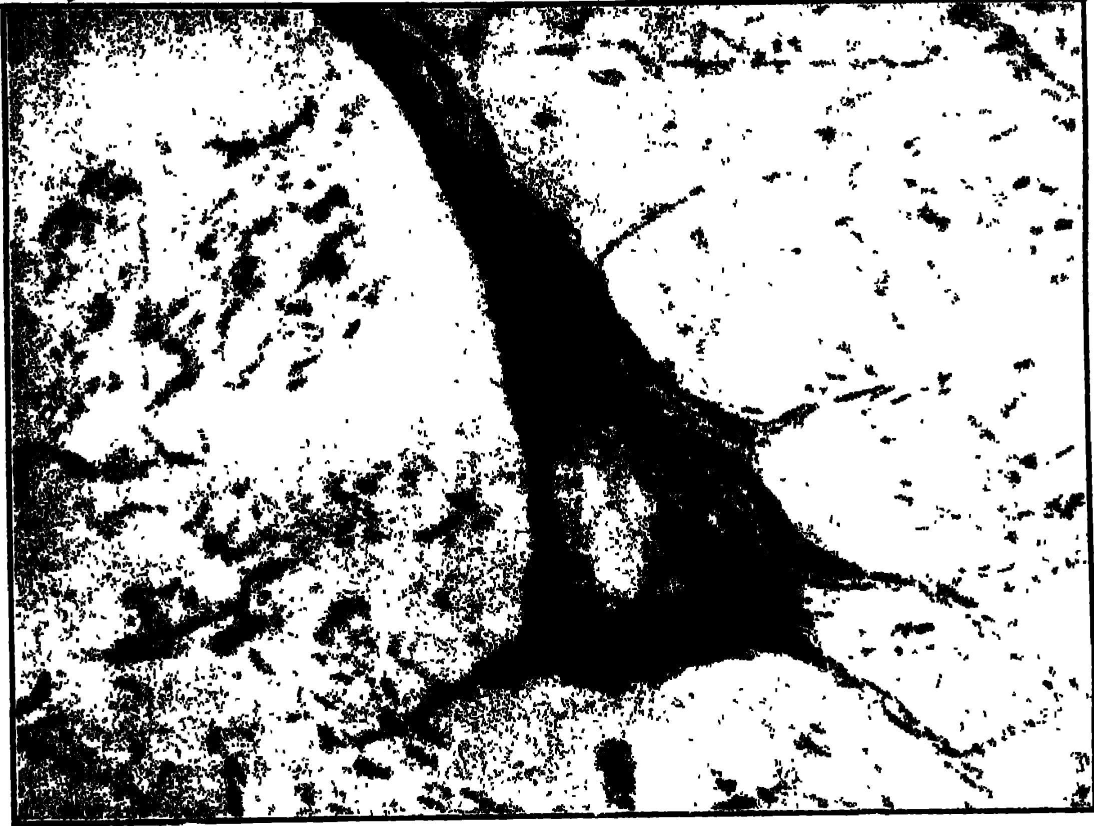
মস্তিষ্কের আবরণ (Brain covers) বা করোটি ভিতরের দিক্ দিয়া তিনটি ভাগে বিভক্ত। এই তিনটি ভাগ তিনটি স্তরে স্থাপিত আছে। উহাদিগের নাম—(১) অনুরক্ত মাতৃআবরণ (Pia matter), (২) লূতাতন্তু আবরণ (Arachnoid), (৩) কঠোর মাতৃআবরণ (Dura matter)। এই সকলের বিস্তৃত পরিচয় আর তোমাদের নিকট দিলাম না। এই তিনটি আবরণ দ্বারা আমাদের মস্তিষ্ক নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য বিধান, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ।

করোটির উপরে—মস্তকের কেশযুক্ত যে ত্বক্ যাহাকে ইংরাজীতে বলে Scalp তাহার উপর কেশের ছাউনি রহিয়াছে।

মূল মস্তিষ্ক ভাগ—মস্তিষ্ক পিণ্ডের আট ভাগের সাত ভাগ হইবে। মূল মস্তিষ্কভাগ (Cerebrum) সম্মুখের দিকে ভ্রূদুইটির কাছাকাছি আসিয়া পশ্চাতের দিকে যেখানে মাথার চুল শেষ হইয়া ঘাড়ের উপর পর্য্যন্ত গিয়াছে অর্থাৎ মাথার চুল যেখানে শেষ হইয়াছে, সে পর্য্যন্তমস্তিষ্কের মূলভাগ বিস্তৃত। এই ভাগটি মাঝামাঝি একটি চিড় বা ফাইট দ্বারা দুই অর্দ্ধ গোলাকার খণ্ডে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত। এই যে গোলাকার ভাগ দুইটি (hemispheres) প্রত্যেক-টিতে আবার তিনটি করিয়া খণ্ড (lobe) রহিয়াছে। মস্তিষ্ক পিণ্ড পাকানো পাকানো। মস্তিষ্কের ভিতরের অংশ শ্বেত স্নায়ু মজ্জা দ্বারা পূর্ণ। উহার উপর একটি ধূসর বর্ণের (Grey matter) স্নায়ু মজ্জার স্তর আছে। উহা এই শ্বেত স্নায়ু মজ্জার চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে। এই ধূসর ও শ্বেত বর্ণের স্নায়ুমজ্জাতে মস্তিষ্ক গঠিত হইয়াছে। এই যে স্তর, ইহাই হইতেছে মস্তিষ্কের মূলাধার। এই স্তরের গাঢ়তার উপর মস্তিষ্কের শক্তির কম ও বেশির তারতম্য হয়। অন্যান্য প্রাণীর মস্তিষ্কে, মানুষের মস্তকের ন্যায় ভাঁজ থাকে না।

মানুষের মাথাতেই এই চুনোট বা ভাঁজের সংখ্যা চেয়ে বেশী। আবার মানুষের মধ্যেও অসভ্য সকলের ও বর্ব্বর জাতীয় মনুষ্যের মস্তিষ্ক অপেক্ষা সুশিক্ষিত ও সুসভ্য জাতির মস্তিষ্কের এই ভাঁজ বা চুনোট অধিক।

মস্তিষ্ক কি ভাবে গঠিত, এখন তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছ। ধূসর ও শ্বেতবর্ণের তরল পদার্থ দিয়াই ইহা গঠিত। কিন্তু এই মস্তিষ্কের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে মানুষের মূল শক্তি। এই মস্তিষ্কের



মস্তিষ্কের কোষ

সাহায্যেই তুমি দেখিতে পাও, শুনিতে পাও, আস্বাদ ও স্পর্শ প্রভৃতি অনুভব কর। আমাদের মাংস-পেশী আমাদের ইচ্ছার উদ্রেক হইলে পর কার্য্য করে। এই চালনা করে কে? তাহাও তোমার মস্তিষ্ক। তুমি তোমার মস্তিষ্ক ধরিতে পার, ছুঁইতে পার, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার, কিন্তু তোমার মন, তোমার বিবেক, তোমার বুদ্ধিবৃত্তি, তোমার ইচ্ছা শক্তি, তোমার চিন্তা-ভাবনার মূল কি? এ সকল কি দেখিতে পার? না বুঝিতে পার? মানুষের মনের উপর কি কেহ কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে?

আমাদের দেহের বিভিন্ন আকারগুলির উপর যেমন মস্তিষ্কের প্রভাব, তেমনি মন, বুদ্ধি, বল, যাহা কিছু—তাহাও সেই মস্তিষ্কের দ্বারাই পরিচালিত।

ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বা Cerebellum মূল মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগে ঠিক ঘাড়ের উপর অবস্থিত। অর্থাৎ এক কাণের পিছন হইতে অপর কাণের পিছন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, চলা, দৌড়ান, কথা বলা, গান করা, প্রভৃতি ক্রিয়া, একই সময়ে বহু পেশীর ক্রিয়া যাহাতে হয়, সে সকল ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

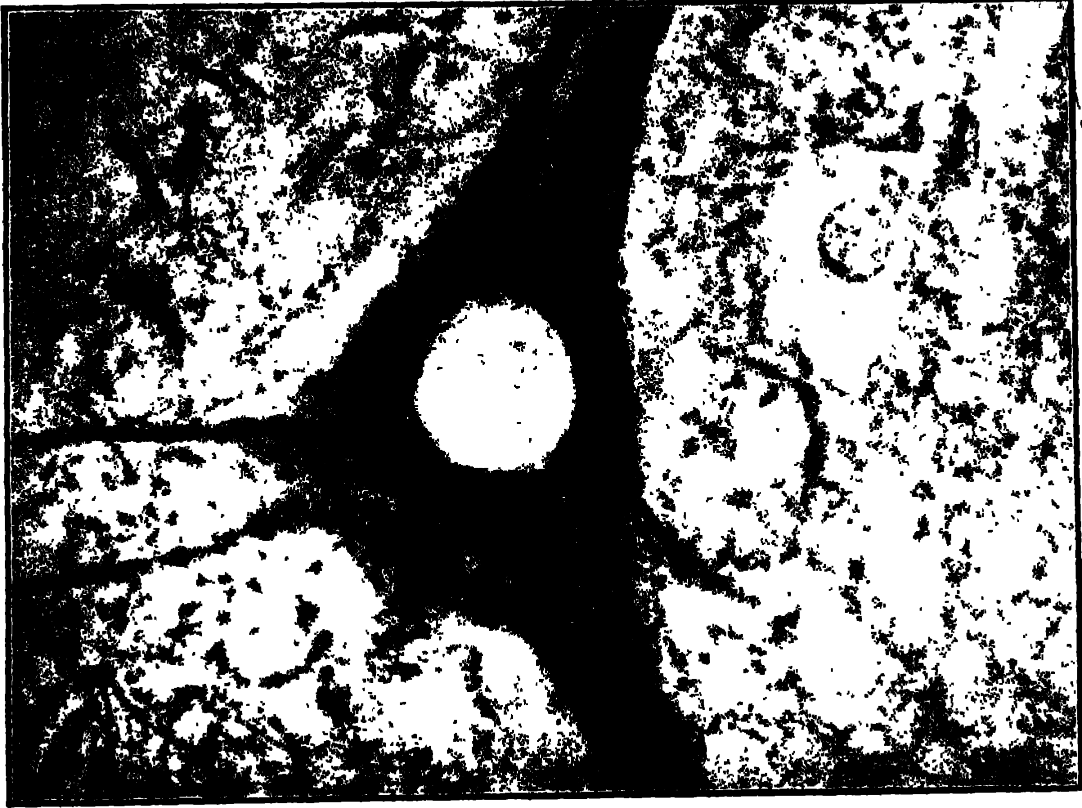
পৃথিবীতে এক মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবজন্তু দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের হাঁটিবার বা দৌড়িবার সময়ে আমরা যে ভারকেন্দ্র রক্ষা করিয়া থাকি, তাহার শক্তি এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কভাগেই নিহিত আছে।

Spinal cord বা মেরুমজ্জা যাহাকে বলে, তাহারও উপরের মোটা দিক্‌টাও ঠিক ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ভাগের নীচে মেরুমজ্জা এবং মস্তিষ্ককে যুক্ত করিয়া আছে। এই মজ্জা করোটিতে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ভাগের ঠিক্

নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া মেরুদণ্ড বা শির-দাঁড়ার মধ্য দিয়া বরাবর কটিদেশ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহার উপরের অংশটার বাহিরের দিকটা শাদা এবং ভিতরের অংশটা ধূসরবর্ণ স্নায়ুমজ্জা দ্বারা পরিপূর্ণ। ইহার নাম আয়তমজ্জা ইংরাজীতে বলে Medulla oblongata—মেডিউলা অবলঙ্গেটা।

এই আয়তমজ্জা আমাদের মানবদেহের জীবনী শক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট। ইহার এক জায়গায় হৃদযন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার মূলশক্তিরূপে অনেকগুলি স্নায়ুকোষ (Nervecells) রহিয়াছে এবং পারি না। যদি মজ্জার নিম্নদিকের অংশে আঘাত লাগে, তাহা হইলে হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায় এবং রক্তসঞ্চালন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে মৃত্যু হয়।

আমাদের দেশে অনেক সময় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের শাসন করিবার সময় কিংবা আদর করিবার সময় মস্তিষ্কের প্রতি আঘাত দেওয়া হয়। যেমন—শূন্যে তুলিয়া শিশুকে নাড়াচাড়া করা, ধপাস্ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া, কাণ মলা, মাথায় চাঁটি মারা, মাথায় আঘাত করা,



মস্তিষ্কের

রক্তবহা, নালীগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এই স্থানটির নাম Vital knot বা জীবন-গ্রন্থি। আয়ত মজ্জার উপরের দিকের অংশে আঘাত লাগিলেই আমাদের জ্ঞান লুপ্ত হয়। আমরা অজ্ঞান হইয়া পড়িলে আমাদের জ্ঞান লুপ্ত হয় বটে কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতে থাকে। ঐ সময় আমাদের অনুভব শক্তি মাত্র লোপ পায়। দেহের সহিত মস্তিষ্কের যোগ এই ভাবে ছিন্ন হইয়া যায় বলিয়াই আমরা আমাদের ইচ্ছানুসারে অঙ্গ চালনা করিতে অস্বাভাবিক ঝাকুনি দেওয়া হয়। এইরূপ কথনও করিতে নাই। এইরূপ আঘাতে হঠাৎ বিপদ ঘটে। এসব বিষয়ে প্রত্যেক অভিভাবকের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

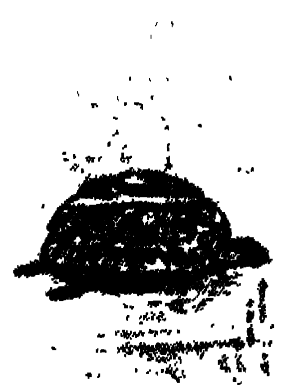
এখন বেশ বুঝিতে পারিলে যে, মানুষের জীবনের একমাত্র অবলম্বন, এক কথায় জীবন-কেন্দ্র হইতেছে, আমাদের মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্করূপ যন্ত্রের সাহায্যেই মানুষ পৃথিবীর উপর আপনার প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে ও করিতেছে।

ঘুমের দেশে









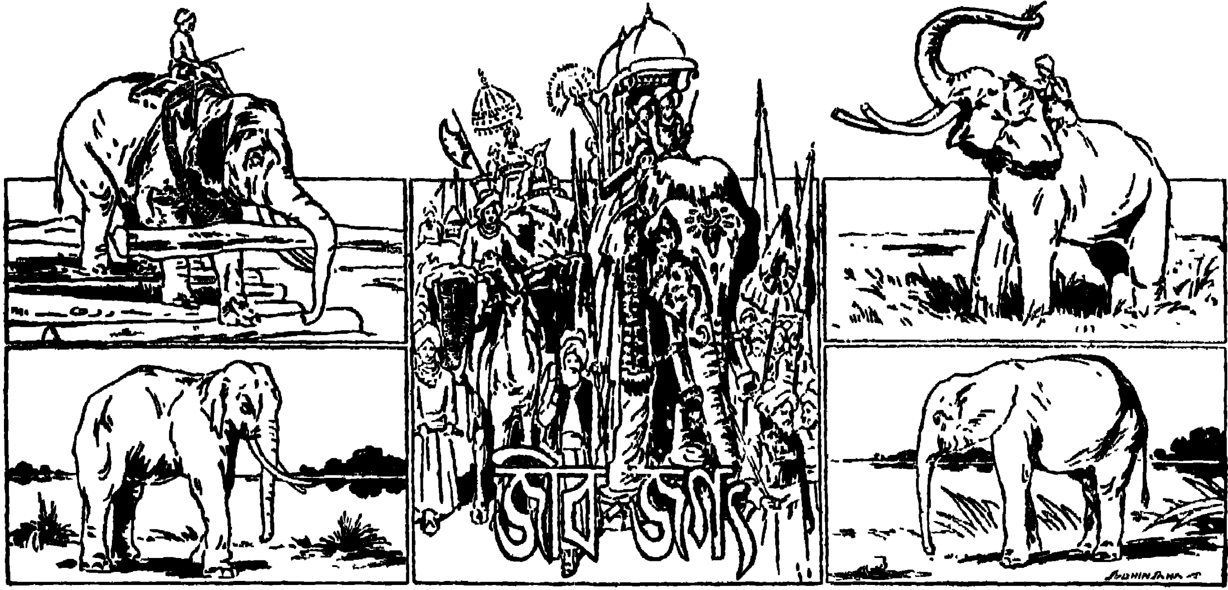









জীবজন্তুর নিদ্রা



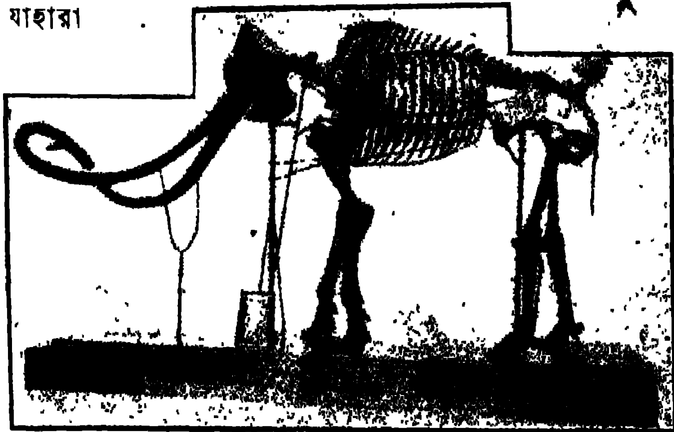
হস্তী

১৭৯৭ পৃষ্ঠার পর



হস্তী বা হাতীর কথা তোমরা সকলেই জান। হস্তীর সহিত ভারতবর্ষের লোকের পরিচয় নূতন নহে--বেদেও হাতীর কথা আছে। তারপর পুরাণে হস্তীর উৎপত্তির ইতিহাস আছে। সত্যযুগে দেবাসুরের যুদ্ধের সময় সমুদ্র-মন্থনে শ্বেতবর্ণ চতুর্দ্দন্ত ঐরাবত হস্তী উৎপন্ন হইয়াছিল। 'রামায়ণে' ঐরাবতের উল্লেখ আছে। 'মহাভারতে' যে "গজকচ্ছপের যুদ্ধের গল্প রহিয়াছে, তাহা তোমাদের মধ্যে যাহারা মহাভারত পড়িয়াছ, তাহারা সকলেই জান। প্রহ্লাদকে তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু হরি-ভক্তির জন্য হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও তোমাদের অজ্ঞাত নাই। তারপর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের হস্তে "কুবলয়াপীড়" নামক বিরাট্-দেহ হস্তীর মৃত্যু হইয়াছিল ইহাও তোমরা বোধ হয় পড়িয়াছ।

সংস্কৃত সাহিত্যে হস্তীর ত একেবারে ছড়াছড়ি। কালিদাস শুধু ভারতবর্ষের নন—পৃথিবীর মধ্যে একজন বড় কবি। তাহার লিখিত প্রায় সকল কাব্যেই হস্তীর কথা আছে। 'রঘুবংশ' কালিদাসের একখানা প্রধান কাব্য। এই কাব্যের এমন একটি সর্গ নাই, যেখানে কোন না কোন প্রসঙ্গে হস্তীর কথা না আছে। হস্তী চিকিৎসার কথা, হস্তীর লক্ষণ, আকৃতি ও প্রকৃতির পরিচয় আমাদের পুরাণ ও উপ-পুরাণগুলিতে অনেক রহিয়াছে। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন হস্তী ধরিতে খুব ভালবাসিতেন এবং হস্তী বশ করিবার মন্ত্রও তিনি জানিতেন। এবিষয়ে বেশ একটি সুন্দর গল্পও আছে। সে গল্পটিও তোমরা পড়িয়াছ। (শিশু ভারতী—১৫৯৩ পৃষ্ঠা)।

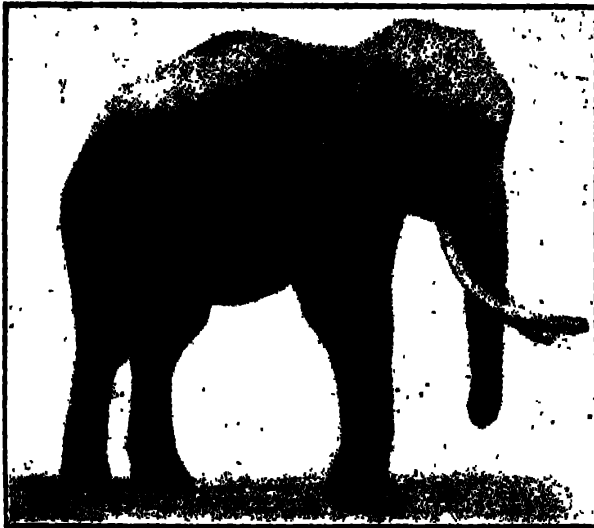


মাশ্‌টোডোনের কঙ্কাল - হাতীর পূর্ব্বপুরুষ

হস্তী, হস্তী নাম পাইল ভারতবর্ষ হইতে। হস্তী যাহার আছে, সে-ই হস্তী। হস্তীর শুণ্ড বা

শুঁড়টি মানুষের হস্তের ন্যায়, তাই তাহাকে বলা হয় 'হস্তী'। হস্ত বা শুণ্ড আছে বলিয়া যেমন হস্তীর নাম হস্তী, তেমনি বৃহৎ দন্ত আছে বলিয়া হস্তীর আর এক নাম 'দন্তী'। সংস্কৃত সাহিত্যে হস্তীর অনেক নাম আছে। তোমাদের কাছে কত নামই বা বলিব? তবু কয়েকটি নাম বলিলাম;—হস্তী, দ্বিরদ, গজ, বারণ, করী, কুঞ্জর, মহামৃগ, সূর্প-কর্ণ, সিন্ধুর ইত্যাদি। সংস্কৃত নামগুলির ব্যবহার বাঙ্গালাভাষায়ও প্রচলিত। বিদেশী লোকেরাও হাতীর নানা নাম দিয়াছে।

ব্রহ্মদেশে হাতীর নাম সেন, ওলিফাণ্ট, ওলন্দাজ (ডচ্) এলিফাস্, গ্রীক্ এলিফান্টিস্, ইতালি এলিফাস্ বা এলিফাণ্টাস্, লাটিন গজ বা বেরাম, মালয় ফেল, পারসিক ফ্রাইয়েল; নরওয়ে-সুইডেন্ এলিফান্টি, স্পেন গলা, সিংহলী আনি;

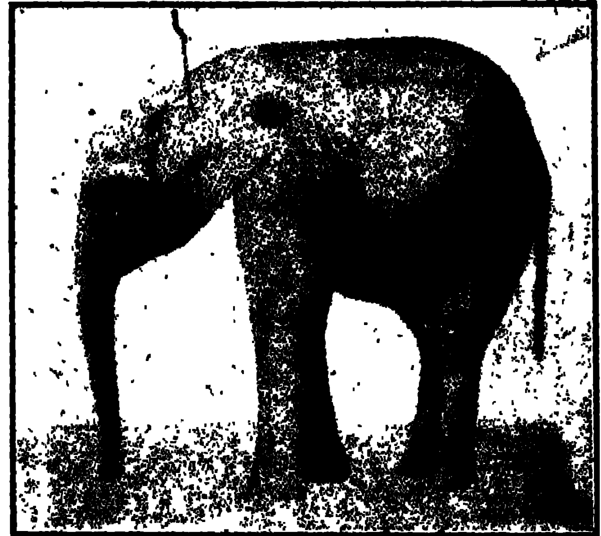


ভারতবর্ষের হস্তী

তামিল জেনি বা জেন্নুগ। ইংরাজী, ফরাসী জারমেণ ভাষায় হস্তীকে বলে এলিফেণ্ট (Elephant)। হিব্রু "এলেফ" (বলদ) হইতে উৎপন্ন, একথা অনেক পণ্ডিত বলেন। নামের ইতিহাস ত শুনিলে, এইবার অন্যান্য কথা শোন।

হস্তী এসিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে পাওয়া যায়। এই দুই মহাদেশেই হস্তীর বাস। কিন্তু এসিয়ার হাতী ও আফ্রিকার হাতীর আকারেও গঠনে অনেক কিছু তফাৎ আছে। ছবি দেখিয়া তাহা বুঝিয়া লও। এসিয়ার হস্তী সিংহল, ভারতবর্ষ, মালয় উপদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ এবং পূর্ব্ব উপদ্বীপের পাহাড়-পর্ব্বতে ও বন-জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যায়। সিংহল দ্বীপের সাত আট হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গেও হস্তী বিচরণ করে। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের চার পাঁচ হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গেও হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের পূর্ব্ব প্রান্তের গভীর বনে-জঙ্গলে, নেপাল, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পাহাড়ে ও বনে অনেক বন্য হস্তীর বাস।

হস্তীর উচ্চতা ৭ ফিট্ হইতে ১০ ফিট্ পর্যন্ত হয়। সিংহলের হাতী সচরাচর ৯ ফিট্ উচ্চ হয়, তবে কোন কোনটা ৯ ফিট্ হইতেও বেশী উচ্চ হইয়া থাকে। জাপানে একবার একটা হাতী ধরা পড়ে, তাহার উচ্চতা ছিল ১২ ফিট্ ১ ইঞ্চি। ভারতবর্ষের এবং সিংহলের অপেক্ষা অন্যান্য উপদ্বীপে হস্তীর সংখ্যা অনেক অধিক। গল্প আছে যে, পারস্যের শাহ-রুস



আফ্রিকার হস্তী

জার পিটার দি গ্রেটকে যে হাতীর কঙ্কাল পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উচ্চতা ছিল প্রায় ১২ হাত।

হস্তীর আকার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। প্রথম বৎসর ৩ ফিট ১০ ইঞ্চি, দ্বিতীয় বৎসর ৪ ফিট ৬ ইঞ্চি, ৩য় বৎসর, ৫ ফিট—এইভাবে হস্তীরা আঠার কিংবা চব্বিশ বৎসরে যতটা উচ্চ হয়, তাহা অপেক্ষা আর প্রায় উচ্চ হয় না।

বাঙ্গালাদেশের চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলের হস্তী সিংহলের হস্তী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাংশের, ব্রহ্ম এবং পেগু রাজ্যের হস্তী

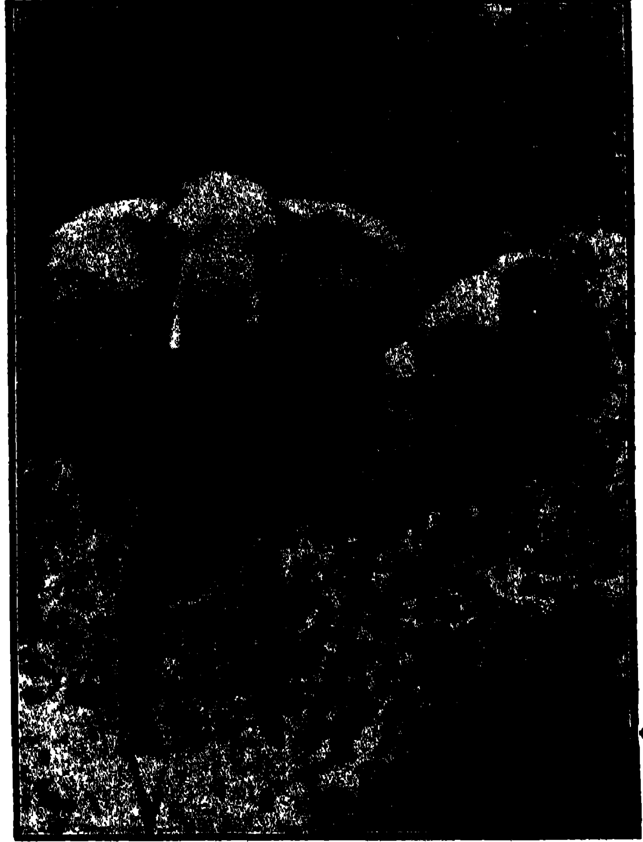
হইতেছে সবচেয়ে ভাল। সিংহলের গভীর জঙ্গলে হস্তীরা নির্ভয়ে বিচরণ করে। সিংহলে তিন শত চারি শত হস্তীর মধ্যে হয়ত একটি হস্তীর দাঁত দেখিতে পাইবে। সেখানে ছোট ছোট হস্তীরই দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়। হস্তী প্রায় আটটি করিয়া দল বাঁধিয়া যায়। দলে পঞ্চাশটি হইতে আশীটি পর্য্যন্ত থাকে। প্রত্যেক দলেই হস্তিনীর সংখ্যা অধিক। অনেক সময় দলে একটি হস্তীও দেখা যায় না। আবার কোন কোন দলে কেবল হস্তীই থাকে।

ব্রহ্ম এবং শ্যাম রাজ্যে শ্বেত হস্তীর পূজা হয়। ব্রহ্মদেশের রাজাব ও শ্যামদেশেব রাজাদের উপাধি হইতেছে শ্বেত হস্তিরাজ। রাজা কখনও শ্বেত হস্তীর উপর চড়েন না। ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে শ্বেত হস্তীব বড়ই আদর। মালা ও চন্দন দিয়া তাহাদিগকে সাজান হয়, সোণার শৃঙ্খলে তাহাদের বাঁধা হয়। শ্বেত হস্তী বড় সহজে মিলেও না। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ্যে একটি শ্বেত হস্তী পাওয়া যায়,—ঐ হস্তীটির উচ্চতা ছিল ১০ ফিট্। কিছুদিন আগে একটি শ্বেত হস্তীকে মহাসমারোহের সহিত ইংল্যাণ্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। পূর্ব্ব-মধ্য-আফ্রিকার ইনারিয়া নামক স্থানেও শ্বেত হস্তী পাওয়া যাইত।



ছবির দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মদেশের শ্বেত হস্তী

আফ্রিকার হস্তী যেমন বলশালী, দেখিতেও তেমনি সুদর্শন। ঐ দেশের হস্তী কোন কোনটি ১৪ ফিট্ ১২ ফিট্ এইরূপ উচ্চ হইয়া থাকে। গভীর বনের মধ্যে ইহারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। আফ্রিকার হাতীর কাণ ও শুঁড়ের সহিত এসিয়া



আফ্রিকার হস্তী—আফ্রিকার জঙ্গলে

বা ভারতবর্ষের হস্তীর কি কি পার্থক্য, তাহা ছবি দেখিয়াই বুঝিতে পারিবে।

এই হস্তিনীর পাশে তাহার শাবকটিকে খুবই সুন্দর দেখাইতেছে, না? হস্তি-শিশু স্তন পান করে, কিন্তু শুঁড় দিয়া করে না। হস্তী শুঁড় দিয়া খাদ্যদ্রব্য মুখে ফেলিয়া দেয়। শুঁড়, হস্তীর নাসিকা। শুঁড় একেবারে মাটি পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে। হস্তীর দেহ যে অতি প্রকাণ্ড এবং তাহার কাঁধটি যে তুলনায় কত ছোট, তাহা বুঝিতে কোন কষ্টই হয় না। হস্তীর মাথা নাড়িবার-চাড়িবার জো নাই, তাই সে আর কি করিবে, তাহার যাহা কিছু করিবার, তাহা শুঁড় দিয়াই করে। শুঁড় দিয়া তাহারা না করিতে পারে এমন কোন কাজ নাই। শুঁড়ের সাহায্যে যে কেবল তাহারা খায়, তাহা নহে, শুঁড় দিয়া তাহারা শত্রু দমন করে, শুঁড় দিয়া

তাহারা ডালপালা বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া পথ পরিষ্কার করে। এই শুঁড়ে তাহাদের অসীম শক্তি। হস্তী পড়ে। মনে হয়, যেন একেবারে রণমুখো হইয়াই আছে। তোমরা পথেঘাটে অনেক সময় বামন-বীর মানুষ দেখিতে পাও। কিন্তু বামন বীর অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্রাকার হস্তী দেখিয়াছ কি ? বোধ হয় দেখ নাই। আফ্রিকার কোন কোন স্থানে বামন-বীর হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। ছবিতে দেখ, বামন-বীর হাতীটি কেমন ভাবে তাহার মনিবকে আদর করিতেছে।



ভারতবর্ষের হস্তী ও হস্তিশাবক



বামন-বীর হাতী

হস্তীর বুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। হস্তীর প্রভুভক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্বন্ধে ত অসংখ্য গল্প রহিয়াছে। তোমরা বড় বড় শোভাযাত্রায়, সার্কাসে, শিকারে, হস্তী কেমন আশ্চর্য্য বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তাহা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইয়াছ। ঐ দেখ দেখি, কেমন সুন্দরভাবে হস্তীটি বাড়ী পরিষ্কার করিতেছে।

যখন কিছু শোনে, তখন তাহারা কাণ বিস্তার করিয়া দেয়। আফ্রিকার হাতীরা যদি কোনরূপ বিপদের আভাস পায়--যেমন কোনও শিকারীর আক্রমণ, কিংবা সিংহ ও অন্য কোনও হিংস্র প্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে, হস্তী এতটুকুও বিচলিত হয় না, লেজও নাড়ে না, কিংবা সেস্থান হইতে সহজে পলায়ন করে না, বরং অপূর্ব্ব সাহসিকতার সহিত এমন-ভাবে দাঁড়ায়, ভাবটা এইরূপ, যেন, এস না, ভয় কি ? একবার দেখে নেব, এই রকম! বড় বড় দাঁতওয়ালা হস্তীগুলি চলিবার সময় শুঁড় উঁচু করিয়া চলে। তাহাদের দাঁত দুইটি সম্মুখের দিকে ছড়াইয়া



হস্তী বাড়ী পরিষ্কার করিতেছে

হস্তী অপেক্ষা হস্তিনীর বুদ্ধি বেশী। 'আকবরনামা' বা মোগল বাদশাহ আকবরের জীবনচরিতে একটি

গল্প আছে যে, একবার সম্রাট আকবর শিকারে যাইয়া বনের মধ্যে একটি হস্তিনী মরিয়া আছে, এইরূপ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন সেখানে যাইয়া দেখিলেন যে, সেই হস্তিনীটি তথায় নাই। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সম্রাট ও তাঁহার সঙ্গের শিকারীদিগকে দেখিয়াই হস্তিনীটা মড়ার মত পড়িয়াছিল।

হস্তিনী অষ্টাদশ মাস হইতে বিংশতি মাস পরে একটি শাবকই প্রসব করে। সাধারণতঃ হস্তী ৬০ বৎসর বয়সে পূর্ণাবয়বসম্পন্ন হয়। হস্তিনী ত্রিশ বৎসর বয়সে পূর্ণাবয়বসম্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্ণাবয়বসম্পন্ন হইলে হস্তীর কর্ণ বৃহৎ এবং গোলাকার হয়। চক্ষু দুইটি ঈষৎ পাণ্ডুল বর্ণের হয়, কোন প্রকার দাগ উহাতে থাকে না। শুঁড়ের উপরে এবং জিহ্বায় বড় একটা দাগ থাকে না। শুঁড় বৃহৎ এবং লেজের লোমগুলি প্রায় ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকে। সম্মুখের পায়ে প্রত্যেকে পাঁচটি করিয়া এবং পশ্চাতের পায়ে প্রত্যেকে চারিটি করিয়া মোট আঠারটি নখ থাকে। হস্তী ১২০ বৎসর হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর বাঁচে।



আফ্রিকার একটা হস্তী কাণবিস্তার করিয়া শুনিতেছে

ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতেই হস্তী ধরিবার নানা কৌশল প্রচলিত আছে। তাহার মধ্যে কয়েকটি প্রধান। যথা (১) খেদা, (২) গাদ, (৩) বার।



আফ্রিকার এক একটি হস্তী একবারে চৌদ্দ গ্যালন জল পান করে

খেদা—গ্রীষ্মকালে শিকারীরা যে বনে হস্তীর দল বিচরণ করে, সেখানে যাইয়া ঢাক, ঢোল ও ভেঁপু বাজাইতে থাকে। তাহাতে হস্তিযূথ ভীত হইয়া পড়ে এবং এদিকে ওদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে।



এস না! ভয় কি?

এইরূপভাবে দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন পাকা শিকারীরা গাছের ছাল বা পাটের তৈয়ারী দড়ি হস্তীর গলায় বা পায়ে বাঁধিয়া



দীর্ঘদন্ত হস্তী

দেয়। পরে শিক্ষিত হস্তীর সাহায্যে ঐ সকল বন্যহস্তীকে মানুষ বশ করিয়া ফেলে।

গাদ—যেখানে হস্তিযূথ বিচরণ করে, সেখানে গর্ত্ত করিয়া রাখা হয়। সেই গর্ত্ত ঘাসে পূর্ণ থাকে। শিকারীরা জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্যভাবে লুকাইয়া থাকে এবং ঝোপের মধ্য হইতে শব্দ করিতে থাকে। শব্দ শুনিয়া হস্তিগণ অসাবধানে দৌড়াইয়া যাইতে যাইতে কোন না কোন গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং উচ্চৈঃ-স্বরে চীৎকার করিতে থাকে। গর্ত্তের ভিতরে কোন-রূপ খাদ্য দেওয়া হয় না। ফলে, হস্তীটি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং আপনা হইতেই বশে আসে।

বার—শিকারীরা হস্তীর চলাচলের স্থান বুঝিয়া একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত করে। সেই গর্ত্তের একদিকে একটা পথ থাকে, পথের মুখে একটা দরজা বসান থাকে। দরজা দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। দড়ি কাটিলেই দরজা বন্ধ হইয়া যায়। দরজার কাছে হস্তীর অনেক খাদ্যাদি থাকে। হস্তীযূথ যেমন খাদ্যের লোভে দরজার ভিতর প্রবেশ করে, শিকারীরা তখন দড়ি কাটিয়া ফেলে, দরজাও তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। তখন বন্দী হস্তীগুলি বিকট চীৎকার করিতে থাকে। এদিকে শিকারীরাও আগুন জ্বালিয়া, বাদ্য বাজাইয়া হল্লা করে। ক্রমে হস্তীগুলি যখন দৌড়াদৌড়ি ও চীৎকার করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সেই সুযোগে শিকারীরা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে।

হস্তীর ব্যবহার অনেক দিন হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত। হস্তী আরোহণের জন্যও যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি যুদ্ধেও এক সময়ে হস্তীর ব্যবহার হইত। সেকালে ভারতের নৃপতিরা হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শিকার করিতেন, যুদ্ধ করিতেন এবং শোভা-যাত্রার সময় হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই নগর পরিভ্রমণ করিতেন। হস্তীর বলও অসাধারণ। বড় বড় গাছ সরাইতে, জাহাজ জলে ভাসাইতে এক সময়ে হস্তীর সাহায্য লওয়া হইত। এখনও ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে হস্তী-দিগকে এই সকল কাজে লাগান হয়।

হস্তীর শরীর যেমন বৃহৎ, তাহার আহারও তেমনি আশ্চর্য্য ব্যাপার। সাধারণতঃ একটা হাতী একমণ চাউল এবং সাড়ে তিন মণ জল পান করিতে পারে। এইজন্যই কথায় বলে "হাতী-পোষা"। ধনবান্ ব্যক্তি ব্যতীত



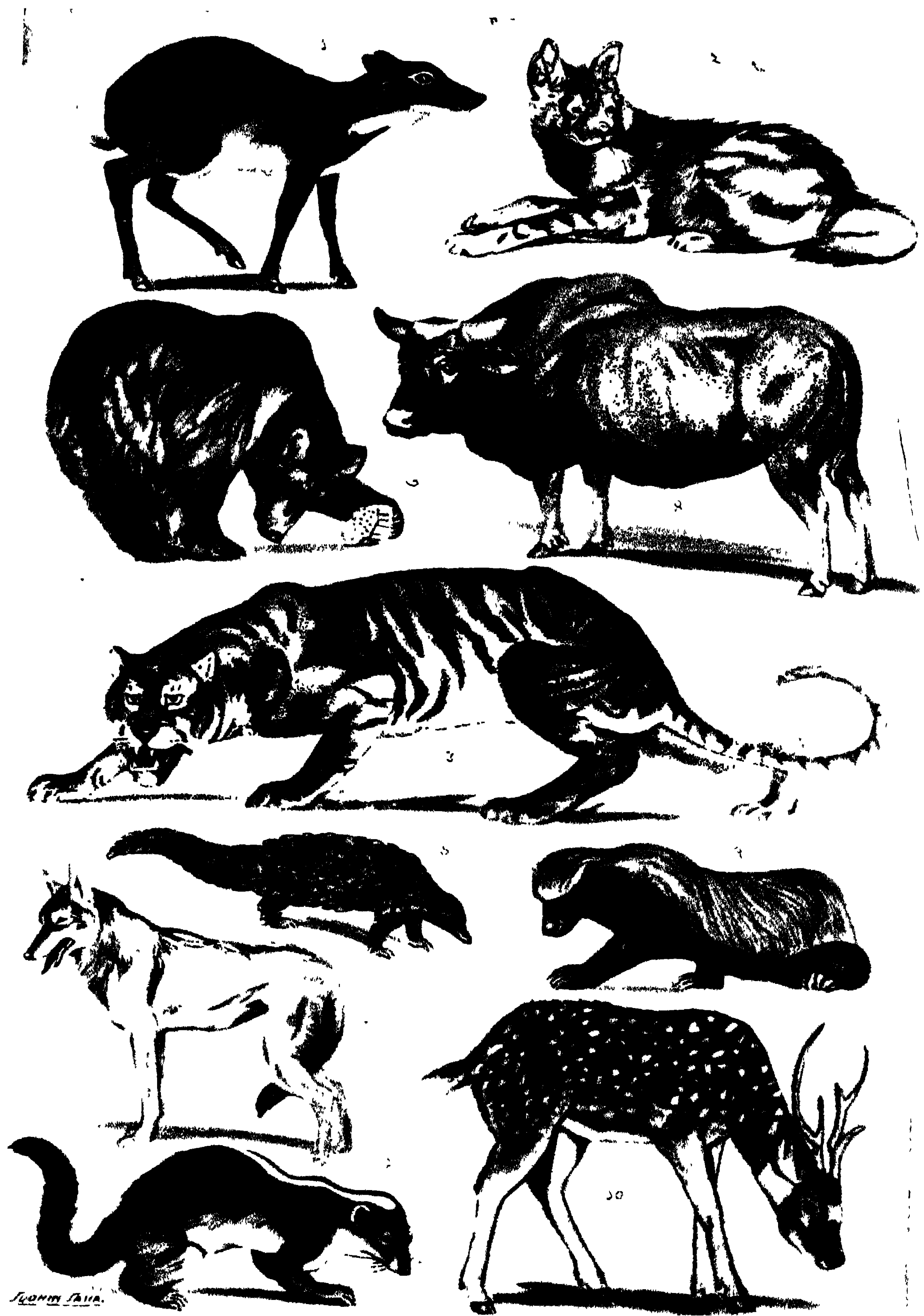
দাঁতাল হস্তী

যে সে লোক হাতী পুষিতে পারে না। এই জন্যই হস্তী ভাগ্যবান্ ব্যক্তির সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

প্রত্যেক মহাদেশেই নানা বিভিন্ন প্রকারের জীব জন্তু দেখা যায়। এখানে এসিয়ায় যে সকল জন্তু-জানোয়ার দেখা যায়, তাহাদের কতকগুলির রঙিন চিত্র দেওয়া হইল।



(১) কৃষ্ণ ভল্লুক—হিমালয় (২) গণ্ডার—আসাম (৩) ওরাংওটাং—বর্ণিও (৪) কাঁকড়াভোজী বানর (৫) বড় কাঠবিড়ালী (৬) গিবন (৭) টাপির—মালয় দেশ (৮) হনুমান (লালমুখ) (৯) তুপাই—বোর্ণিও (১০) শুশুক



(১) [illegible] (২) [illegible] (৩) [illegible] (৪) [illegible] (৫) বাঘ (৬) [illegible] (৭) [illegible]
(৮) নেকড়ে বাঘ [illegible] (৯) [illegible] (১০) চিত্রা হরিণ



সাঁওতালদের রূপকথা

[১৯০৫ পৃষ্ঠার পর]

[সাঁওতালেরা মুণ্ডা জাতির অন্তর্ভুক্ত। বোধ হয়, ইহারা ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব সীমা দিয়া ভারতে আসিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে সাঁওতালেরা বেশীর ভাগ ছোটনাগপুরের পূর্ব্বদিকে বাস করে। পূর্ব্বে তাহারা শিকার করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত এবং জঙ্গলের মধ্যেই বাস করিত। এখন তাহারা চাষবাস করিয়া খায়। মুণ্ডা এবং হোদের মত সাঁওতালেরা খুব আমোদপ্রিয়,—নাচিয়া গাহিয়া, আমোদপ্রমোদ করিয়া দিন কাটাইতে চাহে। ইহাদের সামাজিক ব্যবস্থা অতি সুন্দর। প্রত্যেক গ্রামে একজন মাঝি বা সর্দ্দার থাকে। মাঝি গ্রাম শাসন করে, অন্য কয়েকজন সহকারীর সাহায্যে। তাহাদের কাহারো নাম পারাণিক, কাহারো বা যোগ মাজ্ঝ। সাঁওতালেরা ভূত-প্রেতের উপাসক। ইহাদের প্রধান দেবতার নাম বোঙ্গা। বোঙ্গা বা ভূত তাহারা সর্ব্বত্রই দেখিতে পায়। গাছের গায়ে, পাহাড়ের গায়ে,—সকল জায়গায়ই বোঙ্গা আছে। সন্ধ্যাবেলা সাঁওতাল বালক-বালিকারা গ্রামের বৃদ্ধদের কাছে বসিয়া গল্প শোনে। এই সকল গল্পে কোনও বিদেশী প্রভাব আসিয়াছে, বলিয়া মনে হয় না। তবুও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সব গল্পের সহিত বৌদ্ধজাতকের, কথাসরিৎসাগরের এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত অনেক গল্পের সাদৃশ্য রহিয়াছে। কি ভাবে এইরূপ সাদৃশ্য আসিল, তাহাই আশ্চর্য্য বটে। এখানে দুইটি সাঁওতালী গল্প দেওয়া হইল।]

[১]

কারা ও গুজা

এক গ্রামে কারা ও গুজা নামে দুই ভাই বাস করিত। এই দুই ভাই ছিল খুব ভাল শিকারী। তাহাদের মত তীর ছুঁড়িতে সে সময়ে বড় কেহই একটা ছিল না। যেদেশে তারা দুই ভাই বাস করিত, সে গ্রামের কাছে একটা ছোট পাহাড়ের উপর বাস করিত দুইটি বড় চিল। এই চিল দুইটির যন্ত্রণায় সে গ্রামেরই শুধু নয়, সে অঞ্চলেরই ছোট ছোট শিশুদের বাঁচান দায় হইয়া উঠিয়াছিল। চিল-দম্পতী তাহাদের বাচ্চাগুলিকে খাওয়াইবার জন্য প্রতিদিন এক একটি ছোট শিশুকে চুরি করিয়া তাহাদের বাসা—সেই পাহাড়ের উপর বৃক্ষ-কোটরে লইয়া যাইত। এই জন্য ঘরে ঘরে পুত্রহারা জননীদের ও পিতার মুখে হাহাকার জাগিয়া উঠিয়াছিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গ্রামের লোকেরা শত চেষ্টা করিয়াও এই চিল-দম্পতীকে মারিতে পারে নাই। ক্রমে গ্রামগুলি একেবারে শিশু-শূন্য হইয়া পড়িল। তখন গ্রামবাসী পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলে মিলিয়া রাজার কাছে যাইয়া তাহাদের দুঃখের বার্ত্তা জানাইল।

রাজা ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি এই চিল-দম্পতীকে বধ করিতে পারিবে, তাহাকে তিনি দিবেন এক মস্ত গ্রামের জমিদারী আর নগদ দুইশত টাকা পুরস্কার। কত লোকে চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই সফলকাম হইতে পারিল না।

রাজার ঘোষণার কথা যখন কারা ও গুজার কাণে আসিল, তখন তাহারা দুই ভাই পণ করিল, যেমন করিয়াই হউক, এই চিল-দম্পতীকে মারিতে হইবে।

কয়েক দিন চিল-দম্পতীর গতিবিধির খোঁজ লইয়া তাহারা দেখিতে পাইল যে, পাখী দুইটি বাসা হইতে বাহির হইয়া গঙ্গাযমুনার সঙ্গম স্থলের দিকে উড়িয়া ছোট ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। কত দিন চলিয়া গেল, পাখীরা আর তাহার কাছাকাছিও আসে না। এক দিন যেমন পাখী দুইটি ঝোপের অল্প একটু



চিল-দম্পতী প্রতিদিন এক একটি ছোট শিশুকে চুরি করিয়া লইয়া আসিত



কারা ও গুজা তাহাদের অপূর্ব্ব লক্ষ্য দ্বারা…পাখী দুইটিকে মারিয়া ফেলিল

যায়, আবার সেদিক্ হইতেই ফিরিয়া আসে। এইরূপ সন্ধান পাইয়া তাহারা গঙ্গা ও যমুনার ধারে একটা উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল, অমনি কারা ও গুজা তাহাদের অপূর্ব্ব লক্ষ্য দ্বারা তীর ছুঁড়িয়া পাখী

দুইটিকে মারিয়া ফেলিল। পাখী দুইটি মাটিতে যেখানটায় পড়িল, সেখানে হইয়া গেল গভীর একটা খাদ। মৃত পাখী দুইটিকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইবামাত্রই তিনি কারা ও গুজাকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত জমিদারী দান করিলেন। গ্রামের লোকেরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কারা ও গুজার জমিগুলি চাষবাস করিয়া তাহাদিগকে প্রচুর শস্যোৎপাদন করিয়া দিল।

কারা, গুজা দুই ভাই কিন্তু গ্রামে থাকে না। তাহারা থাকে গভীর বনে। সেখানে তাহারা কখনও শিকার করিয়া পশুর মাংস খাইয়া জীবনধারণ করে, কখনও বা বনের ফল সংগ্রহ করিয়া খায়, কখনও বা ভাত রাঁধিয়া কিংবা বনের শিকড় ও মূল সিদ্ধ করিয়া খাইয়া দিন কাটায়। একদিন তাহারা বনের এক নিভৃত ভাগে বসিয়া রান্না করিতেছে, এমন সময় এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত!

বাঘ বলিল, "তোমরা কি রাঁধিতেছ? যদি আমাকে কিছু খাবার না দেও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে খাইয়া ফেলিব।" কি আর করে? কাজেই, তাহারা দুই ভাই প্রত্যহ তাহাদের খাবার হইতে কিছু না কিছু বাঘের গুহার মধ্যে ফেলিয়া দিত। বাঘও খাবারের লোভে সেই বন আর ছাড়িয়া যাইত না। কারা ও গুজা এই দুষ্ট বাঘের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল।



একদিন তাহারা বনের এক নিভৃত ভাগে বসিয়া রান্না করিতেছে, এমন সময় এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত!

একদিন বাঘটা যেমন শুইয়া আছে, এমন সময় তাহারা দুই ভাই তাহার ল্যাজ ধরিয়া এমন জোরে মোচড়াইতে লাগিল যে, বাঘের ল্যাজটা একেবারে খসিয়া পড়িল। নিরুপায় হইয়া বাঘ প্রাণভয়ে দৌড়াইতে লাগিল, কিন্তু কারা ও গুজা ত আর সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহারাও পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া বাঘটাকে তীর দিয়া মারিয়া ফেলিল এবং বাঘের মাথাটা কাটিয়া সঙ্গে রাখিল।

একদিন তাহারা দুই ভাই একটা বটগাছের তলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল যে, একজন রাজা বিবাহ করিবার জন্য শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছেন। তাহারা দুই ভাই ইহা দেখিতে পাইয়া গাছের উঁচু ডালে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। রাজা ও তাঁহার সঙ্গের লোকেরা ঐ বটগাছের তলায় আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। রাজা পাল্কী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া গাছের ছায়ায় শুইয়া পড়িলেন।

এদিকে হইল মহা বিপদ। কারার হাতে ছিল বাঘের মাথাটা। অত বড় একটা বোঝা আর কত কাল ধরিয়া রাখা যায়? কারা বলিল, "ভাই গুজা, তুমি যদি বাঘের মাথাটা না ধর, তাহা হইলে যে আর পারি না, হাত যে অবস হইয়া যাইতেছে।" গুজা বলিল, "বাঘের মাথাটা দিয়া কি-ই বা আর কাজ হইবে, ওটা ফেলিয়া দিলেই ত আপদ চুকিয়া যায়।" যেমন বলা, অমনি কারা দিল মাথাটা ফেলিয়া। মাথাটা গিয়া পড়িল কিনা, গাছের

তলায় ঘুমন্ত রাজার মাথায়! রাজার মাথা ভাঙ্গিয়া গেল। রাজার লোকেরা এই আকস্মিক বিপদে বিব্রত হইয়া পড়িয়া যে যেদিকে পারিল, ছুটিয়া পলাইল। কিছু দূরে যাইয়া রাজার লোকেরা ভাবিল, কাজটা ত ভাল হইল না! জিনিষপত্র সবই ত বটগাছের তলায় পড়িয়া রহিয়াছে! তাহারা সেগুলি লইবার জন্য ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইল, মূল্যবান, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধনরত্ন কিছুই সেখানে নাই। তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

[৩]

আসল ব্যাপারটা হইয়াছে কি, এই সুযোগে কারা ও গুজা গাছের তলা হইতে সমুদয় মূল্যবান জিনিষপত্র লইয়া গাছের উপর রাখিয়া দিয়াছিল। কারা একটা মস্তবড় ঢাকও সেই সঙ্গে গাছের উপর লইয়া গিয়াছিল। ঢাকটার একদিকে বড় বড় ছিদ্র করিয়া দুই ভাই মিলিয়া গাছের একটা ডগায় ভীমরুলের যে একটি বাসা ছিল, সেই বাসাটা ভাঙ্গিয়া আনিয়া ঢাকের ছিদ্রকরা দিকটা দিয়া উহা ঢাকের ভিতরে রাখিয়া দিল।

রাজার লোকেরা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। হঠাৎ তাহাদের নজর পড়িল গাছের উপর। সেখানে কারা ও গুজা দিব্য আরামে পা দোলাইয়া বসিয়াছিল।

রাজার লোকেরা বলিল, "তোমরা কে? নিশ্চয় তোমরাই আমাদের রাজাকে মারিয়া ফেলিয়াছ। আমরা তোমাদের মারিয়া ফেলিব।"

কারা ও গুজা দুই ভাই কহিল, "ভারী ত গুমর! দেখা যাবে কে কাকে মারে? এস না একবার কাছে।"

রাজার লোকেরা কারা ও গুজার দিকে বন্দুক ছুড়িল, তীর ছুড়িল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একে একে তাহাদের গোলা, বারুদ, তীর সব নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন কারা ও গুজা বলিল, "এইবার কিন্তু আমাদের পালা।" তখন তাহারা দুই ভাই খুব জোরে ঢাক পিটিয়া বলিল, "ভাই সব! এইবার রাজার লোকদের গায়ের উপর যাইয়া পড়।" আর যায় কোথায়? ঢাকের ছিদ্রের ভিতর হইতে পালে পালে সব ভীমরুল বাহির হইয়া আসিল এবং রাজার লোকদের কামড়াইতে আরম্ভ করিল। ভীমরুলের কামড় ত আর যে সে কামড় নহে। ভীমরুলের সেই ভীষণ দংশন হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহারা সব পলাইয়া গেল। কারা ও গুজা দুই ভাই তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল।



ভাই সব! এইবাব রাজার লোকদের গায়ের উপর যাইয়া পড়

এইবার কারা ও গুজাকে আর কে পায়! রাজা ও তাহার দলের লোকদের পরিত্যক্ত তৈজসপত্র ও ধনরত্ন পাইয়া তাহারা তাহাদের রাজার দেওয়া জমিদারীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিল। এখন হইতে কারা ও গুজাই হইল সে অঞ্চলের রাজা।

দানশীল রাজা

এক দেশে ছিলেন এক রাজা, তেমন দানশীল রাজা আর হয় না। তাঁহার কাছে যে যা চায়, তাই সে পায়। একদিন এক সন্ন্যাসী আসিয়া চাহিলেন তাঁহার রাজ্য। রাজা আর কি করেন, অমনি বিনা ওজরে সন্ন্যাসীকে রাজ্য দান করিয়া নিজে রাণী ও দুইটি ছেলে নিয়ে এক বস্ত্রে সকলে পথে বাহির হইলেন।

বড় কষ্টে এখন তাঁহাদের দিন চলে। যেদিন ভিক্ষা জোটে, সেদিন দুইটি ভাত রাঁধিয়া খান, যেদিন ভিক্ষা জোটে না সেদিন থাকেন অনাহারে। এদিকে পরিবার কাপড়ও হইয়াছিল শত ছিন্ন।

একদিন তাঁহারা শুনিলেন যে, এক-দেশের এক ধনী বণিক্ গরীব, দুঃখী ও ভিখারীদের নূতন বস্ত্র দান করেন। তাঁহারা সে দেশে যাইয়া গ্রামের এক পাশে একটা গাছের তলায় আশ্রয় লইলেন। রাণী পথে ভিক্ষা করিয়া যে দুই মুষ্টি চাউল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা দিয়া ভাত রাঁধিলেন এবং ছেলে দুইটিকে ও রাজাকে খাওয়াইয়া সেই ধনী বণিকের কাছে কাপড় চাহিতে চলিলেন। রাজা ছেলে দুইটিকে লইয়া গাছতলায় রহিলেন রাণীর অপেক্ষায়। এদিকে হইয়াছে কি, রাণীকে দেখিয়া সেই ধনী বণিকের মনে দুষ্টবুদ্ধি জাগিল। সে চাহিল রাণীকে বিবাহ করিতে। রাণী দেখিলেন মহা বিপদ! তখন তিনি করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন, হে দয়াল ঠাকুর! আমাকে জরাগ্রস্ত কর। ঠাকুর রাণীর করুণ মিনতি শুনিলেন; সেই মুহূর্তেই রাণী কুৎসিত ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তবু কিন্তু বণিক্ তাঁহাকে ছাড়িল না। কি আর করেন, বাধ্য হইয়া বণিকের বাড়ীতে বন্দিনী হইয়া রহিলেন।

[২]

রাজা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন—কিন্তু রাণী আর ফিরিলেন না। গাছতলায়ও ত আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা চলে না। কাজেই, তিনি ছেলে দুইটিকে লইয়া পথ চলা সুরু করিয়া দিলেন। চলিতে চলিতে তাঁহারা এক নদীর পাড়ে আসিলেন। সে নদীতে তখন বন্যা আসিয়াছিল। রাজা একটি ছেলেকে নদী সাঁতরাইয়া ওপারে রাখিয়া আবার অন্য ছেলেটিকে লইবার জন্য যেমন নদী পার হইতেছিলেন, এমন সময় স্রোতের বেগে তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। কাজেই, নদীর দুই পাড়ে ছেলে দুইটি পড়িয়া রহিল।



এমন সময় স্রোতের বেগে তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল

বন্যা থামিয়া যাওয়ার পর এক গোয়ালিনী নদীতে জল আনিতে আসিয়া দেখিল, নদীর দুই পাড়ে দুইটি সুন্দর ছেলে কাঁদিতেছে; দেখিয়া তাহার বড় দয়া হইল। সে নিজেও ছিল নিঃসন্তান; কাজেই, বিধাতার দান মনে করিয়া পরম সমাদরের সহিত সে ছেলে দুইটিকে বাড়ী লইয়া গেল।

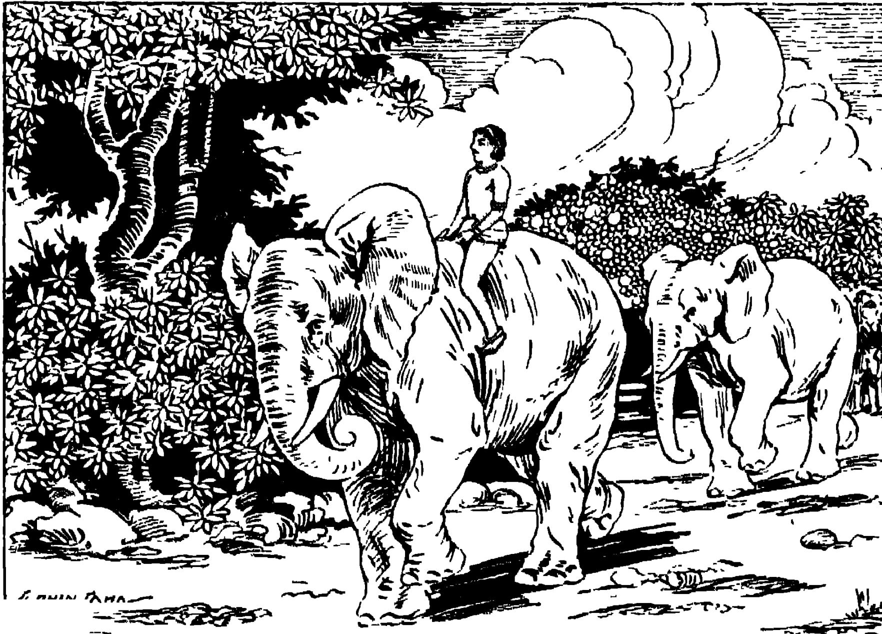
[৩]

রাজার কথা শোন। রাজা স্রোতের বেগে ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূরে যাইয়া নদীর পাড়ে উঠিলেন। তাঁহার সারা শরীর ছড়িয়া গিয়াছিল। রাজা নদীর পাড়ে যেখানটায় উঠিয়াছিলেন, সেখানে দেখিলেন ভয়ানক জনতা, বহু লোকজন মিলিত হইয়া সোরগোল করিতেছে। তিনি কৌতূহলী হইয়া জনতার এক পাশে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ব্যাপারটা কি হইয়াছে জান? সেদেশের রাজার মৃত্যু হইয়াছে। রাজা ছিলেন নিঃসন্তান। তাই রাণীমা ঘোষণা করিয়াছেন রাজহস্তী যাহাকে পিঠে তুলিয়া লইবে, সে-ই হইবে—এ রাজ্যের রাজা।

রাজা ছিন্নবস্ত্রে উস্কুখুস্কু চুলে জনতার মধ্যে বসিয়াছিলেন। তাঁহার গা বহিয়া ক্ষতস্থান হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিতেছিল। কেহই তাঁহার দিকে বড় একটা লক্ষ্য করে নাই। কাহার ভাগ্য খুলিবে, কে রাজা হইবে, সকলে সেই ঔৎসুক্য লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল।

রাজবাড়ীর হাতী দুইটি জনতার মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল, কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিল না। সেই যে জীর্ণ চীরপরা রাজা বসিয়াছিলেন সেখানে আসিয়া হাতীটি উপস্থিত হইল। একটি হাতী তাহার কাছে যাইয়া, রাজার গলায় সোণার হার পরাইয়া দিল। অপর হস্তীটি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পৃষ্ঠে তুলিয়া রাজধানীর দিকে চলিল। জনতা তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে নূতন রাজার জয়! নূতন রাজার জয়! শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়া চলিল। রাজা যেমন সিংহাসনে বসিলেন, অমনি তাঁহার শরীরের সব ব্যথা বেদনা এবং ক্ষত চিহ্ন সারিয়া গেল।



হস্তীটি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পৃষ্ঠে তুলিয়া রাজধানীর দিকে চলিল

[৪]

বৎসরের পর বৎসর কাটে। রাজার ছোট দুইটি ছেলে এখন বেশ বড় হইয়াছে। গোয়ালিনীকেই তাহারা দুই ভাই তাহাদের মা বলিয়া জানে। গোয়ালিনী অত্যন্ত গরীব, অতি কষ্টে তার দিন চলে। কাজেই, দুই ভাই কোথাও কোন কাজ কর্ম্ম জোটে কিনা, সেইজন্য বাহির হইয়া পড়িল।

দৈবের ঘটনা। তাহারা দুই ভাই এই নূতন রাজার অধীনে সিপাহীর কাজ পাইল। এই রাজাই যে তাহাদের পিতা, সেকথা ত আর তাহারা জানে না।

নূতন রাজা, রাজা হইবার পরেই রাজ্য জুড়িয়া এক উৎসবের আয়োজন করিলেন। সেই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য নানা দেশ-বিদেশ হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। সেই যে বণিক্— সেও রাণীকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে



আমি যদি সতীসাধ্বী হইয়া থাকি তাহা হইলে আমাকে রোগমুক্ত করিয়া আমার পূর্ব্ব রূপ ফিরাইয়া দেও

আসিয়াছিল। তাহার মনে এই ইচ্ছা ছিল যে, এই উৎসব উপলক্ষে হয়ত এমন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক আসিবেন, যাঁহার সাহায্যে হয়ত বা রাণীর রোগ দূর করিতে পারিবে।

বণিক্ রাজধানীতে পৌঁছিয়াই রাজাকে বলিল যে, তাহার সঙ্গের স্ত্রীলোকটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যদি তিনি দুইজন সিপাহী দেন, তবে বড়ই ভাল হয়। রাজা, তাঁহারই ছেলে সেই নবনিযুক্ত দুই সিপাহীর উপর সেই ভার দিলেন। আপনার মায়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভারই পড়িল, তাহাদের দুই ভাইয়ের উপর। কিছুকাল পরে মা সন্তানদের চিনিতে পারিলেন। সন্তানেরাও মাকে পাইয়া আনন্দে অধীর হইল। রাণী যখন ছেলেদের মুখে শুনিলেন, রাজা নদীর জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন, তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে আকুল হইয়া পড়িলেন।

বণিক্, রাণীর এইরূপ করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া রাজার নিকট যাইয়া অভিযোগ করিল যে, সিপাহী দুইজন নিশ্চয়ই তাহার সঙ্গের স্ত্রীলোকটির প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছে, নতুবা সে এইরূপ ভাবে কাঁদিবে কেন?

বণিকের কথা শুনিয়া রাজা স্বয়ং প্রকৃত ব্যাপারটার অনুসন্ধানের জন্য সেখানে আসিলেন এবং দেখিবামাত্রই তাঁহার দুঃখিনী রাণীকে চিনিতে পারিলেন। রাণীও রাজাকে চিনিতে পারিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর! আমি যদি সতীসাধ্বী হইয়া থাকি তাহা হইলে আমাকে রোগমুক্ত করিয়া আমার পূর্ব্ব রূপ ফিরাইয়া দেও।" — দেবতার বরে রাণী আবার পূর্ব্বের রূপ ফিরিয়া পাইলেন। বণিক্ বিস্মিত হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

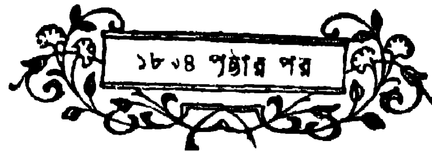
এইভাবে রাজা ও রাণী এবং তাঁহাদের দুই পুত্রের মিলন হইল। এমন যে দুষ্ট বণিক্ তাহাকেও এই শুভমিলনের আনন্দে রাজা ও রাণী এবং তাঁহাদের দুই পুত্র ক্ষমা করিলেন।

তারপর—তারপর আর কি?

সকলে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।



প্রাচীন ভারতের সামাজিক অবস্থা বৌদ্ধশাস্ত্র


১৮৩৪ পৃষ্ঠার পর

বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে চারি প্রকার জাতি ছিল এবং ইহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়জাতির স্থান সর্ব্বপ্রথমে। তাহার পর ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র। ইহা ব্যতীত আরও দুইটি হীনজাতীর উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা—চণ্ডাল এবং পুক্কুস। কোন কোন বৌদ্ধ পুস্তকে গৃহপতির উল্লেখ আছে। গৃহপতি এবং বৈশ্য একই জাতি। হিন্দু সাহিত্যে ব্রাহ্মণদিগের স্থান সর্ব্বপ্রথমে। তাহার পর ক্ষত্রিয়দের স্থান। প্রাচীন ভারতে জাতের প্রাধান্য খুব অধিক ছিল না। উচ্চশ্রেণীর এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিবাহ হইত। জাতকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাশীর রাজা একজন নিম্নশ্রেণীর সুন্দরী স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ প্রকার পেশা বা কার্য্য ছিল না; তাহারা সকল কার্য্যই করিত। ছুতার এবং ধনুকধারীর কাজও তাহারা করিত।

জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার জন্য তখনকার লোকেরা যে সকল কার্য্য করিত, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। জ্যোতিষ বিদ্যা, ২। লক্ষণ বিদ্যা (অর্থাৎ শরীরের চিহ্ন দেখিয়া ভবিষ্যৎ বলা), ৩। অগ্নিহোম, ৪। অঙ্গবিদ্যা, ৫। বাস্তুবিদ্যা (গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ভাল স্থান ঠিক করিয়া দেওয়া) ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত বৌদ্ধযুগে আমরা আরও অনেক প্রকার কার্য্যের তালিকা পাই :—১। হস্তিচালক, ২। অশ্বচালক, ৩। সারথি, ৪। ধনুকধারী, ৫। দাসক-পুত্র, ৬। পাচক, ৭। নাপিত, ৮। নাহাপক (যাহারা স্নানে সাহায্য করিত), ৯। মালাকার, ১০। রজক, ১১। পেশকার, ১২। নলকার (যাহারা বেতের বাক্স প্রস্তুত করিত), ১৩। কুম্ভকার, ১৪। উদ্যানপালক, ১৫। অর্ঘকার (যাহারা জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণ করিত), ১৬। বৰ্দ্ধকী (ছুতার), ১৭। বালিসিক (ধীবর), ১৮। কৃষক, ১৯। নাবিক, ২০। কর্ম্মকার, ২১। তূর্ণকার (দর্জ্জি), ২২। ভেরীবাদক, ২৩। সর্পবৈদ্য (যাহারা সর্পদংশন হেতু বিষ নষ্ট করে), ২৪। লঙ্ঘনক্রীড়ক ইত্যাদি।

সেকালে যে পল্লীতে কেবল কর্ম্মকার বাস করিত কিংবা ধীবর বাস করিত, সে-পল্লীকে কর্ম্মকারপল্লী কিংবা ধীবরপল্লী বলা হইত। উদাহরণ স্বরূপ আমরা আরও দেখাইতে পারি যে, সেকালে বৰ্দ্ধকী (ছুতার) গ্রাম, নেষাদ (ব্যাধ) গ্রাম, ব্রাহ্মণগ্রাম ছিল। ইহা ব্যতীত কুলের (বংশের) উল্লেখ পাই, যথা, রথকারকুল, নিষাদকুল। বর্ত্তমান যুগে এইরূপ নাম আমরা অনেক পাই, যথাঃ—কুমারটুলী, তেলীপাড়া, কাঁসারীপাড়া ইত্যাদি।

বৌদ্ধযুগে কতকগুলি পর্ব্ব ছিল। প্রাচীনকালে শিশু-দিগের নামকরণ প্রথা ছিল। সেকালে একটি স্ত্রীলোক দুইবার বিবাহ করিতে পারিত। বিবাহে স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বয়ংবর প্রথা এইরূপ ছিল যে, কুমারী সমবেত কতকগুলি যুবকের মধ্য হইতে তাহার স্বামী পছন্দ করিত। কোন একজন ধনীকেও বলিতে দেখা যায় যে, তাহার কন্যা তাহার স্বামীও নিজেই পছন্দ করিয়া লইবে। প্রাচীনযুগে পর্দ্দা প্রথা

ছিল। মুসলমানেরা আসিবার বহু পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে পর্দ্দা প্রথা ছিল। স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দা প্রথা বিশেষভাবে মানিত। কিন্তু কোনও পর্ব্ব উপলক্ষে, তীর্থস্থানে, নদীতে স্নানের সময়ে এই নিয়ম মানিত না।

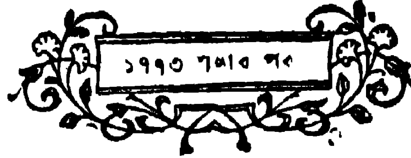
প্রাচীন ভারতে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি সকলেরই খুব চেষ্টা ছিল। ব্রাহ্মণযুবকগণ তাহাদের শিক্ষকের নিকট হইতে বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, যথা :— ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, ইতিহাস, ব্যাকরণ ইত্যাদি। তক্ষশিলায় এবং অন্যান্য বিদ্যাপীঠে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাহারা যাইত। ছাত্রদের মধ্যে দুই-প্রকারের ছাত্র ছিল। যাহারা ধনী ছাত্র, তাহারা বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া গৃহে যাইবার সময় গুরুকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিয়া যাইত। আর যে সকল ছাত্র তেমন সঙ্গতিশালী নহে, তাহারা গুরুর সেবা শুশ্রূষা করিয়া যৎসামান্য দক্ষিণা দিয়া গুরুগৃহ ত্যাগ করিত। ইহা ছাড়া ধনী ছাত্রেরা গুরুর গৃহে বাস করিয়া দিনের বেলায় শিক্ষা লাভ করিত। গুরু গরীব ছাত্রগণকে রাত্রিকালে শিক্ষাদান করিতেন। সেকালে গুরু ছাত্রগণকে শারীরিক শাস্তি দিতেন না। তবে তাঁহারা দরকার মত ছাত্রগণকে নানা রকম আদেশ দান করিতেন। যে-কোনও জাতির ছাত্রগণকে তাঁহারা শিক্ষাদান করিতেন না। উচ্চ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্যতীত অন্য জাতীয় ছাত্র গুরুগণের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইত না। শিষ্যেরা নিজ নিজ বিদ্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে গুরুগণ তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিতেন এবং শিষ্যগণকে পুত্রের মত আদর-যত্ন করিতেন। এ সম্বন্ধে অনেক কথা তোমরা "প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়" শির্ষক প্রবন্ধে (শিশুভারতী ১৪৪১ পৃষ্ঠা) জানিতে পারিবে। ছাত্রগণ গুরুকে দক্ষিণা দিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত কিংবা গুরু-সেবায় রত থাকিত। বারাণসীবাসীরা, যাহাতে দরিদ্র ছাত্রগণ বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। প্রাচীনকালে রাজারা তাঁহাদের নিজেদের দেশে ভাল শিক্ষক থাকা সত্বেও পুত্রদিগকে দূরদেশে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠাইতেন; এই উদ্দেশ্য—যাহাতে তাঁহাদের পুত্রগণ সেই দেশের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ভাষা বিশেষভাবে জানিতে পারে। যেমন আমরা দেখিতে পাই যে কাশীরাজের পুত্র এবং কাশীরাজের পুরোহিতের পুত্র দুইজনে মিলিয়া তক্ষশিলায় বিদ্যার্জ্জন করিতে গিয়াছিল। যাহাতে তাহারা বঙ্গদেশের আচার-পদ্ধতি ভালভাবে জানিতে পারে সেইজন্য তাহারা অনেক নগর এবং গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছিল।

মৃতদেহের সৎকার সেকালে কি ভাবে করিত তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হইল। সামান্য লোকের মৃতদেহ কোন একটি সাধারণ স্থানে (যাহা আমকশ্মশান নামে পরিচিত ছিল) ফেলিয়া দেওয়া হইত। ঐ সকল মৃতদেহ বন্য পশুরা ভক্ষণ করিত। বড়লোকের মৃতদেহ দগ্ধ করা হইত এবং তাহাদের মৃতদেহের অংশের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইত। নূতন বস্ত্র এবং রজ্জুর দ্বারা মৃতদেহ পরিবেষ্টিত হইত। একটি লৌহপাত্রে ঐ মৃতদেহ রাখা হইত এবং পরে দগ্ধ করা হইত। রামায়ণে রাজা দশরথের মৃতদেহ তৈল-পাত্রে রাখা হইয়াছিল, কারণ যুবরাজগণ রাজার মৃত্যুর সময়ে রাজ্যে উপস্থিত ছিলেন না। সম্ভবতঃ কিছুকালের জন্য এইরূপ প্রথা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল।



গ্রীস

ভৌগোলিক বিবরণ



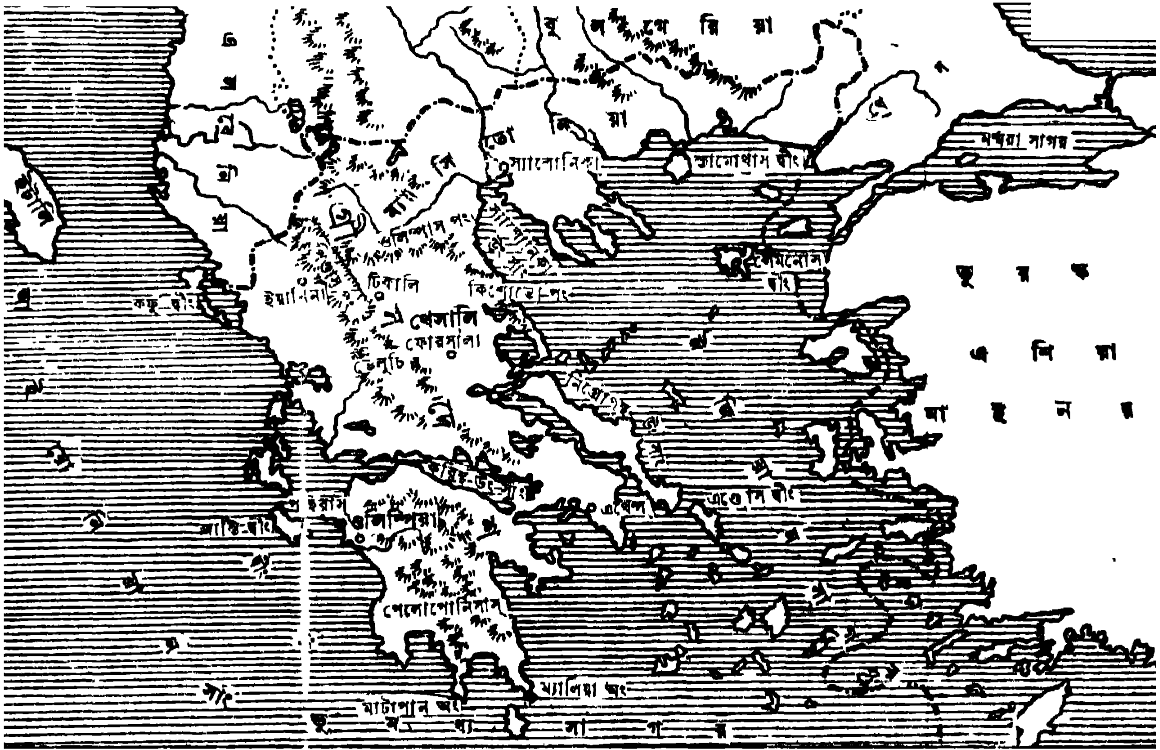
কতটুকুই বা দেশ! কি বা তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ্! লোকসংখ্যাও যে তাহার বেশী ছিল, তাহাও নহে। কিন্তু জগৎকে সে যে অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছে সেই জন্য সভ্যতার ইতিহাসে তাহার স্থান চিরদিনই উচ্চে থাকিবে। এক কথায় বলিতে গেলে গ্রীসই হইল ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি। ২৫০০ বৎসর আগে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে, শিল্প ও কলায়, সাহিত্য ও দর্শনে, ইতিহাস ও দণ্ডনীতিতে সে যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, আজও তাহা সমগ্র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। আজ আর তাহার সে গরিমা নাই। ভাগ্যচক্রের পুনঃপুনঃ বিবর্ত্তনে খাঁটি গ্রীকজাতিও একরূপ ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার গৌরবময় কাহিনী আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ! কতকাল হইল এথেন্সের মল্লভূমি (Gymnasium) ও বিপণিক্ষেত্রের কোলাহল থামিয়া গিয়াছে; পার্থিনন (Parthenon) ও ওডিয়ন (Odeon) ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে; ডেল্ফির (Delphi) মন্দিরে আর কেহ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিতে যায় না; ওলিম্পিয়া তাহার পূর্ব্ব গৌরব হারাইয়া নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এত দিন পরেও প্রাচীন গ্রীকদের ভাবধারা, আদর্শ ও কর্ম্মপ্রেরণা মানুষের মনে সাড়া জাগায়।

ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত বল্কান উপদ্বীপের দক্ষিণাংশকে সেকালে হেলাস্ (Hellas) অথবা গ্রীসদেশ বলিত। এই ক্ষুদ্র দেশটির তিনদিক ঘেরিয়া রহিয়াছে ভূমধ্যসাগর। আর ইহাকে মাঝামাঝি প্রায় দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে করিন্থীয় উপসাগর। কেবলমাত্র সঙ্কীর্ণ একটি যোজক এই দুই অংশের সংযোগ সাধন করিয়া আছে। সেকালে দক্ষিণাংশকে গ্রীকেরা পেলোপনেসাস্ (Peloponnesus) নামে অভিহিত করিত। পেলোপনেসাস্ ছিল উত্তর গ্রীস হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র।

এই সমুদ্র-মেখলা দেশের অধিবাসীরা যে নির্ভীক ও কৌশলী নাবিক হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রকৃতিদেবী দেশটাকে এমনভাবে গড়িয়াছেন যে, ইহার কোন অংশই সমুদ্রতীর হইতে বেশী দূরে নহে। বেলাভূমিও ছিল পোতাশ্রয় হইবার বিশেষ উপযোগী। তাহা ছাড়া দেশের সর্ব্বত্র উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী এমন ইতস্ততঃভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়াছে যে, স্থলপথে এক অংশ হইতে অন্য অংশে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা নাই। শীর্ণকায়া খরস্রোতা নদীগুলিও নৌচালনার পক্ষে একেবারে অনুপযোগী। সুতরাং অনেকটা বাধ্য হইয়াই গ্রীকেরা সমুদ্রবক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল।

গ্রীসের পূর্ব্বদিকে ঈজিয়ান (Aegean sea) সাগরে অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ ইতস্ততঃ ছড়ান রহিয়াছে। দেখিলেই মনে হয় যেন গ্রীস ও এসিয়ার সংযোগ সাধনের জন্যই ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলেও দাঁড়াইয়াছে তাহাই।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই গ্রীস ও পশ্চিম এসিয়ার মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এমন কি, পশ্চিম এসিয়ার সমুদ্রতীরে গ্রীকেরা অনেকগুলি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহার ফলে ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও পশ্চিম এসিয়ার উপকূলস্থিত প্রদেশকে গ্রীসের অন্তর্ভূত বলিয়াই মনে করা হইত। আর সুসভ্য এসিয়ার সংস্পর্শে আসিয়া গ্রীসের পূর্ব্বদিকের অধিবাসীদের উপকারও হইয়াছিল যথেষ্ট পরিমাণে। ফল কথা, এসিয়া হইতেই গ্রীকেরা সভ্যতার আলোক প্রথম পায়। তবে গ্রীসের পশ্চিমদিকের লোকেরা (City State)। গ্রীসের গৌরবময় যুগে সমস্ত দেশটি লইয়া একটি মহারাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। এদেশের জল-হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। সুতরাং এখানকার লোকেরা ছিল খুব বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। জমিও মোটেই উর্ব্বরা নহে। কাজেই, তাহাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। তবু কিন্তু দেশের সমস্ত অধিবাসীর উপযোগী খাদ্য উৎপন্ন করা সম্ভব হয় নাই। তাই বাধ্য হইয়াই অতি প্রাচীন কাল হইতেই গ্রীকেরা নানাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।



গ্রীসদেশ

কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত 'যে তিমিরে, সে তিমিরেই' রহিয়াছিল।

গ্রীস যে পাহাড়-পর্ব্বতে সমাকীর্ণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার ফলে দেশটি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছে। আর পাহাড়গুলি এত উচ্চ যে, এক অংশের সহিত অন্য অংশের একরূপ কোন সম্বন্ধছিল না বলিলেই চলে। কাজেই, এখানে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। এক একটি নগর ছিল এক একটি স্বাধীন রাজ্য

ঈজিয়ান সভ্যতা

ঈজিয়ান সাগরের উপকূলে ও দ্বীপপুঞ্জে অতি প্রাচীনকালে একটি সভ্যতার বিকাশ হয়; তাহার নাম ঈজিয়ান সভ্যতা (Aegean civilisation) দেওয়া হইয়াছে। গ্রীক সভ্যতার উপর ইহার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হইলেও এই সভ্য লোকেরা গ্রীক ছিল না। ক্রীট্, ট্রয়, মাইসেনী (Mycenae) ও টাইরিন্স্-এ (Tiryns) ছিল এই সভ্যতার পীঠস্থান। খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন

হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ক্রীটে ব্রঞ্জের প্রচলন হইয়াছিল। এক হাজার বৎসর পরে দেখা যায় যে, এখানকার অধিবাসীরা সভ্যতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল নসস্ (Gnossus)। এখানকার বিরাট্ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই রাজাদের প্রচুর ধনসম্পদ ছিল। তাঁহাদের অনেক সমুদ্র-পোতও ছিল। এই সময় এখানে লেখারও প্রচলন হইয়াছিল।

এসিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ট্রয় নগরও ছিল ক্রীট্ সভ্যতার সমসাময়িক। এই স্থানে পর পর অনেকগুলি নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর কাছাকাছি এই ঈজিয়ান সভ্যতা পেলোপনেসাসে প্রসার লাভ করে। টাইরিনস্ ও মাইসেনী ছিল ইহার প্রধান কেন্দ্র। তবে মাইসেনী ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী। সেইজন্য এই পরবর্ত্তী সভ্যতাকে মাইসেনীয়ান্ সভ্যতা (Mycenaean civilisation) বলা হয়।

গ্রীকদের আগমন

এই অনার্য্য সভ্যতার দেশে গ্রীকেরা আসে বোধ হয় উত্তর-পশ্চিম হইতে। সমগ্র দেশটিকে জয় করিতে অবশ্য তাহাদের অনেক দিন লাগিয়াছিল। তবে আদিম অধিবাসীদিগকে তাহারা একেবারে নির্ম্মূল করিয়াছিল, মনে করার কোন কারণ নাই। পরাজিত ঈজিয়ান লোকেরা তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করে ও ধীরে ধীরে বিদেশী আগন্তুকদের সঙ্গে মিশিয়া যায়। গ্রীকেরা তাহাদের উচ্চতর সভ্যতা অনেকাংশে গ্রহণ করে মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, গ্রীক-সভ্যতা ঈজিয়ান-সভ্যতারই ক্রমবিকাশ। তবে গ্রীক ভাষার সর্ব্বত্র প্রচলন হয় ও সমগ্র দেশটি গ্রীকভাবাপন্ন হইয়া যায়। গ্রীকেরা চারিটি প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। তাহাদের নাম একীয়ান (Achaean), ঈওলিয়ান (Aeolian), আইওনিয়ান (Ionian) ও ডোরিয়ান (Dorian)।

গ্রীকেরা কিন্তু গ্রীসদেশ জয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। শীঘ্রই তাহারা ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ও এসিয়া মাইনরের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে। এসিয়া মাইনরের উত্তরাংশের উপকূলে একীয়ান ও ঈওলিয়ান গোষ্ঠীর গ্রীকেরা উপনিবেশ স্থাপন করে। এই অঞ্চলের নাম তাহারা ঈওলিস্ (Aeolis) দেয়। ইহার দক্ষিণে আইওনিয়ান গ্রীকেরা বসতি স্থাপন করে। এই অঞ্চলকে আইওনিয়া (Ionia) বলা হয়। আর ইহারও দক্ষিণে উপনিবেশ স্থাপন করে ডোরিয়ানরা। তাহাদের নাম হইতে এই স্থানের নাম হয় ডরিস্ (Doris)। পরবর্ত্তিকালে গ্রীকেরা পশ্চিমদিকেও উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। সিসিলিদ্বীপে ও ইটালীর দক্ষিণাংশে তাহারা অনেক উপনিবেশ স্থাপন করে। সেইজন্য দক্ষিণ ইটালীকে বৃহত্তর গ্রীস (Magna Grecia) বলা হইত।

এইখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। গ্রীকেরা কোন বিশাল রাজ্য স্থাপন করে নাই। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। কালক্রমে সেই সব জায়গায় এক একটি সহর গড়িয়া উঠে। সেই সহরকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন হয়। এইজন্য এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে নগররাষ্ট্র (City State) বলা হয়। এই নগররাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। কেহ কাহারও সহিত সংযুক্ত হইতে অথবা অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিত না। রাষ্ট্রীয় বৈষম্য সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে যে একেবারে একত্ব-বোধ ছিল না, এমন নহে। গ্রীকেরা নিজেদের হেলেনিস্ (Hellenes) ও অপর সব লোককে বর্ব্বর (Barbarian) বলিত। এই একত্ববোধের নানা কারণ ছিল। তাহারা মনে করিত যে, তাহারা সবাই একই জাতীয় লোক। ভাষা ছিল তাহাদের এক। ধর্ম্মগত ও আচারগত ঐক্যও তাহাদের ছিল। ডেল্‌ফির মন্দিরে ভবিষ্যদ্বাণী (Oracle) শুনিতে গ্রীক মাত্রেই যাইত। ওলিম্পিয়ান (Olympian), ইস্‌থমিয়ান (Isthmian), পীথিয়ান (Pythian) প্রভৃতি জাতীয় ক্রীড়াতে যোগ দিতে এত লোকের সমাগম হইত যে, মনে হইত যেন সমগ্র গ্রীসদেশ ভাঙ্গিয়া লোক সেখানে সমবেত হইয়াছে। গ্রীক ছাড়া অপর কাহারও এই সব ক্রীড়াতে যোগ দিবার অধিকার ছিল না। আবার বিশেষ বিশেষ উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য অথবা ধর্ম্মমন্দিরের পূজা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার জন্য কতকগুলি নগর ধর্ম্মসঙ্ঘ (Amphictyony) স্থাপন করিত। ইহা ছাড়া হোমারের (Homer) মহাকাব্যগুলি, বিশেষতঃ

ইলিয়ার্ড (Iliad) ও ওডেসি (Odyssey) গ্রীকদের জাতীয় সম্পদরূপে পরিগণিত ছিল।

হোমারের মহাকাব্য

যদিও গ্রীকেরা মনে করিত যে, উক্ত কাব্যগুলি হোমার নামে কোন এক অন্ধ কবি রচনা করিয়াছিলেন, আজকালকার ঐতিহাসিকেরা কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে এই মহাকাব্যগুলি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ইহাতে বিভিন্ন হাতের নিদর্শন পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, ইলিয়াড ও ওডেসি গ্রীক সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ্।

ট্রোজান যুদ্ধ (Trojan war) হইতেছে ইলিয়াডের বিষয়বস্তু। ট্রয়ের রাজা ছিলেন প্রায়াম (Priam)। তাঁহার পুত্র প্যারিস (Paris) গ্রীসদেশের স্পার্টা-রাজ্যের রাজা মেনেলাসের (Menelaus) স্ত্রী হেলেনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লইয়া পলায়ন করেন। সেকালে হেলেনের মত সুন্দরী কেহই ছিল না। মেনেলাসের সঙ্গে বিবাহের পূর্ব্বে গ্রীস-দেশের অনেক রাজা তাহার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন। কাজেই, হেলেনের হরণের সংবাদে এই সব রাজা তাহার উদ্ধারের জন্য মেনেলাসকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। এই অভিযানে তাঁহাদের নেতা হইলেন মাইসেনীর রাজা আগামেম্নন্। তবে সর্ব্বাপেক্ষা বীর ছিলেন থেসালী দেশের সর্দ্দার আকিলিস্ (Achilles); আর ইথাকার রাজা ওডিসিউস্ (Odysseus) ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা চতুর ও কৌশলী। বীওশিয়ার (Boeotia) উলিস্ (Aulis) দেশ হইতে এই গ্রীকবাহিনী ট্রয় নগর অভিমুখে যাত্রা করে।

এদিকে ট্রোজানরাও নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহারাও যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাদের সৈন্যদলের নেতা ছিলেন প্রায়ামের জ্যেষ্ঠপুত্র হেক্টর। হেক্টরও খুব মস্ত বড় বীর ছিলেন। গ্রীক সৈন্য ট্রয় নগরের নিকট সমুদ্রতীরে শিবির স্থাপন করিল। দশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ চলিল। এই যুদ্ধে দেবতারাও গ্রীক ও ট্রোজানদের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শেষ বৎসরের ঘটনা লইয়াই ইলিয়াড মহাকাব্য হয়। কোন কারণে আকিলিস্ ও আগামেম্-ননের মধ্যে মতান্তর ও মনান্তর উপস্থিত হয়। ইহার ফলে আকিলিস্ রাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি আর অস্ত্রধারণ করিবেন না। এই সুযোগে হেক্টর গ্রীকদিগকে বিশেষভাবে পরাজিত করিতে লাগিলেন। তাহারা হটিতে হটিতে একেবারে সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আকিলিস্ তাঁহার প্রিয় বন্ধু প্যাট্রক্লিউস্কে (Patroclius) তাঁহার নিজের বর্ম্ম ও অজেয় সৈন্যদল দিলেন। প্যাট্রক্লিউস অসীমপরাক্রমে ট্রোজানদিগকে আক্রমণ করিয়া হটাইয়া দিলেন। কিন্তু হেক্টরের হাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। বন্ধুর মৃত্যুসংবাদে আকিলিসের বিশেষ দুঃখ হয়। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তিনি বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য পুনরায় অস্ত্রধারণ করিলেন। ট্রোজানরা তাঁহার কাছে হারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। হেক্টরকে তিনি স্বহস্তে বধ করেন। হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা করিয়াই ইলিয়াডের শেষ হয়। পরবর্ত্তিকালের গাথাতে বাকি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। আকিলিস্ ট্রয়নগরের সম্মুখে প্যারিসের তীরে নিহত হন। গ্রীকসৈন্যেরা কিছুতেই ট্রয় অধিকার করিতে পারিল না। তখন কুটবুদ্ধি ওডিসিউস্ এক ফন্দী বাহির করিলেন। একটা প্রকাণ্ড কাঠের ঘোড়া তৈয়ারী করা হইল। ইহার পেটের মধ্যে ৫০ জন বীর যোদ্ধা লুকাইয়া রহিল। ঘোড়াটাকে প্রাচীরের কাছে আনিয়া গ্রীকসৈন্যেরা চলিয়া যাইবার ভাণ করিল। তখন ট্রোজানরা মহা স্ফূর্ত্তিতে ঘোড়াটাকে প্রাচীরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। রাত্রিকালে গ্রীকসৈন্যেরা ঘোড়ার পেটের মধ্য হইতে বাহির হইয়া নগরের তোরণ উন্মুক্ত করিল। আর গ্রীক সৈন্যেরা তখন সেই পথে নগরে প্রবেশ করিয়া ট্রোজানদিগকে বধ করিয়া নিঃশেষ করিল এবং সহরটিকে পোড়াইয়া ভস্মে পরিণত করিল। এইবার গ্রীকসৈন্যেরা দেশে ফিরিল।

ওডেসি মহাকাব্যে ওডেসিউসের পথ ভ্রষ্ট হইয়া দশবৎসর ভ্রমণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে অনেকে আসিয়া তাঁহার স্ত্রী পেনিলোপের পাণিপ্রার্থী হয়। তাঁহার পুত্র টেলিমিকাস নিরুপায় হইয়া পিতার দুঃখে ম্রিয়মাণ হইল। এই সময়ে ওডেসিউস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতাপুত্রে পরিচয় হইল। তারপর

তিনি বীরবিক্রমে তাঁহার স্ত্রীর পাণিপ্রার্থিগণকে হত্যা করিলেন।

প্রাচীন গ্রীসের সমাজ ও রাষ্ট্রের চিত্র

হোমারের মহাকাব্য হইতে তৎকালীন গ্রীক সমাজ ও রাষ্ট্রের অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়। প্রত্যেক রাজ্যেই একজন রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রধান বিচারক, প্রধান পুরোহিত ও প্রধান সেনাপতি। রাজবংশ কোন না কোন দেবতা হইতে সম্ভূত। কাজেই রাজাকে দেবতার মত সম্মান করা হইত। রাজদণ্ড বংশপরম্পরা (hereditary) প্রচলিত ছিল। রাজার অনেক বিশেষ অধিকার ছিল। উৎসবে তাঁহাকে একটি বিশিষ্ট আসন দেওয়া হইত। যুদ্ধের লুণ্ঠিত (booty) দ্রব্য হইতে তিনি একটি প্রধান অংশ পাইতেন। যজ্ঞে Sacrifice উৎসর্গ দ্রব্যেরও তিনি শ্রেষ্ঠাংশ পাইতেন।

রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য তাঁহাকে বৃদ্ধ-পরিষদের (Council of Elders) মতামত লইতে হইত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্ত্তাদের লইয়া এই পরিষদ গঠিত ছিল। ইহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে তাঁহাকে জনসভা (Agora ; Assembly of freemen) আহ্বান করিতে হইত। এই সভায় রাজ্যের সমস্ত স্বাধীন ব্যক্তির (freemen) উপস্থিত হইবার অধিকার ছিল। তাহারা রাজার প্রস্তাব অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত। আলোচনা করিবার কোন অধিকার তাহাদের ছিল না। আলোচনা ও পরামর্শ চলিত বৃদ্ধপরিষদে।

রাজ্যে তিন শ্রেণীর লোক ছিল—সম্ভ্রান্ত জমিদার, স্বাধীন জনসাধারণ ও দাস। স্বাধীন ব্যক্তিদের মধ্যে যাহাদের জমিজমা অথবা বিশেষ ধন-সম্পত্তি ছিল না, তাহাদিগকে থীট্‌স (Thetes) বলা হইত।

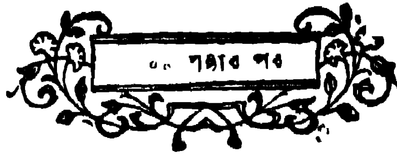
এই সময়ে গ্রীকদের জীবনযাত্রা-প্রণালী অতীব সরল ও সাধারণ ছিল। রাজা ও সম্ভ্রান্ত জমিদারেরা স্বহস্তে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈয়ারী করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। তাঁহারা গৃহনির্ম্মাণ করিতে, ক্ষেত্র চষিতে অথবা নৌকা তৈয়ারী করিতে কিছুতেই পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না। রাজপরিবারের মহিলারাও স্বহস্তে রান্নাবান্না ও অন্যান্য গৃহকর্ম্ম করিতেন। সূতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতেও তাঁহাদের লজ্জা ছিল না। তাঁহাদের আহার্য্য দ্রব্যও খুবই সাধারণ ছিল—মাংস, পনীর, রুটি ও কখন কখন ফলমূল। মদ্য অবশ্য তাঁহারা পান করিতেন—তবে সাধারণতঃ বেশী মাত্রায় নয়। ভোজের সময় গান ও বীণা বাজান হইত।

কৃষিকার্য্য ও পশুপালন ছিল ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন। পশুই ছিল তখন প্রধান সম্পদ। বৃষ দ্বারাই দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইত। এই সময় দেশে বড় একটা শান্তি ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহ সর্ব্বদা লাগিয়াই ছিল। সমুদ্রে যাতায়াতও বড় নিরাপদ ছিল না। কারণ, জলদস্যুরা সর্ব্বত্রই অবাধে বিচরণ করিত এবং তাহাদের কাজ মোটেই নিন্দনীয় ছিল না। ব্যবসায় বাণিজ্য ফিনিসীয় বণিকদের হাতে ছিল।

গ্রীকেরা বহু দেবদেবীর পূজা করিত। এই সব দেবতারা ছিলেন নৈসর্গিক পদার্থ ও শক্তি। তাঁহাদিগকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করা হইত। তাঁহাদিগের পূজার জন্য নানারূপ যাগযজ্ঞের প্রচলন ছিল। এক একজন বিশিষ্ট দেবতা প্রত্যেক নগরের অধিপতি ছিলেন।



পাহাড়ের উপর উঠিতে কষ্ট বোধ হয় কেন?



পৃথিবীর পিঠের উপর যা-কিছু আছে, পৃথিবী তাকে নিজের দিকে টেনে রাখতে চাইছে। এই টানের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয় ব'লে একখণ্ড পাথরকে তুলতে গেলে ভারী বোধ হয়। পৃথিবী যত জোরে তাকে টেনে রাখচে, তুমি তার চাইতে বেশী জোর দিলেই তবে তাকে স্থানচ্যুত করতে পার। এ টান থেকে কারুরই নিস্তার নেই। তোমাকে পর্যান্ত সে ধ'রে রেখেছে তার সেই অদৃশ্য বাঁধন দিয়ে।

পৃথিবীর কাছ থেকে দূরে যেতে চাইলেই তখন মুস্কিল হয়। তখন তোমাকে এই টানের বিপরীত দিকে কাজ করতে হয়। এই টানকে কাটিয়ে ওঠবার জন্যে তোমাকে পরিশ্রম করিতে হয়। তোমার ওজন মনে কর এক মণ। এক মণের একখণ্ড পাথরকে তুমি বোধ হয় তুলতেই পারবে না। তুলতে পারলেও তাকে কতক্ষণ ওপরে তুলে রাখতে পারবে? এক মিনিটেই পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়বে। পাহাড়ে চড়বার সময় তোমাকে তোমার শরীরের ওজনটাকে ক্রমাগত টেনে টেনে তুলতে হয়। নিজের শরীর ব'য়ে নিয়ে বেড়াতে আমরা খুব অভ্যস্ত ব'লেই এক মিনিটেই পরিশ্রান্ত হই না। কিন্তু কতক্ষণ তা না হ'য়ে পারি? দেখতে দেখতেই হাঁপাতে আরম্ভ করি।

পাহাড়ের ওপর আর একটা ব্যাপার আছে। সমতল দেশের বাতাস যেমন ঘন, পাহাড়ের বাতাস ততটা ঘন নয়—অপেক্ষাকৃত পাতলা বা বিরল। কাজে কাজেই, যতটা নিঃশ্বাস টানলে আমরা সমতল দেশে আমাদের দরকারের উপযুক্ত বাতাস পাই, পাহাড়ে সেই পরিমাণ বাতাস পেতে হ'লে ঢের বেশী নিঃশ্বাস টানতে হয়। এইজন্যেও পাহাড়ের ওপর ওঠবার সময় আমাদের খুব তাড়াতাড়ি হাঁপ এসে পড়ে।

তাছাড়া আর একটা কথা আছে। সমতল যায়গায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে আমাদের পায়ের পেশী-গুলো সমতল যায়গায় বেড়াবার উপযুক্ত হ'য়েই গ'ড়ে উঠেছে। চ'লে চ'লে এরা এমন অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছে যে, অনেকটা দূরে গেলেও এদের বিশেষ ক্লান্তি আসে না। যে ছেলেরা অলস, যারা খেলা-ধূলো, দৌড়ধূপ করে না—শুধু ঘরের মধ্যে ব'সে ব'সে indoor games নিয়েই সময় কাটায়, তাকে আধ মাইল পথ হাঁটিতে বল না। বাড়ীতে ফিরে এসে হয়ত তার পায়ে মালিশ করতে হবে। কিন্তু পাহাড়ে চড়া ত আমাদের অভ্যাস নেই। পাহাড়ে চড়তে হ'লে পায়ের যে পেশীগুলোর ব্যবহার হয়, সমতল যায়গায় চলতে হয় ব'লে তারা কাজ করতে না পেরে প্রায় অব্যবহার্য্য হ'য়ে গিয়েছে। তাই তারা একটুতেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। এই জন্যেও পাহাড়ে উঠিতে গেলে আমরা কষ্ট বোধ করি। যারা পাহাড়ী লোক, তাদের কিন্তু অন্য রকম। তারা পাহাড়েই চ'লে চ'লে মানুষ। তাদের পাহাড়ে চড়ার পেশীগুলোই বেশী কাজের। তাদের যদি সমতল ক্ষেত্রে চলতে দেওয়া হয়, তবে প্রথম প্রথম তাদের ভারী অসুবিধা হয়।

খুব পালিশ-করা মেঝের চাইতে খরখরে মেঝেতে হাঁটিতে সুবিধা হয় কেন?

আমরা চলবার সময় কেমন ক'রে এগিয়ে যাই, সেইটে লক্ষ্য ক'রলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। আমরা মেঝের উপর দাঁড়ালাম। সামনে একটা পা বাড়ালাম। আমাদের সমস্ত শরীরের ভারটা সেই পা-টার ওপর দিলাম। তার পর পা-টাকে মেঝের ওপর চেপে রেখে যাতে কি সে নিজের যায়গা থেকে না সরতে পায় এমন ক'রে তাকে নিজের দিকে টানবার চেষ্টা করলাম। ফলে হ'ল কি, পা-টা শরীরের কাছে না এসে শরীরটাই পা-টার কাছে চ'লে গেল। আমাদের প্রতি পা হাঁটবার বেলায় আমরা প্রত্যেকবারই এই কাজ ক'রে থাকি, আর এইভাবেই আমরা হাঁটি।

এইখানে একটি কথা আছে। মেঝের ওপর পা-টাকে চেপে যখন তাকে নিজের দিকে টানতে যাই, তখন মেঝেটা যদি পালিশ করা হয় তবে পা-টাই আমাদের কাছে চ'লে আসবে—মেঝেতে আটকে থাকবে না। মেঝে খরখরে থাকে ব'লেই আমরা তার ওপর ভর ক'রে, যেখানে ইচ্ছা পা-কে বসিয়ে রাখতে পারি। আর এমনি ক'রে বসাতে পারি ব'লেই আমাদের শরীরটাকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। এইজন্যেই পায়ে চাকা লাগিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব।

লবণ দিলে বরফ তাড়াতাড়ি গ'লে যায় কেন?

সব জিনিসেরই জমে' যাবার একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থা আছে। ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে যখন সে এই নির্দ্দিষ্ট অবস্থাতে পৌঁছায়, তখনই সে জমে' যায়। জল জমে' বরফ হ'তেও সেই জন্যে একটি সঠিক অবস্থা আছে। সাধারণতঃ জলের বেলায় এই অবস্থাটার নাম দিই 0°C; অর্থাৎ সেন্টিগ্রেড তাপমানের শূন্য তাপাংশ। জল যখন সেন্টিগ্রেড তাপমানের শূন্য তাপাংশ ঠাণ্ডা হয়, তখন সে বরফ হ'তে আরম্ভ করে। কিন্তু লবণাক্ত জল জমে' কঠিন হ'তে আরও কম তাপাংশের দরকার। তাপাংশ শূন্য ঘরের আরও ২০।৩০ তাপাংশ নীচে নামলে তবে লবণাক্ত জল জমতে পারে। সাধারণতঃ বাজারে যে বরফ পাওয়া যায়, তার তাপাংশ শূন্য তাপাংশের অল্প নীচেই থাকে। লবণাক্ত জলকে জমিয়ে রাখবার জন্যে এ তাপাংশ ঠিক উপযুক্ত নয়। তাই বরফটা তাড়াতাড়ি গ'লে গিয়ে নুনগোলা ঠাণ্ডা জল হ'য়ে যায়।

জোনাকী পোকা জ্বলে কেন?

কোনও জিনিসকে যদি খুব উত্তপ্ত কর'তে থাক তাহলে তা থেকে ক্রমে ক্রমে আলো বের হ'তে থাকে। আমরা সাধারণতঃ যত রকমের আলো দেখ্‌তে পাই তা সবই এই রকম উত্তপ্ত হ'তে হ'তে আলো ছড়াতে আরম্ভ করে। দীপশিখা, ইলেক্‌ট্রিকের বাতি, সূর্য, নক্ষত্র সবই এই ভাবে আলো ছড়ায়। তোমরা যত রকমের আলো দেখেছ, যেখান থেকে তা বের হয় সে জিনিসটা গরম কিনা মনে মনে ভেবে দেখ্‌লেই আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবে।

কিন্তু গরম না হ'য়েও যে জিনিষ থেকে আলো বের হ'তে পারে না তা নয়। আমাদের চোখে অবশ্য এমন ব্যাপার সচরাচর খুব বেশী পড়ে না। একরকমের ঘড়ি পাওয়া যায় অন্ধকারে যার লেখাগুলো জ্বলতে থাকে। ঘড়ি যারা তৈরী করে তারা এই সব ঘড়ির লেখা ও কাঁটাগুলোর ওপর এক রকমের মশলা মাখিয়ে দেয়। এই মশলার গুণ এই যে, দিনের বেলায় সূর্য্যের আলো সে নিজের মধ্যে কতক পরিমাণে আবদ্ধ ক'রে রাখে আর রাতের অন্ধকারে সেই আলো আবার বের ক'রে বাইরে ছড়িয়ে দেয়। তাই অন্ধকারের মধ্যেও এই সব ঘড়িতে সময় দেখা চলে। যতই আলো দিক্ না কেন, ঘড়ির লেখাগুলো আর কাঁটা দুটো একটুও গরম হয় না। এই রকম জিনিস গরম না হ'য়েও যে সব আলো আমরা পাই তাকে আমরা "ঠাণ্ডা আলো" নাম দিতে পারি। জোনাকী পোকার আলো এই "ঠাণ্ডা আলোর" পর্য্যায়ে পড়ে ব'লে তা আমাদের কাছে এত অদ্ভুত মনে হয়। যতই কেন না আলো ছড়াক জোনাকী কখনও গরম হয় না। তবে গোড়াতেই তোমাদের এক বিষয়ে সাবধান ক'রে দিই। ঘড়ির লেখা থেকে যে আলো বের হয় আর জোনাকী যে আলো ছড়ায়, যদিও উভয়েই ঠাণ্ডা আলো', তা সত্ত্বেও, ওদের প্রকৃতি এক নয়। অর্থাৎ আলো ছড়াবার মূল কারণটি একটির অপরটি থেকে স্বতন্ত্র। আপাততঃ তোমরা জোনাকীর আলোর কথা শোন। রেডিয়াম ঘড়ির জ্বল্ জ্বল্ করবার কথা অন্য সময়ের জন্যে তোলা থাক্।

অনেকেরই এই ধারণা আছে যে, জোনাকীর আলো মূলতঃ "জীবনের" ব্যাপার। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পোকাটা জ্যান্ত থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত

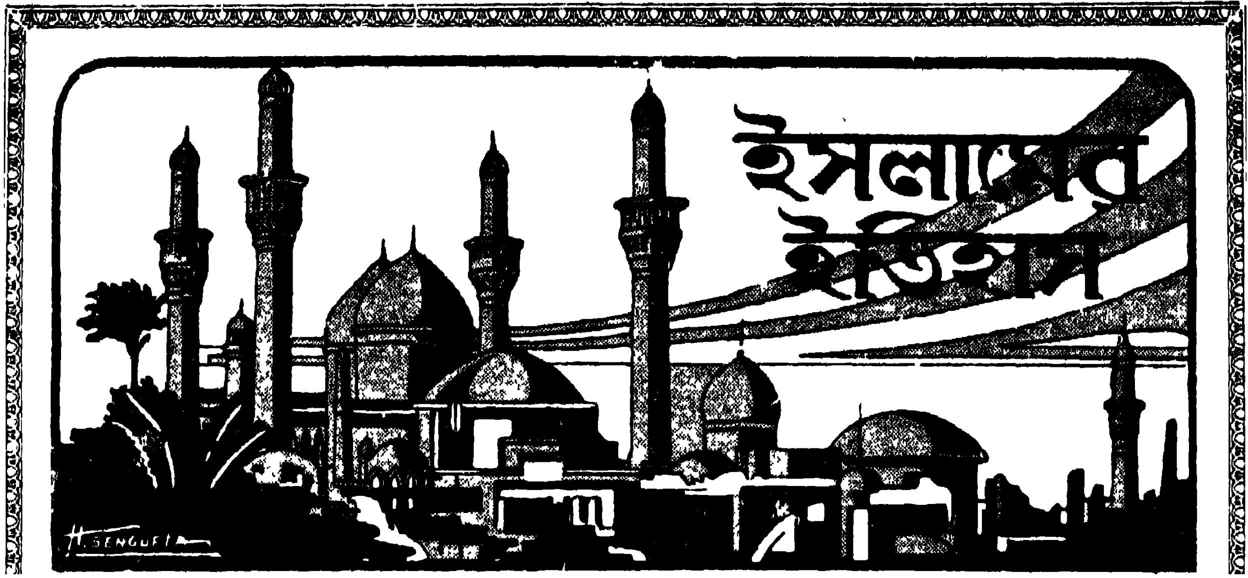
পোকাটার শরীরে জীবনের ক্রিয়া চলতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই সে এই রকম আলো ছড়ায়। এই আলো পোকাটার শরীরে যে "Spark of life" বর্ত্তমান রয়েছে তারই সেটা অভিব্যক্তি মাত্র।

বাস্তবিক পক্ষে উপরের এই কথাগুলোর কোনও স্পষ্ট অর্থ হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা জোনাকীর আলো নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা ক'রে এই পেয়েছেন যে, এই আলো পেতে হ'লে বাতাস, বিশেষ ক'রে অম্লজান গ্যাসের প্রয়োজন হয়। মরা জোনাকী পোকা নিয়ে দেখা গিয়েছে যে, ভিজলে পরে কখনও কখনও আবার তা থেকে আলো বের হচ্ছে। এই সময় বাতাসের স্থানে যদি অম্লজান গ্যাস ব্যবহার করতে পারা যায়, তবে আলোর উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে ওঠে। এই থেকে এই প্রমাণ হয় যে, জোনাকীর আলো মূলতঃ একটা রাসায়নিক ব্যাপার —জীবনের ব্যাপার নহে। আসল ব্যাপার হয় এই—জোনাকী আলো ছড়াবার জন্যে দুই রকমের রস সৃষ্টি করে। এই দুটোর একটা জলের সহযোগে বাতাসের অম্লজানের সঙ্গে মিশতে চায়। দ্বিতীয় রসটি তখন এই কাজে প্রথমটিকে সাহায্য ক'রে এই মিশবার ক্রিয়াকে খুব দ্রুততর ক'রে তোলে। অম্লজানের সঙ্গে এইভাবে মিশবার ব্যাপারটি একটি রাসায়নিক ক্রিয়া। আর সব রাসায়নিক ক্রিয়ার মতই এক্ষেত্রেও শক্তির বা Energy পরিবর্ত্তনের দরকার হয়। এই রকম পরিবর্ত্তনের মধ্যে যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে তা আলো হ'য়ে বাইরে বেরিয়ে আসে—আর তখন আমরা জোনাকীকে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে দেখি।

আমরা সাধারণতঃ এই জানি যে, শুধু জোনাকীর অন্ধকারে আলো ছড়াতে পারে। কিন্তু তা নয়। এইভাবে আলো ছড়াতে পারে এমন জীবের সংখ্যা শুধু যে অসংখ্য তাই নয়, জোনাকীর চাইতেও বহুগুণ বেশী আলোও তাদের অনেকে ছড়িয়ে থাকে। রাতের অন্ধকারে সমুদ্র যে জল্ জল্ করতে থাকে তাও একরকম pyrosomes নামধারী জীবের কারণেই। স্থলচর জীবদের মধ্যে আলো ছড়াতে পারে এর সংখ্যা অবশ্য কম।

জোনাকীর আলো দেবার কথার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য অবান্তর হলেও একটা মজার কথা তোমাদের বলি। আমাদের শরীরে যে যন্ত্র বা ইন্দ্রিয়টি দেখার কাজের জন্যে তৈরী হ'য়ে উঠেছে তার নাম "চক্ষু"। এই "চক্ষু" বা সোজা কথায় চোখের ভিতর আলো গেলে সে তাকে সোজাসুজি রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে পরিবর্ত্তন করে নেয়। এইখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। আলো-কে এইসব সোজাসুজি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিয়ে যেতে চোখকে একটুও গরম হ'তে হয় না। ঠাণ্ডা আলোর সঙ্গে এই ব্যাপারের অনেক সাদৃশ্য আছে। ঠাণ্ডা আলোর বেলা রাসায়নিক প্রক্রিয়া সোজাসুজি আলো হ'য়ে ওঠে—আর চোখ আলো-কে একেবারে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে নিয়ে যায়। তাই এই ব্যাপারে দুটো বাইরের দৃষ্টিতে একটি অপরটির বিপরীত মনে হ'লেও, একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে যে, ওরা মূলতঃ একই। মূলতঃ যে এরা একই, ত' যে যন্ত্রটি দিয়ে আলো তৈরী হয় তার গঠন দেখলেই তা ধরা পড়ে। জোনাকীতে যে-ভাবে আলো বেরোয়, তা তেমন জটিল ব্যাপার নয়। কিন্তু যে-সব জীবের এইরকম আলো ছড়াবার ক্ষমতা বেশ উন্নত, তারা যে যন্ত্রটি দিয়ে তাদের আলো ছড়ায়, তা আমরা যে যন্ত্রটি দিয়ে আলো ধরি, অবিকল তারই অনুরূপ। অর্থাৎ তাদের এই যন্ত্রটি আর জীবদেহের দর্শনেন্দ্রিয় যে চোখ, এই দুইয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। আমাদের চোখের লেন্স-এর মত এতেও একটা আবার কখনও কখনও তিনটা পর্য্যন্ত লেন্স্ আছে। আলো-কে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে চোখের রেটিনার মত একটা পর্দ্দা আছে। চোখের মধ্যে চারদিক দিয়ে বন্ধ একটা অন্ধকারময় ঘর আছে। এই ঘরের দেয়ালেই চোখের লেন্স্ আলো নিয়ে ফেলে। এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেই রকম একটা কালো পর্দ্দা দিয়ে ঘেরা একটা প্রকোষ্ঠ থাকে—আর তারই দেয়ালের ওপরই রাসায়নিক প্রক্রিয়া আলোতে রূপান্তরিত হ'য়ে যন্ত্রটার লেন্স্ দিয়ে বাইরে ফোকাস হ'য়ে পড়ে। তাছাড়া দৃষ্টি স্নায়ু (Optic nerve)-র মত জীবটার মস্তিষ্ক থেকে এই যন্ত্রটা পর্য্যন্ত একটা স্নায়ুও বর্ত্তমান থাকে। এইভাবে নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবটা তার আলোর ওপর কর্ত্তৃত্ব করে। অতএব এতে চোখের আর বাকী রইল কি। জীবনের খেয়াল অনুযায়ী কত অদ্ভুত জিনিসই সৃষ্টি হয়!

জীবনের খেয়াল! এ খেয়াল কোনও বাধা জানে না। প্রকৃতি নিজে তার সমস্ত উপকরণ নিয়ে এর সেবায় প্রতিনিয়ত নিযুক্ত। আলো ছড়াবার চোখ ও এই অদ্ভুতকর্ম্মীর বিচিত্র খেয়ালের একটা সামান্য উদাহরণ মাত্র।



খলিফার ইতিহাস

খলিফা ওসমান্ (৬৪৪—৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দ)



খলিফা ওমর মৃত্যুর পূর্ব্বে খলিফা মনোনয়ন না করিয়া ছয় জন প্রধান ব্যক্তির হস্তে খলিফা নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করেন। এই খলিফা নির্ব্বাচন ব্যাপারে ইস্লামের শাসন-তন্ত্রে ষড়্‌যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। ওমিয়া বংশ একটা দল সৃষ্টি করে। মক্কার এই ওমিয়া-বংশ চিরকালই হাসেমীবংশের শত্রু ছিল। তাহারা মহাপ্রাণ আলিকে মনোনীত না করিয়া বৃদ্ধ ওমিয়া-বংশীয় ওসমান্‌কে নির্ব্বাচন করিল। এই ব্যাপারে হাসেমী ও ওমিয়া বংশের পুরুষ-পরম্পরা শত্রুতাকে কেন্দ্র করিয়া খিলাফতে এমন একটা বিবাদ সৃষ্টি হইল যে, তাহা প্রায় একশত বৎসর চলিয়াছিল এবং ইস্লামের গৌরবকে অনেকটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল।

খলিফা ওসমান্ ব্যক্তিগত ভাবে অতি সজ্জন ছিলেন। তাঁহার দানের অবধি ছিল না। এখানে তাহার একটি গল্প বলিলাম। একদা একজন দরিদ্র মুসলমান প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মুহম্মদের নিকট ভিক্ষা চাহিতে আসিলে, তাহাকে তিনি বলিলেন,—'তুমি ওসমানের নিকট যাও এবং আমার আশীর্ব্বাদ তাহাকে বলিও।' দরিদ্র মুসলমানটি ওসমানের বাড়ী গেল এবং বাহির হইতে শুনিতে পাইল, ওসমান্ তাঁহার পত্নীকে বলিতেছেন—"আমি আমার নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য হইতে বাঁচাইয়া সামান্য অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি, তুমি পূর্ব্ব হইতে এইরূপভাবে অর্থ সঞ্চয় কর নাই, জান না কি অর্থের অপব্যয় করা ইস্লামের নীতি-বিরুদ্ধ।"

দরিদ্র ব্যক্তি বাড়ীর বাহির হইতে ওসমানের কথা শুনিয়া মনে করিল,—যে ব্যক্তি এত কৃপণ সে আমাকে আর কি দান করিবে? তার পরদিন সেই দরিদ্র ব্যক্তি পুনরায় মুহম্মদের নিকট যাইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। তিনি পুনরায় তাহাকে ওসমানের নিকট যাইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ জানাইতে বলিলেন। পুনবায় সেই দরিদ্র ব্যক্তি ওসমানের বাড়ী যাইয়া শুনিল, ওসমান্ তাঁহাব স্ত্রীকে বলিতেছেন,—"তুমি কাল রাত্রিতে এত তেল জ্বালাইলে কেন? এইরূপ অপব্যয় করা ঠিক নয়।" এইবারও সেই দরিদ্র মুসলমানটি মনে করিল, "যে ব্যক্তি এইরূপ কৃপণ, তাহার নিকট আর কি ভিক্ষা করিব?" তারপরদিন আবার প্রেরিত মহাপুরুষের নিকট যাইয়া ভিক্ষা চাহিলে, তিনি সেই এক কথাই বলিলেন,—"তুমি ওসমানের নিকট গিয়া আমার আশীর্ব্বাদ জানাও।" এইবার দরিদ্র ব্যক্তি ওসমানের নিকট গিয়া কহিল,—"হজরত মুহম্মদ আপনাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন" ওসমান এই কথা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া কহিলেন, "প্রভু আমাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন, হে আনন্দ-সংবাদ-বাহক, তুমি আমার পুরস্কার

গ্রহণ কর। আমার এই অর্থ ও উষ্ট্র আজ বাণিজ্য হইতে ফিরিয়াছে, তুমি তাহা গ্রহণ কর।" দরিদ্র ব্যক্তি, ওসমান্ তাহাকে উপহাস করিতেছে মনে করিয়া নিরস্ত থাকিলে পর, ওসমান্ বলিলেন,—"না, না বন্ধু, ইহা উপহাস নয়, আমি সত্যই তোমাকে আমার এই উষ্ট্র এবং বাণিজ্যে যাহা কিছু লাভ করিয়াছি, তাহা দান করিলাম।" দরিদ্র মুসলমান ভাবিল—হাঁ, ওসমান্ দাতা বটে।

ওসমানের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব সত্ত্বেও আরবদের মত দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে পরিচালনা করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। ওসমান অশীতিপর বৃদ্ধ, দুর্ব্বল এবং অপটু ছিলেন। তিনি সমস্ত রাজ্যভার ওমিয়া পরিবারের হাতে ছাড়িয়া দেন এবং খলিফা ওমরের নিযুক্ত বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে পদচ্যুত করিয়া নিজের বংশের লোক ও আত্মীয় স্বজনদের নিযুক্ত করেন। আর একটা দুর্ভাগ্যের কারণ এই যে, প্রেরিত মহাপুরুষ নিজে যে মারওয়ানকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি সর্ব্বময় প্রতিভূ নিযুক্ত করেন। ছয় বৎসর বেশ নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল। কারণ, তখন মুসলমানগণ পূর্ব্বে বাল্হীক, হীরাট, কাবুল, গজনী, সিস্তান প্রভৃতি প্রদেশ বিজয়ে ব্যস্ত ছিল। তাঁহারা উত্তরে এশিয়া মাইনর, কৃষ্ণসাগর, পশ্চিমে আফ্রিকার ত্রিপলী ও ভূমধ্যসাগরে সাইপ্রাস দ্বীপ জয় করিয়া রোমকদের মিসর বিজয়ের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। বিজিত প্রদেশে জলাশয় খনন, পথ ও মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করা হইল, কিন্তু ইস্‌লামের এই নানাদেশে প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার আভ্যন্তরীণ অশান্তির অভাব ছিল না। ওমিয়াদের অত্যাচারে, মারওয়ানের নিষ্ঠুর আচরণে প্রজাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। আলি, বহুবার ওস্‌মান্‌কে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ ওসমানের মারওয়ানের উপর অসীম বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল; কাজেই, তিনি অত্যাচারের কোনও প্রতিকার করিলেন না। নির্য্যাতিত প্রজাবৃন্দ একদা বৃদ্ধ ওসমানকে আক্রমণ করিল। মহাপ্রাণ আলি বহু চেষ্টা করিয়াও ওসমানের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলেন না, অসন্তুষ্ট প্রজাদের হাতে তাঁহার প্রাণ দিতে হইল। ওসমানের মৃত্যুর পর আলি খলিফা মনোনীত হইলেন।

খলিফা ওসমানের শাসনকালে ইস্‌লাম যদি রাজ্য জয় ও রাজ্যবিস্তারের জন্য উন্মুখ না হইয়া বিজিত দেশসমূহে সত্যকার ইস্‌লাম প্রচারের চেষ্টা ও যত্ন করিত এবং আরবী ভাবধারা ও সংস্কৃতি বিস্তারের প্রয়াসী হইত, তবে হয়ত ইস্‌লামের রূপ অন্য প্রকারের হইত। ইস্‌লামের বিরাট্ ও বিস্তৃত সাম্রাজ্য বিস্তারের ফল হইল এই যে, ইস্‌লাম আপনার গুরুভারে আপনি নত হইয়া পড়িল। দূরের রাজ্য শীঘ্রই খলিফার হাত হইতে খসিয়া পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামের একত্ব হ্রাস পাইল।

খলিফা আলি (৬৫৬—৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ)

এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদের স্ববংশ, কোরায়েশ জাতির অন্তর্ভূক্ত এবং হাসেমী বংশের সন্তান। ইনি মুহম্মদের পিতৃব্য আবুতালিবের পুত্র, মুহম্মদের কন্যা ফাতিমার স্বামী। শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও জ্ঞানের গরিমায় ইস্‌লামের ইতিহাসে আলির চরিত্র অতুলনীয়। রক্তের দাবীতে আলির খিলাফতের দাবী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। জ্ঞানের দিক্ দিয়া আলির অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি তখন ছিল না। সাধুতায়, বীরত্বে ও ইস্‌লামের প্রচারের চেষ্টায় আলির দান খুব বড়। কথিত আছে, একদা কোন দুষ্ট ইহুদী আলিকে ঋণ দান করিয়াছিল, আলি সেই ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহুদী আলিকে অপদস্থ করিবার জন্য কাজীর নিকট যাইয়া অভিযোগ করিল যে, আলি তাহার ঋণ পরিশোধ করেন নাই। রাজ্যের নিয়মানুযায়ী কাজী আলির বিরুদ্ধে সমন পাঠাইলেন। আলি উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিয়াছি।" ইহুদী বলিল, "তোমার সাক্ষী কে?" আলি উত্তর করিলেন, "আমার পুত্র হাসান ও হোসেন।" ইহুদী কাজীকে বলিল, "আত্মীয়ের সাক্ষী প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।" সেই অনুসারে কাজী আলিকে ঋণ পরিশোধ করিতে আদেশ দিলেন। আলি, কাজীর আদেশ মানিয়া লইয়া আবার ইহুদীকে অর্থ দান করিলেন। আলি বলিলেন, "আমি জানি, আমি

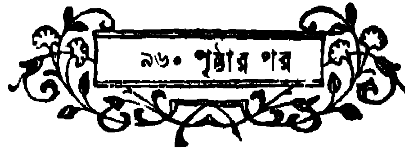
খলিফা, তবু আমি রাজ্যের যিনি প্রধান বিচারপতি সেই কাজীর আদেশ অমান্য করিতে পারি না। আমি ইহুদীকে পূর্ব্বেই অর্থ দান করিয়াছিলাম, কিন্তু কাজীর আদেশে আমাকে আবার ঋণ পরিশোধ করিতে হইল।" ইহুদী আলির এইরূপ সদাশয়তা, সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

খলিফা আলির মধুর চরিত্র এবং সর্ব্বব্যাপী মহত্ত্ব সত্ত্বেও ওমিয়াগণ তাঁহার শত্রুতা করিতে ক্ষান্ত ছিল না। তাহারা সিরিয়াতে প্রচার করিয়া দিল যে, আলিই ওসমানের মৃত্যুর কারণ। আলি ওসমানের নিযুক্ত অনুপযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে পদচ্যুত করিলেন ও তাহাদের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। ইহাতে বিরুদ্ধ দলের সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাইল। সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা মুয়াবিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। টাল্‌হা ও জুবেয়ার বিদ্রোহী হইল। হজরত মুহম্মদের প্রিয়তমা পত্নী আবুবকরের কন্যা আয়েসা সপত্নী-কন্যা ফাতিমার স্বামী আলিকে চিরকালই ঘৃণা করিতেন। আয়েসা বিবি বহুভাবে বিদ্রোহিদলকে প্ররোচিত করেন। ইরাকের পথে খোরাইবা নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হইল। টাল্‌হা ও জুবেয়ার নিহত হইল। আয়েসা বিবি বন্দিনী হইলেন। মহানুভব আলি মহাসমারোহে ও সসম্মানে আয়েসা বিবিকে মদিনায় প্রেরণ করিলেন। তারপর সিসিনের যুদ্ধে মুয়াবিয়া পরাস্ত হইলেন এবং কিছুকাল পরে ৬৬০ খৃষ্টাব্দে খলিফা আলি ও সিরিয়ার শাসনকর্ত্তার সহিত মুয়াবিয়ার সন্ধি হয়। সেই সন্ধি অনুসারে মুস্‌লিম রাজ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। কিন্তু এই সময় হইতে আলির শত্রু-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শত্রুরা চারিদিক হইতে তাঁহাকে বিব্রত করিতে লাগিল; গুপ্ত হত্যা ও বিষ প্রয়োগে আলির বন্ধুগণকে হত্যা করিতে লাগিল। খারেজী নামক একদল লোক আলির পক্ষ ত্যাগ করিয়া মুয়াবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে। তারপর পবিত্র রমজান মাসে ৬৬১ খৃষ্টাব্দে মসজিদের ভিতর খলিফা আলি যখন প্রার্থনারত ছিলেন, সে সময়ে আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। আলির সমাধি কুফার নিকট 'নজফ' নামক স্থানে বর্ত্তমান আছে। তাহা মুস্‌লিমদের তীর্থস্থান।

ইস্‌লামের ইতিহাসে ইহা একান্ত দুর্ভাগ্যের কারণ এই যে, হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার তিনজন প্রিয় শিষ্য ও খলিফা আততায়ীর গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। মানুষ হিসাবে ওমর, ওসমান ও আলি এই তিনজন মহাপ্রাণ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি পৃথিবীর যে কোন জাতির গৌরবের সামগ্রী। মুহম্মদ যে দশ জনকে বেহস্তের খবর দিয়াছিলেন, আলি তাঁহাদের একজন। মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া প্রেরিত মহাপুরুষ যে ছয় জন প্রিয় ব্যক্তির নাম করেন, আলি তাঁহাদের একজন। খলিফা আলি মুহম্মদের সঙ্গে বদর, ওহোদ, খন্দক ও তাবুকের যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধেই যোগদান করিয়াছিলেন। আলির পরামর্শ অনুসারেই খলিফা ওমর হিজরত হইতে মুস্‌লিম সন গণনা করিয়াছেন। আলির নিকট হইতে ৫৮৬ হাদিস পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার মধ্যে ৪৪টি বোখারি কর্ত্তৃক গৃহীত। কোন পার্থিব পদার্থের জন্য আলির আকর্ষণ ছিল না। মৃত্যুর পর তাঁহার সঞ্চিত অর্থ ছিল মাত্র ছয় শত দিরহাম।



সাত বারের নাম



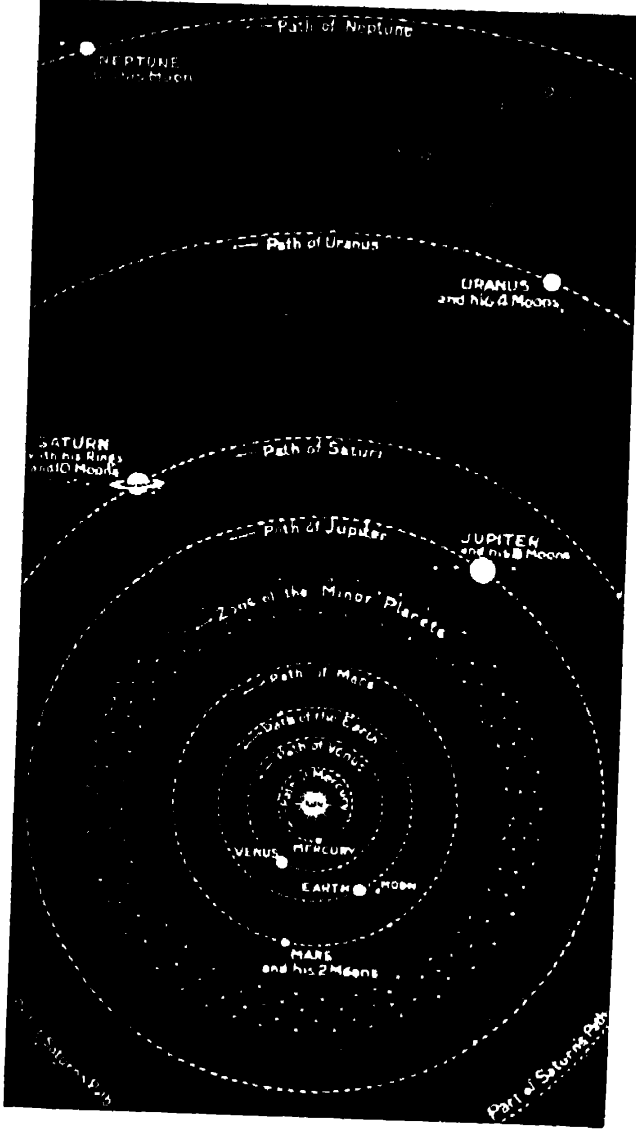
ছয়টি গ্রহ ও একটি উপগ্রহের নাম অনুসারে সাত বারের নাম হইয়াছে। এই নামকরণ ও উহাদের পর্য্যায়-নিরূপণ সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। রবির পর সোম, তারপর মঙ্গল ও মঙ্গলের পর বুধ ইত্যাদি পর্য্যায়-নির্দ্ধারণের কারণ কি?

যদি গ্রহগুলির অবস্থান বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে সূর্য্যের পর কখনও সোম বা চন্দ্রের নাম এবং চন্দ্রের পর মঙ্গলের নাম হইতে পারে না। গ্রহগুলির অবস্থান অনুসারে রবির পর বুধ (Mercury), বুধের পর শুক্র, (Venus), শুক্রের পর (পৃথিবীর নাম যদি বাদ দেওয়া যায়) মঙ্গল (Mars), মঙ্গলের পর বৃহস্পতি (Jupiter) এবং উহার পর শনির (Saturn) নাম হওয়াই সম্ভবপর ছিল। কোন কোন ফলিত জ্যোতিষ গ্রন্থে এই গ্রহগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। (১) পুং গ্রহ, (২) স্ত্রী-গ্রহ ও (৩) ক্লীব-গ্রহ। এই শ্রেণী বিভাগ মতে সূর্য্য, মঙ্গল ও বৃহস্পতি পুং-গ্রহ, চন্দ্র, বুধ ও শুক্র স্ত্রী-গ্রহ এবং শনি ক্লীব-গ্রহ। এই মতানুসারে প্রত্যেক পুং-গ্রহের পর এক একটি স্ত্রী-গ্রহের অবস্থান কল্পনা করা হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত রবির পর সোম, মঙ্গলের পর বুধ এবং বৃহস্পতির পর শুক্র ও তাহার পর শনি ক্লীব-গ্রহের নাম ও অবস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষ ও চীনদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে সপ্তাহ গণনা চলিয়া আসিতেছে। আবার ইহুদীজাতির মধ্যেও এই নিয়ম প্রাচীন সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকেরা কিন্তু এইরূপ সময় বিভাগ জানিতেন না। খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার হওয়ার পরে উহা ক্রমে মিশর হইতে রোমসাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে প্রচলিত হয়। চন্দ্রের গতি অনুসারেই প্রাচীন সময়ে মাসের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু মাসকে সপ্তাহে বিভাগ না করিয়া, অন্য প্রকারে বিভাগ করিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মোটামুটি সাত দিনে চন্দ্র উহার কক্ষের এক চতুর্থাংশ পরিভ্রমণ করে এবং এক-চতুর্থাংশ অতিক্রম করিবার পর যথাক্রমে উহার প্রধান চারিটি পরিবর্ত্তন অর্থাৎ অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও দুইবার অর্দ্ধাকার চন্দ্র দৃষ্ট হয়। চান্দ্রমাসের পরিমাণ, অর্থাৎ এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময় ২৯'৫৩ দিন। ভগ্নাংশ বাদ দিলে মোটামুটি ৭ দিন অন্তর চন্দ্রের এক একটি প্রধান পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এই কারণেই বোধ হয়, মাসকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগকে এক সপ্তাহ ধরা হইয়াছে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মিশর দেশ হইতে ইউরোপে সপ্তাহে মাস বিভাগকরণ-প্রথা প্রচলিত হয়। মিশরের ফলিত জ্যোতিষ মতে দিবসের প্রত্যেক ঘণ্টার এক একটি গ্রহ অধিপতি। গ্রহগুলির অবস্থান উক্ত দেশের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা টলেমির মতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—(১) শনি (Saturn), (২) বৃহস্পতি (Jupiter), (৩) মঙ্গল

(Mars), (৪) রবি (Sun), (৫) শুক্র (Venus),



গ্রহগণের অবস্থান

(৬) বুধ (Mercury), (৭) চন্দ্র (Moon)। সুতরাং শনি হইতে আরম্ভ করিলে কোন সপ্তাহের প্রথম দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতিও উক্ত গ্রহ এবং ঐ দিনের নামও তদনুসারে হইয়াছে। এইরূপ ঐ দিনের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ঘণ্টার অধিপতি যথাক্রমে অবশিষ্ট ছয়টি গ্রহ। পর্য্যায়ক্রমে অষ্টম, পঞ্চদশ ও দ্বাবিংশতি ঘণ্টার অধিপতি পুনরায় শনি এবং পঞ্চবিংশতি ঘণ্টার, অর্থাৎ পর-দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি শনি হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ স্থানের গ্রহ, অর্থাৎ রবি। রবি হইতে ঐরূপ চতুর্থ স্থানে চন্দ্র বা সোম এবং সোম হইতে চতুর্থ স্থানে মঙ্গল এবং মঙ্গলের পর বুধ ও বুধের পর বৃহস্পতি এবং উহার পর শুক্র—এইরূপ পর্য্যায় হইবে। সুতরাং দিনের নাম শনি হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র হইয়াছে। শনি কোন দিবসের প্রথম, অষ্টম, পঞ্চদশ, দ্বাবিংশতি ঘণ্টার অধিপতি হইলে বৃহস্পতি যথাক্রমে দ্বিতীয়, নবম, ষোড়শ, ত্রয়োবিংশতি ঘণ্টার, ও মঙ্গল সেই দিনের চতুর্ব্বিংশতি ঘণ্টার অধিপতি হইবে। সুতরাং পরদিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে রবি। এইরূপে উহার পরদিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি চন্দ্র বা সোম হইবে। ইংরাজী চারিটি বারের নাম প্রাচীন স্যাকসন্ জাতির মধ্যে প্রচলিত গ্রহের বা দেবতাদের নাম অনুসারে হইয়াছে। Tuesday (মঙ্গলবার) স্যাকসন্ (Teuth), (Mars) এবং Wednesday (বুধবার)—Woden (Mercury), Thursday (বৃহস্পতিবার) Thor (Jupiter) এবং Friday (শুক্রবার) – Friga (Venus) নামানুসারে কল্পিত হইয়াছে। অপর তিনটি বার শনি, রবি ও চন্দ্রের নামে অভিহিত।

পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য্য জিনিষ

সেকালে "The seven wonders of the world" বা সাতটি আশ্চর্য্য জিনিষের কথা লোকের মুখে মুখে শুনা যাইত। সেই সাতটি আশ্চর্য্য জিনিষ হইতেছে (১) মিশরের পিরামিড (The Pyramids of Egypt); (২) ব্যাবিলনের শূন্যোত্থান (The hanging gardens of Bobylon); (৩) ওলিম্পিয়ার জিউস দেবতার মূর্ত্তি (The Statue :of:zeus at Olympia); (৪) এফিসাসের

ডায়েনা দেবীর মন্দির (The temple of Diana at Ephesus); (৫) হালিকারনেশাসের সমাধি-মন্দির (The Masoleum at Halicarnassuss); (৬) আলেকজেন্দ্রিয়ার ফেরোস্ বা আলোক-স্তম্ভ (The 'Pharos Light hause of Alexandria; (৭) রোডস্ দ্বীপের বিরাট্ মূর্ত্তি (The Colossus at Rhodes)।

মিশরের পিরামিড

পৃথিবীর এই সাতটি প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন হইতেছে মিশরের পিরামিড। খুফু (Khufu)-র নির্ম্মিত পিরামিডটি অক্ষত দেহে সগৌরবে দাঁড়াইয়া আছে।

এই পিরামিড গঠিত হইয়াছে ৪৭০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে। কায়রো সহরের দশ মাইল দূরে একটি মরুভূমির বুকে প্রাচীন মিশরের পিরামিডগুলি দেখা যায়। ছয় হাজার বৎসর যাবৎ এই সকল পিরামিড বালুকাময় বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গ্রীক্ ঐতিহাসিক হিরো ডোটাস্ (Hero dotus) বলেন যে, একলক্ষ লোক শুধু পিরামিডের পাথরগুলি আনিবার জন্যই নিযুক্ত থাকিত। কাজেই, কিভাবে কত অর্থব্যয়ে এবং কতজন মজুর খাটিয়া এই পিরামিডগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া



খুফুর বৃহৎ পিরামিড

কতকাল চলিয়া গিয়াছে, কত বর্ষা-বাদল, ঝড় ঝঞ্ঝা ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তবু আজ পর্য্যন্ত দেখ। পিরামিডের ভিতরে সেকালের ফেরোয়া বা মিশরের সম্রাটদের সমাধি রহিয়াছে। পাথরের

সিঁড়ি বাহিয়া যেমন পিরামিডের উপরে উঠিতে পারা যায়, তেমনি ইহার নীচেও অর্থাৎ সমাধি-কক্ষগুলির মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারা যায়।

ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান

বোগদাদ নগরী হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে, ইউফ্রেতিস্ (Euphrates) নদীর তীরে অতি প্রাচীনকালের একটি সহরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সহরটি হইতেছে সেকালের ব্যাবিলন নগরী—অর্থাৎ কি না স্বর্গদ্বার (Gate of God)। তোমরা ইহুদীজাতির ইতিহাসে নেবুকাদ্‌নেজার (Nebuchadnezzar) নামে একজন রাজার কথা পড়িয়াছ। ইনি ৬০৪-৫৬১ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত বেবিলোনিয়ার রাজা ছিলেন। নেবুকাদ্‌নেজার ব্যাবিলন নগরীকে নানা সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ী ও বাগান ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া সুশোভিত করিয়াছিলেন।



ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান

এই ব্যাবিলন নগরীতে নেবুকাদনেজার একটি অপূর্ব্ব উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্-পত্নী আমিতিসের (Amytis) মনোরঞ্জনের জন্য নেবুকাদনেজার ইহা নির্ম্মাণ করেন। আমিতিস্ ছিলেন পার্ব্বত্য দেশের কন্যা, তাঁহার নিকট ব্যাবিলনের ন্যায় সমতলদেশ একেবারেই ভাল লাগিত না। এইজন্য স্তরে স্তরে খিলানের পর খিলান দিয়া এই বিচিত্র সুন্দর উদ্যান নির্ম্মিত হয়। কোন কোন স্তর ৭৫ ফিট উঁচু এবং প্রায় তিন শত ফিট বিস্তৃত ছিল। সিঁড়ি বাহিয়া একটির পর একটি স্তরে উঠিতে পারা যাইত। আর প্রত্যেকটি স্তর নানা জাতীয় ফুল ও ফলবান্ তরুতে শোভা পাইত। সর্ব্বোচ্চ স্তরের উপর দাঁড়াইলে ব্যাবিলন নগরীর শোভা ছবির ন্যায় ফুটিয়া উঠিত। রাজ্ঞী আমিতিস এই উদ্যানে আসিয়া পিতৃভূমির কথা স্মরণ করিতেন। ইউফ্রেটিস্ নদীর রূপার মত শাদা জল ও তাহার বক্রগতি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইতেন। এই উদ্যান বহুকাল হইল একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।



জিউস্ দেবতার মূর্ত্তি

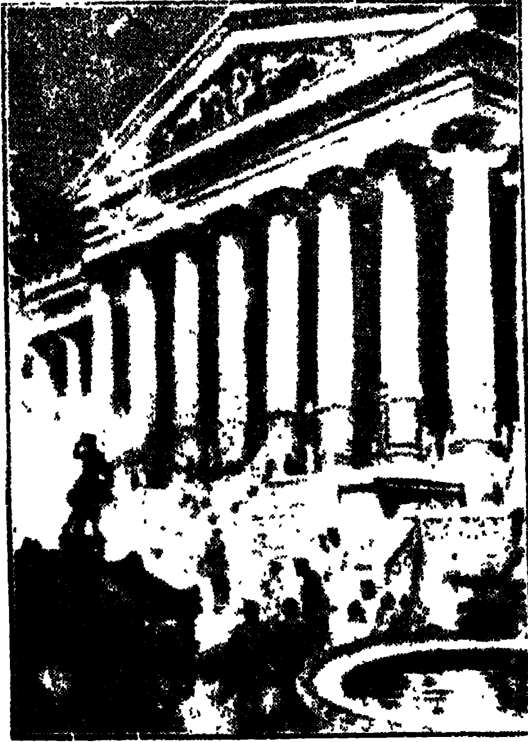
ওলিম্পিয়ার জিউস দেবতার মূর্ত্তি

এই মূর্ত্তির বিষয় তোমরা 'শিশু-ভারতী'র ১৯১৩ পৃষ্ঠায় পড়িয়াছ। ষাট ফিট উঁচু জিউস বা জুপিটার

দেবতার মূর্ত্তিটি ছিল গ্রীক শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। হস্তিদন্তের ও সোনার নানারূপ কারুকার্য্য-শোভিত জিউস দেবতার মূর্ত্তি দেখিলে মানুষের মন শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে নত হইত। জিউসের মূর্ত্তিটির কোন চিহ্ন আর এখন বিদ্যমান নাই। এলিসের (Elis) মুদ্রার গায়ে এই মূর্ত্তির খোদিত প্রতিলিপি হইতে আমরা সেকালের জিউস দেবতার মূর্ত্তি কেমন ছিল, তাহা জানিতে পারিতেছি।

ডায়েনা দেবীর মন্দির

এশিয়া মাইনরের মধ্যে সেকালে গ্রীকদের নির্মিত এফিসাস্ (Ephesus) নামে একটি প্রাচীন নগরী

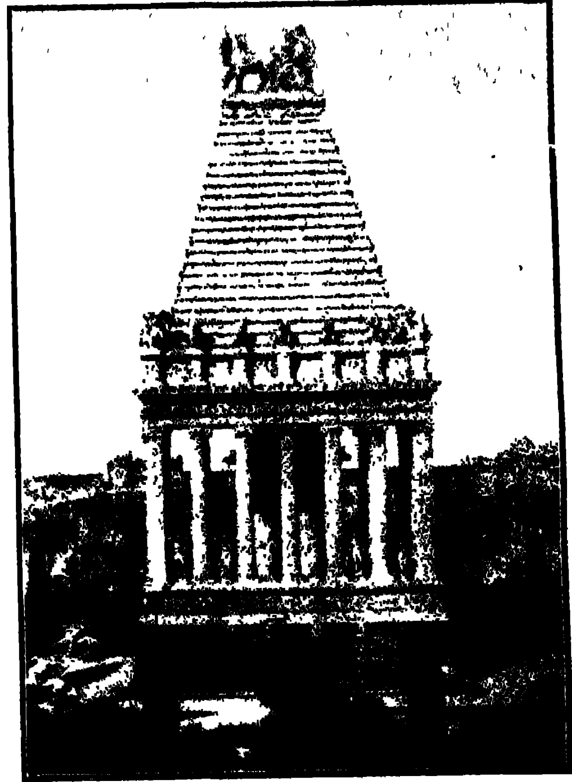


ডায়েনা দেবীর মন্দির

বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান সময়ে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে সেই প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে। গ্রীকেরা যখন এফিসাস নগরীর প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁহারা আর্ত্তিমিস্ (রোমকদের ডায়েনা) দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। উহা পরে ডায়েনা দেবীর মন্দিররূপে পরিচিত হয়। ডায়েনা দেবীর মন্দির একটির পর একটি এই ভাবে চারিটি মন্দির বিনষ্ট হইলে পর, যে পঞ্চম মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়, তাহা ছিল শিল্প ও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। সম্ভবতঃ ৩০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ২৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মন্দিরটি বিদ্যমান ছিল। গথেরা এই মন্দির ধ্বংস করে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ডায়েনা দেবীর মন্দিরের একটি স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে।

হালিকারনেশাসের সমাধি-মন্দির

সেকালে এশিয়া মাইনরের অন্তর্ভুক্ত কারিয়া (Caria) রাজ্যের রাজা ছিলেন মৌসোলাস (Mausolus)। খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ তৃতীয় শতাব্দীতে



হালিকার্নেশাসের মৌসোলাস

মৌসোলাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পতিব্রতা পত্নী রাজার সমাধির উপর যে মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা ভাস্কর শিল্পের দিক্ দিয়া অপূর্ব্ব সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইত। গ্রীক্ নৃপতিরা ঐ সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব, ইহা তৃতীয় খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের অষ্ট-কোণাকৃতি চূড়ার উপর ছিল চার ঘোড়ার একটা

রথ। হালিকার্ণেশাসের এই সমাধি-মন্দির 'মৌসোলিয়াম' হইতে এখন বিখ্যাত সমাধি-মন্দির-গুলিই 'Mausoleum' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এই সমাধি-মন্দিরের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আছে।

ফ্যারোসের আলোক-স্তম্ভ

প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ নগরী আলেক্‌জান্দ্রিয়ার কাছাকাছি ফ্যারোস্ নামে একটি ছোট দ্বীপ ছিল। দিগ্বিজয়ী বীর আলেক্‌জাণ্ডার যখন আলেক্‌জান্দ্রিয়া



ফ্যারোসের আলোক-স্তম্ভ

নগরী প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি ফ্যারোস্ দ্বীপের সহিত আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরীকে একটি সেতু দ্বারা সংযোজিত করিয়াছিলেন। ফ্যারোস্ দ্বীপের পূর্ব্বকোণে মিশরের সম্রাট দ্বিতীয় টলেমি (Tolemy II) শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা একটি আলোক-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। এই আলোক-স্তম্ভটির উচ্চতা ছিল পাঁচশত ফিট। সম্ভবতঃ ২৮০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে এই বিরাট আলোক-স্তম্ভটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বিরাট আলোক-স্তম্ভটি সেকালে ফ্যারোস্ অব্ আলেকজান্দ্রিয়া বা আলেকজান্দ্রিয়ার আলোক-স্তম্ভ নামে বিখ্যাত ছিল।

রোডস্ দ্বীপের বিরাট মূর্ত্তি

এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, ইজিয়ান্ সমুদ্রের মধ্যে রোডস্ নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। সেকালে রোডস্ দ্বীপের রোডস্ বন্দর ছিল খুবই বিখ্যাত। এই বন্দরের প্রবেশ-পথে হেলিয়োস



রোডস্ দ্বীপের বিরাট মূর্ত্তি

(Helios) বা সূর্য্যদেবের ব্রোঞ্জধাতুনির্ম্মিত এক বিরাট মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মূর্ত্তির উচ্চতা ছিল একশত ফিট। অনেকে বলেন যে, এই মূর্ত্তিটি দুই দিকের দুইটি পাদপীঠে পদদ্বয় বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সম্ভবতঃ এইরূপ অনুমান সত্য নয়। বন্দরের প্রবেশ-পথের একদিকেই উহা স্থাপিত ছিল। ২২৪ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের ভূমিকম্পে এই মূর্ত্তিটি ভূমিসাৎ হইয়া যায়।



দেশ-বিদেশের জাতীয় সঙ্গীত

[এখানে ভারতবর্ষ ব্রিটানিয়া, ক্যানাডা, ওয়েলস্, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ডেন্‌মার্ক, মাওরি-জাতি—অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় সঙ্গীত প্রকাশিত হইল। ব্রিটানিয়া, ক্যানাডা, ওয়েলস্, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড ও ডেন্‌মার্ক্-এর জাতীয় সঙ্গীতের অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম, এ, আই ই, এস। মাওরি জাতির জাতীয় সঙ্গীতটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক অনূদিত।]

ভারতবর্ষ

[১৫৭৩ পৃষ্ঠার পর]

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা !
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশীষ মাগে,
গাহে তব জয়-গাথা।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয়, হে।
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক মুসলমান, খৃষ্টানী,
পূরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয়, হে।
পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চিরসারথি তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে, তব শঙ্খধ্বনি বাজে,
সঙ্কট-দুঃখত্রাতা।
জনগণপথ পরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয়, হে।


শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে,
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণ দুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয়, হে।

রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব্বউদয়গিরিভালে
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবন রস ঢালে!
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে,
তব চরণে নত মাথা।
জয়, জয়, জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্যবিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে।



ব্রিটানিয়া

সুনীল সিন্ধু মথিয়া যেদিন বিধিনির্দ্দেশে
উঠিলেন ভবে,
ব্রিটন্ লক্ষ্মী, ছিল হাতে তাঁর এই বিধি-লিপি,
—ধরাবাসী সবে

কর অবধান,—দেবদূতগণ ধরিলেন তান
মিলিত স্বরে,
—ব্রিটানিয়া, তুমি উর্ম্মিদোদুল সপ্তসাগর
করিবে শাসন,
ব্রিটন্‌রা ভবে যত দিন র'বে জেনো পরাধীন
হ'বে না কখন'।
অপর জাতিরা যা'রা তোমাসম দেবাশীর্ব্বাদে
হ'ল বঞ্চিত,
বলদর্পিত বিদেশী রাজার দাসত্বে তা'রা
হ'বে লাঞ্ছিত।
তুমি চিরদিন বন্ধনহীন ঋদ্ধি-গরিমা
লভিবে মহান,
ঈর্ষান্বিত নয়নে তোমারে হেরি ভয়ে
হবে বেপথুমান্।
মহিমা তোমার উজ্জ্বলতর হ'বে অনুদিন
নব নব জয়ে
অমোঘবীর্য্য অমরকীর্ত্তি অর্জ্জিবে তুমি
শত্রুক্ষয়ে।
বজ্রনিনাদে অন্তরীক্ষ শতধা হ'লেও
ওক্ মহীরুহ
দৃঢ়-মূল যথা, তেমনি তোমারে অটল করিবে
শত্রুসমূহ।
কভু বশীভূত করিতে তোমারে প্রতিদ্বন্দ্বী
পারিবে না জানি,
তাদের চেষ্টা বক্ষে তোমার নববিক্রম
দিবে শুধু আনি'।

গর্ব্বোজ্জ্বল দিব্যদীপ্তি তুলিবে ফুটায়ে
আননে তোমার,
নিজ-নিগ্রহ লইবে বরিয়া রটাবে তোমার
জয়জয়কার।

সুজলা সুফলা পল্লী কত না জানি হ'বে তব
করতলগত,
নগরে নগরে শোভিবে তোমার বণিকপণ্য
বীথি কত শত।

সাগরসেবিতা তুমি অধিরাণী সিন্ধু-মেখলা
এ বিপুল ভবে,
প্রতি উপকূলে তোমার পতাকা সুনীল আকাশে
উড্ডীন হ'বে।

রাজ্যে তোমার পদ্ম-সদ্ম লভিবেন মহাসুখে
বীণাপাণি,
সৈকতে তব পাতিবেন তিনি অমলকমল-
দলাসনখানি।

দেবতা-আশীষে দীপ্তোজ্জ্বল অনুপকান্তি
ললাটে তোমার
অকুতশঙ্ক বীরকেশরীরা অটলপ্রহরী
তব সিকতার।

উর্ম্মিদোদুল নীলসিন্ধুরে নিরবধি তুমি
করিও শাসন,
ব্রিটনরা ভবে যতদিন র'বে জেনো পরাধীন
হ'বে না কখন'॥



ক্যানাডা

মহীয়সী দেশলক্ষ্মী, প্রণমি তোমারে।
'ওক্' আর 'পাইনের' তুমি মাতৃভূমি,
সৌরকরে শস্যক্ষেত্র বিছায়েছ তুমি,
কত খনি, কী বনশ্রী নত ফলভারে!

'নায়াগ্রা' প্রপাতধারা গায় অবিরল
তোমার প্রশস্তি-গাথা সদা ভীমনাদে,
'হাড্‌সনের' উপকূলে উছল-আহ্লাদে
সেই সাথে করতালি দেয় উর্ম্মিদল।

'লাব্রাডরের' তটে মত্ত 'আট্‌লান্টিক্'
করে তব স্তব গান যবে অট্টরোলে,
সেই সনে 'ভ্যাঙ্কুভার্'-সিকতায় তোলে
'প্যাসিফিক্' জয়ধ্বনি মথি' দশদিক্।

উত্তরাশানিবাসিনী 'মেপ্‌ল্'-কুন্তলা,
তোমারে প্রণমি রাণী ওগো জন্মভূমি,
হিমগিরিনিখচিত কিরীটিনী তুমি
উদার প্রান্তরে তুমি শ্যামলদুকূলা॥

পোল্যাণ্ড



মাওরি জাতি—অষ্ট্রেলিয়া



মোদের পোল্যাণ্ড্ বিশ্বে স্বাধীন র'বে
পুত্রেরা তা'র যত দিন র'বে ভবে।
যাহা কিছু কভু হারায়ে গিয়াছে তা'র
প্রাণপণ করি' করিব তা' উদ্ধার।

হে দমব্রস্কি হও তুমি আগুয়ান
যাব সাথে মোরা স্বদেশের সন্তান,
মুক্তি লভিতে, ছিঁড়িবারে শৃঙ্খলে,
পোল্যাণ্ড্ স্বাধীন হবে এই ভুজবলে॥

শত্রু আছে ঘরের কাছে
চড়াও হ'য়ে পড়্‌ব কি ?
—হাঁ, জী জোয়ান! হাঁ, হাঁ, জী!
শত্রু আছে বনের পাছে
শড়্‌কী ধনুক ধর্‌ব কি ?
—হাঁ, জী জোয়ান! হাঁ, হাঁ, জী!
শক্তি সাহস কেমন ওদের ?
ওদের সাথে পার্‌ব কি ?
—হাঁ, জী জোয়ান। হাঁ, হাঁ, জী!
শড়্‌কী এখন ছাড়্‌ব কি ?
—হাঁ, জী জোয়ান! হাঁ, হাঁ, জী!

মুণ্ড কেটে পাড়্ব কি ?
—হাঁ জী জোয়ান ! হাঁ, হাঁ, জী !
ওদের ফুঁড়্ব তবে ফাড়্ব তবে
রক্তেতে জিভ নাড়্ব কি ?
—হাঁ জী জোয়ান ! হাঁ, হাঁ, জী !
তপ্ত সাগর ওড়ন পাড়ন
ওদের মাংস সেঁকে সারব কি ?
—হাঁ জী জোয়ান ! হাঁ, হাঁ, জী !

ওয়েল্‌স্‌

'হারলেখ্'-বাসী পাও কি শুনিতে উপত্যকার কোলে
প্রচণ্ড বেগে একি কলরোল আকাশ ভরিয়া দোলে ?
ঢেউ পর ঢেউ পড়ে যেন ভাঙি' ভুজঙ্গ-ফণা তোলে ?
রণ ঝনঝনা অদূরে উঠেছে বাজি' ।

ধরাকম্পিত 'স্যাক্সন্'-অরি-মন্দ্রিত-পদভরে,
বর্শা-ফলক 'স্যাক্সন্' হাতে ধনু স্যাক্সন্ করে,
হোক্ না আমীর, হীন পদাতিক, ধরুক্ যে নাম ধরে,
ধূলি-শয্যায় তা'রা লীন হ'বে আজি ।

উড়াও পতাকা, সে নিশান-তলে আমরা লভিব জয় ।
ভেদি' নীল নভ হানিব বজ্র, অন্যথা কভু নয় ।
গুটান' নিশান প্রসাদ পবনে দাও আজি প্রসারিয়া,
যে পতাকা-তলে জয়ী হ'ব মোরা শত্রুসংহারিয়া,
বজ্রে বজ্রে হানিব মৃত্যুবাণ ।

চল আগুসারি' দুর্ব্বার বেগে শোন' স্বদেশের বাণী,
শ্রেষ্ঠ সে বীর ছুটেছে যে আগে, সেই অগ্রণী জানি,
সে অধিনায়ক দেশমর্য্যাদা জয়শ্রী দিবে আনি' ।
জয় 'ক্যাম্ব্রিয়া' জয় ন্যায়, ভগবান্ ।

উপল-বহুল তুঙ্গ শৃঙ্গ, গিরিসঙ্কটাবলী
শর-নির্ঝর ভল্লফলক দিক্ আজ ঝলমলি,'
দুঃখ শঙ্কা তুচ্ছ করিয়া নির্ভয়ে যাব চলি,'
মৃত্যু মোদের মণ্ডিত গৌরবে ।

অশ্বারোহণে আসিছে যাহারা লুটাক্ ধরণী' পরে,
ধূলিশয্যায় লভুক্ কবর আসে যারা বেগভরে,
পত্নী, বন্ধু, প্রিয়ার ভাগ্য আজি টলমল করে,
প্রতিপদাঘাতে মৃত্যুর তাণ্ডবে ।

জীবন-সূত্র ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় সংঘাতে সংঘাতে,
মরণের দেনপাওনা শুধিয়া দিব আজি হাতে হাতে,
কালের বহ্নি-উঠিছে জ্বলিয়া ভীষণ অশনিপাতে,
কাঁদিছে করুণা চাহিয়া স্বর্গপানে ।

'গারলেখ'বাসী বৃদ্ধ তরুণ অমর হ'তে কি চাও ?
কিংবদন্তী-কীর্ত্তিত যদি হ'বে তবে প্রাণ দাও।
স্বদেশ, জীবন, গৌরব তরে সম্মুখে ছুটে যাও,
ভুলোনা স্বদেশে, সত্যে ও ভগবানে।

ডেন্‌মার্ক

মাস্তুল পাশে কৃপাণ হস্তে নৃপতি কৃষ্টিয়ান্
কুণ্ডলায়িত ধূম্রকুহেলি মাঝে দণ্ডায়মান্।
ঘূর্ণায়মান্ অসির ঝিলিক্ খেলে অরাতির শিরে,
সেই কুয়াশায় শত্রু-তরণী ডুবিল সিন্ধুনীরে।
'কর পলায়ন' 'কর পলায়ন' ওঠে রব চারিধারে,
ডেন্‌মার্কের কৃষ্টিয়ানেরে কে বল রোধিতে পারে ?

ঝঞ্ঝাবাত্যা ওই পড়ে ভেঙে শোন 'নিল্‌সজুয়েল্'।
মাহেন্দ্রখণ এসেছে এখন সাথে লয়ে উদ্বেল।
রক্তপতাকা অমনি করে সে উড্ডীন অম্বরে
আহত শত্রু আর্ত্তনিনাদে ক্ষুব্ধ গগন ভরে।
ডেনমার্কের রুদ্র প্রতাপ সহিবে সাধ্য কার ?
পলায়নপর বিজিত শত্রু নাহি পায় নিস্তার।

হে মেরুসিন্ধু, ভ্রূকুটিকুটিল তব আকাশের পারে
'অপসারি' মেঘ 'উইসেল্, গিরি ওই দেখ উঁকি মারে।
তোমারি লাগিয়া যত বীর-হিয়া সমর দর্পে জাগে,
তোমার অতলে শত্রু সদলে সিন্ধু-সমাধি মাগে।
নাই আশা আর 'পালাও' 'পালাও' ফুকারে বিজিত অরি,
ডেন্‌মার্ক হ'তে 'ষ্ট্রিকেন্‌স্কিয়ল্ড' হাঁকে,-'দাও দূর' করি'।

ডেনদের খ্যাতি প্রতাপের পথ তুমি অববোধ-হারা,
ওই কালো জলে লহ তাহাদেরে টলে নাই কভু যারা,
ভীষণ মরণ সম্মুখে, ঘোর বিপদের মাঝখানে
তোমারি মতন ঝঞ্ঝারে যারা তুচ্ছ করিতে জানে।
তোমার নিবিড় বাহুবন্ধনে ডুবিব গহনতলে,
আমার রুধির সমর-বিজয়ে মিশুক্ তোমার জলে।



সুইটজারল্যাণ্ড

পূরবে যখন জাগে মধু অরুণিমা
তোমারে নয়নে আনে যে সে ঊষালোক।
হে ভূমা, নাহিক মহাকালে তব সীমা!
তোমার চরণে ঊর্দ্ধগামিনী হোক্
মোদের স্বাধীন হৃদয়ের প্রার্থনা।
প্রতি প্রত্যূষে 'আল্প্‌সে' লোহিত-রাগে
আঁকে যবে ভানু কিরণের আলিপনা
স্বর্গ-সরণি আমাদের চোখে জাগে।



সন্ধ্যা আঁধার হেথায় ঘনায় যবে,
তারকা-বিথারে হেরি প্রেম-আঁখি তব।
হে চিরবন্ধু, শুধু কি গগনে র'বে?
দিব্যদৃষ্টি দাও মোরে অভিনব,
জন্মভূমিতে স্বর্গ হেরিব তবে।

ওই গিরিমালা মেঘে ঢেকে যায় যদি,
মেঘবিস্তারে তোমারে হেরিব আমি,
দুরবগাহ্য প্রেম তব নিরবধি।
সে জলদজাল ধীরে যবে আসে নামি,'
ধূসর কুহেলি মেলি' দেয় পথখান
বিজয়ী ভানুর জয়শ্রী-অঙ্কিত।
তাহারি প্রসাদে ধরাবাসী হ'য়ে জানি,
পিতৃ-ভূ-স্বর্গে নিখিলেশ উপনীত।

ঝঞ্ঝাবাতের পৃষ্ঠে ফিরিছ তুমি,
সে তুমি মোদের চির-আশ্রয়ভূমি।
নিগূঢ় তোমার শুভোদ্দেশ্য জানি,
নিঃসংশয়ে ভ্রান্তি-বিহীন মানি।

ঝড়ের নিশীথে হও প্রলয়ঙ্কর,
তবু শিশুসম করি মোরা নির্ভর,
ওগো ভগবান, তোমার অভিপ্রায়
স্বর্গীয় ভূমি বুঝিবারে যেন পায়।



ধাঁধা ও হেঁয়ালী

[১৬০০ পৃষ্ঠার পর]

এক যে বুড়ী, তার ছয়টি ছেলে। ছেলেরা বড় দুষ্টু, নেহাত অবাধ্য। গরীব বেচারী ভিক্ষা করিয়া আনিয়া রান্নাবান্না করিয়া তাহাদের খাওয়ায়। আজও সে রান্না করিতেছে, ছেলেদের জন্য। কিন্তু



ছেলেরা সব এদিকে ওদিকে লুকাইয়া রহিয়াছে। বল দেখি, কোথায় তাহারা লুকাইয়া আছে? তোমরা যদি ছেলে কয়টিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দাও, তাহা হইলে বেচারী বুড়ী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবে। একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

শিশু-ভারতী

[ছেলেদের বিশ্বকোষ]

সম্পাদক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিষয়-বিভাগ

সপ্তম খণ্ড ৩১ হইতে ৩৫ সংখ্যা পৃষ্ঠা ২৪০১ হইতে ২৮০০